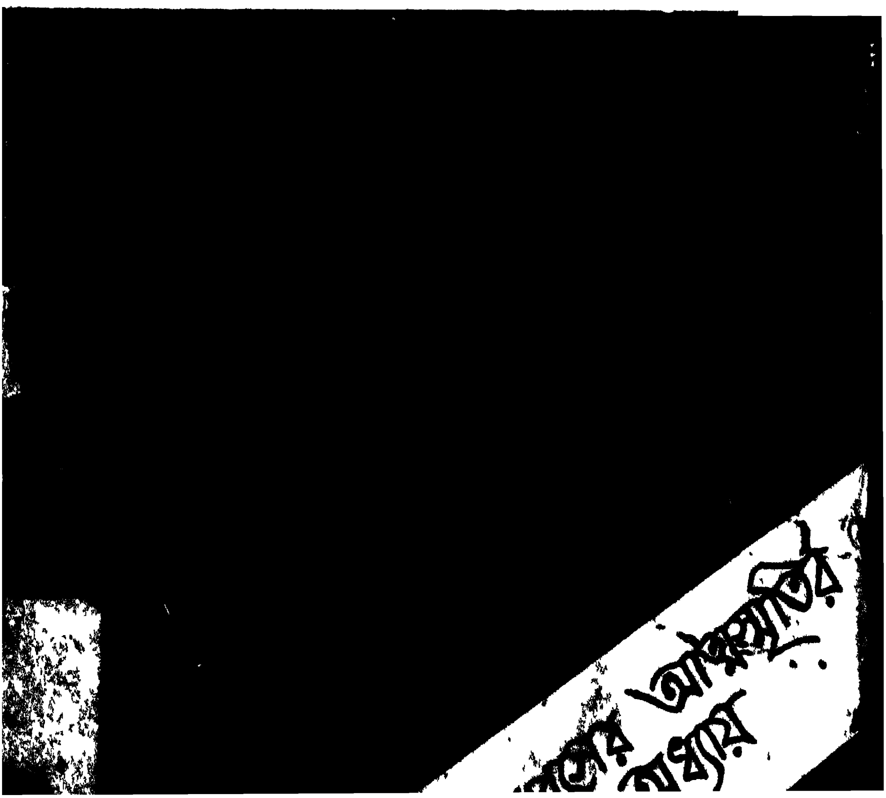
জেলে ত্রিশ বছর ও পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম



জেলে ত্রিশ বছর
ও
পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী
(মহারাজ)

প্রকাশক :—
মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী স্মৃতিরক্ষা কমিটির পক্ষে,
শ্রীদীনেশচন্দ্র ঘটক
১ গ্রীক চার্চ্চ রো এক্সটেনশন।
কলিকাতা-৭০০০২৬

প্রচ্ছদ-শিল্পী : শ্রীশুচিব্রত দেব

মুদ্রাকর—শ্রীঅজিতমোহন গুপ্ত
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
৭২।১, কলেজ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭৩

উৎসর্গ

পরাধীন পাক-ভারতে যাঁহারা দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ
বিসর্জন দিয়াছেন, অত্যাচার, নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন,
দেশবাসী যাঁহাদের নাম জানে না, সেই সব
অজ্ঞাতনামা বীরপুরুষদের উদ্দেশ্যে এই
ক্ষুদ্র পুস্তক খানা উৎসর্গ করিলাম।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী

ভূমিকা

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, জাতিকে সজীব রাখার ইতিহাস। একটা জাতি স্বাধীনতা সংগ্রামে যে আদর্শ, ত্যাগ নিষ্ঠা, বীরত্ব ও নির্যাতন ভোগের পরিচয় দিয়া যায়, তাহা দেখিয়া ভবিষ্যৎ জাতি গড়িয়া উঠে। পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, বীরত্ব আত্মত্যাগ ও নির্যাতন ভোগের ইতিহাস। দেশের স্বাধীনতা হঠাৎ একদিনে আসে নাই, সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরের কঠোর সংগ্রামের ফলে আসিয়াছে দেশের স্বাধীনতা। এই দেশেরই নির্ভীক যুবকের দল পরাধীনতার কলঙ্ক কালিমা মুছিয়া ফেলার জন্য স-শস্ত্র বিপ্লবের আয়োজন করিয়াছিল, তাহারা প্রাণের মায়া বিসর্জন দিয়া, সংসার বন্ধন ছিন্ন করিয়া, বিপ্লব অনলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল, নিজের সুখ-সুবিধার জন্য তাকায় নাই। তাহারা ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়া, সম্মুখ সংগ্রামে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া, জেলে-দ্বীপান্তরে সুদীর্ঘকাল অসহ্য অত্যাচার যন্ত্রণা সহ্য করিয়া আনিয়াছে দেশে নব-জাগরণ, আনিয়াছে দেশের স্বাধীনতা। আমার যৌবনের প্রারম্ভে আমি এই দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সহিত সক্রিয় ভাবে জড়িত ছিলাম, আজ আমার জীবনের সায়াহ্নে, আশী বৎসর বয়সে, আমার দেশের যুবকদিগের নিকট এই আশাই করিব, তাহারা দেশ প্রেমিক হইবে, দেশের কল্যাণ কামনা করিবে। তাহারা দেশকে সাম্প্রদায়িকতা বর্জিত, দুর্নীতি বর্জিত শক্তিশালী গণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করিবে।

এই পুস্তক প্রকাশে স্বদেশ নাগ, মৌলানা আলতাব হোসেন, বীরেন সরকার, শ্যামল বিশ্বাস, আজিজ খাঁন প্রভৃতি যাঁহারা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, আমি তাহাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। তরুণ শিল্পী "অরূপ" প্রচ্ছদপট আঁকিয়া এবং শ্রীরামলাল রায় ব্লকগুলি তৈয়ার করিয়া সাহায্য করিয়াছে, আমি তাহাদিগকেও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। ইতি।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী
পোঃ, গ্রাম—কাপাসাটীয়া
জিলাঃ—ময়মনসিং।

প্রস্তাবনা

আমার জীবন সফল হয় নাই। সাধারণতঃ সফল জীবন বলিতে লোকে যাহা মনে করে,—অর্থাৎ অর্থ উপার্জন, গৃহধর্ম পালন, রাজ-সম্মান লাভ,—তাহা আমার ভাগ্যে হয় নাই বলিয়া আমি জীবন ব্যর্থ হইয়াছে, মনে করি না ; বস্তুতঃ একদিক দিয়া দেখিতে গেলে আমার জীবন ব্যর্থ হয় নাই, আমার জীবন সফল হইয়াছে—সার্থক হইয়াছে। কিন্তু যে উদ্দেশ্য লইয়া জীবন প্রভাতে ঘরের বাহির হইয়াছিলাম, সেই উদ্দেশ্য সার্থক ও সফল হয় নাই। আমার যৌবনে যখন আমার ১৫ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ড হয়, ডাণ্ডা বেড়ী পায়, ক্ষুদ্র নির্জনকক্ষে দিন রাত্রি যখন আমি আবদ্ধ, তখনও মনে করি নাই আমার জীবন ব্যর্থ হইয়াছে, তখনও আমার মনে এই ধারণাই ছিল যে ১৫-বৎসর আর কত দিন, দেখিতে দেখিতে পনের বৎসর কাটিয়া যাইবেই ; ইতিমধ্যে যদি ভারতবর্ষ স্বাধীন না হয়, আমি জেল হইতে বাহির হইয়া ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের ব্যবস্থা করিব।

আমার স্বপ্ন সফল হয় নাই,—আমি সফলকাম বিপ্লবী নই। আমার ব্যর্থতার কারণ, আমার দুর্বলতা নয়! আমি কখনও ভীরু ছিলাম না—আমার জীবনে কখনও দুর্বলতা দেখাই নাই। আমি আমার চরিত্র নির্মল ও পবিত্র রাখিতে সক্ষম হইয়াছি। অর্থলোভ আমার ছিল না। এক সময় হাজার টাকা আমার হাতে আসিয়াছে, কিন্তু সে টাকা নিজের ভোগ-বিলাসিতার জন্য ব্যয় করি নাই। সেই সময়ও আমি রাস্তাঘাটে চলা ফিরার সময় চিড়া মুড়ি খাইয়াছি, যতটা সম্ভব পায়ে হাঁটিয়াই চলিয়াছি—গাড়ী ঘোড়া চড়ি নাই। মৃত্যুভয় আমার ছিল না, যে কোন বিপদজনক কাজে হাত দিতে

আমি পশ্চাৎপদ হই নাই। আমার স্বাস্থ্য ভাল ছিল, আমি কখনও অলস ছিলাম না, কঠিন পরিশ্রমের কাজে কখনও ভীত হই নাই, যখন যে কাজ করিয়াছি, আন্তরিকতার সহিতই করিয়াছি। আমার ব্যর্থতার কারণ পারিপার্শ্বিক অবস্থা, আমার ব্যর্থতার কারণ একজন দক্ষ ও সফলকাম বিপ্লবীর যতটা ধীশক্তি ও জন-গণ-মন অধিনায়কতার যে ব্যক্তিত্ব থাকা আবশ্যক তাহার অভাব।

আমার পিতার আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল। আমি ভাইদের মধ্যে ছিলাম সর্বকনিষ্ঠ। আমার পড়ার খরচের কোন অভাব ছিল না। আমি ছাত্রও খারাপ ছিলাম না—ভাল ছাত্রের মধ্যে গণ্য ছিলাম। তথাপি আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ডিগ্রী লাভ করিতে পারি নাই। আমার শৈশবে ১৯০২।৩ সনে যখন আমি মালদহ জিলার অন্তর্গত কাণসাটে ছিলাম এবং পুখুরিয়া মাইনর স্কুলে পড়িতাম তখন সেখানে স্কুলের শিক্ষক মহাশয়গণ আশা করিতেন আমি বৃত্তি পাইব। কিন্তু বৃত্তি পাওয়া আমার হয় নাই। মাইনর পরীক্ষা দেওয়ার পূর্বেই আমাকে কাণসাট পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হয় এবং উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্তি হই।

ময়মনসিংহ জিলার ধলা হাইস্কুলে আমি একবৎসর পড়িয়াছিলাম এবং সেখানেও ভাল ছাত্রের মধ্যে গণ্য ছিলাম। পর বৎসর আমি সাটিরপাড়া হাইস্কুলে ভর্তি হই এবং স্কুল-বোর্ডিং-এ থাকি। আমি সাটির পাড়া স্কুলে প্রথম দ্বিতীয় স্থানই অধিকার করিতাম। একবার একটি ঘটনা ঘটে। আমি যখন থার্ড ক্লাস হইতে সেকেণ্ড ক্লাসে উঠি,সেই বৎসর সংস্কৃতের প্রশ্ন খুব কঠিন হইয়াছিল। সংস্কৃতে মাত্র একজন ছাত্র পাশ করিয়াছিল। আমি কয়েক নম্বরের জন্য ফেল করিয়াছিলাম, কিন্তু মোটের উপর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলাম। সকল ছাত্রকেই কিছু গ্রেস্ দিয়া প্রমোশন দেওয়া হইয়াছিল। আমি প্রমোশনের দিন উপস্থিত ছিলাম না, সমিতির কাজে অন্যত্র ছিলাম, আমাকে প্রমোশন দেওয়া হয় নাই। আমি

বোর্ডিং-এ উপস্থিত হইয়া যখন শুনিতে পাইলাম আমি প্রমোশন পাই নাই, তখন বলিতে লাগিলাম, আমি আর পড়িব না, ঢাকা-সমিতির বোর্ডিং-এ চলিয়া যাইব এবং সমিতির কাজ করিব। আমার শিক্ষক মহাশয়গণ আমাকে খুব স্নেহ করিতেন। আমার মন্তব্য শুনিয়া তাঁহারা আমাকে ডাকাইলেন। আমি উপস্থিত হইলে, আমাদের তৃতীয় শিক্ষক শ্রদ্ধেয় শীতল চক্রবর্তী মহাশয় আমাকে স্নেহভরে বলিলেন—তুমি প্রমোশন নিশ্চয়ই পাইবে, কিন্তু তোমার নিকট হইতে আমরা এই প্রতিশ্রুতি চাই,—তুমি সমিতির কাজের জন্য যতক্ষণ সময় ব্যয় কর, পড়াশুনার জন্যও ততক্ষণ সময় দিতে হইবে—তোমার সকালে দুই ঘণ্টা ও রাত্রে এক ঘণ্টা পড়াশুনা করিতে হইবে। তিনি বলিলেন, দেশ যেমন তোমাকে চায়, আমরাও তোমার দিকে চাহিয়া আছি। আমাদের স্কুল হইতে এপর্যন্ত কেহ স্কলারশিপ পায় নাই। তুমি যদি প্রত্যহ তিন ঘণ্টা পড় তবে আমাদের বিশ্বাস তুমি স্কলারশিপ পাইবে। আমি শিক্ষক মহাশয়দের কথায় সম্মত হইলাম এবং আমার প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু স্কলারশিপ পাওয়া আমার অদৃষ্টে ছিল না। প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার পূর্বেই ১৯০৮ সনের মধ্যভাগে নারায়ণগঞ্জে ধৃত হই এবং আমার ছয় মাস জেল হয়। সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্য-জীবন শেষ হইয়া নূতন জীবন আরম্ভ হয়।

কারা-জীবন হইতেই আমার নূতন জীবন আরম্ভ হয় এবং সম্ভবতঃ কারাগারেই আমার জীবনের শেষ হইবে। আমি ভারতবর্ষের মধ্যে, ভারতবর্ষ কেন সম্ভবতঃ পৃথিবীর মধ্যে রাজনৈতিক কারণে সর্বাপেক্ষা অধিক বৎসর যাঁহারা কারাগারে কাটাইয়াছেন, তাঁহাদের অন্যতম। আমি ১৯০৮ সন হইতে ১৯৪৬ সন পর্যন্ত ৩০ বৎসর কারাগারে কাটাইয়াছি, ৪।৫ বৎসর অজ্ঞাতবাসে কাটাইয়াছি। আমি ১৯১৬।১৭ সনে আন্দামানে বারীণবাবু, পুলিনবাবু, সাভারকর, ভ্রাতৃদ্বয়, ভাই পরমানন্দ, জোয়ালা সিং, পৃথ্বি সিং, গুরুমুখ সিং, পণ্ডিত

পরমানন্দ, মোস্তাফা আমেদ প্রভৃতির সহিত একত্র ছিলাম। ১৯২৫।২৬ সনে ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত মান্দালয় জেলে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কাটাইয়াছি, ১৯৩২।৩৩ সনে মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত বিভিন্ন জেলে কে রামন মেনন, কর্ণাটকের সদাশিব রাও, অধ্যাপক এন, জি,রঙ্গ, মালাবার বিদ্রোহের নেতা এম, পি, নারায়ণ মেনন প্রভৃতির সহিত একত্র ছিলাম। বাঙ্গালা দেশের ছয়টি সেণ্ট্রাল জেলে এবং কয়েকটি ডিষ্ট্রীক্ট জেলেও ছিলাম। আমি বহু বৎসর সাধারণ কয়েদীর মত ছিলাম, দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদী ছিলাম এবং বিশেষ শ্রেণী (Special Class) কয়েদী ছিলাম। আমি ষ্টেট-প্রিজনার ছিলাম, ডেটিনিউ ছিলাম, সিকিউরিটি বন্দী ছিলাম এবং অন্তরীণাবদ্ধও ছিলাম। জেলখানার পেনাল কোডে যে সব শাস্তির কথা লেখা আছে এবং যে-সব শাস্তির কথা লেখা নাই, তাহার প্রায় সবগুলি সাজাই ভোগ করিয়াছি। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ জেলে বেশীর ভাগ সময় অসহ্য উৎপীড়নে জীবনের ত্রিশ বৎসর আমার কাটিয়াছে, জেলে এবং জেলের বাহিরে ষাট বৎসরকাল বিদেশী শাসনের অবসান ঘটাইয়া কেমন করিয়া দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধন করিব তাহাই চিন্তা করিয়াছি। আমার জীবনব্যাপী সাধনায় ও সেবায় জাতিকে বড় করিয়া তুলিব, ধর্মে-কর্মে, শৌর্যে,বীর্যে সংযমে-ঔদার্যে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে এবং চারিত্রিক শক্তিতে শ্রেষ্ঠ করিয়া তুলিব। আমার দেশের মানুষ অনুশীলনের দ্বারা পূর্ণ মানুষ হইয়া উঠিবে, থাকিবে না ক্ষুদ্র স্বার্থচেতনা, দুর্নীতি, বঞ্চনা, বৈষম্য ও শোষণ,—এই স্বপ্নই দেখিয়াছিলাম—আজ দেশ স্বাধীন হইয়াছে,—বৃটিশ প্রভুত্বের অবসান ঘটিয়াছে বটেই ; কিন্তু দেশ ও জাতিকে চরিত্র-গৌরবে বড় করিয়া তুলিবার যে আদর্শ ছিল বিপ্লবীর, যে দায়িত্ব ছিল বিপ্লবীর তাহা সফল হইল কই ? তাই তো স্বাধীনতার পরে দেশকে যেমনটি দেখিবার স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, সেই স্বপ্ন আজও বাস্তবে রূপায়িত দেখিতে পাই না। মানুষকে গতানুগতিক গ্লানি ও

দুঃখ দৈন্যের ঊর্ধ্বে তুলিয়া লইয়া যাওয়ার মধ্যে তো বিপ্লবীর সাধনার সিদ্ধি। কিন্তু সেই সিদ্ধি আনিতে পারি নাই; তাই মর্মান্তিক বেদনা-বোধ করিয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছি; আমার জীবন সফল হয় নাই।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

তখন স্কুল ছেড়ে সগু কলেজে উঠেছি। মৈমনসিং শহরে আনন্দমোহন কলেজে পড়ি, অনুশীলন সমিতির দাদাদের নির্দেশে যাকে বলা হতো দেশের কাজ তা-ই কিছু কিছু করি, আর গ্রামে গঞ্জে ঘুরে ঘুরে বেড়াই। এক মহারাজের কথা মাঝে মাঝে শুনতাম। মৈমনসিং শহর আর জেলাটা রাজা মহারাজে তখন রম্‌রমা ; সুতরাং কোনো এক মহারাজের কথা কানে এলে চমকে ওঠবার কিছু ছিলনা। কিন্তু অবাক হতাম, অনুশীলন সমিতির দাদারা যখন মহারাজ নামটি উচ্চারণ করতেন তখন তা করতেন খুব নীচু পরদায়, আর তার সঙ্গে জড়ানো থাকতো একটা আশ্চর্য শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম। মানুষটিকে তো তখনও চোখে দেখিনি ; কাজেই সবটাই যেন কেমন রহস্যময় লাগতো, কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতেও সাহস পেতাম না। তারপর একদিন মানুষটিকে দেখলাম, পাশের বন্ধুটি বললেন, এই তো মহারাজ। আমি দেখলাম, একটা তক্তাপোষের উপর বসে আছেন বেঁটে ধুতিপরা বেঁটে জামাপরা একান্ত আটপৌরে একটি মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ভদ্রলোক, যাঁর ব্যক্তিত্বের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য এমন কিছু নয় যা মানুষকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করতে পারে। সেদিনই প্রথম শুনলাম, তিনি মৈমনসিং জেলারই লোক, যাঁর নাম ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, কিন্তু দেশের মানুষ, বিশেষ করে বাংলার বিপ্লবীরা যাঁকে মহারাজের আসনে বসিয়ে ভালোবেসে তাঁকে ডাকে মহারাজ বলে।

এরও বেশ কিছুদিন পর এই মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। আমার অনুজপ্রতিম পরমপ্রীতিভাজন বন্ধু বিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরীকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন ; একাধিক রাজনৈতিক আপৎকালে তাঁরা দুজন একই সঙ্গে

একাধিক নাটকীয় ভূমিকায় অংশ নিয়েছিলেন। বিনয়ের বন্ধু ও 'দাদা' হিসেবেই বোধহয় তাঁর কাছে ছিল আমার মর্যাদা। যাইহোক, যখন সে-পরিচয় হলো তখন তিনি প্রায় কিম্বদন্তির মানুষ, বাঙ্গালীর বিপ্লবী যৌবনের গুরু, স্থিতধী এমন এক গীতোক্ত মানুষ, এমন এক মুনি যিনি লোমহর্ষক বিপ্লবীক্রিয়ার পরমুহূর্তেই একান্ত 'বীতরাগভয়ক্রোধ' হয়ে স্থির হয়ে ঘরের এক কোণে বসে নিজের ছেঁড়া জামা সেলাই করবার জন্য সরু স্ঁচের প্রায় অদৃশ্য ছিদ্রের ভেতর দিয়ে সূতো পরাতে পারেন। এমন একটি মানুষকে জানবার, স্নেহাকর্ষণে তাঁর নৈকট্য পাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ধন্য মানি, কৃতকৃতার্থ মানি নিজেকে। গভীর বিশ্বাসে বলি, আমার এই আশী ছুঁই ছুঁই বিচিত্র অভিজ্ঞতার জীবনে এমন স্বদেশ ও মানবপ্রেমী, এমন নির্ভীক, এমন সহজ, সরল, এমন রাগদ্বেষহীন, স্থিরচিত্ত, সর্বত্যাগী মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি।

ত্রৈলোক্য মহারাজের কিঞ্চিদধিক আশী বছরের জীবনে, ইংরেজ আমলে, ত্রিশ বছরেরও বেশি কেটেছে কারাগারে—ভারতবর্ষে, আন্দামানে, ব্রহ্মদেশে—নানা নিপীড়ন-উৎপীড়নের মধ্যে। চার-পাঁচ বছর কেটেছে অজ্ঞাতবাসে। পূর্বপাকিস্তানের জেলেও কেটেছে বেশ কিছুকাল। এর যে শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা সমস্তই তিনি বহন করেছিলেন ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মত, শুধু একটি স্বপ্নকে, দেশের স্বাধীনতার স্বপ্নকে জাগতিক জীবনে মূর্ত করে তুলবার জন্য। যে-স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন আজীবন, হয়তো আংশিকত তা সফলও হলো, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে দেশটাও দু'ভাগ হয়ে গেল। সে-দুঃখ বহন করেও তিনি তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের, অধুনা বাংলাদেশেই থেকে গেলেন, সে দেশের নাগরিক হিসেবেই। তিনি তা পেরেছিলেন যেহেতু দুই দেশের মানুষের মধ্যে তিনি কোনো সংকীর্ণ বিভেদকে স্বীকার করতেন না, এবং সে-দেশের মানুষকে

বিপ্লবীর আদর্শে গড়ে তোলাকেও তিনি নিজের বাকী জীবনের কর্তব্য বলে মনে করতেন। দেশে ব্রিটিশ প্রভুত্বের অবসান ঘটানোই তো তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য কখনো ছিল না। আমরা যারা তাঁকে মহারাজ বলতাম, আমরাই কি স্বাধীনতা চেয়েছিলাম শুধুমাত্র সেই সংকীর্ণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য? না, অনুশীলন সমিতিতে আমরা যারা স্বদেশদীক্ষা নিয়েছিলাম, আমাদের চিত্তে ও চেতনায় স্বাদেশিকতা ও স্বাজাত্যবোধের এই সীমিত সংকীর্ণ অর্থ ছাড়া বৃহত্তর, গভীরতর অর্থও একটা ছিল, তা হচ্ছে মানুষের মানবিক মহিমার পরিপূর্ণ বিকাশের পথ উন্মুক্ত করা।

সচেতন সাহিত্য সৃষ্টি প্রয়াসবিহীন, চারুকলাবিহীন, সাদা, সহজ, সরল সত্যভাষণের স্বচ্ছ সহৃদয়তায় ত্রৈলোক্য মহারাজ তাঁর জীবনের ক্রিয়াকর্ম, আদর্শবিশ্বাস, পদ্ধতিপ্রকরণ প্রভৃতির কথা বলেছেন, বলেছেন এমন অপরিপাটি, এমন আনান্দনিক ভঙ্গি ও ভাষায় যা তাঁর ব্যক্তিগত জগতের সঙ্গে অপরিচিত পাঠকের কাছে খুব অর্থবহ বলে মনে হবে না। কিন্তু, আমরা যারা তাঁকে দেখেছি, তাঁর কথা শুনেছি, তাঁর সঙ্গে ঘর করেছি, আমরা জানি তাঁর এই ছলাকলাহীন, রূপকালঙ্কারবিহীন কথাগুলি কোথায় গিয়ে আঘাত করে, তার প্রত্যাভিঘাত কোথায় তার ধ্বনি ও ব্যঞ্জনাকে বাজায় বিচিত্র সুরে।

এই পরম সত্যভাষী মানুষটি যখন সারা জীবনের সংগ্রাম-স্মৃতিমন্থন শেষ করে ভূমিকায় বলেন, "...আমার দেশের মানুষ অনুশীলনের দ্বারা পূর্ণ মানুষ হইয়া উঠিবে, থাকিবে না কোনো স্বার্থ চেতনা, দুর্নীতি, বঞ্চনা, বৈষম্য ও শোষণ—এই স্বপ্নই দেখিয়াছিলাম। আজ দেশ স্বাধীন হইয়াছে, বৃটিশ প্রভুত্বের অবসান ঘটিয়াছে বটেই; কিন্তু দেশ ও জাতিকে চরিত্র গৌরবে বড় করিয়া তুলিবার যে আদর্শ ছিল বিপ্লবীর তাহা সফল হইল কই? তাই তো স্বাধীনতার পরে দেশটি যেমনটি দেখিবার স্বপ্ন

দেখিয়াছিলাম সেই স্বপ্ন আজও বাস্তবে রূপায়িত দেখিতে পাই না। মানুষকে গতানুগতিকতার গ্লানি ও দুঃখদৈন্যের উর্দ্ধে তুলিয়া লইয়া যাওয়ার মধ্যেই তো বিপ্লবীর সাধনার সিদ্ধি। কিন্তু সেই সিদ্ধি আনিতে পারি নাই; তাই মর্মান্তিক বেদনাবোধ করিয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছি—আমার জীবন সফল হয় নাই।"—তখন সমস্ত অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়ে বলতে চায়, না, !একথা কখনও সত্য হতে পারে না. এমন মানুষের জীবন ব্যর্থতায় নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে না।

আমার যখন চোদ্দ বছর বয়স, চোখে যখন স্বপ্ন অথচ বুদ্ধি যখন পাকেনি, তখন অনুশীলন সমিতিতে এসে পড়েছিলাম, কী ভাবে, কোন পথে এখন আর খুব স্পষ্ট মনে নেই। তারপর ১৯৪৭-এ দেশের স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত অন্য যা কিছু করিনে কেন, যে কোনো রাজনৈতিক গোষ্ঠী ও আবর্তেই লিপ্ত হইনে কেন, মূল প্রেরণাটা ছিল, অন্তত আমার ক্ষেত্রে, অনুশীলন সমিতির এবং সে-সমিতির মহারাজের মত দু'চারজন মানুষের। আমার তরুণ চিত্তে এঁরা যে শীলমোহর এঁকে দিয়েছিলেন তা আজও মুছে যায়নি! একথা স্বীকার না করলে মিথ্যাচরণ করা হবে।

অথচ, প্রায় শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ যে বলে গেছেন, "আমার জীবন সফল হয় নাই", এই মর্মান্তিক সত্যটাকেও তো একেবারে অস্বীকার করতে পারিনে। এ-দুঃখ বহন করে তিনি এবং তাঁর অনেক সহকর্মী সহমর্মীকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হয়েছে, এই স্বাধীন ভারতবর্ষের বুকে। এ দুঃখ আমারও, এবং আমার মত অনেকেরই।

তবু কি করে বিশ্বাস করবো আমৃত্যু এমন দুঃখের তপস্যা, এমন স্বেচ্ছায় মৃত্যুসম যন্ত্রণাবরণ, এমন অগ্নিদহন জ্বালা, এমন পরের তরে আত্মবিলোপ, এ সমস্তই মিথ্যা, ব্যর্থ। মানুষের উপর, তার ভবিষ্যত বন্ধনমুক্তির উপর কি করে আশা ও বিশ্বাস

হারাবো ; মানুষের চারিত্র্য মহিমার কোনো মূল্য নেই এ কথা কি করে বিশ্বাস করবো !! না তা সম্ভব নয়।

"এ দু'এর মাঝে কোথা আছে কোনো মিল
নহিলে নিখিল
এত বড় প্রবঞ্চনা
হাসিমুখে কিছুতে বহিতে পারিত না
সব তার আলো
কীটে কাটা পুষ্পসম হয়ে যেতো কালো।"

—রবীন্দ্রনাথ

নীহাররঞ্জন রায়

জেলে ত্রিশ বছর ও পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম

প্রথম পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বাভাস

কোন জাতিই চিরকাল পরাধীন থাকে না, উত্থান-পতন সৃষ্টির নিয়ম। আমরা পৃথিবীর ইতিহাসে দেখিতে পাই কত জাতি উন্নতির উচ্চ শিখরে উঠিয়াছে, আবার তাহাদের ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। জাতির উত্থানের মধ্যেই পতনের বীজ নিহিত থাকে। আবার পতনের মধ্যেও উত্থানের বীজ থাকে। বিনা কারণে কখনও কোন জাতির পতন হয় না। জাতির মধ্যে যখন দুর্ব্বলতা আসে তখনই জাতির পতন হয়। ভারতবর্ষের পতনের কারণও ছিল জাতীয় দুর্ব্বলতা। এই দুর্ব্বলতা জাতির মধ্যে হঠাৎ একদিনে আসে না, দুর্ব্বলতা জাতিকে আস্তে আস্তে গ্রাস করে। জাতির মধ্যে যখন দুর্ব্বলতা আসে, জাতি প্রথমে তাহা অনুভব করিতে পারে না। জাতির গৌরবরবি দুর্ব্বলতাকে প্রকাশ করিতে দেয়না। কিন্তু আস্তে আস্তে যখন ক্ষুদ্র কাল মেঘ জাতির ভাগ্যাকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে তখন জাতির রক্ষার আর কোন উপায় থাকে না, জাতি তখন অতি সহজেই দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়। ভারতবর্ষও দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল। ভারতবর্ষ দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল সত্য, কিন্তু ভারতবাসী কখনও দাসত্ব বরণ করিয়া লয় নাই, চিরকালই দাসত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছে।

ভারতবর্ষ মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্বে এবং বৃটিশ কর্ত্তৃক অধিকৃত হওয়ার সময় অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং তাহাদের

মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ অনবরত চলিতেছিল। তখন ভারতবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবোধ ছিল না। ভারতবর্ষকে রাষ্ট্র হিসাবে গড়িয়া তোলার চিন্তা কেউ করে নাই, তাহাদের স্বদেশ ছিল ক্ষুদ্র রাজ্য এবং তাহাদের স্বদেশপ্রেম তাহারই মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। দেশের জনসাধারণ ছিল অশিক্ষিত, অজ্ঞ, এবং শাসকশ্রেণী ছিল চরিত্রহীন, ভোগ-বিলাসিতায় মত্ত, ব্যাপক দৃষ্টি কাহারও ছিল না। বৈদেশিক আক্রমণের সময় ভারতবর্ষ অন্তর্বিদ্রোহের ফলে শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল, তখন জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং প্রাধান্যই বড় ছিল, তাই সংঘবদ্ধ ভাবে সাধারণ শত্রুর সম্মুখীন হওয়ার চেষ্টা করে নাই, বরং প্রতিবেশীকে জব্দ করার জন্য শত্রুর সাহায্য গ্রহণ করিতেই ব্যগ্র ছিল।

ভারতবর্ষে কখনও খাদ্যাভাব ছিল না, তাই ভারতবাসী ছিল শান্তিপ্রিয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বহু লোকক্ষয় হইয়াছিল, তাহার ফলে দেশে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সমরাস্ত্রের প্রতি একটা ঘৃণা জন্মে এবং দেশবাসর মন অহিংসা ও শান্তির দিকে ধাবিত হয়। এই সময় বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তি। বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে একদিকে যেমন দেশে শান্তি, সুখ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইল, অপর দিকে অহিংসার মোহে দেশবাসী নির্বীর্য্য হইয়া পড়িল। ভারতবাসী যখন সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক পরকালের চিন্তায় মগ্ন ছিল, সেই সময় পৃথিবীর অন্যান্য জাতি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার দ্বারা পার্থিব জগতে বহুদূর অগ্রসর হইল। ইহকাল ও পরকালের প্রতিযোগিতায় পার্থিব জগতে ভারতবাসীর পরাজয় ঘটিল। পৃথিবীর অন্যান্য জাতি পার্থিব জগতে কতটা অগ্রসর হইয়াছে সে খবর ভারতবাসী রাখিত না, তাই প্রগতিশীল জাতির সহিত পা মিলাইয়া চলিতে পারে নাই। ভারতবাসী এই নিষ্ক্রিয়তার জন্য নূতন অস্ত্রশস্ত্র ও চিন্তাধারার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে নাই, বৈদেশিক আক্রমণকারীর নিকট পরাজিত হইয়া দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল।

পরাধীন জাতির অবস্থা

একটা দেশ যখন অপর জাতি কর্তৃক অধিকৃত হয় তখন বিজিত দেশের দেশপ্রেমিকগণ নির্য্যাতিত ও নিষ্পেষিত হয়। যাহারা বৈদেশিক শাসন মাথা নত করিয়া না নেয়, বিদেশী সরকার জনসাধারণের মনে ত্রাস সঞ্চারের জন্য তাহাদিগকে নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করে, তাহাদের পরিবার পরিজনের উপর অকথ্য অত্যাচার চালায়। এক দিকে যেমন স্বদেশ-প্রেমিকদিগকে হত্যা করিয়া তাহাদের অধিকৃত রাজ্য নিষ্কণ্টক করে, অপরদিকে তাহারা একদল দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক সৃষ্টি করিয়া তাহাদের রাজত্ব সুদৃঢ় করে। যাহারা দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক, তাহাদিগকে তাহাদের দেশদ্রোহিতা ও বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার স্বরূপ কাহাকেও জায়গীর দিয়া, কাহাকেও অর্থ দ্বারা, কাহাকেও ব্যবসায় সুবিধা করিয়া দিয়া, আবার কাহাকেও উপাধি দান করিা স্ববশে রাখে। এই শ্রেণীর লোক বিদেশী সরকারের হয় স্তম্ভস্বরূপ, তাহারা পঞ্চমুখে তাহাদের স্বদেশবাসীর নিকট বিদেশী সরকারের জয় গান করিতে থাকে। বিজেতা বিজিত দেশের শাসন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া নূতন নূতন আইন প্রণয়ন করে এবং এই আইনের বলে দেশবাসীর নিজ দেশের উপর কোন অধিকার থাকে না। পরাধীনতা আইনসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হয়। তখন দেশোদ্ধারের চেষ্টা হয় বে-আইনী। যাহারা দেশপ্রেমিক, তাহারা বিদ্রোহী ষড়যন্ত্রকারী, খুনে, ডাকাত বলিয়া গণ্য হয়। স্বাধীনভাবে চলাফেরার তাহাদের কোন অধিকার থাকে না, তাহাদের স্থান হয় জেলখানায়। বিজেতা বিজিত জাতির আত্মবিশ্বাস নষ্ট করার জন্য বিবিধ কৌশল অবলম্বন করে এবং ফলে সেই জাতি সম্পূর্ণ পর নির্ভরশীল হইয়া ওঠে। শিক্ষা, রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা, শিল্প-বাণিজ্য সবই থাকে বিদেশী সরকারের হাতে। বিজেতার বিজিত দেশে শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্য থাকে—দেশী লোকদিগকে রাজভক্ত করিয়া গড়িয়া তোলা, দেশী সভ্যতা

ও সংস্কৃতির উপর ঘৃণা জন্মান, বিজেতার সভ্যতা ও কৃষ্টির উপর আকর্ষণ জন্মান এবং তাহাদের রাজকার্য্য চালানোর জন্য কেরাণী সৃষ্টি করা রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা হাতে থাকায় বিজেতা কূটনীতি প্রভাবে দেশীয় লোকদিগের মধ্যে গৃহবিবাদ সৃষ্টি করে, ফলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়। একটা জাতি যখন স্বাধীনতা হারায় তখন সঙ্গে সঙ্গে সেই জাতি সমুদয় সদ্‌গুণাবলী হইতে বঞ্চিত হয়। একটা প্রবাদ আছে, ক্রীতদাস ক্ষমতা পাইলে অত্যাচারী হয়, পরাধীন দেশে ইহা অতি সত্য কথা। বিদেশী সরকার পরাধীন জাতিকে অধীনতা পাশে আবদ্ধ রাখে দেশী কর্মচারীদিগের সাহায্যে। এই শ্রেণীর লোক হয় আত্মসম্মান-বর্জ্জিত স্বার্থপর। ইহারা প্রভুর মনস্তুষ্টির জন্য সকল প্রকার ঘৃণিত কাজ করিতে প্রস্তুত। তাহারা গুপ্তচর সাজিয়া স্বদেশপ্রেমিকদিগের স্বাধীনতার চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দেয়। তাহারা প্রভুর কৃপা লাভের জন্য তাহাদের স্বদেশবাসী এমন কি আত্মীয়-স্বজনদিগের উপরও অকথ্য অত্যাচার চালায়। পরাধীন ভারতে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট পরাধীন ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলন ব্যাহত করার জন্য সাম্প্রদায়িকতা আমদানী করিয়াছে। যখনই স্বাধীনতা আন্দোলন প্রবল রূপ ধারণ করিয়াছে, তখনই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সুরু হইয়াছে। বিপ্লবীদল পঙ্গু করার জন্য দলের মধ্যে গুপ্তচর ঢুকাইয়া দিয়াছে, সেই সব গুপ্তচরের দল সুকৌশলে মতবাদের কুজ্ঝটীকা (Ideological Confusion) সৃষ্টি করিয়া দল ভাঙ্গনের ব্যবস্থা করিয়াছে, সরল যুবক কর্মীদিগকে হস্তগত করিয়া নেতাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছে, বিপ্লব-প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার চেষ্টা করিয়াছে।

সিপাহী যুদ্ধ

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে লর্ডক্লাইভ মীর্জাফরের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া ভারতে ইংরাজ রাজত্বের সূত্রপাত করেন। ইহার পর ইংরাজ জাতি সুকৌশলে ভারতবর্ষ অধিকার করে। ভারতবাসী কখনও দাসত্বকে, পরাধীনতাকে চিরতরে বরণ করে নাই। ভারতবাসী যখনই সুযোগ-সুবিধা পাইয়াছে পরাধীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে, স্বাধীনতার জন্য লড়াই করিয়াছে। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, পিণ্ডারী বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, ওয়াহবী বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ ভারতবাসীর স্বাধীনতা সংগ্রাম। পলাশী যুদ্ধের একশত বৎসর পর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে নানা সাহেব, তাঁতিয়া তোপী, আজিমউল্লা খান, ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাই, রাজা কুমার সিং প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে ভারতের যে স্বাধীনতা সংগ্রাম হয় তাহাই সিপাহী বিদ্রোহ নামে খ্যাত। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রচার বিভাগ যতই প্রচার করুক না কেন ইহা কুসংস্কারাচ্ছন্ন অশিক্ষিত সিপাহীদিগের বিদ্রোহ, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই বিদ্রোহ পরাধীনতার বিরুদ্ধেই ছিল।

সিপাহী বিদ্রোহ এবং অন্যান্য বিদ্রোহ দমনের জন্য ইংরেজ জাতি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিকদিগের উপর যে অকথ্য অত্যাচার করিয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। ব্যাপকভাবে হত্যাকাণ্ড, লুণ্ঠন, নারীধর্ষণ, গ্রাম পোড়াইয়া দেওয়া প্রভৃতি বর্বর যুগের পন্থা অবলম্বন করিয়া দেশবাসীর মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছিল। মালাবার বিদ্রোহের নেতা নারায়ণ মেননের নিকট ভেলোর জেলে শুনিয়াছিলাম ১৯২১ সনের মালাবার বিদ্রোহ দমনের জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট মোপলাদিগের উপর সৈন্য লেলাইয়া দিয়াছিল। সেখানেও হত্যাকাণ্ড, লুণ্ঠন, গ্রাম পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে—

কোন রমণীই অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা পায় নাই; এমন কি বৃদ্ধা রমণীগণও। ইহাই পাশ্চাত্য সভ্যতা। সিপাহী যুদ্ধের সময় ভারতীয় সৈন্যগণ বহু ইংরাজকে বন্দী করিয়াছে, তাহাদের সহিত স্ত্রীলোকও ছিল বহু। ভারতীয় সৈন্যগণ কোন ইংরাজ মহিলার উপর পাশবিক অত্যাচার করে নাই, ইংরাজ বিচারপতি ম্যাককার্নী লিখিয়াছিলেন, "ইংরাজ রমণীদিগের উপর বাধ্যতামূলক ধান ভানা ছাড়া অপর কোন প্রকার অসম্মানজনক ব্যবহার বা রমণীদের উপর কোনরূপ নির্যাতন করা হয় নাই।" ইহাই ভারতীয় সভ্যতা।

জাতীয় কংগ্রেস, স্বদেশী আন্দোলন ও অনুশীলন সমিতি

স্বদেশী আন্দোলন ভারতের নবজাগরণ। এই জাগরণ হঠাৎ একদিনে হয় নাই, জাতি যখন জাগে, আস্তে আস্তে জাগে, পিছনে থাকে বহু লোকের দান। রাজা রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বঙ্কিম, হেমচন্দ্র, উমেশ চন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতির অর্দ্ধশতাব্দী ব্যাপী সাধনার ফল ভারতের নবজাগরণ। এই নবজাগরণ যাহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তাহারা দেখিয়াছে জাতির প্রাণের স্পন্দন কিরূপ অভূতপূর্ব্ব ছিল। বিগত ২০ বৎসরের জাতীয় কংগ্রেসের কর্মপ্রয়াস ও আবেদন-নিবেদনের বিফলতার ফলে জাতির মধ্যে যে মনোভাব সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাই স্বদেশী আন্দোলন রূপে দেখা দিল, বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ মাত্র। ১৯০৫ সনের ১৬ই অক্টোবর, ৩০শে আশ্বিন বঙ্গভঙ্গ হয়। এই বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ করিয়াই স্বদেশী আন্দোলনের জন্ম। জাতীয় কংগ্রেস নেতাদের কৃতিত্ব এই, তাঁহারা উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে

সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহারা যদি বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করিতেন, তবে এত বড় আন্দোলন হইত না। এই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনই ভারতের স্বাধীনতার প্রথম সোপান।

পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার ফলে জাতীয় কংগ্রেস নেতারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সরকারের সহিত সহযোগিতা দ্বারা, শুধু আবেদন-নিবেদনের দ্বারা কোনই লাভ হইবে না; তাঁহারা সরকারের প্রতি আস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। ১৯০৫ সনের ডিসেম্বর মাসে কাশীতে যে কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল তাহার সভাপতি গোপালকৃষ্ণ গোখলে, তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছিলেন, "যদি সমস্ত ভারতীয়ের প্রতিই গৃহপালিত পশুর ন্যায় ব্যবহার করা হয় এবং যাহাদিগকে পাইলে অন্যান্য দেশ গৌরব অনুভব করিতে পারে এমন সমস্ত লোককে যদি তাহাদের নিজেদের দেশেই চূড়ান্ত অপমান ভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে আমি এই কথা বলিব সে আমলাতন্ত্রের সহিত সহযোগিতা করিয়া আর কোন লাভ নাই।" এই অধিবেশনে বিদেশী পণ্য বর্জ্জন প্রস্তাব গৃহীত হয়। কংগ্রেস নেতাদের ধারণা ছিল, ইংরাজ বণিকের জাতি, বিলাতি পণ্য বর্জ্জন করিলে ইংলণ্ডে মহা হৈ চৈ পড়িয়া যাইবে, ফলে গভর্ণমেণ্ট আমাদের দাবী মানিয়া লইতে বাধ্য হইবে।

বঙ্গ ভঙ্গের প্রতিবাদকল্পে ৩০শে আশ্বিন রাখীবন্ধন ধার্য্য হইল। একদিকে যেমন বিদেশী বর্জ্জন, আবার সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশী-গ্রহণ সংকল্পও গ্রহণ করা হয়। রাখীবন্ধন অর্থ, উভয় বঙ্গের পুনর্মিলন চাই, আমরা ভাই ভাই বিচ্ছিন্ন হইব না, আমরা একই সূত্রে আবদ্ধ থাকিব। যুবকের দল স্বদেশী গান গাইতে গাইতে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিত। তখন অনেক স্বদেশী গান রচিত হইয়াছিল, গানগুলি ছিল সময়োচিত এবং তাহা দ্বারা স্বদেশী প্রচার বেশ সহজ হইয়াছিল। দ্বিপ্রহরে অরন্ধন ছিল, সারাদিন উপবাস থাকিয়া প্রার্থনা করা হইত, বৈকালে শোভাযাত্রা ও সভা হইত। সন্ধ্যার

পর অনশন ভঙ্গ হইত। সেই সময় বহু স্বদেশী শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও জাতীয় বিদ্যালয় গড়িয়া ওঠে।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় যাঁহারা বাংলা দেশকে নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করেন, তাহাদের মধ্যে কলিকাতায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, পি মিত্র, ভূপেন বসু, সুরেন্দ্রনাথ হালদার, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, আশুতোষ চৌধুরী, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, মতিলাল ঘোষ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বিনয় সরকার' রাধাকুমুদ মুখার্জি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আনন্দমোহন বসু, লালমোহন ঘোষ, গীস্পতি কাব্যতীর্থ, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, এ, রসুল, মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন, সুন্দরীমোহন দাস প্রভৃতি প্রধান ছিলেন। ঢাকায় আনন্দচন্দ্র রায়, আনন্দচন্দ্র পাকড়াশী, ললিতমোহন রায়, ত্রৈলোক্য বসু, পি, সি, সেন, রজনীকান্ত গুপ্ত, রসিক চক্রবর্ত্তী, কুঞ্জলাল নাগ, যোযেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, যোগেন্দ্র গুহঠাকুরতা, দীনবন্ধু মজুমদার, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (উকিল), মনোরঞ্জন ব্যানার্জি, পুলিনবিহারী দাস, কবি হরিচরণ আচার্য্য, রজনীকান্ত বসাক, হরকুমার গুপ্ত প্রভৃতি প্রধান ছিলেন। ময়মনসিংহে মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য, অনাথবন্ধু গুহ, ডাঃ বিপিন সেন, হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য্য, কুমার উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী (গোলকপুর) ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলী, অমর ঘোষ প্রভৃতি প্রধান ছিলেন'। ফরিদপুরে অম্বিকাচরণ মজুমদার, বরিশালে অশ্বিনীকুমার দত্ত, দুর্গামোহন সেন, সুরেন সেন, কবি মুকুন্দদাস। চট্টগ্রামে যাত্রামোহন সেন, কুমিল্লায় বসন্ত মজুমদার, হরদয়াল নাগ, উপেন্দ্রমোহন মিত্র, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। নোয়াখালীতে যশোদা ঘোষ, রাজসাহীতে কিশোরী মোহন চৌধুরী, সুদর্শন চক্রবর্ত্তী, সুরেন্দ্র মৈত্র, দিনাজপুরে যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, বহরমপুরে বৈকুণ্ঠনাথ সেন, রংপুরের

উমেশচন্দ্র গুপ্ত, ঈশান চক্রবর্ত্তী, যশোহরে যতুনাথ মজুমদার, মেদিনীপুরে উপেন্দ্রনাথ মাইতি, নরেন্দ্রলাল খাঁ, নারাজোলের মহারাজা, বর্দ্ধমানে আবুল কাসিম, নলিনাক্ষ বসু প্রধান ছিলেন।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় যুবকদিগের মন স্বাদেশিকতায় ভরপুর ছিল, তখন কোন কৃত্রিমতা ছিল না, ছিল আন্তরিকতা। তখন সম্মুখে কোন প্রলোভন ছিল না, ত্যাগের আদর্শই ছিল বড়। আমার দেশকে বড় করিব, আমার দেশকে স্বাধীন করিব, আমি স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিব, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করিব, সকলকে ভাইয়ের মত দেখিব, আমি বিলাসিতা বর্জ্জন করিব, চরিত্র পবিত্র রাখিব, এই মনোভাবই সকলের মধ্যে বিরাজমান ছিল। তখন 'বন্দেমাতরম',—'আল্লাহো আকবর' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস আলোড়িত হইতে লাগিল, যুবকদের মনে কি উৎসাহ উদ্যম!

বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন হইতে মিত্র মহাশয় (পি, মিত্র) "অনুশীলন" নাম গ্রহণ করেন। অনুশীলন নামের মধ্যেই অনুশীলনের মতবাদ নিহিত আছে। অনুশীলনের নেতারা এরূপ একটি আদর্শ সমাজ কল্পনা করিয়াছিলেন যে, সমাজের প্রত্যেকটি নরনারীর মনুষ্যত্বের পূণ বিকাশ হইবে। অনুশীলনের চিন্তাধারায় মানুষের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলির পরিপূর্ণ বিকাশই হইতেছে মনুষ্যত্ব এবং উহার বিকাশ শুধু অনুশীলন দ্বারাই সম্ভবপর। অনুশীলনকল্পিত সমাজে প্রত্যেক মানুষ স্বাস্থ্যবান, কর্ম্মঠ, বলিষ্ঠ এবং দীর্ঘায়ু হইবে।

অনুশীলনের মতে শুধু শারীরিক বৃত্তির পূণ বিকাশেই মানুষের মনুষ্যত্ব লাভ হয় না, মানসিক বৃত্তিরও পূর্ণ বিকাশ চাই। অনুশীলন-কল্পিত সমাজে প্রত্যেক নরনারী বিদ্বান, চরিত্রবান, সাহসী ও দয়ালু হইবে। ইহা। শিক্ষার উপর নির্ভর করে। অনুশীলন পরিকল্পিত সমাজে নিরক্ষর লোক থাকিতে পারিবে না, তুর্নীতিপরায়ণ লোক থাকিতে পারিবে না, চরিত্রহীন ভীরু লোক থাকিতে পারিবে না,

দরিদ্র থাকিবে না, অলস লোক থাকিবে না, স্বাস্থ্যহীন লোক থাকিবে না। ঐরূপ সমাজ তৈয়ার করিতে হইলে সকল প্রকার বৈষম্য দূর করিতে হইবে, বৈষম্যের মধ্যে মানুষের মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে না। তাই সকল প্রকার বৈষম্য দূর করিতে হইবে। মানব সমাজ হইতে ধন-বৈষম্য, সামাজিক বৈষম্য, সাম্প্রদায়িক বৈষম্য, প্রাদেশিক বৈষম্য দূর করিয়া সকল মানুষের মধ্যে সমতা আনিতে হইবে। ইহা একমাত্র জাতীয় গভর্ণমেণ্ট দ্বারাই সম্ভবপর, পরাধীন অবস্থায় অনুশীলন কল্পিত সমাজ সম্ভবপর নয়, তাই পরাধীনতার বিরুদ্ধে অনুশীলনের বিদ্রোহ ঘোষণা। অনুশীলন চায় ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতা কোন শ্রেণীবিশেষের নয়, এ স্বাধীনতা দেশের সর্বজনের স্বাধীনতা. এ স্বাধীনতা সমতার উপর প্রতিষ্ঠিত।

অনুশীলন সমিতির নেতাদের মধ্যে কলিকাতায় (পি, মিত্র) (প্রমথ), যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (নিরালম্ব স্বামী), অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, তারকনাথ দাস, যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ, সতীশচন্দ্র বসু, সখারাম গণেশ দেউস্কর, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ হালদার, ভূপতি মজুমদার, নরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, হরিকুমার চক্রবর্ত্তী, যাদুগোপাল মুখার্জ্জি প্রভৃতি প্রধান ছিলেন। ঢাকায় আনন্দচন্দ্র পাকড়াশী, ললিতমোহন রায় পি, সি, সেন, পুলিন বিহারী দাস, ভূপেশচন্দ্র নাগ, উপেন্দ্রচন্দ্র নাগ, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, মনোরঞ্জন ব্যানার্জী, ডাঃ মোহিনীমোহন দাস, বীরেন্দ্র মজুমদার, হরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, আশুতোষ দাশগুপ্ত, নরেন্দ্রমোহন সেন, মাখনলাল সেন, প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, বীরেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মদনমোহন ভৌমিক, নলিনীকিশোর গুহ, অমৃতলাল হাজরা, শচীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিপদ মুখার্জ্জি, মতি সেন, জ্যোতির্ম্ময় রায়, রাধিকাভূষণ রায়, রজনীকান্ত বসাক মোক্তার, কেদারেশ্বর সেনগুপ্ত, নলিনীকান্ত ঘোষ, তরণী সোম, প্রভৃতি প্রধান ছিলেন।

ময়মনসিংহে—জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, রবীন্দ্রমোহন সেন, রমেশচন্দ্র আচার্য, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী, চন্দ্রকুমার ঘোষ, (রামপুর নেত্রকোণা,) অমর ঘোষ মোক্তার, টাঙ্গাইল, প্রিয়নাথ রায়, জমিদার, ধানাটা, অমৃত সরকার, নাগরপুর টাঙ্গাইল; যোগেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সুসুং দুর্গাপুর, পূর্ণ চক্রবর্ত্তী, কলমাকান্দা, নেত্রকোণা যোগেন্দ্র ভট্টাচার্য্য—ডিয়ারা নেত্রকোণা, যোগেন্দ্র ভট্টাচার্য্য গচিহাটা রমেশচন্দ্র চৌধুরী নান্দিনা-বাজিতপুর, সতীশচন্দ্র রায়, কাপাসাটিয়া প্রভৃতি প্রধান ছিলেন।

বরিশালে—দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, যতীন্দ্র রায় (ফেগু), গোপাল মুখার্জি, চণ্ডী বসু, কবিরাজ নরেন সেন, নিবারণ কর, প্রবোধ গুহ-ঠাকুরতা, রোহিণী গুহ, সুশীল ঘোষ, রমণীমোহন দাস, অরাকুস চণ্ডী কর, প্রবোধ দাশগুপ্ত (গৈলা) প্রভৃতি প্রধান ছিলেন।

ফরিদপুরে—আশুতোষ কাহালী, বিলাসখান, যদুনাথ পাল, মোক্তার—ফরিদপুর, সতীশ দাসগুপ্ত (স্বামী সত্যানন্দ), গিরীন্দ্র ভট্টাচার্য্য নল্‌তা, শিশিরকুমার গুহরায়, জীবন ঠাকুরতা প্রভৃতি প্রধান ছিলেন।

নোয়াখালিতে—সারদাচরণ গুহ, খগেন্দ্র কাহালী, নলিনী মিত্র, অনুকুল চক্রবর্তী, দীনেশ চন্দ্র বিশ্বাস প্রভৃতি প্রধান ছিলেন।

কুমিল্লায়—রমেশচন্দ্র ব্যানার্জি, প্রফুল্ল চক্রবর্তী, পুলিন গুপ্ত, যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জি, ক্ষেত্র সিং, অতীন্দ্রমোহন রায় প্রভৃতি প্রধান ছিলেন।

চট্টগ্রামে—চন্দ্রশেখর দে, চারুবিকাশ দত্ত, প্রতাপ রক্ষিত, গিরিজা চৌধুরী, মোহিনী ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি প্রধান ছিলেন।

শ্রীহট্টে—নগেন্দ্র দত্ত (গিরিজা)

রাজসাহী—প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী, জিতেশচন্দ্র লাহিড়ী, হরেন্দ্র মৈত্র, (কালী), পাটুল হাপানিয়া, নাটোর নরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য,

নকুল, সরস্বতী, পুটিয়া ; শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (উকিল, নাটোর), জ্ঞান সান্যাল, প্রবোধ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি প্রধান ছিলেন।

নালদহে—হংসগোপাল আগরওয়ালা, মহেন্দ্র দে, দক্ষিণা লাহিড়ী প্রভৃতি প্রধান ছিলেন।

দিনাজপুর—অশ্বিনী ভট্টাচার্য্য, প্রফুল্ল বিশ্বাস, প্রবোধ বিশ্বাস, প্রভৃতি প্রধান ছিলেন।

পাবনা—বঙ্কিমচন্দ্র রায় সুধীর মজুমদার (লাহিড়ী মোহনপুর), অমূল্য লাহিড়ী, মণি লাহিড়ী (জলপেশ) প্রভৃতি প্রধান ছিলেন।

কুড়িগ্রাম, রংপুর—খর্গ বর্ম্মণ, সুশীল দেব, যতীন্দ্র দেব প্রভৃতি প্রধান ছিলেন।

অনুশীলন সমিতি

ঢাকা কেন্দ্র

অনুশীলন সমিতির স্রষ্টা ও নেতা ব্যারিষ্টার প্রমথ মিত্র (পি, মিত্র) পশ্চিমবঙ্গের অনুশীলন সমিতির ভার সতীশচন্দ্র বসুর উপর এবং পূর্ব্ববঙ্গের ভার পুলিনবিহারী দাসের উপর ন্যস্ত করেন। পশ্চিমবঙ্গের কেন্দ্র কলিকাতা ও পূর্ব্ববঙ্গের কেন্দ্র ঢাকা ছিল, পুলিনবাবু ও সতীশবাবু অনুশীলন সমিতির যুক্ত সম্পাদক ছিলেন। কলিকাতা কেন্দ্রের কর্মক্ষেত্র বেশী বিস্তৃত হয় নাই, কিন্তু ঢাকার কেন্দ্রই সমগ্র বাংলাদেশ ও পরে সমগ্র ভারতে ও ব্রহ্মদেশে বিস্তার লাভ করে। কিছুদিন পর মিত্র মহাশয়ের মৃত্যু হয় এবং পুলিন বাবুই কার্যতঃ অনুশীলন সমিতির নেতা হন। পুলিনবাবু দেশের মধ্যে ক্ষাত্রশক্তি জাগরণের জন্য অসি খেলা, লাঠি খেলা, ছোরা খেলা ও ড্রিল শিক্ষা প্রচলন করেন। স্বদেশী আন্দোলন দেশের মধ্যে একটা নূতন প্রেরণার সৃষ্টি করিলে জনসাধারণের মধ্যে একটা

বীরত্বের ভাব সঞ্চারিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি পড়িল অসিখেলা ও ড্রিল শিক্ষার উপর। এই সময় কোন কোন স্থানে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হইল এবং অনুশীলন সমিতির সভ্যেরা বীরত্বের সহিত উহার সম্মুখীন হইল; ফলে সমিতির উপর সকলে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল এবং দলে দলে লোক অনুশীলন সমিতির সভ্য হইয়া আত্মরক্ষার কৌশল শিক্ষা করিতে লাগিল।

পুলিনবাবুর বাড়ী ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত লোনসিং গ্রামে। পিতা জমিদার ছিলেন এবং তাঁহাদের বাড়ী ডেপুটি বাড়ী বলিয়া খ্যাত ছিল। পুলিনবাবু ঢাকা জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ করিতেন। ঢাকা সহরে অনুশীলন সমিতির প্রধান কেন্দ্র ছিল ৫০নং ওয়ারী; ইহা সমিতির বাড়ী ছিল। ৫১নং ওয়ারী ছিল জাতীয় বিদ্যালয়। ইহাও সমিতির কেন্দ্র ছিল। ক্রমে ক্রমে সমিতির সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে দক্ষিণ মৈশণ্ডী 'ভূতের বাড়ী' ভাড়া করা হয়। এই ভূতের বাড়ীতে অনুশীলন সমিতির আর একটি কেন্দ্র ছিল। এখানে প্রায় ২০০ শত বাড়ী-ঘরছাড়া সভ্য থাকিত, তাহাদের ব্যয়ভার সমিতি বহন করিত। এই 'ভূতের বাড়ী' সম্বন্ধে প্রবাদ ছিল যে, এই বাড়ীতে কেহ বাস করিতে পারিত না, ভূতের উপদ্রবে পলায়ন করিত। এজন্য এই বাড়ীতে কোন ভাড়াটিয়া আসিত না, বাড়ী খালি পড়িয়া থাকিত। এই বাড়ীটি ছিল একটি প্রকাণ্ড বাড়ী। পুলিনবাবু এই বাড়ীতে সমিতির বোর্ডিং স্থাপন করেন।

দেশের স্বাধীনতার জন্য যাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, যাঁহারা বিবাহ বা সংসার ধর্ম্ম পালন করিবেন না, সমিতির জন্য সর্ব্বক্ষণ কাজ করিবেন, এরূপ বাড়ী-ঘর-ছাড়া কর্ম্মীগণই (whole-time worker) এখানে স্থান পাইতেন। এই সব কর্ম্মীদিগকে অনুশীলনের আদর্শে গড়িয়া তোলার চেষ্টা করা হইত। এখানে একটি বেশ বড় লাইব্রেরী ছিল, শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এখানে

লাঠিখেলা ও ড্রিল শিক্ষা করিয়া কর্ম্মীদিগকে মফঃস্বলে যাইয়া শাখা-সমিতির সভ্যাদিগকে শিক্ষা দিতে হইত।

উদয়পুর—শিক্ষাকেন্দ্র

দেশে অস্ত্র-আইন থাকায় সমিতির সভ্যগণ প্রকাশ্যে বন্দুক চালনা শিক্ষা করিতে পারিত না, গোপন ব্যবস্থা করিতে হইত। সমিতির সহানুভূতিশীল সভ্যদের মধ্যে যাহাদের বাড়ীতে পাশ-করা বন্দুক ছিল, তাহাদের বাড়ী যাইয়া বন্দুক চালনা অভ্যাস করিতে হইত। অনুশীলন সমিতির ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে বিলোনিয়া এবং উদয়পুর পাহাড়ের মধ্যে দুইটি শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। বিলোনিয়া কেন্দ্র কিছুদিন পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। উদয়পুরই প্রধান কেন্দ্র ছিল। উদয়পুর কেন্দ্রের জমি বাড়ী নোয়াখালী জিলার লামচর গ্রামের শ্রীযুক্ত দ্বারিকা রায় মহাশয়ের নামে ছিল। দ্বারিকবাবু পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। আমি কালীচরণ চক্রবর্ত্তী নামে দ্বারিকাবাবুর অংশীদার হিসাবে সময় সময় সেখানে থাকিতাম। বিক্রমপুরের ব্রজেন্দ্র চক্রবর্ত্তী (বাগু) আমার ছোট ভাই হিসাবে স্থায়ী ভাবে সেখানে থাকিত। দ্বারিক বাবু মাঝে মাঝে সেখানে যাইয়া থাকিতেন। দ্বারিকবাবুর নামে একটা পাশ-করা দোনালা গাদা বন্দুক ছিল। বিনা পাশে বন্দুক-পিস্তলও সেখানে ছিল। একটা পাশ-করা বন্দুক থাকিলে বিনা পাশে কতকগুলি বন্দুক রাখিতে অসুবিধা হয় না, বিশেষতঃ নির্জ্জন পাহাড়ের মধ্যে। আমাদের বাসস্থান উদয়পুর কালীবাড়ী হইতে অল্প দূরেই ছিল। তখন সেখানে লোকজনের বসতি খুব কম ছিল, কোন ভদ্রলোকের বসতি ছিল না, কয়েক ঘর মুসলমান কৃষক ছিল। উদয়পুর কুমিল্লা হইতে ৩২ মাইল দূরে এবং পায়ে হাঁটিয়া যাইতে হইত। সেখানে সময় সময় হাতীর উপদ্রব হইত, বাঘের উপদ্রবও ছিল।

কুমিল্লা শহরে রমেশ ব্যানার্জ্জীর বাড়ী আমাদের একটি আশ্রয়

কেন্দ্র ছিল। সমিতির যে-সব সভ্য উদয়পুর শিক্ষাকেন্দ্রে যাইত, তাহারা প্রথমে রমেশ ব্যানার্জ্জির বাড়ীতে উঠিত। সাধারণতঃ স্কুল-কলেজের ছাত্ররাই শিক্ষাকেন্দ্রে যাইত। সমিতির কাজে যাহারা পরীক্ষিত এরূপ সভ্যকেই উদয়পুর পাঠান হইত। উদয়পুর যাত্রীরা সোনামোড়া পৌঁছিয়া রাস্তায় পোষাক পরিবর্ত্তন করিয়া মজুর বেশে উদয়পুরে পৌঁছিত।

সেখানে গিয়া পরিচয় দিত বাবুর দেশ হইতে আসিয়াছে। সেখানেও তাহাদের মজুর বেশে থাকিতে হইত। উদয়পুরে আমাদের অনেক জমি ছিল এবং একটি কৃষি ফার্ম্ম ছিল। আখের আবাদ খুব ভাল হইত। আমাদের ধান জমি মুসলমান বর্গাদার চাষ করিত। আখের চাষ নিজেরাই করিতাম। খাদ্যদ্রব্য বিশেষ কিছু পাওয়া যাইত না, শুধু ডালই ছিল সম্বল, তখন এক ডাল-ভাতেই সকলে সন্তুষ্ট ছিল। বাগু মাঝে মাঝে কালী-মন্দির হইতে পাঠার মাথা লইয়া আসিত, মোহন্তর সহিত তাহার ভাব ছিল। রন্ধনকার্য্য নিজেদেরই করিতে হইত।

উদয়পুর শিক্ষাকেন্দ্রে অলসের কোন স্থান ছিল না, সকলেরই কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত। দেশে তখন চা'র প্রচলন ছিল না, প্রাতে জাউ-ভাত, পান্তাভাত বা চিঁড়া খাইয়া জমিতে কাজ করিতে হইত, দ্বিপ্রহরে স্নান-আহার ও বিশ্রামের পর বন্দুক লইয়া জঙ্গলে বাহির হইতে হইত এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সকলকে বাসায় ফিরিতে হইত। রাত্রে বিভিন্ন পুস্তক পাঠ, আলোচনা ও নিদ্রা। উদয়পুর পাহাড়ের গভীর অরণ্যে যেখানে লোকজনের বসতি ছিল না, সেখানে সমিতির সভ্যরা বন্দুক চালনা শিক্ষা করিত। সেখানে রাস্তা-ঘাট কিছুই ছিল না। পাহাড় অঞ্চলে রাস্তা ঠিক করিয়া চলা খুবই কঠিন। জঙ্গলে হিংস্র জন্তুর আক্রমণের ভয়, বিশেষতঃ সাপের ভয় খুব ছিল। উদয়পুর কেন্দ্রে বন্দুক এবং রিভলবার মেরামত হইত এবং বোমা ও অস্ত্র শস্ত্র নির্ম্মাণের চেষ্টা চলিত।

১৯১২ সনে রমেশ ব্যানার্জী, ব্রজেন্দ্র চক্রবর্তী (বাগু), আদিত্য দত্ত, দেবেন্দ্র বণিক্য প্রভৃতি দশজন সভ্য কুমিল্লা শহরে ধৃত হয় এবং পরে তাহাদের বিরুদ্ধে ডাকাতির ষড়যন্ত্র মামলা চালান হয়। ঐ মামলায় প্রত্যেকের সাত বৎসর কারাদণ্ড হয়। বাগুর সহিত ডাকাতির কোন সম্বন্ধ ছিল না, পূর্বদিন সে উদয়পুর হইতে কুমিল্লা আসিয়াছিল, বাগু রাত্রে যে বাসায় শুইয়াছিল সেই বাসা ঘেরাও করিয়া সকলকে গ্রেপ্তার করে। ঐ সময় বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার রাজসাক্ষী প্রিয়নাথ তাহার স্বীকারোক্তিতে বলিয়াছিল, উদয়পুর পাহাড়ে অনুশীলন সমিতির একটি গুপ্ত কেন্দ্র আছে এবং কালীচরণ সেখানে থাকে। তখন কালীচরণের (ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী) নামে ওয়ারেণ্ট ছিল এবং পুরস্কার ঘোষণা ছিল। আমরা পূর্বেই আভাস পাইয়া উদয়পুর কেন্দ্র পরিত্যাগ করিলাম। ইহার কিছুদিন পরই পুলিস সদলবলে সেখানে উপস্থিত হয়। তাহারা সেখানে যাইয়া দেখিল সব শূন্য, খাঁচা পড়িয়া আছে, পাখী নাই। ইহার পর বৃটিশ পুলিশ তিন বৎসর সমানে বোমার কারখানা ও বন্দুকের কারখানার অনুসন্ধানে সমস্ত পাহাড়-জঙ্গল তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করে কিন্তু কোথায়ও কোন সন্ধান পায় নাই।

অনুশীলন সমিতির গঠন-তন্ত্র
প্রতিজ্ঞা পত্র ও দীক্ষা

অনুশীলন সমিতির প্রধান কেন্দ্রের অধীনে জিলা-সমিতি, মহকুমা সমিতি, পরগণা সমিতি ও গ্রাম্য সমিতি ছিল। প্রত্যেক সমিতির একজন সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক থাকিত। স্থানীয় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে অধ্যক্ষ করা হইত। সমিতির সভ্যদিগকে প্রত্যহ বৈকালে লাঠি খেলা ছোরা খেলা ও ড্রিল শিক্ষা করিতে হইত। খেলার মাঠে নামডাকা হইত এবং অনুপস্থিত সভ্যদিগকে কারণ দর্শাইতে হইত। যে সকল সভ্য বহুদিন অনুপস্থিত থাকিত এবং

সমিতির কাজে যাহাদের কোন নিষ্ঠা থাকিত না, তাহাদের নাম কাটিয়া দেওয়া হইত, সমিতির সাধারণ সভ্যদিগের মধ্য হইতে যাহাদিগকে কর্ম্মঠ, চরিত্রবান, সাহসী ও দেশপ্রেমিক বলিয়া মনে হইত তাহাদিগকে আদ্য প্রতিজ্ঞা করান হইত।

আদ্য প্রতিজ্ঞা আমি এই সমিতি হইতে কখনও বিচ্ছিন্ন হইব না, আমি আমার চরিত্র সর্ব্বদা নির্ম্মল ও পবিত্র রাখিব। আমি সকল সময়ই সমিতির বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিব। আমি সমিতির কর্তৃপক্ষের আদেশ বিনা বাক্যব্যয়ে প্রতিপালন করিব। আমি আমার নেতার নিকট কোন বিষয় গোপন করিব না এবং মিথ্যা বলিব না।

এই সব সভ্যদিগের মধ্য হইতে আবার বাছাই করিয়া যাহা-দিগকে বিপ্লবী দলের উপযুক্ত বলিয়া মনে হইত, তাহাদিগকে মধ্য প্রতিজ্ঞা করান হইত।

মধ্য প্রতিজ্ঞা—আমি সমিতির আভ্যন্তরীণ বিষয় সম্পর্কে অযথা আলোচনা বা কাহারও নিকট প্রকাশ করিব না। আমি পরি-চালকেব নির্দ্দেশ ব্যতীত একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাইব না। যদি কোন সময় সমিতির বিরুদ্ধে কোন প্রকার ষড়যন্ত্রের বিষয় জ্ঞাত হই, তাহা হইলে অবিলম্বে পরিচালককে জানাইব এবং তাহার প্রতি-কারের চেষ্টা করিব। আমি যে কোন অবস্থায়, যে কোন সময়ে পরিচালকের নির্দেশ পালন করিব।

আবার এই সব সভ্যদিগের মধ্য হইতে বাছাই করিয়া অন্ত্য-প্রতিজ্ঞা করান হইত।

অন্ত্য প্রতিজ্ঞা—আমি সমিতির উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত ইহার বেষ্টনী পরিত্যাগ করিয়া যাইব না। আমি পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনীর স্নেহ, গৃহের মোহ সমস্ত ত্যাগ করিব।

আবার এইসব সভ্যদিগের মধ্য হইতে বাছাই করিয়া বিশেষ প্রতিজ্ঞা করান হইত।

বিশেষ প্রতিজ্ঞা—আমার জীবন ও ঐহিকের সমস্ত সম্পদের বিনিময়ে আমি সমিতির প্রসারের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিব। সমিতির কোন গোপন বিষয় লইয়া কাহারও সহিত আলোচনা করিব না, অথবা আমার বন্ধু বা আত্মীয়ের নিকট প্রকাশ করিব না। ইহা ছাড়া কোন বিষয়ে সমিতির কোন সভ্যের নিকট কোন প্রকার অযথা প্রশ্ন করিব না।

প্রতিজ্ঞা করণের সময় সাধারণতঃ কোন দেবী মন্দিরে লইয়া গিয়া দেবীর সম্মুখে দীক্ষা দেওয়া হইত। পুলিনবাবু পি, মিত্রের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। দীক্ষাগ্রহণ-প্রণালী এইরূপ ছিল। পূর্ব্বদিন একবেলা হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া, সংযমী হইয়া, পরদিন প্রাতে স্নান করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইত। দেবীর সম্মুখে ধূপ-দীপ, নৈবেদ্য সাজাইয়া, বৈদিকমন্ত্র পাঠ করিয়া যজ্ঞ করিতে হইত। পরে প্রত্যালীঢ় আসনে বসিয়া (বাম হাঁটু গাড়িয়া শিকারোদ্যত সিংহের প্রতীক) মস্তকে গীতা স্থাপন করা হইত। গুরু শিষ্যের মস্তকে অসি রাখিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিতেন। শিষ্য যজ্ঞাগ্নির সম্মুখে দুই হাতে প্রতিজ্ঞা-পত্র ধরিয়া প্রতিজ্ঞা পাঠ করিতেন। আমি বাহ্রা ডাকাতির পূর্ব্বে, পুলিনবাবুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করি।

পুলিনবাবু ঢাকা অনুশীলন সমিতির সভ্যদিগকে রমনা-সিদ্ধেশ্বরী কালী-বাড়ীতে বা বুড়া শিবের মন্দিরে দীক্ষা দিতেন। দীক্ষা গ্রহণের পর প্রত্যেক সভ্যকে দুধ, ঘি, চিনি মিশ্রিত এক গ্লাস সরবৎ পান করিতে দেওয়া হইত। আদ্য প্রতিজ্ঞার সভ্যগণ প্রাথমিক সভ্য এবং বিশেষ প্রতিজ্ঞার সভ্যগণ পূর্ণ সভ্য (full-fledged member) বলিয়া গণ্য হইত। কেহ ইচ্ছা করিলেই যখন খুশী অনুশীলন সমিতির সভ্য হইতে পারিত না। আবার যখন ইচ্ছা দল ছাড়িয়া যাইতে পারিত না। অনুশীলন সমিতির নিয়মাবলীতে ছিল, কেহ দলত্যাগ করিলে সমিতির সম্পর্কে তাহার জ্ঞান নষ্ট

করিতে হইবে, অর্থাৎ দলত্যাগ করিয়া পাছে সে দলের অনিষ্ট করে বা গুপ্ত খবর প্রকাশ করে এজন্য তাহাকে সরাইয়া দেওয়া হইবে। অবশ্যই অনুমতি লইয়া গৃহী সভ্য হিসাবে থাকিতে পারিত। ১৯১২ সনের পর প্রতিজ্ঞা উঠাইয়া দেই। প্রতিজ্ঞা-পত্রগুলি গভর্ণমেণ্ট ঢাকা ষড়যন্ত্রের মামলার দলিল হিসাবে ব্যবহার করিয়াছিল।

১৮১৮ সনের ৩ আইনে বন্দী

স্বদেশী আন্দোলন যখন প্রবল বেগে চলিতে লাগিল, গ্রামে গ্রামে লাঠিখেলা ও সামরিক ড্রিল শিক্ষা, কৃত্রিম যুদ্ধ ব্যাপক হইয়া উঠিল, তখন গভর্ণমেণ্ট ১৯০৮ সনের নভেম্বর মাসে শ্রীঅশ্বিনী কুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র. সুবোধ মল্লিক, মনোরঞ্জন গুহ-ঠাকুরতা, পুলিনবিহারী দাস, ভূপেশচন্দ্র নাগ,শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, সতীশচন্দ্র চ্যাটার্জ্জিকে তিন আইনে গ্রেপ্তার করিয়া বিভিন্ন জেলে আটক রাখিলেন।

গভর্ণমেণ্ট ১৯০৯ সনের জানুয়ারী মাসে অনুশীলন সমিতি (ঢাকা), স্বদেশ বান্ধব সমিতি (বরিশাল), ব্রতী সমিতি (ফরিদপুর), সুহৃদ সমিতি (ময়মনসিংহ), সাধনা সমিতি (ময়মনসিংহ) বে-আইনী ঘোষণা করিলেন। বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলন দমিত হইল না। প্রকাশ্য সমিতি গুপ্ত সমিতিতে পরিণত হইল।

যুগান্তর পত্রিকা

অনুশীলন সমিতির কাজ কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর পি, মিত্র ও বারীন বাবুর মধ্যে কর্ম্মপন্থা লইয়া মতভেদ ঘটে। বারীন বাবু প্রভৃতি একদল যুবক হিংসাত্মক কাজকর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু প্রবীণ নেতা মিত্র মহাশয় গঠনমূলক কাজের উপর

জোর দেন। ফলে অনুশীলন সমিতির মধ্যে ভাঙ্গন ঘটে, বারীন বাবুর দল অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ, বোমা তৈয়ার ও হিংসাত্মক কাজে মনোনিবেশ করেন। এই দলের মুখপত্র ছিল যুগান্তর। ১৯০৬ সনের ১৮ই মার্চ যুগান্তর পত্রিকা বাহির হয়। যুগান্তরের সম্পাদক ছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দের কণিষ্ঠ ভ্রাতা)। লেখকদিগের মধ্যে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবব্রত বসু, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, কিরণচন্দ্র মুখার্জ্জি প্রভৃতি ছিলেন। ঐ সময় যুগান্তরের লেখনী হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইত। যুগান্তর পত্রিকা ঐ সময় খুব জনপ্রিয় ছিল। গভর্ণমেণ্ট যুগান্তর পত্রিকা প্রকাশ করা বন্ধ করিয়া দেন, কিন্তু যুগান্তর বন্ধ হইল না, গোপনে বাহির হইতে লাগিল, সকল দলের লোকই যুগান্তর পত্রিকা নিজের মত মনে করিয়া প্রচার করিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্বদেশী আন্দোলন ও তাহাতে যোগদান

১৯০৫ সনে বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের জন্ম হয়। স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল বন্যায় সমগ্র বাংলাদেশ প্লাবিত হইয়াছিল, সেই বন্যায় আমার ক্ষুদ্র জীবনতরীখানাও ভাসিয়া যায়। স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাংলার যুবক, বৃদ্ধ, জমিদার সকলেই স্বদেশপ্রেমে মাতিয়া উঠে, সকলের মনে নূতন উৎসাহ —আমরা স্বাধীনতা চাই, বৃটিশের অধীনে থাকিব না। স্বদেশী আন্দোলনের নেতাগণ নির্দেশ দিয়াছেন, বিদেশী দ্রব্য বয়কট করিতে হইবে, দেশের সর্বত্র বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ জানাইতে হইবে। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ কল্পে দেশের সর্বত্র সভা ও শোভাযাত্রা হইতে লাগিল, হাটে-বাজারে পিকেটিং

চলিতে লাগিল। আমি তখন ধলা স্কুলে পড়ি এবং বোর্ডিংএ থাকি। স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ ধলায় আসিয়া পৌঁছিল, জমিদার বাড়ীতে তাঁত, চরকা বসিল ; সভা, শোভাযাত্রা পিকেটিং চলিতে লাগিল—"বন্দেমাতরম, আল্লাহো আকবর, ভারতমাতা কী জয়" ধ্বনিতে আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। যুবকের দল ডন, কুস্তি, কুচকাওয়াজ করিতে লাগিল—লোকের মনে কি উৎসাহ! ধলাতে যাহারা আন্দোলনে মাতিয়াছিল আমি তাহাদের মধ্যে একজন ছিলাম।

একদিন দেখিলাম বাড়ী হইতে আমার নামে একটা পার্শেল আসিয়াছে। কিসের পার্শেল বুঝিতে পারি নাই, আমার নামে কোন পার্শেল আসার কথা ছিল না ; আমি মনে করিলাম, এখানে খাওয়ার বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না, এজন্য বাড়ী হইতে কিছু খাদ্য দ্রব্য পাঠাইয়াছে। তাড়াতাড়ি পার্শেল খুলিয়া দেখিলাম একজোড়া দেশী মোটা কাপড়। আমার কাপড়ের প্রয়োজন ছিল না,আমার জামা-কাপড় ক্রয় করার জন্য বাড়ী হইতে টাকা আসিত, আমি আমার পছন্দমত জামা-কাপড় ক্রয় করিতাম। পার্শেল পাঠাইয়াছিলেন আমার পিতা। তিনি সম্ভবতঃ চাহিয়াছিলেন, তাঁহার স্নেহের কনিষ্ঠ পুত্র স্বদেশপ্রেমিক হউক। তাই তিনি তাহাকে দেশী বেশভূষায় সজ্জিত দেখিতে চাহিয়াছিলেন ; হয়ত তিনি এজন্যই পাঠাইয়াছিলেন একজোড়া দেশী মোটা কাপড়। এই কাপড়ের মধ্য দিয়াই তিনি পাঠাইয়াছিলেন তাঁর আশীর্বাদ—আমি তাহা মাথা পাতিয়া লইলাম।

স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামেও পৌঁছিয়াছিল। আমার পিতা (দুর্গাচরণ চক্রবর্তী) আমাদের বাড়ীতে বিদেশী দ্রব্য বর্জন করেন। তিনি দেশী কাপড় ও দেশী নুন প্রচলন করেন। সেই সময় হইতে আমাদের বাড়ীতে বিলাতী কাপড় ও বিলাতী নুন আর প্রবেশ করিতে পারে নাই। আমাদের কাপাসাটিয়া গ্রামে

(ময়মনসিংহ) যে কয়ঘর লোকের বাস, সকলের বাড়ীতেই দেশী কাপড় ও নুন প্রবেশ করিল।

ধলাতে প্রায়ই কলেরার প্রাদুর্ভাব হইত। একবার খুব ব্যাপক ভাবে কলেরা দেখা দেয়। আমাদের স্কুল বোর্ডিংএর তিনটি ছাত্রের কলেরা হয়—স্কুল বন্ধ হইয়া যায়। বোর্ডিংএর প্রায় সকল ছাত্রই বাড়ী চলিয়া গেল ; রোগীর সেবা-শুশ্রূষার জন্য স্বেচ্ছায় কয়েকজন রহিয়া গেল—আমিও তাহাদের মধ্যে একজন ছিলাম। আমার বয়স অল্প ছিল, এজন্য আমাকে বিশেষ কাজ করিতে দেয় নাই—কেবল বড়দের ফরমাশ তামিল করিতে হইত। আমাদের স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বিজয়চন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতারও কলেরা হইয়াছিল, আমি তাহার বাসায় যাইয়াও সময় সময় রোগীর সেবা করিতাম। এই ঘটনার পর হইতে তিনি আমাকে খুব স্নেহ করিতেন।

পর বৎসর আমার ছোড়দা (চন্দ্রমোহন চক্রবর্তী) আমাকে সাটিরপাড়া স্কুলে ভর্তি করিয়া দেন। সাটিরপাড়া স্কুলের সম্পাদক পরলোকগত ললিতমোহন রায়ের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। আমি স্কুল বোর্ডিংএ থাকিতাম। কিছুদিন পর বিজয়বাবু সাটিরপাড়া স্কুলের হেডমাস্টার হইয়া আসেন। সাটিরপাড়াতেও স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ লাগিয়াছিল। সাটিরপাড়ায় জমিদার ললিতবাবু স্বদেশী আন্দোলনের একজন নেতৃস্থানীয় ছিলেন, তিনি ঢাকাতে ওকালতি করিতেন। ললিতবাবুর ভাই মোহিনীবাবু বাড়ীতে থাকিতেন। মোহিনীবাবু এবং ব্রাহ্মণদীর কামিনী মল্লিক মহাশয় ঐ অঞ্চলের স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। আমি অল্প দিনের মধ্যেই সকলের সহিত পরিচিত হইলাম এবং উৎসাহী কর্মীদের একজন হইয়া উঠিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিপ্লবীদলের উৎপত্তি ও কর্মধারা

স্বদেশী আন্দোলনের সময় জাতীয় কংগ্রেস নূতন রূপ ধারণ করে, তাই ইহাকে কংগ্রেসের দ্বিতীয় রূপ বলা যাইতে পারে। ইহার পূর্বে কংগ্রেসের কার্যক্রম ছিল সরকারের নিকট আবেদন নিবেদন করা। ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে সর্বপ্রথম কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সময় নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্য ছিল—বৎসরে একবার সকলে একত্রিত হইয়া দেশের অভাব অভিযোগের কথা পরস্পরের মধ্যে আলোচনা ও আলোচনান্তে তাহা সরকারের নিকট নিবেদন করা। তখনকার দিনে ইহাই ছিল দুঃসাহসিক কার্য। এই কার্যটুকুর জন্যই তখনকার কংগ্রেস গরমপন্থী বা বৈপ্লবিক 'এজিটেটর' বলিয়া অভিহত হইত। বর্তমানে আমরা তাহাকে উপহাস করিতে পারি, নির্বোধ ও ভীরু বলিয়া সম্বোধন করিতে পারি, কিন্তু বর্তমানের মাপকাঠি দিয়া সেই সময়কে বিচার করিলে ভুলই করা হইবে। কেননা, আজ যাহারা গরমপন্থী, সময়ের ব্যবধানে তাহারাই একদিন নিতান্ত নরমপন্থী বলিয়া বিবেচিত হইবে। আজ যাহা দুঃসাহসিক কার্য বলিয়া মনে হইতেছে, কাল তাহা সাধারণ কার্য্য বলিয়া গণ্য হইবে। স্বদেশী আন্দোলনের আবির্ভাবের পূর্বে জেলে যাওয়া ছিল অত্যন্ত দুঃসাহসিক কাজ কিন্তু এখনকার দিনে জেলে যাওয়া একটি সাধারণ কাজের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে—বাড়ীর মেয়েরাও ইহাতে ভয় পায় না। তাই আজ, আমরা যাহারা গরমপন্থী বা বিপ্লবী বলিয়া গর্ব করিতেছি, ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে তখনকার যুবকদের নিকট এই আমরাই হয়ত নিতান্ত নরমপন্থী বলিয়া পরিগণিত হইব। স্বাধীন ভারতের যুবকেরা মনে করিবে আমরা নিতান্ত ভীরু ছিলাম—নতুবা এতদিন

কি করিয়া পরাধীনতার বোঝা বহন করিয়াছি। ১৯০৭-৮ সনে আমরা যেভাবে জেলে থাকিতাম আজকাল যাহারা জেলে আসে তাহারা তাহা শুনিয়া নিঃসঙ্কোচে বলিবে, "কেন আপনারা এই অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করিয়াছিলেন? তাহারা জানে না যে, বর্তমান অবস্থা অকস্মাৎ—একদিনে আসে নাই, তাহার পিছনে জমাট রহিয়াছে বহুদিনের আন্দোলন. শত শত কর্মীর অত্যাচার নির্যাতন ভোগ, সহস্র সহস্র দেশ সেবকের নিবিড় আত্মত্যাগ। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে গভর্ণমেণ্টের কার্যের প্রতিবাদ করা তো দূরে থাকুক, সরকারের নিকট আবেদন নিবেদন করিতেও লোকে ভয় পাইত। জেলখানার কয়েদীরা যেমন কোন পরিদর্শকের নিকট অভিযোগ করিতে ভয় পায়, ভারতবাসীর অবস্থাও তদ্রূপ ছিল। অবশ্য কেহ কোন অভিযোগ করিলে যে সরকার তাহাকে তৎক্ষণাৎ ধরিয়া ফাঁসী দিত তাহা নহে। সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতবর্ষে যে দমননীতি অবলম্বিত হইয়াছিল তাহারই ফলস্বরূপ বংশপরম্পরাগত ভয় এই অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছিল। অভিযোগ করিলে "না জানি কি হয়" এই অনিশ্চিত ভয়ের জন্যই কেহ কিছু বলিতে সাহস পাইত না, সকলেই নীরবে সহ্য করিয়া যাইত। এই কারণে কংগ্রেসের এই কার্যকেও সকলেই দুঃসাহসিক কার্য মনে করিত। দীর্ঘ বিশ বৎসর পরে কিন্তু একদিন এই কংগ্রেসই দৃঢ়স্বরে বলিল—আমাদের দাবী পূরণ না করিলে আমরা বিলাতী পণ্য দ্রব্য বর্জন করিব। অথচ তখনও কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ পূর্ণ স্বাধীনতার কল্পনা করিতে পারেন নাই—তখনও তাহাদের দাবী ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, যে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বর্তমানে আমরা ভোগ করিতেছি।

একদিন শনিবার বৈকালে সাটিরপাড়া বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে ঢাকা হইতে একজন ভদ্রলোক আসিলেন। তাঁহার বাড়ী সাটিরপাড়ারই নিকট এবং তিনি আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসের

দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র বরদাকান্ত দেব মহাশয়ের পরিচিত। বরদাবাবুকে তিনি বলিলেন যে সাটিরপাড়ায় অনুশীলন সমিতির শাখা স্থাপন করিতে হইবে। বরদাবাবু আমাকে ডাকিয়া আমার মত জিজ্ঞাসা করিলে আমি সম্মত হইলাম। আগন্তুক ভদ্রলোকটি তখন বরদাবাবু ও আমাকে সমিতির 'প্রতিজ্ঞা' করাইলেন এবং সামান্য কিছু লাঠিখেলা শিক্ষা দিলেন। পরদিন যাত্রাকালে তিনি সমিতির নিয়মাবলী ও প্রতিজ্ঞা-পত্র দিয়া গেলেন এবং বলিয়া গেলেন, আমরা যেন সর্বদা মনে করি আমাদের জীবন দেশের জন্য। প্রতিজ্ঞাগুলি ছিল অতি সাধারণ, যেমন (১) আমি কখনও এই সমিতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইব না। (২) সর্বদা আমি আমার চরিত্র নির্মল ও পবিত্র রাখিব। (৩) নেতার আদেশ আমি বিনা বাক্যব্যয়ে প্রতিপালন করিব। আমার গুরুদেবের বিদায়কালীন বাণী আমি সর্বদা মনে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি—প্রতিজ্ঞাগুলিও পালন করিয়াছি কিন্তু আমার গুরুদেব তাঁহার নিজের জীবনে তাহা পালন করেন নাই—কিছুদিন পর বিবাহ করিয়া তিনি অর্থোপার্জন করিতে আরম্ভ করেন ও শেষ বয়সে অসুখে ভুগিয়া মারা যান।

বরদাবাবু ও আমি ১৯০৬ সনে সাটিরপাড়াতে প্রথম অনুশীলন সমিতির সভ্য হইলাম। অতঃপর আমাদের মধ্যে কর্মকর্তা নিযুক্ত করিতে হইল। বরদাবাবু আমাকে সম্পাদক হইতে অনুরোধ করিলেন। আমি আপত্তি জানাইয়া বলিলাম ইহা কিছুতেই হইতে পারে না, কারণ, আপনি আমার অপেক্ষা বয়সে বড়; উপরের ক্লাশে পড়েন, উপরন্তু আপনিই প্রথম প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। কাজেই আপনিই সম্পাদক হউন,আমি আপনার সহকারীরূপে কাজ করিব। বরদাবাবু কিছুতেই রাজী হইলেন না, বলিলেন, "আপনার কোন ভয় নাই, আমিই সব করিয়া দিব।" অগত্যা আমাকেই সম্পাদক হইতে হইল, বরদাবাবু হইলেন সহকারী সম্পাদক। বরদাবাবু ও

আমার চেষ্টায় সাটিরপাড়ার সমিতির সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইহার পর আমরা বিভিন্ন গ্রামে যাইয়াও শাখা-সমিতি স্থাপন করিতে লাগিলাম। কাহারও অসুখ হইলে আমরা যাইয়া সেবা করিতাম, গ্রামে চোরের উপদ্রব হইলে রাত্রে আমরা পাহারা দিতাম। মেলার সময় জলসত্র খুলিতাম, যাত্রীদের সাহায্য করিতাম ও শান্তিরক্ষা করিতাম। ক্রমে সাটিরপাড়াতে ফুটবল খেলা বন্ধ হইয়া গেল, তাহার পরিবর্তে আরম্ভ হইল লাঠিখেলা, ছোরা খেলা, ডন, কুস্তি ও ড্রিলশিক্ষা। প্রথম সমিতির বোর্ডিং হইতে লোক আসিয়া আমাকে শিখাইয়া যাইত। পরে আমি সকলকে শিক্ষা দিতাম। পুলিনবাবু দুই একবার সাটিরপাড়া আসিয়া শাখা-সমিতি পরিদর্শন করিয়া যান।

এক চৈত্র সংক্রান্তিতে সাটিরপাড়ার নিকট চিনিশপুর কালী-বাড়ীতে মেলা বসিয়াছে। মেলাটি তিন দিন থাকিবে। আমরা মেলায় জলসত্র খুলিয়াছি। নিজেরাই কলসে করিয়া জল আনিয়া বড় বড় মাটির জালা পূর্ণ করিয়া রাখিতাম। জল আনিবার সময় যাহাতে অপর কেহ স্পর্শ করিতে না পারে তজ্জন্য সকলকে রাস্তা ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ জানাইতাম। কারণ আমরা না মানিলেও সমাজে অস্পৃশ্যতা দোষ তখনও প্রবল ছিল, স্পর্শদোষ হইলে অনেকে আমাদের জল পান করিয়া জাতি নষ্ট করিতে রাজী হইবে না। দ্বিতীয় দিন বৈকালে "ভুলু" (ভুপেন রায়) জল আনিতে-ছিল। সেই রাস্তা দিয়া থানার দারোগা যাইতেছিলেন। দারোগারা এবং জেল-দারোগারা বরাবরই নিজদিগকে লাটসাহেব হইতেও অধিকতর ক্ষমতাশালী বলিয়া মনে করেন। "ভুলু" 'সর-সর, বলিয়া জল লইয়া আসিতেছিল, দারোগাবাবু মনে করিলেন তাঁহাকে অপমান করা হইল। তিনি 'ভুলুকে' বেশ করিয়া শাসাইয়া গেলেন। ঘটনাটি অতি সামান্য এবং 'ভুলুও' বিশেষ কিছু মনে করে নাই। আমি কিছুক্ষণ পর যখন এই ঘটনা জানিতে পারিলাম, দারোগাবাবু

তখন মেলা ছাড়িয়া থানায় চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘটনাটি তিল হইতে তাল হইয়া চারিদিকে প্রচারিত হইল ও অবশেষে সকল দোষ আমার স্কন্ধে আসিয়া চাপিল। জমিদার বাড়ীর হিন্দুস্থানী বরকন্দাজ খুব বীরত্বের সহিত লাঠি ঘুরাইতে লাগিল—আমি কেন দারোগাবাবুর অপমানকর উক্তির কোন প্রতিবিধান করিলাম না' এজন্য সমস্ত বিরূপ সমালোচনা আমার উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ এমনও বলিতে লাগিলেন যে, "ছেলেমানুষ, দারোগা দেখিয়া ভয় পাইয়াছিল।" মাষ্টার মহাশয়দের মধ্যে অবশ্যই দুই-একজন বলিয়াছিলেন, "খুব বুদ্ধিমানের কাজ করিয়াছে, মাথা ঠাণ্ডা রাখিছে।" আমি কিন্তু ইহার মধ্যে ভয়েরও কিছু দেখি নাই, মাথা ঠাণ্ডা রাখিবারও কিছু দেখি নাই। যাহা হউক এই সব পরস্পর বিরোধী মন্তব্য শুনিয়া আমি একটু দুঃখিত ও উত্তেজিত হইলাম এবং সন্ধ্যাকালে নিকটবর্তী গ্রামের সমিতির সম্পাদকের নিকট পত্র পাঠাইলাম। পরদিন তিনশত ভলাণ্টিয়ার লাঠি সহ উপস্থিত হইল। খেলার মাঠে কিছুক্ষণ 'রাইট-লেফ্ট' করাইয়া আমি তাহাদিগকে আদেশ দিলাম যে, মেলার মধ্যে দারোগাকে দেখিলেই পিটাইতে হইবে। দারোগাও কিছু বিপদাশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাই তিনিও থানার সমস্ত চৌকিদার আনাইয়া রাখিয়াছিলেন। সমিতির ভলাণ্টিয়ারগণ বীরদর্পে মেলায় ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল ও সমস্ত সময় বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিতে থাকিল। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সেদিন কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই, কেননা যে কারণেই হউক দারোগাবাবু সেদিন মেলায় উপস্থিত হন নাই। যাঁহারা পূর্ব্বে আমাকে "ছেলেমানুষ ও ভীরু" বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলেন, এই ঘটনা হইতে তাঁহারা আশ্বস্তবোধ করিলেন।

আমার নাম ছিল ত্রৈলোক্যমোহন। কিন্তু 'মোহন' শেষ পর্য্যন্ত 'নাথে' পরিবর্তিত হইয়াছিল। ইহার একটি ইতিহাস আছে।

একদিন বিদ্যালয় পরিদর্শকের কর্মস্থল হইতে আমাদের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের নিকট একখানি পত্র আসিল, তাহাতে লেখা ছিল, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী তোমার বিদ্যালয়ের ছাত্র। সে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করে, সুতরাং তাহার নাম কেন বিদ্যালয় হইতে কাটা যাইবে না—ইত্যাদি। ইহাও ছিল যে আমি কোন প্রকার রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিব না এই মর্মে যেন একখানা প্রতিশ্রুতি-পত্র লিখিয়া দেই। চিঠি পাইয়া শিক্ষক মহাশয়গণ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। আমি কিন্তু আনন্দিত হইলাম। আমি এইজন্য আনন্দিত হইলাম যে, আমার নাম কাটিয়া দিলে আমি ঢাকায় গিয়া সমিতির বোর্ডিংএ থাকিয়া জাতীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে পারিব। আমার মাষ্টার মহাশয়গণ আমাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন বলিয়া তাঁহাদের চিন্তা হইল কি করিয়া তাঁহারা আমাকে রক্ষা করিবেন। প্রথমতঃ তাঁহারা স্থির করিলেন যে, তাঁহারা উত্তরে লিখিবেন "ত্রৈলোক্যনাথ বলিয়া আমাদের স্কুলে কেহ নাই।" পরে ভাবিয়া দেখিলেন যে, ইহাতে সমস্যার সমাধান হইবে না। সমাধানের জন্য তাই তাঁহারা ললিতবাবুর উপদেশ চাহিয়া পাঠাইলেন, ললিতবাবু সকল দিক রক্ষা করিয়া একখানা মুসাবিদা লিখিয়া পাঠাইলেন। মুসাবিদার মর্ম ছিলঃ আমি কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিই না বা দিবার ইচ্ছা রাখিনা, আমি শুধু স্বদেশী ব্যায়াম করি এবং স্বদেশী খেলা খেলি। শীতলবাবু আমাকে দিয়া ঐ মুসাবিদার নকল করাইয়া যথা সময়ে তাহা পাঠাইয়া দেন। ঐ মুসাবিদায় আমার নাম ত্রৈলোক্যনাথই লেখা ছিল। ইহার পর হইতে এই চিঠির ফলে বিদ্যালয়ের হাজিরা বহিতে আমার নাম 'মোহনের' পরিবর্তে 'নাথ' লিখিত হইল এবং আমি ত্রৈলোক্যনাথ হইলাম।

প্রতি বৎসর ঢাকা শহরে অনুশীলন সমিতির কৃত্রিম-যুদ্ধ হইত এবং সময় সময় খেলারও প্রতিযোগিতা হইত। খেলার

প্রতিযোগিতায় তুই একবার আমি পুরস্কারও পাইয়াছি। এই কৃত্রিম যুদ্ধের খেলা একটা দেখিবার জিনিষ ছিল। সহরের বহুলোক উহা দেখিতে যাইতেন। জেলা হাকিম, পুলিশ সাহেবরাও যাইতেন। তাঁহারা তামাসা দেখিতে যাইতেন কি আন্দোলনের গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করিতে যাইতেন তাহা তাহারাই জানেন। কৃত্রিম যুদ্ধে উভয়-পক্ষে সমিতির পাঁচ সাত হাজার সভ্য সমবেত হইয়া, ছোট লাঠি, বড় লাঠি, ছোরা প্রভৃতি লইয়া যুদ্ধ করিত। তুই দিকে তুই প্রকাণ্ড বৃক্ষের উপর বড় বাঁশ বাঁধিয়া তাহাতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হইত। যে দল যুদ্ধ করিয়া বিপক্ষ দলের ঐ জাতীয় পতাকা কাড়িয়া লইতে পারিত ও প্রধান সেনাপতিকে গ্রেপ্তার করিতে পারিত সেই দলই জয়লাভ করিত। বহুলোক এই 'যুদ্ধে' আহত হইত। এজন্য পূর্ব হইতেই হাঁসপাতাল ও ডাক্তারের ব্যবস্থা থাকিত। প্রত্যেক লাঠিতে রং মাখান থাকিত এবং কাহারও কাপড়-জামায় ঐ রং লাগিলে সে আহত বলিয়া গণ্য হইত ও তাহাকে বসিয়া থাকিতে হইত। কেহ তাহাকে প্রহার করিতে পারিত না এবং অ্যামবুলেন্স আসিয়া তাহাকে হাঁসপাতালে লইয়া যাইত। এক কৃত্রিম যুদ্ধে আমি আহত হইয়াছি, অর্থাৎ বিপক্ষের লাঠির আঘাতে আমার জামায় রং এর দাগ লাগিয়াছে। আমার সেদিকে লক্ষ্য ছিল না। আমি মারামারি করিয়া যাইতেছি-- এমন সময় এক পরিদর্শক সেই দিক দিয়া যাইতেছিলেন, তিনি আমার ঘাড় ধরিয়া আমাকে বসাইয়া দিলেন। এদিকে অপর রাস্তা দিয়া বিপক্ষের একটি দল আসিয়া আমাদের দলের উপর সঙ্গীন-চালনা করিল। চারিদিকে চাহিয়া যখন দেখিলাম, পরিদর্শকটি চলিয়া গিয়াছে তখন একখানা বড় লাঠি লইয়া আমি বিপক্ষ দলটিকে বাঁধা দিলাম। পরে দূর হইতে তাহারা আমাদের দলের উপর বড় লাঠি নিক্ষেপ করতে লাগিল—আমরাও পাল্টা জবাব দিতে লাগিলাম। হঠাৎ বিপক্ষের একটি বড় লাঠি আসিয়া

আমার কপালে পড়িল। তাহা ফিরাইতে না পারায় আমার কপাল বাহিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। এমন সময় অ্যাম্বুলেন্স আসিয়া আমাকে উঠাইয়া লইয়া গেল এবং একখানা গাড়ীতে করিয়া হাঁসপাতালে রাখিয়া আসিল। সেই রাত্রেই হাঁসপাতালে থাকিয়া সংবাদ পাইলাম আমাদের অর্থাৎ মফঃস্বলের জয় হইয়াছে।

সাটিরপাড়ার নিকট চিনিশপুর কালীবাড়ী অবস্থিত। ইহা প্রসিদ্ধ পীঠস্থান। সম্ভবতঃ বৈশাখ মাসে, কোন এক তিথিতে (অমাবস্যা), সেখানে হাজার হাজার লোক পূজা দিতে আসে। এই পূজায় চা'র-পাঁচশ পাঁঠা এবং পাঁচ-সাতটা মহিষ বলি পড়ে। একবার গুজব রটিল যে, এই পূজার দিন মুসলমানেরা কালীবাড়ীটি আক্রমন করিবে। আমি মফঃস্বল সমিতির সম্পাদকগণকে সংবাদ দিলাম, সেইদিন প্রাতে লাঠিসহ সকলকে উপস্থিত থাকিতে হইবে। প্রায় পাঁচশত স্বেচ্ছাসেবক ঐ দিন উপস্থিত হইল। প্রথমে তাহাদিগকে 'কুচকাওয়াজ' করাইলাম, পরে যাত্রীদের সুবিধার জন্য তাহাদের নানা কাজে বিভক্ত করিয়া দিলাম। সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা সেখানে উপস্থিত ছিলাম, কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই এবং যাত্রীরা সকলে বিদায় হইলে আমরাও প্রত্যাবর্তন করিলাম।

সাটিরপাড়া ছিল মফঃস্বল সমিতির একটি কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে প্রায় দেড় শত সভ্য ছিল। এই কেন্দ্রের অধীনে পঞ্চাশটি শাখা- সমিতি ছিল। আমরাই গ্রামে-গ্রামে যাইয়া ঐ সকল শাখা-সমিতি স্থাপন করি। উহাদের সভ্যগণকে আমরাই খেলা শিখাইতাম। এইভাবে সমিতির কাজ দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকিলে একদিন শুনিতে পাওয়া গেল বাহ্রা গ্রামে একটি ডাকাতি হইয়াছে। ডাকাতরা সকলেই ভদ্রলোক এবং তাহারা পুলিশের সহিত লড়াই করিয়া পলাইয়া গিয়াছে, ধরা দেয় নাই। এই ঘটনায় এক অভিনব চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল।

পুলিশ ঢাকা-সমিতির বোর্ডিং ও অন্যান্য স্থান থানাতল্লাসী করিতে আরম্ভ করিল। এই বাহ্রা ডাকাতির একটু বিস্তারিত বিবরণ দিলে পাঠকের স্বদেশী ডাকাতদের সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হইবে। ১৯০৮ সনে বাহ্রা ডাকাতি হয়। পুলিশ মনে করে ইহা অনুশীলন-সমিতির কাজ। এই ডাকাতিতে যুবকের দল অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়াছে, এই ডাকাতেরা প্রমাণ করিয়াছে বাঙ্গালীরা ভীরু নয়, বাঙ্গালী লড়াই করিতে জানে, মরিতে জানে। ডাকাতেরা সংখ্যায় পয়ত্রিশ জন ছিল, তাহারা নির্দিষ্ট সময়ে বাড়ী আক্রমণ করিতে পারে নাই, মধ্য রাত্রিতে বাড়ী আক্রমণ করিয়াছিল এবং যখন তাহাদের লুণ্ঠন কার্য শেষ হয় তখন প্রায় ভোর হইয়াছে, ডাকাতেরা ডাকাতি করিয়া বড় ঘাসী নৌকায় উঠিয়াছে, নৌকার দাঁড়ি-মাঝির কাজও তাহারাই চালাইয়াছে। অপ্রশস্ত খালের মধ্য দিয়া ডাকাতের দল নৌকা বাহিয়া চলিয়াছে। ডাকাত দেখার জন্য খালের দুইপাড়ে শত শত লোক নৌকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছে। ডাকাত ধরার জন্য বহুলোক বন্দুক, কোচ, বল্লম, প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া ডাকাতদের আক্রমন করিয়াছে। ডাকাতের দল মাঝে মাঝে বন্দুক ছুড়িয়া লোকদিগকে ভয় দেখাইতেছে। ইতিমধ্যে থানায় সংবাদ পৌছিয়াছে, দারোগা পুলিশ কনেষ্টেবলও বন্দুকসহ উপস্থিত হইয়াছে। খণ্ডযুদ্ধ সুরু হইয়াছে। এভাবে কয়েক ঘণ্টা অতিক্রান্ত হইয়াছে ঃ ডাকাতের দল ছোট নদী হইতে বড় নদী ধলেশ্বরীতে পড়িয়াছে। চারিদিকে সংবাদ পৌছিয়াছে। বিভিন্ন থানার পুলিশ-বাহিনীসহ দারোগারাও বন্দুক লইয়া ডাকাত ধরার জন্য উপস্থিত হইয়াছে। পুলিশের লোক ছাড়াও যাহাদের বন্দুক ছিল তাহারাও বন্দুক সহ উপস্থিত হইয়াছে। লড়াই চলিতেছে। ধলেশ্বরী নদীতে শত শত নৌকা, সহস্র সহস্র লোকের সমাবেশ হইয়াছে। উভয় পক্ষ হইতে গুলির আওয়াজ আসিতেছে, উভয় পক্ষে হতাহত হইয়াছে। সন্ধ্যা পর্যন্ত সমস্ত দিন এ ভাবেই চলিতেছে। ডাকাতির সংবাদ ইতিমধ্যে ঢাকাতে

পৌঁছিয়াছে। পুলিশ-সুপার ডাকাত ধরার জন্য গুর্খা সৈন্য সহ 'লঞ্চ' যোগে রওনা হইয়াছেন। ডাকাতেরা ছিল তরুণ যুবক। আহার নাই, নিদ্রা নাই, অনবরত পরিশ্রম করিতেছে। হতাহত হইতেছে। নৌকা গুলি-বিদ্ধ হওয়ায় অনবরত নৌকায় জল উঠিতেছে। কয়েকজন জলসেচার কাজে নিযুক্ত আছে। কিন্তু সন্ধ্যার সময় প্রবল ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল। চারিদিক অন্ধকার, ধলেশ্বরী নদী ক্রোধে উন্মত্ত হইয়াছে। ধলেশ্বরীর রুদ্রমূর্তি, উত্তাল তরঙ্গমালা দেখিয়া বহুলোকের মনে ডাকাত ধরা অপেক্ষা প্রাণ বাঁচানোর চিন্তাই প্রবল হইল। নিশার অন্ধকারে ডাকাতের নৌকা যে কোথায় বিলীন হইয়া গেল কেহ তাহার সন্ধান পাইল না। এই খণ্ডযুদ্ধে অনুশীলন সমিতির সভ্য গোপাল সেন নিহত হয়। রাজেন্দ্র দত্ত ও ক্ষিরোদ ঘোষ আহত হন। এই ডাকাতির মধ্যে শচীন্দ্র ব্যানার্জি (বিক্রমপুর ঢাকা) শান্তিপদ মুখার্জি (ঢাকা) অমৃত লাল হাজরা (মাণিকগঞ্জ ঢাকা) শিশির কুমার রায় (ফরিদপুর) আশুতোষ দাস গুপ্ত (বিক্রমপুর ঢাকা) শরৎ চ্যাটার্জি (ফরিদপুর) যোগেন্দ্র দাশ গুপ্ত (কলমা ঢাকা) সতীশ দাশ গুপ্ত (স্বামী সত্যানন্দ ফরিদপুর) জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার (ময়মনসিং) শশী সরকার (বাহ্রা ঢাকা) অংশ গ্রহণ করিয়া ছিলেন।

স্বদেশী যুগে লোকের মনে আজিকার মতো নেতৃত্ব স্পৃহা ছিল না, স্পৃহা ছিল দেশের সেবা করিবার, আর তখনকার দিনে দলাদলি ছিল না, দলাদলির স্থানে ছিল সহযোগিতা। আমি যখন থার্ড-ক্লাসে অধ্যয়ন করি তখন আমার অধীনে মহেশ্বরদী পরগণায় পঞ্চাশটি শাখা-সমিতি ছিল। সেইসব সমিতির সম্পাদক ছিলেন— উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক, মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক—প্রধান পণ্ডিত—কেহ আই এ. পাশ, কেহ বি-এ পাশ কেহ পোষ্ট-মাষ্টার, কেহ তালুকদার। সকলেই ছিলেন বয়সে ও বিদ্যায় আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সাটিরপাড়াতেও প্রথম ও দ্বিতীয়

শ্রেণীর অনেক ছাত্র সমিতির সভ্য ছিল। আজকালকার যুগে ইহা কেহ কখনও কল্পনা করিতে পারিবেন না, মনে করিবে হয় ইহা অসম্ভব, না হয় ইহা অতিরঞ্জিত। অথচ ইহার মধ্যে অসম্ভব বা অতিরঞ্জিত কিছুই নাই। ইহাতো মাত্র সেদিনের কথা, আমার শিক্ষক মহাশয় ও বন্ধুদের মধ্যে প্রায় সকলেই এখনও জীবিত আছেন। সাধারণ লোক হইতে পৃথক করিয়া দেখানো যায় আমার মধ্যে এমন কোন বিশেষত্বও ছিল না—তখনকার দিনে নেতার নির্দেশ পালনে বয়স ও বিদ্যার প্রাধান্যও কেহ কোনদিন দেখিতে চাহে নাই। ইহাই ছিল তখনকার কর্মীদের নিকট যুগ-ধর্ম। এখন প্রেসিডেন্ট-সেক্রেটারী ইলেকসনের সময় কত দলাদলি, মারামারি, মাথা ফাটাফাটি হয়; কিন্তু সেই যুগে ইহা কল্পনারও অতীত ছিল। সকলেই মনে করিত সমিতি যাহার উপর ভার দিয়াছে সে যে-কেহই হউক, তাহারই কথা আমরা শুনিব এবং সকলে মিলিয়া আমরা তাহাকে সাহায্য করিব। প্রত্যেকটি কাজে আমি সকলের সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করিয়াছি। সকলেই আমাকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। আমি যখন সময় সময় সাটিরপাড়া বিদ্যালয়ে ড্রিল করাইয়াছি, তখন অনেক সময় অনেককে ধমক দিয়াছি কিন্তু উহাতে কেহ আমার উপর কোনদিন বিদ্বেষভাব পোষণ করে নাই বরং তাহারা লজ্জিতই হইয়াছেন। আজকাল কোন যুবক-কর্মীকে কাজের কথা বলিলে প্রথমতঃ সে একদফা তর্ক করিবে কারণ সে তো অন্ধ-বিশ্বাসী নহে, তাহাকে বুঝিতে হইবে কাজটি ঠিক কিনা—অতঃপর দুই ঘণ্টা তর্কের পরে সে বলিবে "এ কাজের ভার ত অন্যের উপর দেওয়া যাইতে পারে।" ইহাই হইতেছে আজকালকার অধিকাংশ যুবকের কর্ম-চরিত্র। আজকালকার ছেলেরা অবশ্য বুঝে বেশী, তাই বোধ হয় তর্কও করে বেশী। তর্ক করিতে করিতেই সমস্ত শক্তি নষ্ট করে, কাজ করিবার আর বেশী ক্ষমতা থাকে না। অথচ তখনকার ছেলেরা কাজই বেশী করিত, তর্ক করিত না। তখনকার দিনে যখন

যাহাকে যাহা বলা হইয়াছে, বিনা বাক্যব্যয়ে সে তখনই তাহা করিয়াছে। আজকাল কোন একটি ছেলেকে শাসন করিলে সে হয়ত দল ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, অথবা গোপনে দল পাকাইবার চেষ্টা করিবে—ষড়যন্ত্র করিবে। তাই দেখা যায় বর্তমান যুগে ভাব-প্রচার যথেষ্ট হইয়াছে কিন্তু আন্তরিকতা কমিয়া গিয়াছে। নেতা হওয়াও তখন বড় শক্ত ব্যাপার ছিল। নেতৃত্ব তখন মোটেই লোভনীয় ব্যবসা ছিল না। নেতাদের বিপদই ছিল তখন বেশী, ফাঁসি, দ্বীপান্তর, গুলির আঘাতে মৃত্যু। অনুশীলনের নেতা প্রত্যেকেই ছোট হইতে বড় হইয়াছে। প্রথমে প্রত্যেককে বাড়ী-ঘর ছাড়িয়া গ্রামে গিয়া বসিতে হইয়াছে। একটি ক্ষুদ্র গ্রাম, হয়তো সেখানে কোন ভদ্রলোকের বাস নাই, সেখানে প্রথমে তাহাকে একটা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া থাকিতে হইয়াছে, গ্রামের লোকের মুষ্টিভিক্ষার উপর তাহাকে নির্ভর করিতে হইয়াছে। সেখানে যে সংগঠন-শক্তির পরিচয় দিয়াছে, যে অসীম সাহসের পরিচয় দিয়াছে, যে দুঃখ-কষ্ট ভোগ ও ত্যাগের পরিচয় দিতে পারিয়াছে সে-ই ধীরে ধীরে প্রধান-কেন্দ্রে আসিয়াছে। দলের লোক তাহাকেই নেতা বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। তখন কোন 'ইলেকসন' ছিল না, তখন ছিল যোগ্যতা। বর্তমান গণতন্ত্রের যুগে, কে কার নেতৃত্ব মানিবে, সকলেই নেতা।

সমিতির ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থের প্রয়োজন হইত। কিন্তু এই অর্থের অভাব কোনদিন হয় নাই—নানাভাবে অর্থ সমস্যার সমাধান হইত। আমার খরচের জন্য বাড়ী হইতে যে টাকা পাঠাইত তাহা সব খরচ হইত না। অবশিষ্ট যাহা থাকিত সমিতির কাজে তাহা ব্যয় করিতাম। আমার দুধ ও জলখাবারের টাকা বাঁচিয়া যাইত। কারণ সকলের সামনে একা দুধ ও জলখাবার খাইতে লজ্জাবোধ হইত। সময় সময় বাড়ী হইতে ঘি, কাপড়-জামা বই প্রভৃতির নামে করিয়াও টাকা আনাইয়া সমিতির কাজে ব্যয় করিয়াছি।

আমার বাড়ী হইতে টাকা পাঠাইতে কেহ কখনও কার্পণ্য করে নাই বা আমাকে সন্দেহও করিত না। যখন যত টাকার জন্য লিখিতাম তাহাই পাইতাম। আমরা সাটিরপাড়াতে মুষ্টিভিক্ষার প্রচলন করিয়াছিলাম—সপ্তাহে দুই মণ চাউল পাইতাম। ঐ চাউল-বিক্রীর টাকা সমিতির তহবিলে জমা হইত। কিছুদিন পর আয়ের আর একটি পথ আবিষ্কৃত হইল। আমাদের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় একদিন বলিলেন—শ্রাদ্ধের বৃষ ও বৎসতরী শাস্ত্রানুসারে অস্বামিক,বর্তমানে গোয়ালা ও বৈদিকব্রাহ্মণে লইয়া যায়, তোমরা দেশের কাজের জন্য তাহা গ্রহণ করিতে পার। ইহার পর যেখানেই শ্রাদ্ধ হইত সেখানেই যাইয়া আমরা বৃষ ও বৎসতরী লইয়া আসিতাম। উহা বিক্রয় করিয়া প্রাপ্ত টাকা সমিতির তহবিলে জমা দিতাম। শ্রাদ্ধ বাড়ীতে আমরা নিমন্ত্রণও খাইতাম, দক্ষিণাও নিতাম। দক্ষিণার পয়সাও সমিতির প্রাপ্য ছিল। আমরা একবার বলপূর্বক গো-হরণ করি—আমার বন্ধু ও সমিতির সভ্য গোতাসিয়া গ্রামের বীরেন ভট্টাচার্যের বাড়ীর শ্রাদ্ধে। বীরেনের বাড়ীর অবস্থা ভাল ছিল। কাজেই শ্রাদ্ধে বেশ টাকা-পয়সা খরচ করিবে। শ্রাদ্ধের দিন আমরা ত্রিশ-চল্লিশ জন লোক লাঠিসহ সেখানে উপস্থিত হইলাম। গোয়ালা ও ব্রাহ্মণগণও স্থির করিলেন যে, তাঁহারা আমাদিগকে বাধা দিবেন। বীরেন খুব আদর-যত্ন করিয়া সকলকে খাওয়াইল, আমরা সকলেই ব্রাহ্মণ হিসাবে দক্ষিণাও পাইলাম। শ্রাদ্ধের পর গোয়ালা এবং ব্রাহ্মণদের সহিত আমাদের একটি খণ্ড যুদ্ধ হইল। আমরাই জয়ী হইলাম এবং গোধন লইয়া চলিয়া গেলাম। এই ঘটনার পর বৈদিক ব্রাহ্মণ ও গোয়ালাদের প্রতিনিধি ঢাকায় যাইয়া নেতাদের নিকট অভিযোগ করেন এবং এই সর্তে মীমাংসা হয় যে, গোধনের পরিবর্তে তাঁহারা তাঁহাদের ছেলেদিগকে সমিতির সভ্য করিয়া দিবেন, শ্রাদ্ধ ও বিবাহ উপলক্ষে সমিতিকে চাঁদা দিবেন এবং আমরা আর বলপূর্বক গো-হরণ করিতে পারিব না।

সাটিরপাড়ার নিকট মাছিমপুর গ্রামে আমাদের শাখা-সমিতি ছিল। সেই সমিতির সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক ছিল দুই ভাই। তাহারা উভয়েই পুলিশের গুপ্তচর ছিল। তাহারা খুব উৎসাহী, বিনয়ী এবং এতটা বাধ্য ছিল যে কেহ তাহাদিগকে কোনরূপ সন্দেহ করে নাই। মাছিমপুব সমিতিটি আমার এক সহকারীর অধীন ছিল। একদিন সংবাদ পাইলাম ঢাকা সহরে খেলার প্রতিযোগিতা হইবে। আমরাও এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিব মনস্থ কবিলাম। ইহা জানিতে পারিয়া, গুপ্তচর ভ্রাতৃদ্বয় আমার সহকারীর নিকট প্রস্তাব করিল যে তাহাদের একটি বড় নৌকা আছে, বিনা ভাড়ায় তাহারা সেই নৌকাব ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিবে। আমাদেব নিজেদেরই নৌকা চালাইয়া সহরে যাইতে হইবে। আমি এই প্রস্তাবে রাজী হইলাম। নৌকা ছয় মাইল দূরে শীতললক্ষার পাবে ছিল—গুপ্তচর দুইটি আমাদিগকে রাস্তা দেখাইয়া লইয়া চলিল। রাত্রি প্রায় এগারোটাব সময় আমবা নদীর ধারে এক নির্জন স্থানে একটি নৌকা দেখিতে পাইলাম। গুপ্তচরদেব নির্দেশ অনুসাবে আমবা সেই নৌকায় উঠিয়া নৌকা ভাসাইয়া দিলাম। গুপ্তচব ভ্রাতৃদ্বয় সহ আমরা প্রায় মোট আঠার জন ঐ নৌকায় ছিলাম। ঢাকা কতদূব—যাইতে কতদিন লাগিবে, এতগুলি লোক লইয়া যাইতেছি—তাহাবা রাস্তায় কি খাইবে—ইত্যাদি চিন্তা আমার মাথায় আসে নাই। নৌকাতে কোনো আলো ছিল না : উপবন্ত আমরা সকলেই নৌকা চালানো সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিলাম। যাহা হউক, স্রোত আমাদের অনুকূল ছিল, নৌকা চলিতে লাগিল। পরদিন প্রাতে ডাঙ্গাবাজারে আমাদের নৌকা পৌছিল। সারারাত্রির পরিশ্রমে সকলেই ক্ষুধার্ত ছিল—বাজার নিকট দেখিয়া চিড়াগুড় কিনিবার প্রস্তাব হইল। প্রস্তাবে, আমার মুখ শুকাইয়া গেল। বলিলাম, 'টাকা তো আনি নাই।' যদুনাথ দাস তখন আমাকে রক্ষা করিল। সে বলিল, 'টাকা আমার নিকট আছে।' বলিয়া

সতের টাকা আমার হাতে দিল। যদু কিছুদিন পূর্বে আমাদের গ্রামের সমিতি পরিদর্শন করিতে গিয়াছিল, আমাদের গ্রামের সতীশ রায়, বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি কয়েকজন গান গাহিয়া, ভিক্ষা করিয়া কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়াছিল। তাহারা সেই টাকা যদুকে দিয়াছিল। যদু পূর্বদিন সাটিরপাড়া ফিরিয়াছে। সে সেই টাকা আমাকে দিয়াছিল। তখন আমি কাজে ব্যস্ত থাকায় বলিয়াছিলাম, "এখন তোমার নিকটেই রাখ।" যদু বুদ্ধি করিয়া সেই টাকা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে। সেই টাকা হইতে এখন চিঁড়াগুড় কেনা হইল। এই সময় একটি গুপ্তচর বলিল, তাহার শরীর বিশেষ ভাল বোধ হইতেছে না, বাড়ীতেও একটু কাজ আছে। সে বাড়ীর কাজটুকু সারিয়া সেইদিনই ষ্টীমারে নারায়ণগঞ্জ পৌঁছিবে এবং সেইখানে আমাদের সহিত দেখা করিবে। আমি তখন কোন সন্দেহ করিতে পারি নাই, তাহাকে চলিয়া যাইবার অনুমতি দিলাম। সে চলিয়া গেল, আমরাও নৌকা ভাসাইয়া দিলাম। গুপ্তচরটি ডাঙ্গা-বাজারে নামিয়া নরসিংদী থানার দারোগা সহ ষ্টীমারে নারায়ণগঞ্জে রওনা হইল। আমাদের নৌকায় থালা, বাটি, ঘটি কিছুই ছিল না, কাজেই খাইবার খুব অসুবিধা হইয়াছিল। কিন্তু উৎসাহ ও আনন্দে কেহ তাহা গ্রাহ্য করে নাই। বৈকালে আমাদের নৌকা নারায়ণগঞ্জে পৌঁছিল। রাস্তায় যদুর খুব জ্বর হইয়াছিল। পূর্ব রাত্রে বৃষ্টিতে ভিজিয়াছিল। আমাদের সঙ্গে বিছানাপত্র কিছুই ছিল না। জ্বরের ঘোরে সে কতকটা অজ্ঞান অবস্থায় রহিয়াছে। সঙ্গের গুপ্তচরটি, আমাদের নৌকা নিরাপদে রাখিবে বলিয়া স্থির ছিল, সে তদনুসারে ব্যবস্থা করিতে চলিয়া গেল। যদুর সেবার জন্য আমি ও বিনোদ চক্রবর্তী নৌকায় রহিলাম। অপর সকলকে ঢাকা পাঠাইয়া বলিয়া দিলাম, তাহারা ট্রেনে ঢাকা যাইয়া আমাদের সংবাদ দিবে। কিছুক্ষণ পর গুপ্তচরটি একটি হিন্দুস্থানী 'কন্‌ষ্টব্‌ল্‌কে' ময়লা কাপড় পরাইয়া বাসার চাকর সাজাইয়া আনিয়া আমাকে বলিল, সে তাহার এক

আত্মীয়ের বাসার চাকর, সে নৌকা পাহারা দিবে। আমি নৌকার জন্য নিশ্চিন্ত হইলাম। ঘণ্টাখানেক পর দেখিতে পাইলাম অনেক-গুলি পুলিশ আমাদের দিকে আগাইয়া আসিতেছে। ক্রমে তাহারা নিকটবর্তী হইল এবং পরে দৌড়াইয়া ও লাফাইয়া আমাদের নৌকায় উঠিল। সারা নৌকা তাহারা তন্ন-তন্ন করিয়া তল্লাসী করিল কিন্তু কিছুই পাইল না। অবশেষে আমাদিগকে (আমার সহপাঠী যদুনাথ দাস এবং বিনোদ চক্রবর্তীকে) গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অস্ত্র সংগ্রহ, বোমার কারখানা

অনুশীলন সমিতির নেতারা বিশ্বাস করিতেন স-শস্ত্র বিপ্লব দ্বারাই ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে, তাই তাহারা ভাবী স-শস্ত্র অভ্যুত্থা-নের আয়োজন করিতে লাগিলেন। স-শস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য প্রয়ো-জন জনবল, ধনবল এবং অস্ত্র-শস্ত্র। নেতৃবর্গ তাই গোপনে অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ ও দল বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যাহারা বিশেষ পরীক্ষিত, অন্ত্য প্রতিজ্ঞার সভ্য, তাহাদিগকে অস্ত্র-সংগ্রহ বিভাগে নেওয়া হইত। এই বিভাগের লোকেরা প্রকাশ্য কোন আন্দোলনে বা অপর কোন বৈপ্লবিক কাজে যোগ দিতে পারিত না। তাহারা এরূপ কোন কাজ করিতে পারিত না যাহাতে পুলিশের সন্দেহ হয়। তাহারা রাজনৈতিক সন্দেহ-ভাজন ব্যক্তিদিগের সহিত প্রকাশ্যে মেলামেশা করিতে পারিত না। যাহারা অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিত বা যাহাদের নিকট অস্ত্রশস্ত্র থাকিত তাহারা জানিত, ধরা পড়িলে কঠোর সাজা হইবে। তাহারা পুলিশের নির্যাতন এবং জেল সুনিশ্চিত, ইহা জানিয়াই এই সব গুরু দায়িত্ব ভার গ্রহণ করিত।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম দিকে ফরাসী চন্দননগরে অস্ত্র আইন ছিল না, সেখান হইতে অস্ত্র সংগ্রহ করা সহজ ছিল, অবশ্য পরে তাহা বন্ধ হইয়া যায়। ফিরিঙ্গীদিগের নিকট হইতে কিছু অস্ত্র সংগ্রহ হইয়াছে। বিপ্লবীদিগের বন্দুক-পিস্তল আমদানী হইয়াছে বিদেশ হইতে, বিদেশগামী জাহাজের মারফৎ। দেশীয় রাজ্যসমূহ হইতেও কিছু অস্ত্র সংগ্রহ করা হইয়াছে। আবার দেশেও বন্দুক-পিস্তল তৈয়ারের চেষ্টা করা হইয়াছে কিন্তু আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নাই।

তখন অনারেরী ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের বন্দুক-পিস্তল ক্রয় করার লাইসেন্সের প্রয়োজন হইত না, তাহারা বিনা লাইসেন্সেই ক্রয় করিতে পারিতেন। আমাদের কাপাসাটীয়া গ্রামের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার রায় অনারেরী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। সে ১৯১০ সনের কথা, আমি তখন পলাতক ছিলাম। কৃষ্ণকুমার রায়, অনারেরী ম্যাজিষ্ট্রেটের নামে কলিকাতার এক বন্দুক-বিক্রেতা সাহেব কোম্পানীর ঠিকানায় একটি মশার পিস্তল ও দুইশ' কার্তুজের অর্ডার গেল। ঠিকানা দেওয়া হইল ঢাকার একটি বাসার। ঐ ঠিকানায় মাল পাঠানোর সংবাদ আসিল। মাল আনিতে হইবে সদর পোষ্ট আফিস হইতে, অনারেরী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিজের। আমাদের একজন সভ্য আড়াই হাজারের জনৈক জমিদার পুত্র ধীরেন্দ্র চৌধুরী অনারেরী ম্যাজিষ্ট্রেট কৃষ্ণকুমার রায় সাজিয়া, একখানা ভাল ঘোড়ার গাড়ীতে মাল খালাসের জন্য সদর পোষ্ট আফিসে গেলেন। শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী দূর হইতে গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিলেন, কোন গুপ্তচর পেছন লইয়াছে কিনা। ধীরেন্দ্র চৌধুরী অনারেরী ম্যাজিষ্ট্রেট "কৃষ্ণকুমার রায়" নাম দস্তখত করিয়া নিরাপদে মাল লইয়া আসিল, মাল সঙ্গে সঙ্গে নিরাপদ স্থানে চলিয়া গেল। ইহার পর যখন পিস্তলের অনুসন্ধান হইল, তখন পুলিশ জানিল কৃষ্ণকুমার রায় ইহার কিছুই জানেন না, নাম দস্তখতও

তাঁহার নয়। পুলিশ বুঝিয়া ফেলিল ইহা ঢাকা অনুশীলন সমিতির সভ্যদিগের কাণ্ড। তখন মশার পিস্তল ও কার্ত্তুজের সন্ধানে বহু বাড়ী তল্লাসী হইল কিন্তু মশার পিস্তল বা কার্ত্তুজের কোন সন্ধান পাইল না। এরূপ ভাবেও কিছু পিস্তল আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

বিপ্লবীদের কয়েকটি বোমার কারখানা ছিল, তন্মধ্যে চন্দননগরের বোমার কারখানাই খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। এই চন্দননগরের বোমা দিল্লীতে বড়লাটের উপর পড়িয়াছিল, লাহোর হইতে মৌলবীবাজার (শ্রীহট্ট) পর্যন্ত বহুস্থানে এই একই জাতীয় বোমা ব্যবহৃত হইয়াছিল। চন্দননগরের বিপ্লবী দলের নেতৃস্থানীয় শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, রাসবিহারী বোস, মনীন্দ্রচন্দ্র নায়েক প্রভৃতির তত্ত্বাবধানে বোমা তৈয়ার হইত। এই বোমার খোল রাজাবাজার বোমার মামলায় দণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমৃত হাজরা তৈয়ার করিতেন। ইতিপূর্ব্বেই বারীন বাবুদের মাণিকতলা বোমার কারখানা স্থাপিত হয়, উল্লাসকর দত্ত ও হেমচন্দ্র দাস কানুনগুর তত্ত্বাবধানে বোমা তৈয়ার হইত। উল্লাসকর দত্ত খুব প্রতিভাশালী যুবক ছিলেন, তিনি নিজেই গবেষণা করিয়া বোমা তৈয়ার করিতেন। হেমবাবু ফরাসী দেশ হইতে বোমা তৈয়ার প্রণালী শিখিয়া আসিয়াছিলেন। বোমার উপাদাম সংগ্রহ করাও কম কঠিন ছিল না।

ডাকাতি

বিপ্লব দল চালাইতে, স-শস্ত্র বিপ্লবের আয়োজন করিতে লক্ষ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। এখন এই টাকা আসিবে কোথা হইতে? স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম দিকে বিপ্লবী দলের নেতারা কোন কোন বড়লোকের নিকট হইতে বিপ্লবের জন্য কিছু অর্থ সাহায্য পাইয়াছেন, কিন্তু আলিপুর ষড়যন্ত্রের মামলার পর ১৯০৮ সনে নরেন

গোস্বামীর স্বীকারোক্তির ফলে আর কোন বড়লোক অর্থ সাহায্য করিতে সাহসী হইতেন না। সুতরাং বিপ্লবীদিগকে অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজনে অপর পথ গ্রহণ করিতে হইত, তাহা আবেদনের নয় আদায়ের পথ। এই কাড়িয়া লওয়ার স্বপক্ষে যুক্তি এই, ইহাদ্বারা বিপ্লবীদিগের সামরিক শিক্ষা হইবে। তাহারা ডাকাতি করার সময় চোরের মত কিছু করে নাই, বীরের মতই সাড়ম্বরে ডাকাতি করিয়াছে। ডাকাতি বা action এর সময় এক-জন নেতা থাকিতেন। তিনি সেই দলের অধিনায়ক, সকলে তাহার নির্দেশ অনুসারে চলিবে। তিনি সকলের নিরাপত্তার জন্য, অর্থ ও অস্ত্র-শস্ত্রের নিরাপত্তার জন্য দায়ী থাকিতেন। তিনি এই দলটিকে কয়েকটি উপদলে ভাগ করিয়া বিভিন্ন কাজের ভার দিতেন। প্রত্যেক উপদলের একজন নেতা থাকিতেন। এই উপদলের মধ্যে থাকিত (১) রক্ষিদল, (২) মশাল দল, (৩) সিন্ধুক ভাঙ্গা দল, (৪) অর্থ সংগ্রহ দল। (১) রক্ষিদল—এই দলের লোকেরা বন্দুক লইয়া সেই বাড়ীর বিভিন্ন রাস্তা পাহারা দিবে, যেন বাহির হইতে কেহ আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে না পারে। বাড়ীর ভিতরে যাহারা কাজ করিতেছে, তাহাদের নিরাপত্তার জন্য এই দল দায়ী থাকিতেন।

(২) মশাল দল—যে সব স্থানে আলোর প্রয়োজন, তাহারা সেই সব স্থানে মশাল জ্বালাইয়া রাখিবেন। (৩) সিন্ধুক ভাঙ্গা দল—এই দল ছেনী ও হাতুরীদ্বারা লোহার সিন্ধুক ভাঙ্গিয়া দিবেন। (৪) অর্থ সংগ্রহ দল—এই দল অর্থ সংগ্রহ করিবে। ডাকাতির সময় ১০।১৫টা মশাল থাকিত। তিন পোয়া বোতলে কেরোসিন ভরিয়া, সলতা দিয়া, মাটি দ্বারা মুখ বন্ধ করিয়া মশাল তৈয়ার করা হইত। ডাকাতির সময় নির্দিষ্ট প্ল্যান্ অনুসারে অনুমান রাত্রি ১০টা কি ১১টার সময়, নির্দিষ্ট বাড়ী আক্রমণ করা হইত। সেই ডাকাতি বা action এর নেতা বিউগল বাজাইলেন, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর

চারিদিকে মশাল জ্বলিয়া উঠিল, কয়েকটা বন্দুকের আওয়াজ হইল ও বিভিন্ন চীৎকার দেওয়া হইল। ঘরের দরজায় ১২ পাউণ্ড হাতুরের ঘা পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলিয়া গেল। বিভিন্ন উপদল নিজ নিজ কাজে নিযুক্ত হইল। কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রামবাসী জাগিয়াছে, ডাকাত ধরার জন্য কোচ, বল্লম, বন্দুক গ্রামে যাহা ছিল, গ্রামবাসী লইয়া আসিয়াছে। আমরা লোহার সিন্ধুকের চাবির জন্য গৃহস্বামীকে বিশেষ উৎপীড়ন করি নাই, আমাদের সম্বল ছিল ১২ পাউণ্ড হাতুরী এবং ছেনী। বড় বড় লোহার সিন্ধুক ১০।১২ মিনিটের মধ্যে ভাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। যাহার উপর যে কাজের ভার সে তাহা করিয়া যাইতেছে। নেতা চারিদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া তত্ত্বাবধান করিতেছেন, যেখানে কোন বিপদের আশঙ্কা তিনি সেখানে গিয়া নির্দেশ দিতেছেন।

নির্দিস্ট সময়ে নেতাব বিউগল বাজিয়া উঠিল, প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজ ও স্থান ত্যাগ করিয়া নেতার নিকট উপস্থিত হইল। নেতা তখন নিদেশ দিলেন সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইতে (Fall in)। সকলে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁডাইল। নেতা গণনা করিয়া দেখিলেন, সংখ্যা ঠিক আছে কি না। তারপর অর্ডার হইল মার্চের। সারিবদ্ধ ভাবে সকলে চলিতে লাগিল, অর্ডার হইল ডবল মার্চ। সকলে জিনিষপত্র ও মালপত্র লইয়া সারিবদ্ধ ভাবে দৌড়াইতে লাগিল। পরে নির্দিষ্ট স্থানে পৌছিয়া, নেতার নির্দেশে অস্ত্র-শস্ত্র একদিকে, লুণ্ঠিত দ্রব্য একদিকে ও লোকজন একদিকে, বিভিন্ন পথে চলিয়া গেল। চলিয়া যাওয়ার পূর্ব্বে নেতা সকলের পকেট তল্লাসী করিয়া দেখিতেন কোন কাগজপত্র বা মালপত্র কাহাবও নিকট আছে কি না। ডাকাতির সময় সেই বাড়ীতে কোন জিনিষ ফেলিয়া আসার উপায় ছিল না, গণনা করিয়া প্রত্যেককে জিনিষ দেওয়া হইত এবং গণনা করিয়া ফেরৎ লওয়া হইত।

অনুশীলন সমিতির ডাকাতি সম্বন্ধে এইরূপ বিধিনিষেধ ছিল, তাহা

সকলকেই মানিয়া চলিতে হইত। যে কোন বাড়ীতে ডাকাতি করা যাইত না। ডাকাতি করার সময় বাড়ী নির্বাচন পদ্ধতি ছিল, যাহারা দেশদ্রোহী, সরকারের খয়ের খাঁ, অত্যাচারী, কৃপণ, কোন সৎকাজে অর্থ ব্যয় করে না, এরূপ ধনী ব্যক্তির গৃহে ডাকাতি করিতে হইবে। ডাকাতির সময় কেহ স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দিতে পারিত না, কোন স্ত্রীলোকের দেহ হইতে অলঙ্কার ছিনাইয়া নিতে পারিত না। অবশ্য কাহারও দেহে অত্যধিক অলঙ্কার থাকিলে কিছু চাহিয়া নিতে পারিত, কিন্তু বল-প্রয়োগ করিতে বা ভয় দেখাইতে পারিত না। শিশু ও রুগ্ন ব্যক্তিদিগের উপরও হাত উঠান নিষেধ ছিল।

ডাকাতি দুই ভাগে বিভক্ত ছিল, জলপথে (River action) ও স্থলপথে (Land action) হইত। জলপথে ডাকাতির জন্য বড় ঘাসি নৌকার প্রয়োজন হইত। মাঝি-মাল্লা নিজেরাই হইত। ডাকাতির পর নৌকা বড় নদীতে পড়িয়া অদৃশ্য হইত। সুদক্ষ মাঝির নেতৃত্বে চারিখানা বা ছয়খানা দাঁড় যখন দেশপ্রেমিক নির্ভীক যুবকেরা টানিত তখন ঘাসি নৌকা তীরবেগে ছুটিত, সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা অনুসরণ করা কঠিন হইত। নির্দিষ্ট স্থানে "ডি, বি," অর্থাৎ ডেলিভারী বোট থাকিত। সেই সব ছোট ছোট নৌকায় অস্ত্র-শস্ত্র, মালপত্র ও লোকজন বিভিন্ন পথে, বিভিন্ন স্থানে যাইত। বড় নৌকার মাঝি ২।৩ জন মাল্লাসহ তাহার গন্তব্য স্থানে যাইত। রাস্তায় মাঝি নৌকা তল্লাসী করিয়া দেখিত কোন কাগজপত্র বা কার্তুজ নৌকায় রহিয়া গেল কি না।

ডাকাতি সাধারণতঃ অন্ধকার রাত্রে হইত। স্থলপথে ডাকাতির পর দৌড়াইয়া মাঠে পড়িয়া অদৃশ্য হইতে হইত। ডাকাতির পূর্ব্বে একদল লোক টেলিগ্রামের তার কাটিয়া রাখিত, যাহাতে ডাকাতির সংবাদ সহরে বা অন্য কোন স্থানে পৌঁছিতে না পারে। একবার মাণিকগঞ্জের কোন এক স্থানে নৌকাযোগে ডাকাতি হইয়াছে, নির্দিষ্ট দল টেলিগ্রামের তার কাটিয়া দিয়াছে, ফিরিবার পথে

মনে হইল, কোন স্থানে কোন গণ্ডগোল হইয়াছে, ডাকাতির সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তার কাটা হইয়াছিল সত্য কিন্তু অন্য একটা লাইন খোলা ছিল, সেই লাইনে অনেক ঘুরিয়া ডাকাতির সংবাদ ঢাকায় পেঁৗছিয়াছে, চারিদিকে পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি। ঘাসি নৌকা, লোকজন, মালপত্রসহ ঢাকা সহরে আসিতেছে। ঢাকা সহরের চারিদিক, নদীর পাড় পুলিশের কড়া পাহারা। নৌকা শেষ রাত্রে ঢাকা সহরে সদর ঘাটে আসিয়া ভিড়িল। পুলিশ হুকুম দিল নৌকা হইতে কেহ টানে উঠিতে পারিবে না; প্রাতে সব নৌকা তল্লাসী হইবে। পুলিশ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, এই নৌকা কোথা হইতে আসিয়াছে। মাঝি উত্তরে বলিয়াছিল, গয়নার নৌকা। একটা বাজারের নাম বলিয়া দিল। এখন উপায় কি? নৌকায় ডাকাতির মালপত্র, অস্ত্রশস্ত্র সবই আছে। আরোহীদিগের মধ্যে একজন পুলিশকে ডাক দিল, তিনি নৌকা হইতে আস্তে আস্তে নামিয়া পুলিশের নিকট গিয়া বলিলেন, তাহার মা মৃত্যুশয্যায় শায়িতা, তাহার এখনই ডাক্তারের বাড়ী যাইয়া আজ প্রাতেই ডাক্তার লইয়া যাইতে হইবে,নতুবা তাঁহার মা আর বাঁচিবে না। তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। অবশেষে পুলিশের সহিত রফা হইল ১৫০০ টাকা দেওয়া হইবে। যাত্রীরা মালপত্র সহ একে একে সকলেই চলিয়া গেল, নৌকায় আমরা তিনজন শুধু মাঝি-মাল্লা হিসাবে রহিলাম। প্রাতে পুলিশের দল ডাকাতের অনুসন্ধান করিতেছে, নৌকা তল্লাসী করিতেছে কিন্তু ডাকাতের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

বাংলা দেশে বিপ্লবীরা বহু ডাকাতি করিয়াছে, কলিকাতায় প্রকাশ্য দিবালোকে দুঃসাহসিক মোটর ডাকাতি করিয়াছে, বহু ডাকাতির সময় বীরত্ব ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখাইয়াছে, ডাকাতি করিয়া বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে কিন্তু তাহারা ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য সেই অর্থ ব্যয় করে নাই। তাহারা জানিত, এই অর্থে তাহাদের কোন

অধিকার নাই। তাহারা জানিত, এই অর্থদ্বারা ভাবী বিপ্লবের আয়োজন হইবে—দেশের স্বাধীনতা আসিবে। যাহারা অপরের বাড়ীতে ডাকাতি করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে নিজ বাড়ী হইতে টাকা চুরি করিয়া আনিয়া বিপ্লবী দলে দিয়াছে।

খুন

বিপ্লবীরা অপরাধীর শাস্তিবিধান করিয়াছে। যাহারা বিপ্লব প্রচেষ্টার পথের কণ্টক তাহাদের অপসারণের ব্যবস্থা করিয়াছে যদি কোন বিচারক কোন অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দেন, তবে তিনি সে জন্য দায়ী হন না, বা জেলখানায় যাহারা অপরাধীকে ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলায়, তাহারাও সে জন্য দায়ী হয় না, দায়ী সে নিজে, তাহার কৃতকর্ম্মের জন্য। বিপ্লবীরা তাহাদের স্বদেশের স্বাধীনতার চেষ্টা করিতেছে। তাহাদের মতে ইংরেজের ভারতের উপর প্রভুত্ব করার কোন অধিকার নাই। এই স্বাধীনতা আন্দোলনে ইংরেজ শাসকের সহায়ক যাহারা, তাহারা দেশের শত্রু, জাতির শত্রু যাহারা শত্রুর সহায়ক তাহারাও অপরাধী। যাহাদিগকে হত্যা করা হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকেরই বিপ্লবী কর্ম্মীদিগের উপর অত্যাচারের বা বিপ্লবী দলের ক্ষতিসাধন করার একটা ইতিহাস আছে। বিপ্লবীরা ব্যক্তিগত বিদ্বেষবশতঃ কাহাকেও হত্যা করে নাই। করা সম্ভবই ছিল না, কারণ এইরূপ দণ্ডদানের চূড়ান্ত নির্দেশ দিতেন বিচার-বিবেচনা করিয়া নেতৃস্থানীয়গণ। দণ্ড দিবার ব্যবস্থা যেমন দেশীয় পুলিশ ও গুপ্তচরদের প্রতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তেমনি ইংরেজ কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। এ ছাড়া সাধারণের মধ্যে ভয় ভাঙ্গার প্রেরণার জন্যও এইরূপ দণ্ডদানের প্রয়োজন উপলব্ধ হইয়াছে।

বাঙ্গালী মরিতে জানে

বাংলার বিপ্লবীরা "ভীরু বাঙ্গালী"এই অপবাদ বিবিধ কর্মানুষ্ঠান দ্বারা দূর করিয়াছিল, অত্যাচারী শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী ও পুলিশ হত্যা করিয়া এবং সশস্ত্র সংগ্রাম করিয়া প্রমাণ করিল, বাঙ্গালী ভীরু নয়, বাঙ্গালী লড়াই করিতে জানে, প্রাণ দিতে জানে, তাহারা পৃথিবীর যে কোন স্বাধীন জাতির বীর সৈনিকদের সমকক্ষ। বিপ্লবীরা তাহাদের বীরত্বের প্রতিদানে দেশের নেতৃস্থানীয়দের নিকট হইতে আখ্যা পাইয়াছিল "বিপথগামী, সন্ত্রাসবাদী"। বিপ্লবীরা তাহাতে বিচলিত হয় নাই, নিরাশ হয় নাই, সকল অত্যাচার ও দুর্নাম অম্লানবদনে সহ্য করিয়াছে, কর্তব্যভ্রষ্ট হয় নাই। তাহারা জানিত পরাধীন দেশে দেশ-প্রেমের ইহাই পুরস্কার। যে দেশে ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, সত্যেন্দ্র, কানাইলাল, ভগৎ সিং ও গোপীনাথ সাহার মত লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে দেশে কর্তার সিং, বাল মুকুন্দ, পিংলে, আশফাকুল্লা, সূর্য্য সেনের মত নির্ভীক যুবক জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই দেশ ধন্য হইয়াছে, পৃথিবীর যে কোন স্বাধীন জাতি তাহাদের জন্য গৌরব বোধ করিতে পারে।

রাজনৈতিক খুন ছাড়াও খুন হইয়াছে, যেমন সীতাকুণ্ড মোহান্ত খুন। তীর্থক্ষেত্রগুলি ব্যাভিচার-মুক্ত করাই ছিল উদ্দেশ্য। সমাজ-সংস্কারের দিক দিয়া তীর্থক্ষেত্রগুলি ব্যভিচার-মুক্ত করাও বিপ্লবীদিগের নিকট একটা কর্তব্যের মধ্যে গণ্য হইয়াছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশও একই উদ্দেশ্যে তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ সুরু করিয়াছিলেন। ইহার বহু বৎসর পূর্ব্বে সীতাকুণ্ড মোহান্ত হত্যা হয়। চট্টগ্রামের অন্তর্গত চন্দ্রনাথ তীর্থ একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এই তীর্থক্ষেত্রে সীতাকুণ্ড রেল-ষ্টেশনের অতি নিকট। চন্দ্রনাথ পাহাড় বেশ উঁচু। এই মোহান্তের বিরুদ্ধে প্রচুর অভিযোগ ছিল, এই দেবমন্দিরে অর্থও ছিল প্রচুর। বিপ্লবীরা এই মোহান্তকে হত্যা করিয়া অন্যান্য

মোহান্তদিগকে এই বলিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছে যে, তাহারা সৎ জীবন-যাপন না করিলে তাহাদের পরিণতিও এইরূপ হইবে। অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে অপসারিত করিয়াই বিপ্লবীরা ক্ষান্ত হন নাই, পরন্তু স্থানে স্থানে তাহাদের স্থলে সৎলোককে স্থাপন করিবারও চেষ্টা করিয়াছে।

এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছিল সন্ধ্যার পর। মোহান্তর সহিত একজন লাঠিধারী প্রহরী ছিল। মোহান্ত যখন রাস্তা দিয়া যাইতেছিল, তখন হত্যাকারী প্রণাম করার ভাণ করিয়া কোমর হইতে পিস্তল বাহির করিয়া গুলি চালাইল। হত্যাকারীদ্বয় সেই রাত্রেই পায়ে হাঁটিয়া চট্টগ্রাম সহরে চলিয়া গেল। হত্যা-কারীদের একজনের নাম ছিল চন্দ্রশেখর দে, চট্টগ্রাম সহরেই বাড়ী, দ্বিতীয় বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আমি সেই রাত্রে চট্টগ্রাম সহরে ছিলাম, প্রাতে ষ্টেশনের দিকে রওয়ানা হইয়াছি, ঢাকা যাইব। চট্টগ্রাম সহরে হৈ-চৈ পড়িয়াছে। মোহান্তের প্রহরী বলিয়াছিল, হত্যাকারীর লম্বা দাড়ি ছিল। আমারও লম্বা দাড়ি ছিল। আমি পদব্রজে ষ্টেশনের দিকে যাইতেছি। বন্দুকধারী পুলিশ, ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, গোয়েন্দা বিভাগের লোক, সকলেই চট্টগ্রাম রেলষ্টেশনে যাইতেছে, সীতাকুণ্ড ঘটনাস্থলে যাওয়ার জন্য। আমার পাশ দিয়াই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সাইকেলে চড়িয়া ষ্টেশনে গেলেন। একদল বন্দুকধারী পুলিশ মার্চ করিয়া ষ্টেশনে যাইতেছিল আমি সম্মুখে ছিলাম, আমাকে এক ধাক্কা দিয়া চলিয়া গেল। আমি পলাতক আসামী, আমার নামে পুরস্কার ঘোষণা আছে, কাজেই আমি কিছু বলিতে পারি না। রাস্তাঘাটে কত লোকই না এরূপ পুলিশের ধাক্কা খায়, আমি পুলিশের ধাক্কাটা নীরবে হজম করিলাম। আমি ষ্টেশনে গিয়া তৃতীয় শ্রেণীর ঢাকার টিকিট কাটিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। গাড়ী সীতাকুণ্ড ষ্টেশনে পৌঁছিল কিন্তু গাড়ী যেন আর ছাড়িতে চায় না। পুলিশের দল মোহান্তর আরদালীকে লইয়া

গাড়ীর প্রত্যেক কামরায় হত্যাকারীর অনুসন্ধান করিতেছে, পিস্তলের জন্য তল্লাসী করিতেছে। আমার সঙ্গে শুধু একখানি কাপড়•গামছা দিয়া মোড়ান ছিল। মোহান্তর আরদালী, আমি যে কামরায় ছিলাম, সেই কামরায় আসিল, সকলকে দেখিল, বলিল, এই কামরায় হত্যাকারী নাই। প্রত্যেকের তল্লাসী হইল, পিস্তল পাওয়া গেল না, পরে তাহারা অন্য কামরায় চলিয়া গেল। ঐ ট্রেনে হত্যাকারী বা পিস্তলের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না, গাড়ী ছাড়িয়া দিল। আমিও নিশ্চিন্ত হইলাম।

একটি ঘটনা মনে পড়ে, 'পাগলের খেয়াল'। বরিশাল সহরে একটি হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছে, পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার মনোমোহন ঘোষ ১৯১১ সনের ১১ই ডিসেম্বর করোনেশন্ দিবসে সন্ধ্যার পর নিহত হইয়াছে। আমি ও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘটনাক্রমে ঐ সময়ে বরিশাল সহরে ছিলাম। সেই রাত্রেই দশটার সময় একটি ষ্টীমার বরিশাল হইতে নোয়াখালী যাইতেছিল, আমি ও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সেই ষ্টীমারে নোয়াখালী রওয়ানা হইলাম। হত্যাকারীকে এবং পিস্তল ধরার জন্য প্রত্যেক রেল ও ষ্টীমার-ষ্টেশনে পুলিশ প্রহরী নিযুক্ত হইয়াছে, বিভিন্ন স্থানে খানাতল্লাসী চলিতেছে। পরদিন বৈকালে ষ্টীমার নোয়াখালী পৌছিল কিন্তু জোয়ার-ভাটার গণ্ডগোলে ষ্টীমার ষ্টেশনে ভিড়িল না, দূরে লঙ্গর করিয়া রহিল। যাত্রীরা নৌকায় পাড়ে উঠিল, আমরাও একখানা নৌকা করিয়া সহরে পৌঁছিলাম; নোয়াখালী সহরে ললিত বাড়রির একটি মুদী দোকান ছিল, ঐ দোকান ছিল আমাদের একটি আড্ডা। আমি এবং বীরেন সেই দোকানে গিয়া উঠিলাম। ঐ দোকানে ললিত বাড়রির দাদা এবং তাহার একটি ছোট ভাই থাকিত। ছোট ভাইটির কিছু মস্তিষ্ক-বিকৃতি ছিল। ঐ দিন তাহার দাদা দোকানে ছিলেন না; সে আমাদের জন্য রান্না করিয়া আমাদের অপেক্ষায় বসিয়া আছে, নিজে খায় নাই। পূর্বদিন রাত্রে আমাদের খাওয়া হয় নাই সারাদিন উপবাস, ক্ষুধা খুবই

পাইয়াছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, খাওয়ার কিছু আছে কি? তখন বেলা প্রায় ৫টা। ললিত বাড়রির ছোট-ভাইটি তখন উত্তরে বলিল, "কেন? আপনি কাল যে বলিয়াছিলেন আজ আসিবেন, আমি তাই আপনাদের জন্য রান্না করিয়া বসিয়া আছি। আপনাদের খুব দেরী হইয়াছে।" আমি একটু আশ্চর্যান্বিত হইলাম, ভাবিলাম "পাগলের খেয়াল"। আমরা তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া খাইতে বসিলাম। পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার মনোমোহন ঘোষ একজন নামকরা পুলিশ কর্মচারী ছিলেন। তিনি ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার সময় ঐ মামলার তদ্বির করিতেন এবং আমার সাটিরপাড়া স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত শীতল চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে মিথ্যা সাক্ষী না দেওয়ার জন্য প্রহার করিয়াছিলেন। ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার আমি পলাতক আসামী ছিলাম। একদিন শীতলবাবুর সহিত আমার দেখা হইয়াছিল, তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার ললিতবাবু এবং অন্যান্য আসামীদিগের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে রাজী না হওয়ার জন্য মনোমোহন ঘোষ তাহার গালে এরূপ চড় দিয়াছিল যে, তাঁহার কাপড় নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। শীতলবাবুর চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

আমরা যাহাকেহত্যা করিয়াছি, সে চলিয়াছে আপন মনে, কত কিছু সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছে, এক মুহূর্ত পূর্ব্বেও সে কল্পনা করে নাই মৃত্যু তাহার নিকটবর্ত্তী। হঠাৎ পিস্তল গর্জন করিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে দেশদ্রোহী ধরাশায়ী, তাহার প্রহরী ভীত-কম্পিত পলায়মান। প্রহরীর পিস্তল বাহির করার কথা স্মরণ নাই। আমি যাহাকে হত্যা করিয়াছি,প্রথম গুলির সঙ্গে সঙ্গে আততায়ী ধরাশায়ী হওয়ার পর আবার গুলি করিয়া তৎক্ষণাৎ মৃত্যুর ব্যবস্থা করিয়াছি, সে যাহাতে কষ্ট না পায়। কয়েক সেকেণ্ডের কাজ, নিহত ব্যক্তি টেরই পাইল না কি ঘটিয়া গেল। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে লোকজন চারিদিকে দৌড়াইতে লাগিল, হত্যাকারীও তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া দৌড়াইতে

লাগিল, পরে নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া পিস্তল রাখিল। পিস্তল সেই রাত্রেই সেই স্থান হইতে অন্যত্র নিরাপদ স্থানে চলিয়া গেল। হত্যাকারী ভাল মানুষ সাজিয়া, সহরের সকলের সহিত মিশিয়া হত্যাকাণ্ডের গল্প-গুজব শুনিতে লাগিল। দিল্লীতে বড়লাটের উপর বোমা পড়ার পর রাসবিহারী বসু দেরাদুনে প্রকাশ্য সভা করিয়াছিলেন, তিনিই ছিলেন সেই সভার সভাপতি এবং সেই সভায় হত্যার চেষ্টার জন্য নিন্দাসূচক প্রস্তাব পাশ হইয়াছিল। কাহাকেও হত্যা করার সময় সাধারণতঃ আক্রমণকারীর পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করার জন্য দুইজন পিস্তলধারী লোক থাকিত।

বিপ্লবীরা নিজ দলের লোককেও হত্যা করিয়াছে। চরিত্রহীনতার জন্য কেহ কেহ নিহত হইয়াছে, আবার যাহাদিগকে পুলিশের গুপ্তচর বলিয়া নিঃসন্দেহ হওয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে হত্যা করা হইয়াছে। শুধু সন্দেহের বশবর্তী হইয়া কাহাকেও হত্যা করা হয় নাই। কাহারও উপর সন্দেহ হইলে নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য তাহার পেছনে লোক লাগান হইত। পুলিশের গুপ্তচর প্রমাণ হইলে তাহাকে গুম করা হইত অর্থাৎ কোন নিভৃত স্থানে লইয়া গিয়া হত্যা করা হইত।

আমি পরাধীন ভারতে বহু ডাকাতি করিয়াছি, খুন করিয়াছি, চুরি করিয়াছি, নোট জাল করিয়াছি, কিন্তু যাহা কিছু করিয়াছি, সবই দেশের স্বাধীনতার জন্য—কর্তব্যের দায়ে। আমরা বিদ্বেষ ভাব হইতে বা ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধনের জন্য কিছুই করি নাই। আমি যাহাকে হত্যা করিয়াছি, তাহার আত্মার কল্যাণ কামনাই করিয়াছি, তাহার পরিবারের শুভ চিন্তাই করিয়াছি। ডাকাতি বা খুন আমাদের পেশা ছিল না। আমরা যাহাদের বাড়ীতে ডাকাতি করিয়াছি, যাহাদিগকে হত্যা করিয়াছি, আমরা জানিতাম তাহারা আমাদের স্বদেশবাসী। আজ স্বাধীন ভারতে আমাদের হাতে যদি রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকিত, তবে আমরা যাহাদের বাড়ীতে ডাকাতি

করিয়াছি, তাহাদের বংশধরদের মধ্যে যাহারা আজ বিপন্ন তাহাদিগকে সরকারী সাহায্য দান করিতাম। ঘটনাচক্রের আবর্তনে দেশের শাসনভার বিপ্লবীদের হাতে না আসিয়া, ন্যস্ত হইয়াছে অন্যত্র ; এরূপ ক্ষেত্রে সক্রিয় সাহায্য দানের সামর্থ্য হইতে বঞ্চিত যাহারা, আন্তরিক সমবেদনা কেবলমাত্র কথায় জ্ঞাপন করিয়াই তাহারা তাহাদের কর্তব্য সম্পন্ন করিতে বাধ্য হইতেছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রথম কারাজীবন

আমরা এখন নারায়ণগঞ্জ জেলে আছি। জেলের খাওয়ায় আমাদের পেট ভরিত না—রাত্রে মশার কামড়ে ঘুম হইত না। হাজতী ছিলাম বলিয়া আমাদের কাজকর্ম কিছু ছিল না। ললিতবাবু (সাটিরপাড়ার জমিদার ও উকিল) আসিয়া আমাদের সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন, বাড়ী হইতেও আমার মেজদা শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন চক্রবর্তী আসিয়াছিলেন। আমাদের বিরুদ্ধে পুলিশের রিপোর্ট ছিল, আমরা নৌকা চুরি করিয়া ডাকাতি করিতে যাইতে ছিলাম। ডাকাতির অভিপ্রায়ের কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না, তাই আমাদের বিরুদ্ধে শুধু নৌকাচুরির অভিযোগ আনা হইল। কয়েক মাস হাজত বাস করিবার পর বিচারে আমাদের পাঁচমাস সশ্রম কারাদণ্ড ও পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হইল। টাকা অনাদায়ে আরও একমাস জেল। জরিমানার টাকা আদালতে দাখিল করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাই আমাদের পাঁচমাস জেল খাটিতে হয়। নারায়ণগঞ্জ জেলে এক সপ্তাহ ছিলাম। সেখানে আমাদের গম পিষিতে হইয়াছিল। এক সপ্তাহ পর আমরা ঢাকা সেণ্টাল জেলে

চালান যাই। আমাদের পক্ষ হইতে আপীল করা হইয়াছিল, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। জেলে আমাদের তিন জনকেই ঘানিতে দেওয়া হইয়াছিল। আমাদের গায়ে জোর ছিল, মনে উৎসাহ ছিল, কাজেই বিশেষ কোন কষ্ট বোধ হয় নাই। অবশ্য প্রথম প্রথম মাথা ঘুরিয়াছে এবং জল পিপাসা পাইয়াছে। ঘানিঘরের ইস্কিদার (Instructor) আমাদিগকে একটু খাতির করিত। সে বরিশালের একজন মুসলমান, ডাকাতি মোকদ্দমায় তাহার পনর বৎসর জেল হইয়াছিল। ঘানিতে আমরা একমাসের কিছু বেশীদিন ছিলাম, পরে ছাপাখানার কাজে যাই। আমাদের সাজা অল্প বলিয়া আমাদের লেখাপড়া বা অক্ষর-সংস্থিতির (Compositor) কাজে দেয় নাই। প্রথমতঃ বস্তাটানা, পরে কাগজ গুনিয়া প্রেসে দেওয়ার কাজে দেয়।

সেই যুগে, অর্থাৎ ১৯০৮ সনে জেলের অবস্থা অন্যরূপ ছিল ; তখন মারপিট করিয়া, ভয় দেখাইয়া কয়েদীদের সংশোধন করিবার ধারণা ছিল। শুধু এই দেশে নহে, এই ধারণা তখন ইউরোপেও বিদ্যমান ছিল। ইউরোপের জেলসমূহও তখন শোচনীয় ছিল ; বর্তমানে সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ও অভিজ্ঞতার ফলে পূর্বধারণার পরিবর্তন হইয়াছে। সেই যুগে কয়েদীরা মানুষের মধ্যেই গণ্য হইত না, হিংস্র পশুর মধ্যে তাহারা গণ্য ছিল। সেই জন্য তাহাদের প্রতি কঠোর ব্যবহারের ব্যবস্থা ছিল। একটা প্রবাদ আছে, "ক্রীতদাস ক্ষমতা পাইলে খুব অত্যাচারী হয়। জমিদার যদি তাহার প্রজাকে ধরিয়া আনিতে হুকুম দেয়, তবে তাহার বরকন্দাজরা প্রজাকে বাঁধিয়া আনে।" জেলখানায় ইহা প্রবাদ নহে, একেবারে বাস্তব ঘটনা। তাই কথা আছে 'জেল হেল' (hell)। আমাদের শাস্ত্রে নরকের যে বর্ণনা আছে, তখনকার দিনের জেলের সহিত তাহার তুলনা করা যাইতে পারে। জেল তিনটি জিনিষের জন্য বিখ্যাত,—ফাইল, গাইল, ডাইল।—জেলখানায় দিনের মধ্যে

বহুবার গুন্‌তি হয়. ফাইল করিয়া জোড়া জোড়া বসিতে হয়, জোড়া জোড়া চলিতে হয়. বে-ফাইলে যাইবার জো নাই। বে-ফাইলে পা-বাড়াইলেই বিপদ। পায়খানায় যাওয়া, স্নান করা, খাওয়া সবই ফাইল অনুসারে। দেরী করিবার উপায় নাই, 'সরকার' বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড়াইতে হইবে, নতুবা রক্ষা নাই। 'গাইল' (গালি) জেল কর্মচারীদের মুখে লাগিয়াই আছে, সম্বোধন করিবার সঙ্গে সঙ্গে একটি সম্পর্ক পাতানো চাই-ই। জেল খানায় খাইবার মধ্যে 'ডাইল'। কারণ, ধান ও পাথর মিশ্রিত মোটা চাউলের ভাত খাওয়া যায়না, বৃদ্ধ পুই ডাটার তরকারীও খাইতে প্রবৃত্তি হয় না। একমাত্র 'ডাইলই' সম্বল। কাজেই ডাইল দিয়া টাইল ভরিতে হয় অর্থাৎ উদর পূর্তি করিতে হয়। আমরা যখন জেলে ছিলাম, তখন সপ্তাহে ছয় দিনই কলায়েব ডাল দেওয়া হইত। পাঞ্জাবে এবং পশ্চিম-বঙ্গের লোকেরা কলাই-এর ডাল পছন্দ করে কিন্তু পূর্ববঙ্গের লোকেরা এই 'পিছ্‌লা' ডাইল বিশেষ পছন্দ করে না। অবশ্যই জেলের রান্না, বাড়ীর মতো হয়না। প্রত্যহ এই কলাই-এর ডাল দেওয়ার একটা ইতিহাস পুরাণো কয়েদীদের নিকট শুনিলাম। তাহারা বলিল, পূর্বে এক একদিন এক এক রকমের ডাল দেওয়া হইত। একবার জেলের আই. জি. জেল পরিদর্শন করিতে আসিলেন।— কয়েদীরা তাঁহার নিকট মাছ খাইবার প্রার্থনা জানাইল। কয়েদীরা বলিল, হুজুর আমরা মাছ খাইতে চাই। আই. জি. বাংলা জানিতেন না। জেলার বাবু তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তাহারা মাস-কলাইয়ের ডাল খাইতে চায়। আই. জি. জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ ডাল কি খুব দামী?' জেলার-বাবু উত্তর করিলেন, 'দাম খুব বেশী নয়।' আই. জি. হুকুম দিয়া গেলেন—খুব মাস দাও। তখন হইতে মুসুরী ও ছোলার ডাল উঠিয়া গেল—তাহাদের স্থান অধিকার করিল এই মাস-কলাইয়ের ডাল। এই ঘটনা সত্য কিনা জানি না। তবে জেলখানায় এরূপ অনেক ঘটনা ঘটিয়া থাকে।

... মাছ বা মাংসের কোন ব্যবস্থা ছিল না। প্রত্যহ খাট্টা বা তেঁতুল গুলা জল দেওয়া হইত। দুইটা কম্বল, শীত কালে একটা অতিরিক্ত কম্বল পাওয়া যাইত। প্রতি ছয় মাসে দুইটা হাফপ্যাণ্ট, একটা হাত কাটা জামা এবং একটা গামছা পাওয়া যাইত। শীত কালে একটা কম্বলের কোর্ত্তা পাওয়া যাইত। প্রত্যেক কয়েদীর গলায় লোহার হাঁসুলী থাকিত, তাহার মধ্যে একটি তিন কোনা কাঠ ঝুলিত, কাঠে কয়েদীর নম্বর সাজা এবং মুক্তির তারিখ থাকিত। হাঁসুলি রিবেট করা থাকিত, খোলা যাইত না। প্রত্যেক কয়েদীকে একটি লোহার থালা ও লোহার বাটি দেওয়া হইত। তখন সংবাদ পত্রের কোন ব্যবস্থা ছিলনা। সেণ্ট্রাল জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাধারণতঃ শ্বেতাঙ্গ আই.এম.এস. অফিসার হইতেন, জেলার হইতেন এ্যাংলোইণ্ডিয়ান। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যখন জেলের ভিতর প্রবেশ করিতেন, তখন তাহার মস্তকের উপর প্রকাণ্ড রাজ-ছত্র শোভা পাইত, সঙ্গে জেলার-জমাদার-সিপাহী, মেট পাহারার একটি প্রসেশন চলিত, যেন কোন মহারাজ আসিতেছেন। সুপারি-ণ্টেণ্ডেণ্ট যে দিকে যাইতেছেন, সরকার, সেলাম, আজবর ধ্বনি শুনা যাইতেছে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যখন আসিবেন, তখন সকলের জোড়া জোড়া বসিয়া থাকিতে হইবে, সরকার বলিলে উঠিয়া দাঁড়াইবে, সেলাম বলিলে সেলাম দিতে হইবে, আজবর (এজ ইউ ওয়্যার) বলিলে পূর্ব্ববৎ বসিতে হইবে। জেলের কয়েদীরা কোন অপরাধ করিলে বা কাজ কম হইলে প্রথমে মেট পাহারারা ধোলাই (প্রহার) করিয়া হাজির করিবে, পরে অপরাধের গুরুত্ব বুঝিয়া হাতকড়ি-ডাণ্ডা-বেড়ি বা বেত দেওয়া হইবে। প্রহার জেলারের হুকুমে হইত, দণ্ড সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দিতেন, জেলে প্রহারের ফলে বহু কয়েদীর মৃত্যু হইয়াছে, সরকারী রিপোর্ট, অসুখে হাসপাতালে মৃত্যু হইয়াছে।

পূর্ব্বে জেলে কোন শ্রেণী বিভাগ ছিল না, সকলেই তৃতীয় শ্রেণীর

কয়েদী ছিল। রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ডিত হইয়া যাঁহারা জেলে যাইতেন, তাঁহারাও তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী বলিয়া গণ্য হইতেন। ১৯০৮ সনে শ্রীমহিম চন্দ্র নন্দী, সাটিরপাড়া হাইস্কুলের শিক্ষক, বিলাতী লবণ ফেলার অভিযোগে দণ্ডিত হইয়া ঢাকা জেলে ছিলেন। তিনি আমাদের শিক্ষক ছিলেন। তাঁহাকেও ঘানিতে দেওয়া হইয়াছিল। আমরা সাধারণ কয়েদীর সহিত একত্র ঘানি ঘুরাইয়াছি একত্র বাস করিয়াছি, জোড়া জোড়া বসিয়াছি, সরকার সেলাম দিয়াছি, সাধারণ কয়েদীর সহিত আমাদের কোন পার্থক্য ছিল না। স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে রাজনৈতিক কারণে শিক্ষিত যুবকের দল জেলে যাইতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহারা জেল হইতে বাহির হইয়া এই অজ্ঞাত জগতের সংবাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, ফলে দেশ বাসীর দৃষ্টি এদিকে পড়িল। রাজ বন্দীরা জেলের খাদ্য, ব্যবহার এবং সরকার সেলামের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সুরু করিলেন। এই সংগ্রাম ১৯১০।১২ সন হইতে আরম্ভ হয়। রাজবন্দীরা জেলের প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে যাইয়া জেল কর্ত্তৃপক্ষের বহু অত্যাচার নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছেন, বুটের লাথি, প্রহার, হাতকড়ি, ডাণ্ডা বেড়ি, বেত প্রভৃতি দণ্ড ভোগ করিয়াছেন, সুদীর্ঘ কাল নির্জন সেলে বাস করিয়াছেন, সুদীর্ঘ দিন জেলে অনশন করিয়াছেন। এক দিকে যেমন জেলের ভিতর সংগ্রাম চলিতেছিল, আবার জেলের বাহিরেও আন্দোলন চলিতেছিল। সভা-সমিতি করিয়া প্রতিবাদ জ্ঞাপন, কাউন্সিলে প্রশ্ন করা, সংবাদ পত্রে লেখা, সরকারের সহিত আলাপ আলোচনা, নানা ভাবে চেষ্টা চলিতেছিল। এই সংগ্রাম ও আন্দোলন ভারতের সর্ব্বত্র চলিতেছিল। অবশেষে ১৯২৯ সনে, ১৩ই সেপ্টেম্বর, লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে ৬৪ দিন অনশনের পর যতীন দাসের মৃত্যু হয়। যতীনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিরণ দাস, যতীনের শব পুষ্প-শয্যায় লাহোর হইতে ট্রেনে হাওড়া ষ্টেশনে লইয়া আসে। পূর্ব্বেই সংবাদ ছিল, হাওড়া ষ্টেশন লোকে লোকারণ্য, সুভাষ চন্দ্র

বসু প্রভৃতি নেতাগণ ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। সুভাষ চন্দ্র বসুর নেতৃত্বে দুই লক্ষ লোকের শোভা যাত্রা হাওড়া ষ্টেশন হইতে যতীন দাসের শব লইয়া কেওড়াতলা শ্মশানে উপস্থিত হয়। সহস্র সহস্র লোকের অশ্রু বর্ষণের মধ্যে যতীনের শেষ কাজ সম্পন্ন হইল। ইহার পর সমগ্র ভারতে তীব্র আন্দোলন শুরু হয়। রাজবন্দীদের দাবী ছিল, সকল রাজবন্দীকে এক বিশেষ শ্রেণী ভুক্ত করা কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিল, যাহা আজ পর্য্যন্ত চলিতেছে।

জেলে আসিবার প্রয়োজন আমার ছিল—নিজের দিক হইতে—দেশের দিক হইতেও। জেলে না আসিলে হয়তো উকীল হইয়া ময়মনসিংহ 'বারে'র সংখ্যা-বৃদ্ধি করিতাম। কিন্তু জেল হওয়ায় দেশকে সেবা করিবার সুযোগ পাইয়াছি। এতদিন আমি একটা উন্মাদনার বশবর্তী হইয়া চলিয়াছিলাম, গভীরভাবে বিশেষ কিছু চিন্তা করিতাম না,তাই জেলে আমি যেন নূতন-জন্ম লাভ করিলাম। জেলের অন্তরালে আমি স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিখিলাম। এখানে অতীতের কথা যখন মনে পড়িয়াছে তখন ভাবিয়াছি কি ছেলেমানুষই না আমি ছিলাম। দেখিতে দেখিতে পাঁচ মাস কাটিয়া গেল, এই পাঁচ মাস বাহিরের জগতের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ ছিল না—আমরা বাহিরের কোন খবরই পাই নাই। মুক্তির দিন দেখিলাম, আমার কয়েকজন আত্মীয় এবং শীতলবাবু (শীতল চক্রবর্তী, সাটিরপাড়া স্কুলের শিক্ষক) জেল গেটের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন। শীতলবাবু আমাদিগকে বাস্তবিকই অত্যন্ত ভালবাসিতেন। ১৯০৯ সনের প্রথম ভাগে আমরা জেল হইতে মুক্ত হই এবং শহরে দুই একদিন থাকিয়া বাড়ী যাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মুক্তির পর

বন্যা বেশীদিন স্থায়ী হয় না কিন্তু উহারই মধ্যে সে জমি উর্বর করিয়া দিয়া যায়। স্বদেশী আন্দোলনের বন্যায় এখন ভাঁটা পড়িয়াছে, কোনদিকে কোন সাড়াশব্দ নাই—নেতৃবৃন্দের সুরও গরমের পরিবর্তে নরম হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট ভেদ-নীতি ও দমন-নীতি চালাইয়া আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। আমি জেল হইতে বাহির হইয়া দেখিলাম সমিতিগুলি বে-আইনী ঘোষিত হইয়াছে। পুলিনবাবু, ভূপেশ নাগ, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি নয় জন নেতা তিন আইনে নির্বাসিত হইয়াছেন। নূতন নূতন আইন জারী হইয়াছে, প্রকাশ্যে সভা-সমিতির অনুষ্ঠানও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। চারিদিকে নৈরাশ্য, ভয় আর অন্ধকার। আমার মনে হইল আমি নূতন জগতে প্রবেশ করিয়াছি। ইহা অপেক্ষা আমার জেলই ভাল ছিল। বন্ধুরা ভয়ে আমার সহিত কথা কহিতে চাহে না। আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে গেলে তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেন—'তোমার এখানে না আসাই ভাল, পুলিশ আমাদিগকে বিপদে ফেলিবে।' জেলে যাইয়া আমি যেন একটা কতবড় অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছি। আমি সকলের নিকট অস্পৃশ্যবৎ হইয়াছি।

১৯০৭ সনে সুরাট কংগ্রেস 'নরম' ও 'গরম' দুই দলে বিভক্ত হইল। 'গরম' দলের যাঁহারা কংগ্রেস হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বালগঙ্গাধর তিলক ও শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ও ছিলেন। গভর্ণমেণ্ট যখন দমন-নীতি অবলম্বন করিলেন, তখন 'নরম' দলের নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। গরম দলের নেতারাও কিছু করিতে সাহসী হইলেন না। স্বদেশী আন্দোলনকে ভিত্তি করিয়া কংগ্রেস যদিও একধাপ অগ্রসর

হইয়াছে তথাপি কার্যতঃ ইহা বিশেষ কিছু করে নাই। যুবকদের মধ্যে কংগ্রেস নরম দল বলিয়াই পরিচিত ছিল, কারণ কংগ্রেসের কাজ ছিল বৎসরে একবার অধিবেশন আর কয়েকটা প্রস্তাব পাশ করা। এই সময় একদল লোক ছিলেন, যাঁহারা বলিতেন, জলে বাস করিয়া কুমীরের সহিত লড়াই চলে না। বিশেষতঃ ইংরেজ আমাদের কত উপকার করিয়াছে—ইংরেজ রাজত্বে আমরা কত সুখ-শান্তিতে বাস করিতেছি। তাঁহাদের দৃষ্টিতে—যাহারা স্বাধীনতার কথা বলে তাহারা পাগলের মধ্যে গণ্য হইয়াছিল। তাঁহারা মনে করিতেন, ইহাদের মাথা খারাপ হইয়াছে,উইয়ের পাখা গজাইলে যে অবস্থা হয় ইহাদেরও সেই অবস্থা হইবে। তাই এই শ্রেণীর লোকের কাছে কংগ্রেস যাহা করিত তাহা বুদ্ধিমানের কাজ বলিয়া বিবেচিত হইত। বাংলা দেশে তখন একদল যুবক ছিল, যদিও তাহাদের সংখ্যা খুব কম, তথাপি তাহারা সত্য-সত্যই দেশের স্বাধীনতার কল্পনা করিত। ঐ বিকৃত মাস্তিষ্কদের মধ্যেই তাহাদের স্থান ছিল। গভর্ণমেণ্টের দমননীতি তাহাদের নিরাশ বা ভীত করিতে পারেন নাই। বিদ্যাবত্তার ছাপ তাহাদের বেশী ছিল না, অর্থবল তাহাদের মোটেই ছিল না, জনসমাজেও তাহারা ছিল অপরিচিত। কিন্তু সমস্ত বাধা ঠেলিয়া ইহারাই তখন প্রকৃত স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইল। সমিতিগুলি বে-আইনী ঘোষিত হওয়ায় প্রকাশ্যভাবে কিছু করিবার উপায় ছিল না, অগত্যা গুপ্ত-সমিতির উদ্ভব হইল।

আমি জেল হইতে মুক্ত হইয়া বাড়ী যাওয়ার পর কয়েক দিন বাড়ীতে বেশ আদর-যত্নেই ছিলাম। কিন্তু বাড়ীর আবহাওয়া আমার সহ্য হইল না, মন ছট্‌-ফট্‌ করিতে লাগিল, আমি অস্থির হইয়া পড়িলাম। সমিতির সভ্যদের সংবাদ এতদিন পাই নাই, সমিতির বোর্ডিং ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, পুলিনবাবু নির্বাসিত, দলের বন্ধুগণ কে কোথায় আছেন, আমি কিছুই জানি না। আমি

কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। বাড়ীতে বিবাহের প্রস্তাব চলিতেছে, আমার বড়দাদা আমাকে রেঙ্গুন পাঠাইতে সংবাদ দিয়াছেন, তিনি সেখানে আমার চাকুরীর ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। আমার বিবাহ বা চাকুরী কোনটাই মনঃপূত হইল না, আমি চাই সমিতির কাজে আত্ম-নিয়োগ করিতে। আমাকে এই অনিশ্চয়তার মধ্যে অধিক দিন কাটাইতে হয় নাই। একদিন সমিতি হইতে সংবাদ আসিল, আমাকে ঢাকা যাইতে হইবে; এই সংবাদে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। আমার নেতারা আমার কথা ভুলেন নাই, আমার ডাক পড়িয়াছে, এজন্য আমি নিজেকে ধন্য মনে করিলাম। এখন প্রশ্ন এই, আমি বাড়ী হইতে কি করিয়া রওনা হই? আমার যাইতে হইবে বাড়ী হইতে পলাইয়া, আমার হাতে একটিও পয়সা নাই। বাড়ী হইতে অনুমতি পাওয়া যাইবে না। এখন উপায় কি? একদিন সুযোগ মিলিল। আমার মেজদাদা এক আত্মীয় বাড়ীতে গেলেন, তিনি যাওয়ার সময় সিন্দুকের চাবি আমার নিকট রাখিয়া গেলেন; আমি এখন বাড়ীর কর্তা। বাড়ীতে আমার পিসীমা, মেজবৌদি ও ছোটবৌদি ছিলেন। আমার পিসীমা বিধবা ছিলেন, তিনি আমাদের বাড়ীতে থাকিতেন এবং তিনিই আমাকে লালন-পালন করিয়াছেন। আমার ছোটবৌদিও বিধবা ছিলেন। আমি স্থির করিলাম, আগামী কল্য বাড়ী হইতে পলায়ন করিব।

আমাদের বাড়ী হইতে ঢাকা যাইতে তখন ষ্টীমারে নারায়ণগঞ্জ যাইতে হইত, ষ্টীমার ষ্টেশন আমাদের বাড়ী হইতে তিন মাইল দূর। ষ্টীমার প্রাতে ৮।৯ টার সময় ছাড়িত। পরদিন প্রাতে আমি বৌদিকে বলিলাম, আমার বাজিতপুরে কিছু কাজ আছে, আমি এখন বাজিতপুর যাইব, কিছু খাইতে দিন। বাজিতপুর আমাদের গ্রাম হইতে তিন মাইল দূর। তখন অম্বুবাচি ছিল। বাজিতপুরের নাম শুনিয়া আমার পিসীমা কিছু আম কিনিয়া

আনার ফরমাস করিলেন। আমার ছোটবৌদি এবং পসীমা অম্বুবাচীর উপবাসী ছিলেন। আম আনার সংবাদে আমি মনে মনে খুবই ব্যথিত হইলাম, কিন্তু কিছু প্রকাশ করার উপায় নাই। প্রকাশ হইলে বাড়ীতে হৈ-চৈ, কান্নাকাটি সুরু হইবে, সংবাদ পুলিশের কাছে পৌছিবে। আমার মেজ বধুঠাকুরাণী বলিলেন, গরম ভাত তিনি রান্না করিয়া দিবেন, কিন্তু গরম ভাত খাইলে ষ্টীমার ধরা যাইবে না। তাই বলিলাম, আমার এখনই যাইতে হইবে, যাহা কিছু আছে দিন। তিনি বলিলেন, কিছু পান্তা ভাত আছে, কিন্তু তরকারী নাই। আমি তাড়াতাড়ি লেবু পাতা ও লঙ্কা লইয়া খাইতে বসিলাম।

আমি পান্তা ভাত খাইয়া রওয়ানা হইলাম। আমাদের গ্রামের সতীশ রায়ের নিকট পূর্বেই একখানা ধুতি ও একটি তোয়ালে রাখিয়াছিলাম। আমি সিন্দুক হইতে পাঁচ টাকা সঙ্গে লইলাম এবং জমাখরচের খাতায় লিখিলাম, 'আমি পাঁচ টাকা সঙ্গে লইয়া যাইতেছি, বাড়ী ফিরিতে বিলম্ব হইবে।' সতীশ নির্দিষ্ট স্থানে আমাকে কাপড় ও তোয়ালে দিল। আমি তাহার নিকট চাবির গোছা দিয়া বলিলাম, তুমি সন্ধ্যার সময় চাবি বৌদির নিকট দিয়া বলিবে, আমি সমিতির কাজে গিয়াছি। বাড়ী ফিরিতে কিছুদিন বিলম্ব হইবে। হৈ-চৈ হইলে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। আমি সতীশকে বলিলাম, তুমি আগামী কল্য বৌদির নিকট হইতে টাকা লইয়া বাজিতপুর হইতে কিছু আম কিনিয়া পিসীমাকে দিবে।

সতীশ যখন বৌদির নিকট চাবি দিল আমি তখন ষ্টীমারে। বাড়ীতে কান্নাকাটি সুরু হইল। আমি ঢাকা যাইয়া কি করিব, সেই চিন্তায় মগ্ন রহিলাম। সেইদিন রাত্রে আমি ঢাকা যাইয়া স্বদেশী-যুগের নেতা ললিতবাবুর বাসায় উঠিলাম। আমি ললিতবাবুর বিদ্যালয়ের ছাত্র, তিনি আমাকে স্নেহ করিতেন। ললিতবাবু স্বদেশী

ষ্টীমার কোম্পানী খুলিয়াছিলেন, তিনি আমাকে ষ্টীমারে রাখিলেন। আমি ষ্টীমারে টিকিট বিক্রি করিতাম। টিকিট বিক্রয়ের টাকা ললিতবাবুর বাসায় অথবা জয়গোবিন্দবাবুর (রায় চৌধুরী) নারায়ণগঞ্জের গদিতে জমা দিতাম। আমি সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ চালানোর কাজও শিখিতাম, বিদেশী কোম্পানীর সহিত প্রতিযোগিতায় স্বদেশী কোম্পানী পারিয়া উঠিল না। আমি কয়েক মাস স্টিমারে থাকার পর সমিতির কাজে মন ি‍লাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শিক্ষকতা

১৯০৯ সনে আমি পলাতক অবস্থায় এক গ্রামে তিন মাস শিক্ষকতার কাজ করিয়াছি। একবার সমিতির কাজে আমি মাণিকগঞ্জে গিয়াছিলাম। মাণিকগঞ্জের নিকট গড়পাড়গ্রামের অশ্বিনী ঘোষ সমিতির সভ্য ছিল। অশ্বিনী জমিদার-পুত্র, তাহার পিতা জীবিত ছিলেন না। কাকা সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেন। তাহাদের বাড়ীর উপরেই একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় (মাইনর স্কুল) ছিল। বেতনের অভাবে শিক্ষকগণ চলিয়া গিয়াছিলেন, শুধু দ্বিতীয় পণ্ডিত মহাশয় ছিলেন,—উপরের শ্রেণীর ছাত্রেরা বিদ্যালয়ে আসিত না। এখানে সমিতির একটি কেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে অশ্বিনীকে বলিলাম, যে কয়েকজন শিক্ষকের প্রয়োজন আমি ঢাকা হইতে আনাইয়া দিব এবং সম্প্রতি আমি এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার কাজ করিব। অশ্বিনী আনন্দের সহিত রাজী হইল এবং আমাকে তাহাদের বাড়ীতে লইয়া গিয়া তাহার কাকাকে বলিল, "আমাদের স্কুলের জন্য একজন খুব ভাল 'হেড্‌মাষ্টার' আনিয়াছি। তিনি মোক্তারবাবুর পরিচিত। চাকুরির অনুসন্ধানে মোক্তারবাবুর বাসায়

আসিয়াছিলেন।" মোক্তার শ্রীযুক্ত রজনী বসাকের আমি পরিচিত শুনিয়া তিনি আর কোন প্রশ্ন করিলেন না। আমি গড়পাড়া বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হইলাম, আমার খোরাকির ব্যবস্থা জমিদার বাড়ীতে হইল। নূতন হেড্‌মাষ্টার নিযুক্ত হইয়াছে, শুনিতে পাইয়া আবার ছাত্ররা বিদ্যালয়ে আসিতে আরম্ভ করিল। প্রথম শ্রেণীতে একটি ছাত্র ছিল, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১৫।২০টি। মোট ৬০।৭০ জন ছাত্র ছিল। প্রথম শ্রেণীর ছাত্রটি একটু নির্বোধ ছিল এবং প্রায়ই বিদ্যালয়ে আসিত না। আমার পক্ষে ইহা ভগবানের আশীর্বাদ বলিয়া বোধ হইল, কারণ মাইনর ক্লাসের অঙ্ক করানো আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। আমি যখন স্কুলে পড়িতাম তখন ইংরেজী ও ইতিহাসে প্রথম হইতাম, কিন্তু অঙ্কে বেশী নম্বর পাইতাম না, কোন রকমে পাশ করিয়া যাইতাম। একদিন আমি ছাত্রটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম সে কি অঙ্ক করে। সে দেখাইয়া দিলে আমি তাহাকে একটি অঙ্ক দিলাম। সে যদি আমাকে বুঝাইয়া দিতে বলিত তবে আমি নিশ্চয়ই পারিতাম না। কিন্তু সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তাহার অবস্থা দেখিয়া আমি তাহাকে ধমক দিয়া বলিলাম, তুমি নিতান্ত নির্বোধ, কিছুই বোঝ না, প্রথম হইতে অঙ্ক কষ। ইহাতে সেও রক্ষা পাইল, আমিও রক্ষা পাইলাম। দ্বিতীয় শ্রেণী ছিল আমার প্রিয় ক্লাস। আমি চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াইতাম, পণ্ডিত-মহাশয় পঞ্চম শ্রেণী হইতে পড়াইতেন। আমি যখন ইতিহাস পড়াইতাম তখন যাহা ইচ্ছা আমি বলিয়া যাইতাম। বিদ্যালয়ে আমি ছিলাম সর্বে-সর্বা, সেখানে আমার উপরে কথা বলিবার কেহ ছিল না।

তখন ছিল বর্ষাকাল। হঠাৎ একদিন খবর পাইলাম, আগামী কল্য বিদ্যালয়-পরিদর্শক বিদ্যালয়ে আসিবেন। এই সংবাদ পাইয়া আমি মনে মনে ভীত হইয়া পড়িলাম। কে আসিবেন তাহার খবর পাই নাই, ভাবিলাম যদি [illegible]

কথা বুঝিবে না, আমিও তাহার কথা বুঝিব না। পরে শ্রীযুত মহিম বোস আসিতেছেন শুনিয়া কতকটা আশ্বস্ত হইলাম। আমি বৈকালে জমিদার বাড়ীর নৌকা পাঠাইয়া প্রত্যেক ছাত্রের বাড়ীতে আগামী কল্য বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইবার জন্য সংবাদ পাঠাইলাম। পরদিন আবার নৌকা পাঠাইয়া ছাত্রদিগকে আনাইলাম, প্রায় একশত ছাত্র উপস্থিত হইল। কয়েকদিন হাজিরা-বহি ডাকা হয় নাই, কিন্তু আমি প্রায় সকলকেই 'উপস্থিত' চিহ্নিত করিলাম—সকল ছাত্রকে তাহা বলিয়াও দিলাম। আমি যখন মাইনর স্কুলে পড়ি তখন স্কুল-ইন্‌স্‌পেক্টার আসার দিন পণ্ডিত মহাশয় আমাদিগকে বই দেখিয়া একস্থান লিখিতে দিয়াছিলেন এবং প্রত্যেককে ১৫টা বানান ভুল করিতে বলিয়াছিলেন। ইন্‌স্‌পেক্টরবাবু আমাদের শ্লেট দেখিয়া তাহা পড়িয়াছিলেন এবং বানান কম ভুল হওয়ার জন্য সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, আমিও তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য সেইরূপ ব্যবস্থা করিলাম। ইন্‌স্‌পেক্টরবাবু যথাসময়ে উপস্থিত হইলেন। তিনি টেবিলের উপর কতকগুলি শ্লেট দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এইগুলি কি ?" আমি বলিলাম "শ্রুতিলিখন" (dictation) দিয়াছিলাম। তিনি শ্লেটগুলি পড়িয়া দেখিলেন কেহই বিশেষ ভুল করে নাই। মহিমবাবু ছিলেন একজন পাকা ঘুঘু। তিনি সন্দেহ করিলেন এবং ছাত্রদিগকে আবার শ্রুতি-লিখন দিলেন। সে যাত্রা প্রত্যেক ছাত্র ১৫।২০টা বানান ভুল করিল। মহিমবাবু আমার মুখের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ব্যপার কি ?' আমি খুব লজ্জিত হইলাম, উত্তর দিতে পারিলাম না। তৎপর তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাইয়া হাজিরা বহি খুলিয়া দেখিতে লাগিলেন এবং হঠাৎ একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কাল বিদ্যালয়ে উপস্থিত ছিলে ?" সে বলিল, কাল তাহার বাড়ীতে কাজ ছিল, সেজন্য সে কাল বিদ্যালয়ে আসে নাই। আমি তাহাকে 'উপস্থিত' করিয়াছিলাম। ইন্‌সপেক্টরবাবু আমার মুখের দিকে

তাকাইলেন। আমি আরও লজ্জিত হইলাম। কিছুক্ষণ পর তিনি প্রথম শ্রেণীর ছাত্রকে একটি অঙ্ক কষিতে দিলেন। তখন আমার বুক ধড়ফড় করিতে লাগিল ও পা কাঁপিতে লাগিল। আমার মনে হইল, এই অঙ্কটি সে কিছুতেই কষিতে পারিবে না—এখন যদি ইন্‌স্‌পেক্টরবাবু আমাকে এই অঙ্কটা বুঝাইয়া দিতে বলেন, তবে আমার সমস্ত বিদ্যা ধরা পড়িবে। মনে মনে আমি তখন কালী, দুর্গা, শিব, কত নামই যে জপ করিতে লাগিলাম! এই সময় জমিদার বাড়ীতে খাবার ঘণ্টা পড়িল। মহিমবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "এটা কিসের ঘণ্টা? তখন প্রায় বেলা দেড়টা। বলিলাম, "খাবার ঘণ্টা।" আমার খাওয়া হয় নাই জানিতে পারিয়া তিনি আমাকে খাইতে পাঠাইলেন, আমিও কিছুক্ষণের জন্য রক্ষা পাইলাম। মহিমবাবু বিদ্যালয়ের অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই আমি যখন ফিরিয়া আসিলাম তিনি তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেতন কিছু পান কি?" উত্তর করিলাম, "হ্যাঁ কিছু পাই।" তিনি বলিলেন, "আপনি ব্রাহ্মণের ছেলে, আমার মনে হয় আপনি যদি বাড়ীতে বসিয়া শুধু শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ খান তাহা হইলে ও ব্রাহ্মণ-ভোজনের দক্ষিণা ইহা অপেক্ষা অধিক পাইবেন।" আমি চুপ করিয়া রহিলাম। যাহা হউক, দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্ররা ফল ভালই করিল। ইন্‌স্‌পেক্টরবাবু প্রত্যেক শ্রেণীতেই গেলেন। বিদায় লইবার সময় ইন্‌স্‌পেক্টরবাবু তাঁহার মন্তব্যে লিখিয়া গেলেন, বিদ্যালয়ের অবস্থা খুব খারাপ, মাত্র দুইজন শিক্ষক আছেন। তিন দিনের হাজিরা একদিন ডাকা হইয়াছে এবং তাহাও অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল—ভুল। বিদ্যালয়ের অবস্থার যদি পরিবর্তন না হয় তবে সরকারী সাহায্য বন্ধ হইবে।—অবশ্যই ইহার কিছুদিন পর, উপযুক্ত শিক্ষক আসিয়াছিলেন এবং বিদ্যালয়ের অবস্থাও খুব উন্নত হইয়াছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পলাতক অবস্থা

একটা জাতির অন্তরে যখন স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগে তখন অত্যাচার নির্যাতন দ্বারা তাহাকে কখনও দাবাইয়া রাখা যায় না। স্বদেশী আন্দোলন যদিও গভর্ণমেণ্ট আইনের বলে দমন করিয়া দিয়াছিলেন, লোকের আশা-আকাঙ্ক্ষা যদিও ক্ষণকালের জন্য নির্বাপিত হইয়াছিল—তথাপি স্বাধীনতার সত্যকার আন্দোলন কখনও মরে নাই—ভিতরে ভিতরে ইহার আগুন জ্বলিতেছিল। ইহা এখন নূতন রূপ ধারণ করিল ও বিপ্লব আকারে প্রকাশ পাইল। এই যুগকে তাই 'বিপ্লব-যুগ' বলা যাইতে পারে। এই সময় চারিদিকে পিস্তলের গুলি চলিতে লাগিল, স্থানে-স্থানে বোমা ফাটিতে লাগিল। পুলিশ বলিল, এ সব বিপ্লবীদের কাণ্ড। বিপ্লবীদলের লোকেরা জায়গায় জায়গায় ধৃত হইতে লাগিল। পুলিশ তাহাদের উপর মারপিট করিতে লাগিল। বিপ্লবীদের জেল, দ্বীপান্তর, ফাঁসী হইতে লাগিল। জেলের ভিতরেও তাহাদের উপর নির্যাতন চলিতে লাগিল। ফলে সেখানেও জেল-আইন ভঙ্গ করিয়া বিপ্লবীরা দণ্ডভোগ করিতে লাগিল—অনশনব্রত গ্রহণ করিল। জেলে কত লোক জীবন হারাইল, কত লোক পাগল হইল, কত লোকের স্বাস্থ্য চিরদিনের মত ভগ্ন হইল।

ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় বিবাদীপক্ষের ব্যারিষ্টার ছিলেন স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়। তিনি তখন দেশবন্ধু নামে খ্যাত হ'ন নাই। এই মামলা উপলক্ষে আমরা তাঁহার সহিত পরিচিত হই। নরেনবাবু (সেন) মামলার তদ্বির করিতেন এবং দাশ মহাশয়ের সহিত প্রায়ই দেখা করিতেন। একদিন নরেনবাবু দাশ মহাশয়কে

অনুশীলন সমিতির নেতৃত্বভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। উত্তরে দাশ মহাশয় বলিয়াছিলেন, "আমি এখন জেলে যাইতে প্রস্তুত নই।" সম্ভবতঃ তিনি ভাবিয়াছিলেন, নেতৃত্ব করিতে হইলে দেশের জন্য যথাসর্বস্ব উৎসর্গ করিয়া কাজে নামাই সঙ্গত। তাই তিনি তখন রাজী হন নাই,– হয়তো ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। দেশবন্ধু যদিও সমিতির নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন নাই, তথাপি আমরা তাঁহার উপদেশ, সাহায্য ও সহানুভূতি সর্বদা পাইয়া আসিয়াছি। এই মামলা প্রায় দুই বৎসর চলিয়াছিল। এই মামলার আসামীগণকে জেল হইতে কোর্টে লইয়া আসা এবং কোর্ট হইতে জেলে লইয়া যাইবার সময় এক বিরাট শোভাযাত্রা হইত। আসামীরা খোলা গাড়ীতে থাকিত আর প্রায় দুইশত বন্দুকধারী পুলিশ গাড়ীগুলি ঘেরিয়া কুচ-কাওয়াজ করিয়া যাইত। সঙ্গে সঙ্গে বহু দর্শক এবং গুপ্তচর থাকিত। আমি এই মোকদ্দমার পলাতক আসামী ছিলাম। আমার নামে পুরস্কার ঘোষণা ছিল। আমি কিন্তু মাঝে মাঝে এই ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া আসামীদের সহিত ইশারায় কথাবার্তা কহিতাম। একদিন ললিতবাবু আমাকে দেখিয়া ধমক দিয়া বলিলেন, "মরতে এসেছ?" অপরে কেহই ইহার অর্থ বুঝিতে পারিল না। আমি শুধু বুঝিলাম যে তিনি আমাকে উদ্দেশ করিয়াই কথাটি বলিলেন। ইহার পর হইতে আমি আর তাহাদের সঙ্গে যাই নাই।

একবার পুলিশের তাড়া খাইয়া আমি ৮৫ মাইল রাস্তা হাঁটিয়া গিয়াছিলাম এবং রাস্তায় শুধু তিন পয়সার ছোলা ভাজা খাইয়াছিলাম। রাস্তাঘাট চিনিতাম না, মাঠ দিয়া চলিতে চলিতে এক বড় রাস্তায় উঠিলাম। একটি রাখাল ছেলেকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "এই রাস্তা কোথায় গিয়াছে?" সে এক বাজারের নাম করিল। পলাতক আসামী, তাড়া খাওয়ায় রেল-ষ্টীমারের রাস্তা পরিত্যাগ করিয়াছি। শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ও সাধারণ লোকদিগকে জিজ্ঞাসা

করিয়া পথ চলিতে লাগিলাম। সঙ্গে একটা টাকা ও পাঁচটা পয়সা ছিল। মনে করিলাম টাকাটি বিপদের সম্বল রাখিব আর শুধু খাওয়ার জন্য বাকী পাঁচটি পয়সা খরচ করিব। প্রথম দিন এক পয়সার ছোলা ভাজা খাইলাম, দ্বিতীয় দিন দুই পয়সার ছোলা ভাজা খাইলাম। খেয়া পার হইতে বাকী দুই পয়সা খরচ হইয়া গেল। তৃতীয় দিন বৈকালে প্রায় তিনটার সময় মাণিকগঞ্জের অন্তর্গত তিল্লীগ্রামে শ্রীযুত যোগেন্দ্রচন্দ্র রায় মহাশয়ের বাড়ী গিয়া পৌঁছাই। যোগেন্দ্রবাবু গ্রামের মাইনর-স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। যোগেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে অনেক স্বদেশী-লোক যাইত এবং তাহাদের অনুসন্ধানে পুলিশের লোকও যাইত। যোগেন্দ্রবাবুর মা আমাকে বসিতে বলিয়া স্কুলে যাইয়া যোগেন্দ্রবাবুকে বলিলেন, "তোমার নিকট একটি লোক আসিয়াছে। তাহাকে স্বদেশী লোক বলিয়াও মনে হইল না। মুখ শুকনো, চুল রুক্ষ, কতকটা পাগলের মত মনে হইল।" যোগেন্দ্রবাবু বাড়ী আসিয়া আমাকে দেখিয়া জড়াইয়া ধরিলেন। আমি তাহার নিকট সকল ঘটনা বলিলাম। আমার কাপড়খানা ময়লা ও ছেড়া ছিল, বদলাইয়া তিনি একখানা ভালো পরিষ্কার কাপড় দিলেন। আমিও স্নান করিয়া খাইতে বসিলাম। সেখানে দুই তিন দিন বিশ্রাম করিলাম। যোগেন্দ্রবাবু ফরমাইস দিয়া তিল্লীর বিখ্যাত 'চন্দনচুর' দই খাওয়াইলেন। আমি চলিয়া যাইবার সময় আমার ছেড়া কাপড়খানা সেখানেই পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলাম। এই ঘটনার পর বহু বৎসর যোগেন্দ্রবাবুর সহিত দেখা হয় নাই। প্রায় ১৮ বৎসর পর ১৯২৯ সনে, সংবাদ পাইলাম যোগেন্দ্রবাবু আমার সেই পরিত্যক্ত কাপড়খানা স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ রাখিয়া দিয়াছেন এবং তিনি আমাকেও দেখিতে চান। তখন তিনি এক জমিদারের কাছারিতে নায়েব ছিলেন। একদিন ময়মনসিং সহর হইতে মোটরগাড়ীতে আমি যোগেন্দ্রবাবুর সহিত দেখা করিবার জন্য রওয়ানা হইলাম। পথিমধ্যে মোটর দুর্ঘটনা হওয়ায় ফিরিয়া

আসিতে বাধ্য হই। ইহার পর নানা কাজে ব্যস্ত থাকি ও ধৃত হইয়া জেলে যাই। ইহার পর ১৯৩৮ সনে জেল হইতে মুক্ত হইয়া সংবাদ পাইলাম যোগেন্দ্রবাবুর মত্যু হইয়াছে। তাঁহার সহিত আমার আর এ-জীবনে দেখা হইল না।

আমি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিলাম। আগরতলার অন্তর্গত উদয়পুর পাহাড়ে আমাদের একটা কৃষিফার্ম ছিল, একটা পাশকরা দোনালা গাদাবন্দুক ছিল। আমি মাঝে মাঝে সেখানে গিয়া থাকিতাম। আমাদের ফার্ম কুমিল্লা সহর হইতে ৩২ মাইল দূরে ছিল এবং হাঁটিয়া যাইতে হইত। একবার সেখানে আমার জ্বর হয়। প্রায় দুই সপ্তাহ জ্বরে ভুগি। শরীর খুব দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, মনে হইল এখানে আর বেশী দিন থাকিলে নীচে ফিরিয়া যাইতে পারিব না। এইখানে মরিতে হইবে। আমি কুমিল্লা যাইতে মনস্থ করিলাম। বাগুকে (ব্রজেন্দ্র চক্রবর্তী) বলিলাম, "কাল প্রাতে আমি কুমিল্লা যাইব। তুমি ভোরে উঠিয়া আমার জন্য আলুসিদ্ধ ভাত রান্না করিও।" সেখানে সতীশ বলিয়া একটি বি, এস, সি ছাত্র কিছুদিন যাবৎ ছিল। আমি সতীশকে বলিলাম আমার সহিত যাইতে হইবে। বাগু শেষরাত্রে উঠিয়া আমার জন্য ভাত পাক করিয়াছে। আমি ঘুম হইতে উঠিয়া হাত-মুখ ধুইয়া খাইতে বসিলাম—সতীশও খাইল। আমি এতদিন সাবু খাইয়াছি, জ্বর সারে নাই। আজও জ্বর ছিল। জ্বরের মধ্যেই আলুসিদ্ধভাত পেট ভরিয়া খাইয়া কুমিল্লার দিকে রওনা হইলাম, সতীশ সঙ্গে চলিল। রৌদ্র যতই উঠিতেছে জ্বর ততই বাড়িতেছে। আমিও চলিতেছি, কিন্তু পা যেন আর চলিতে চাহে না। ঘন ঘন পিপাসা পায়। এরূপ ভাবে চলিতে চলিতে ১০।১২ মাইল দূর এক বাজারে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। বাজারে আমি পেট ভরিয়া দই চিঁড়া খাইলাম. সতীশ দই চিঁড়া খাইল, আবার রওয়ানা হইলাম। দ্বিপ্রহরে রৌদ্রের তেজ খুব প্রখর ছিল, তাহার উপর পাহাড়িয়া রাস্তা। চড়াই

উৎরাই করিয়া চলিতে হয়। উপরে উঠিবার সময় পা যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে—পিপাসা লাগিয়াই আছে। জল সব সময়ে পাওয়া যায় না। আমি কতকটা অজ্ঞান অবস্থায় চলিতে থাকিলাম—কিছুদূর গিয়া কোন গাছের নীচে লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িয়া বলিলাম, "জল।" সতীশ আমাকে লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িল। জল সব সময়ে যেমন পাওয়া যায় না, তেমনই জলের কোন পাত্রও আমাদের সঙ্গে ছিল না। সতীশ পাহাড়িয়া নদীর জল গামছা ভিজাইয়া আনিয়া আমার মুখে নিংড়াইয়া দিত কোন কোন সময়ে জল আনিতে আনিতে গামছা যাইত শুকাইয়া, আমার মুখে শুধু কয়েক ফোঁটা জল পড়িত। দুই-একবার পাহাড়িয়াদের বাড়ী হইতে লোটা সংগ্রহ করিয়া জল আনিয়াও খাওয়াইয়াছে। জল খাই আবার চলি, রাস্তায় বেশী দেরীও করিতে পারি না, বাঘের ভয় আছে। সন্ধ্যার দিকে মনে হইল জ্বর কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু শরীর খুব দুবল। অবশেষে রাত্রি ৯টার সময় আমরা কুমিল্লা গিয়া রমেশ ব্যানার্জীর বাসায় পৌছি। রমেশবাবুর দাদা অবিনাশ ব্যানার্জী একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার ছিলেন। তিনি আমাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, তখনও জ্বর একশ ডিগ্রী আছে। রাত্রে দুধ পাঁউরুটিও খাইলাম ঔষধও খাইলাম। পরদিন প্রাতে ৯৯° জ্বর লইয়া ঢাকা রওনা হইলাম। আশ্চর্যের বিষয় ঢাকা পৌছিয়া আমার জ্বর সারিয়া গেল।

আজকাল সকলেই দেশের স্বাধীনতার কথা বলে—কংগ্রেস, হিন্দুমহাসভা, মুস্লীম লীগ, রায় সাহেব, খানসাহেব, জমিদার, তালুকদার, কৃষক, মজুর,—সকলেই চাহেন দেশের স্বাধীনতা। কিন্তু বিপ্লবযুগে দেশের যে অবস্থা ছিল তাহাতে কেহ স্বাধীনতার দাবীর কথা মুখে উচ্চারণ করিতেও সাহসী হইতেন না। আমরাও প্রকাশ্যভাবে দেশের স্বাধীনতার কথা বলিতাম না। মামলা মোকদ্দমায় শুধু সরকারী সাক্ষীদের মুখে প্রকাশ পাইত যে আমরা দেশের স্বাধীনতা চাই এবং দেশকে স্বাধীন করারই চেষ্টা করিতেছি। আমরা

কোন ছেলেকে দলে আনিবার সময় প্রথমেই তাহাকে দেশের স্বাধীনতার কথা বলিতাম না। প্রথমতঃ তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া দেখিতাম ছেলেটির স্বভাব-চরিত্র ভাল কিনা, তারপর তাহার সহিত ভাব করিয়া তাহাকে ধর্মপুস্তক পড়িতে দিতাম—পরে পৃথিবীর অন্যান্য পরাধীন জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, রাজপুত কাহিনী, সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস প্রভৃতি পড়িতে দিতাম; সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থার কথাও আলোচনা করিতাম এইরূপ ভাবে তাহার মন গড়িয়া তুলিয়া পরে তাহাকে দেশের স্বাধীনতার কথা বলা হইত। স্বাধীনতার কথা শুনিয়া আবার অনেক ছেলে বিপদের আশংকায় নিকটে আসিত না। এমন কি কোন কোন ছেলে তাহার অভিভাবককে বলিয়া দিয়াছে—আবার সেই অভিভাবক বিপদাশংকা করিয়া পুলিশে সংবাদ দিয়াছে। পুলিশ তখন 'স্বদেশীর গন্ধ' পাইয়া তিলকে তাল করিয়া মামলা বাধাইবার চেষ্টা করিত ও সেই লোকটির উপর নির্যাতন করিত। সেই সময় আমরা প্রকাশ্য সভাসমিতিতে যোগ দিতাম না, কারণ যেখানে স্বাধীনতার কথা উঠিবে না, শুধু আবেদন নিবেদনের উচ্ছ্বাস প্রকাশ পাইবে সেখানে যাওয়া আমরা বৃথা সময় নষ্ট মনে করিতাম। অবশ্যই দেশের সাধারণের ভিতর জাগৃতি আনিবার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ছিল, কিন্তু তখন প্রত্যক্ষ কোন সুবিধা ছিল না। জনসাধারণের ভিতর প্রবেশ করিবার সুযোগ আমরা পাই নাই, তবে গ্রামে গ্রামে পাঠশালা গঠন করিয়া শিক্ষাবিস্তার ও স্বদেশী প্রচারের যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। স্থানে স্থানে পাঠশালার পাশাপাশি পাঠাগার ও 'আশ্রম' স্থাপন করিয়াছি। ঐ আশ্রম আর স্কুল ছিল আমাদের এক-একটি কেন্দ্র।

পলাতক অবস্থায় আমাকে নানাস্থানে নানাভাবে থাকিতে হইয়াছে। কখনও মাঝি, কখনও চাকর বা কুলি, কখনও বড়লোক সাজিয়াছি। যখন আমাদিগকে নৌকায় থাকিতে হইয়াছে তখন

নৌকায় আমরা মাঝির বেশে মাঝির মতোই থাকিতাম। পূর্ববঙ্গে বহু ডাকাতি হইয়াছে। ডাকাতেরা বড় ঘাসী-নৌকা ব্যবহার করিত। আমাদেরও বড় ঘাসী-নৌকা ছিল, আমরা নিজেরাই নৌকা চালাইতাম। স্বদেশী ডাকাত ধরার জন্য তখন জল-পুলিশের ব্যবস্থা ছিল, স্থানে স্থানে জল-পুলিশের আড্ডা ছিল, পুলিশের দল প্রত্যেক নৌকা থামাইয়া অনুসন্ধান করিত। পুলিশ-লঞ্চ নদীতে সর্বত্র ঘোরাফেরা করিত। আমাদের পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন নদীতে চলাফেরা করিতে হইত, জল-পুলিসের আড্ডার নিকট দিয়া অতিক্রম করিতে হইত। সকল সময় পুলিশ-লঞ্চের সহিতও দেখা হইত; বড় ঘাসী নৌকার উপর পুলিশের নজর ছিল অধিক, তাই আমাদিগকে সর্বদা সতর্ক থাকিতে হইত। এক যাত্রায় আমাদের নৌকা এক বাজারে লাগাইয়াছি, ঘাসী-নৌকা দেখিয়া কিছু লোকের সন্দেহ হইয়াছে, আমাকে থানায় ডাকিয়া লইয়া গেল। আমি দারোগাবাবুর সকল প্রশ্নের জবাব দিলাম, আমার কথাবার্তা চালচলনে কাহারও কোন সন্দেহ হইল না। দারোগাবাবুর মফঃস্বলে এক তদন্তে যাওয়ার কথা ছিল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি যাইতে রাজী আছি কিনা। আমি বলি, "কেরায়া বাই, রাজী হইব না কেন?"—আমার নৌকা ছিল খালি। দারোগার সহিত কনষ্টেবল্ যাইবে, কয়েকটা বন্দুক থাকিবে, ইচ্ছা করিলে বন্দুকগুলির মালিক আমিও হইতে পারি। আমি রাজী হইলাম। রাজী না হইয়াও উপায় নাই। তৎক্ষণাৎ সন্দেহ করিবে। আমাকে সন্দেহক্রমে আটক করিয়া যদি আমার বাড়ীঘরের অনুসন্ধান করে, তবে সেই গ্রামে সেই নামের কোম লোক পাইবে না, আমার স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়িবে, আমি তখন পলাতক আসামী। আমার নামে পুরস্কার ঘোষণা ছিল। ঘটনাক্রমে দারোগাবাবুর অন্য একটি বিশেষ কাজ থাকায় মফঃস্বল যাওয়া হয় নাই। আমি অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিয়া হাটে বাজার করিয়া গন্তব্য পথে রওয়ানা হইলাম।

আমি কোন কোন স্থলে নিজেকে আইনের ছাত্র বা পোষ্ট গ্রাজুয়েট শ্রেণীর ছাত্র বলিয়াও পরিচয় দিয়াছি। এক সময়ে আমি কালীচরণ মাঝি নামে খ্যাত ছিলাম। আমি বহু দিন নৌকায় নৌকায় কাটাইয়াছি, নৌকায় থাকিতে থাকিতে চেহারাও মাঝির মতো হইয়া গিয়াছিল। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রং খুব ফর্সা ছিল, দেখিতে রাজপুত্রের মতো। কিন্তু রৌদ্রে বৃষ্টিতে ভিজিয়া তাহার চেহারাও মাঝিব মতো হইয়াছিল। মাঝিরা যেভাবে থাকিত আমরাও সেই ভাবে থাকিতাম। আমবা মাটির শান্‌কীতে ভাত খাইয়াছি! কল্কি দিয়া তামাক খাওয়া পর্যন্ত অভ্যাস করিয়াছি। আমি পূর্ববঙ্গের সমস্ত বড় বড় নদীতে নৌকা চালাইয়াছি, বর্ষাকালে ঝড়-বৃষ্টির দিনে পদ্মা নদী পাড়ি দিয়াছি, বরিশালে গিয়াছি, নোয়াখালি গিয়াছি, জাহাজের সঙ্গে পাল্লা ধরিয়া নৌকা চালাইয়াছি। পুলিশের হাতে বহুবার আমাকে পড়িতে হইয়াছে। কিন্তু তাহারা আমাকে সাধারণ গ্রাম্য মাঝি ভাবিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। অবশ্য কোন কোন সময় সেলামিও দিতে হইয়াছে। সেই যুগে আমি পুলিশ কর্মচারীদের নিকট খুব ভীষণ প্রকৃতির লোক বলিয়া পরিচিত ছিলাম। কিন্তু আমাদের গ্রামের লোক যাহারা শৈশব হইতে আমাকে জানে, তাহারা জানে আমি খুব শান্ত প্রকৃতির লোক।

নবম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় বার জেল-দর্শন

আমি ১৯১২ সনে ঢাকা সহরে এক খুনের মামলায় ধৃত হই। পূর্বদিন সন্ধ্যার সময় একজন পুলিশ কর্মচারীকে (রতিলাল রায়) রিভলভার দ্বারা গুলি করিয়া হত্যা করা হইয়াছে--পরদিন প্রাতে আমি সেই রাস্তা দিয়া যাইতেছিলাম। পুলিশ কর্মচারী অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন, হঠাৎ আমি তাহাদের সম্মুখে পড়িলাম। চলিয়া যাইতেছি, এমন সময় ইন্‌স্‌পেক্টরবাবু আমাকে ডাকিলেন। তিনি পূর্বে নাকি রাজনৈতিক সন্দেহভাজন ব্যক্তির সহিত আমাকে নদীর পাড়ের পার্কে দেখিয়াছিলেন। বিশেষতঃ হত্যাকাণ্ডের সময় যাহারা সেখানে উপস্থিত ছিল, তাহারা বলিয়াছে, হত্যাকারীর লম্বা দাড়ি ছিল—আর ঘটনাক্রমে আমারও লম্বা দাড়ি ছিল। ডাকার সঙ্গে সঙ্গে আমি দাঁড়াইলাম। আমার নাম জিজ্ঞাসা করিলে, একটা নাম বলিয়া দিলাম। আমাকে তাঁহাদের সঙ্গে থানায় যাইতে বলিলেন। বাধ্য হইয়া আমাকে থানায় যাইতে হইল। আমার সঙ্গে একটি 'হুইস্‌ল্' ছিল - জিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম, গ্রামের ফুটবল খেলার জন্য কিনিয়াছি। কোথা হইতে কিনিয়াছি? জিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম নারায়ণগঞ্জ হইতে। অতঃপর কোন দোকান হইতে 'হুইস্‌ল্' কিনিয়াছি তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য আমাকে নারায়ণগঞ্জ লইয়া চলিল। বাঁশীটি আমি বহু পূর্বে কিনিয়াছিলাম, সুতরাং নারায়ণগঞ্জ গিয়া 'কোন্ দোকাম' ভুলিয়া গেলাম। পুলিশ পূর্ব হইতেই সন্দেহ করিতেছিল এখন বুঝিল, আমি সত্য কথা বলি নাই অতঃপর আমি কে, এই অনুসন্ধান চলিলে প্রকাশ পাইল, আমি ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী—ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার পলাতক আসামী।

আমি এখন ঢাকা জেলে আছি। চারি বৎসর পর আবার ঢাকা জেলের সাক্ষাৎ পাইলাম। খুনী-মামলার আসামী, বিশেষতঃ পুলিশ কর্মচারী খুন, কাজেই আমার প্রতি ব্যবস্থা খুব কড়াকড়ি। বিশ ডিগ্রী 'সেলে' আছি, রাত্রে দুই ঘণ্টা পর পাহারা বদল হয়, নূতন সিপাহী 'চার্জ' লওয়ার সময় অর্থাৎ প্রত্যেক দুই ঘণ্টা পর পর আমাকে জাগাইয়া দেখে আমি 'সেলে' আছি কিনা। পুলিশের অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। পূর্বে আরো কয়েকটি হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে, প্রত্যক্ষদর্শীরা পুলিশকে বলিয়াছে হত্যাকারীর লম্বা দাড়ি ছিল। পুলিশ এখন প্রত্যেক স্থান হইতে লোক আনাইয়া আমার দাড়ি মাপিয়া দেখিতে লাগিল -এই দাড়ি সেই দাড়ি কিনা। সকলেই এক বাক্যে বলিল, এ সে নয়। ঢাকার 'প্রত্যক্ষ দর্শীরা'ও আমাকে সনাক্ত করিল না, কাজেই আমার বিরুদ্ধে খুনের মামলা চলিল না। পুলিশ তখন বিফল মনোরথ হইয়া আমার বিরুদ্ধে ঢাকা ষড়যন্ত্রের মামলা চালাইতে স্থির করিল—কিন্তু সরকার তাহাতে রাজী হইল না। ষড়যন্ত্র মামলা চালাইতে হইলে বহু টাকা ব্যয় হইবে, পূর্বের সমস্ত সাক্ষ্যকেই ডাকিতে হইবে, বিশেষতঃ পূর্বের মামলায় ললিতবাবু, যদু, বিনোদ খালাস পাইয়াছে, পুলিনবাবুর হাইকোর্টে মাত্র সাত বৎসর জেল হইয়াছে—আমাকে আট্‌কাইতে পারিবে কি না তারও কোন স্থিরতা নাই। কাজেই সরকার আমার নামে আর ষড়যন্ত্র মামলা চালাইলেন না। তখন পুলিশ আমার বিরুদ্ধে অগতির গতি ১০৯ ধারা চালাইল। ঢাকার অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট রায় সাহেব যামিনীমোহন দাস মহাশয়ের আদালতে আমার বিচার আরম্ভ হইল, কিন্তু মামলা চলিল না। কয়েক মাস হাজত ভোগ করিবার পর আমি বে-কসুর খালাস পাইলাম।

এ যাত্রা বহু গুপ্তচর আমাকে চিনিয়াছে—পুলিশ আমার ফটো তুলিয়া রাখিয়াছে। আমি এখন সর্বদা পুলিশের চোখের উপর আছি। আমার ধৃত হওয়ার পর আমার মেজদা মোকদ্দমার তদ্বির

করিতে ঢাকায় আসিয়াছিলেন। খালাসের পর তিনি আমাকে বাড়ী লইয়া চলিলেন। সেই যে পানতা ভাত খাইয়া বাড়ী হইতে পলাইয়া ছিলাম, তাহার তিন বৎসর পর আজ বাড়ী ফিরিলাম।

দশম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় বার বাড়ী হইতে অন্তর্ধান

আমি দশ বার দিন বাড়ীতে ছিলাম। কয়েক জন গুপ্তচর আমাদের গ্রামে থাকিয়া আমার গতিবিধি লক্ষ্য করিত। আমি একদিন বাড়ী হইতে অন্তর্হিত হইলাম। এ যাত্রা পলাইতে হইল পুলিশকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য। বাড়ী হইতে বিদায় লইয়া চলিলাম।

গুপ্তচর যখন টের পাইল আমি বাড়ীতে নাই, তখন তাহারা চারিদিকে তার করিয়া দিল। পুলিশ চারিদিকে আমার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। আমি তখন ঢাকার দিকে রওনা হইয়াছি এবং দুইদিন পর নির্বিঘ্নে ঢাকায় পৌছিয়াছি। ঢাকা অনুশীলন সমিতির চার্জে ছিলেন, মদন ভৌমিক, তিনি আমার নিরাপদে থাকার জন্য রায় সাহেব যামিনী দাসের বাসা স্থির করিলেন। এই রায়-সাহেবের কোর্টে আমার মামলা হইয়াছিল, তিনি তখন ময়মনসিং ছিলেন, তাঁহার পুত্রগণ আমাদের দলের সভ্য ছিল। আমি এখানে তিন দিন ছিলাম, তাহার পর বিরজা নাম গ্রহণ করিয়া উত্তর বঙ্গে রওয়ানা হই। আমার পক্ষে তখন পূর্ববঙ্গে থাকা অসম্ভব ছিল। কারণ গুপ্তচরেরা সকলেই আমাকে চিনিয়াছে। অনুশীলন সমিতি ক্রমে উত্তরবঙ্গে সর্বত্র বিস্তার লাভ করিল। আমি ঘুরিয়া ফিরিয়া নানাস্থানে কাটাইতাম। একবার আমি বহরমপুর হইতে মালদহ যাই। বহরমপুর কলেজের বি, এ, শ্রেণীর একটি ছাত্র আমাদের

সভ্য ছিল, তাহার বাড়ী ছিল মালদহ শহরে। মালদহে আমাদের দল ছিল না। সে বাড়ী যাইতেছিল, আমি তাহার সঙ্গী হইলাম। তাহার পিতা, কাকা ও দাদা সকলেই ছিলেন শিক্ষিত ও সরকারী কর্মচারী, রাস্তায় ট্রেনে সে আমাকে বলিল, "আপনার সহিত আমার যে পরিচয় আছে তাহা বাসায় প্রকাশ করিবেন না।" আমি তাহাকে বলিলাম, "তবে তোমাদের বাসায় কি করিয়া উঠিব?" সে বলিল, "বলিবেন শহর দেখিতে আসিয়াছেন, ট্রেনে আপনার সহিত আমার পরিচয়। আপনার উঠিবার কোন জায়গা নাই, তাই আমার সঙ্গে আসিয়াছেন।" তাহার বাবা ও দাদা আমায় খুব আদর-যত্ন করিলেন। আমি দুই তিন দিন তাহাদের বাসায় ছিলাম। তাহার দাদা একজন সরকারী কর্মচারী ছিলেন। প্রকৃতি ছিল তাঁহার ধর্মপরায়ণ। দু-একদিনের মধ্যেই আমি তাঁহার সহিত ধর্মকথা বলিয়া ভাব করিয়া লইলাম। আমি যাইবার সময় তাঁহাকে বলিলাম, "আমার একটি বন্ধু, বাড়ীর অবস্থা খুব খারাপ, এখানে চাকুরীর সন্ধানে আসিবে। আপনাদের বাসায় অনেকগুলি ছেলে-পিলে আছে, তাহাকে যদি আপনি আপনাদের বাসায় স্থান দেন তবে সে ছেলেদের পড়াইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে চাকুরীর চেষ্টা করিতে পারিবে।" তিনি বলিলেন, "টাকা পয়সা বিশেষ কিছু দিতে পারিব না।" আমি তাহাতেই রাজী হইয়া গেলাম। একজন গৃহশিক্ষক পাঠানোর জন্য ঢাকাতে চিঠি লিখিলাম,—কিছুদিন পর পূর্ণ চক্রবর্তী আসিয়া হাজির হইল। পূর্ণ লেখাপড়া বিশেষ জানিত না। হোমিওপ্যাথি ডাক্তারী কিছু শিখিয়াছিল। আমি একখানা চিঠি দিয়া পূর্ণকে মালদহে পাঠাইলাম, পূর্ণ সেই বাড়ীর গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইল। পূর্ণর এখন সমূহ বিপদ উপস্থিত—সে ছেলেদিগকে পড়াইতে পারে না—ভুল পড়ায়। পূর্ণ আমাকে পুনঃপুনঃ চিঠি দিতে লাগিল, তাহাকে অন্য স্থানে বদলি করিতে, কিন্তু আমি আদেশ দিলাম তাহাকে সেইখানেই থাকিতে

হইবে। পূর্ণ যদিও পড়াইতে পারিত না ও তাহার বিদ্যা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি সে নিজের চরিত্রগুণে সকলের মন আকর্ষণ করিয়াছিল। বাড়ীর কর্ত্রীঠাকুরাণী পূর্ণকে নিজের ছেলের মত দেখিতেন। পূর্ণকে এখন তাড়ায় কে ? পূর্ণ এখন সেই বাড়ীর একজন হইয়া পড়িল। বাড়ীর কর্তা মনে করিতেন পূর্ণ নাই বা পড়াইতে পারিল—শুধু নিকটে বসিয়া থাকিলে ছেলেরা দুষ্টামী করিবে না, বিশেষতঃ পূর্ণের জন্য কোন পৃথক খরচ হয় না ; কিন্তু তাহার দ্বারা কাজ হয় অনেক। সুবিধা পাইয়া পূর্ণ এখন আস্তে আস্তে দল গড়িতে লাগিল। মালদহে এক সাধু ছিল এবং সেই সাধুর কয়েকজন শিক্ষক ও ছাত্র শিষ্য ছিল। পূর্ণ সেই দলে ভিড়িয়া সাধু এবং বি, এ, পাশ, আই, এ, পাশ শিক্ষকদের সহিত তর্ক করিয়া তাহাদিগকে তাহার পথে টানিয়া আনিল—তাহারাই হইলেন এখন পূর্ণের সহায়ক। পূর্ণ বিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রকে দলভুক্ত করিল। গ্রামেও সমিতির শাখা বিস্তৃত হইল। কিছুদিন পর আমি মালদহে গিয়া দেখিলাম, পূর্ণ বেশ দল গঠন করিয়াছে। আমি পূর্ণকে ঠাট্টা করিয়া বলিলাম, এখন মালদহের কাজ ইহারাই চালাইতে পারিবে। তুমি পূর্বে আমার নিকট চিঠি লিখিয়াছিলে, তোমাকে মালদহ হইতে বদ্‌লি করিতে, এখন তোমাকে অন্যত্র পাঠাইব। পূর্ণ বলিল, "আমি মালদহ ছাড়িয়া অন্যত্র যাইব না।" বুঝিলাম মালদহের প্রতি পূর্ণের মায়া জন্মিয়াছে। পূর্ণ আরও কিছুদিন সেখানে ছিল, পরে কুমিল্লা জেলার ভার গ্রহণ করিয়া সেখানে যায়। পূর্ণ বহু বৎসর জেলে আটক, ছিল। জেল হইতে মুক্ত হইয়া সে বিবাহ করে। যক্ষ্মা রোগে কিছুকাল পর মারা যায়।

বাংলার বাহিরে বিভিন্ন প্রদেশেও ধীরে ধীরে অনুশীলন সমিতি বিস্তার লাভ করিল। সমিতির শাখা বাংলার বাহিরে আসাম, বিহার, সংযুক্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব ও বোম্বাইতে ছিল। বাংলা দেশ

হইতে লোক যাইয়া সেই সব প্রদেশেও দল গঠন করাইয়াছিল। চন্দন নগরে একটি দল ছিল। মতিবাবু (মতিলাল রায়) ছিলেন তাহার নেতা এবং শ্রীশচন্দ্র ঘোষ ও রাসবিহারী বোস সেই দলের প্রধান কর্মী ছিলেন। আমাদের সমিতির সহিত চন্দন নগরের দল এক হইয়া যায়। ইহার পর রাসবিহারীবাবু অধিকাংশ সময়ে উত্তর ভারতে থাকিতেন। কাশীতে শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সান্যালের একটি দল ছিল, সেই দলও আমাদের সমিতির সহিত এক হইয়া যায়। এই সময়ে শচীনবাবু রাসবিহারীবাবুর সহিত পরিচিত হন। এদিকে আমেরিকাতে 'গদর-পার্টি' বলিয়া একটি দল ছিল, তাহাদের একখানা সংবাদ-পত্র ছিল তাহার নাম ছিল 'গদর'। প্রথম জর্মান-যুদ্ধ সুরু হইবার পর জার্মান'কন্‌সাল' তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা এখানে কি করিতেছ? তোমরা ভারতে গিয়া তোমাদের দেশ স্বাধীন করিবার চেষ্টা কর—জার্মান গভর্ণমেণ্ট তোমাদিগকে সাহায্য করিবে।" তাহারা আমেরিকা হইতে দেশে ফিরিয়া আসিয়া রাসবিহারীবাবুর সহিত মিলিলেন।

এই ভাবে একদিকে যেমন সমিতি দিনের পর দিন চারিদিকে বিস্তার লাভ করিতেছিল, অপর দিকে আবার তেমনি ভাঙ্গনও সুরু হইল। এই সময়ে অনবরত ধর-পাকড় চলিতেছিল অস্ত্র আইনে, ডাকাতি মামলায়, খুনের মামলায়, ১০৯।১০ ধারায়, বোমার মামলায়, ষড়যন্ত্রের মামলায় বহুলোক অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হইতে লাগিল। এই সব মামলা-মোকদ্দমার তদবির আমাদিগকে করিতে হইত এবং ইহাতে আমাদের অনেক শক্তিরও অপব্যয় হইত। আত্মীয়-স্বজনেরা ভয়ে কেহ নিকটে আসিতেন না। কাজেই মোকদ্দমার সমস্ত দায়িত্ব আমাদেরই গ্রহণ করিতে হইত। ১৯১২।১৩ সনে আমাদের মধ্যে অনেকের মনে হিংসা ও অহিংসার প্রশ্ন উঠিল। একদল লোক বলিতে লাগিলেন, আমাদিগকে অহিংসার পথে চলিতে হইবে—হিংসার পথে যাইয়া আমাদের কোন লাভ

হইবে না.ইহার দ্বারা আমাদের শক্তির অপব্যয় হইতেছে ও হইবে। *হিংসা ও অহিংসার এই দ্বন্দ্ব আমাদের মধ্যে কিছুদিন ব্যাপিয়া* বেশ চলিল—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ইতিহাস ও দর্শন হইতেও উহাদের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বহু যুক্তি তর্ক চলিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই মীমাংসার পথ আগাইল না। সময় সময় এরূপ হইয়াছে যে তর্ক করিতে করিতে আমরা সারারাত্রি কাটাইয়া দিয়াছি। সূর্যের আলো দেখিয়া তবেই মনে হইয়াছে সারারাত্রি তর্ক করিয়াছি—ঘুমের কথা বিস্মৃত হইয়াছি। যাহা হউক, অবশেষে ইহাকে ভিত্তি করিয়া একদল লোক সরিয়া পড়িলেন। অবশ্যই তাঁহারা অহিংস-ভাবে রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন না। অনেকে বিবাহ করিয়া অর্থোপার্জনে মন দিলেন। অবশিষ্ট কিছু লোক, যাঁহারা সরল বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁহারা সংসারে প্রবেশ করিলেন না কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিলেন। যাঁহারা রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিলেন তাঁহাদের প্রায় সকলেই বেশ নাম করিয়াছেন। হিংসা ও অহিংসার এই দ্বন্দ্ব হইতে কিছু লোক যেমনি সরিয়া পড়িলেন, তেমনই কিছু লোক আবার বিভিন্ন অবস্থায় পড়িয়া বা বিভিন্ন মতলব হইতে সরিয়া পড়িয়া ভিন্ন দল করিলেন। ফলে বাংলা দেশে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের সৃষ্টি হইল।

এদিকে বিখ্যাত রাজাবাজার বোমার মামলা সুরু হইয়াছে। এই মামলার প্রধান আসামী ছিলেন শ্রীযুত অমৃতলাল হাজরা। তিনি শশাংক হাজরা নামেও পরিচিত ছিলেন, বাংলার প্রসিদ্ধ বাহ্রা ডাকাতি সম্পর্কে তাঁহার নামে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা ছিল। পুলিশ দীর্ঘকাল তাঁহার কোন সন্ধান পায় নাই, তিনি কলিকাতায় এক বরফের কারখানায় কাজ করিতেন। এই মামলায় ৺চন্দ্রশেখর দে প্রভৃতিও অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিচারে অমৃতবাবুর ১৫ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। শশাংকবাবুর বাসায় খানা-তল্লাসী করিয়া পুলিশ এরূপ কতকগুলি জিনিষ পাইয়াছিল যাহার ফলে

তাহারা মনে করিল বাসাটি বোমার কারখানা। পুলিশ বলিতে লাগিল, যেসব জিনিষ তাহারা পাইয়াছে, তাহা বোমার 'সেল'। কিন্তু শশাংকবাবু বলিলেন ইহা বোমার 'সেল' নহে নূতন ধরণের গ্যাস-লাইট তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন। এইগুলি হইতেছে তাহার খোল। তিনি একদিন প্রকাশ্য আদালতে বোমার 'সেল' 'গ্যাস-লাইটে' রূপান্তরিত করিয়া সকলকে তাক্ লাগাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গ্যাস লাইটের যুক্তি টিকিল না, তিনি বোমার মামলায় দণ্ডিত হইলেন। এই মামলা উপলক্ষে পুলিশ বহু স্থানে খানা-তল্লাসী করে এবং এক জায়গায় বিরজা নামের একখানা চিঠি পায়। বিরজার নাম পুলিশের খাতায় ছিল না। পুলিশ বিরজার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী তখন বিরজা নামে উত্তর বঙ্গে নিরাপদে বিরাজমান ছিল। সিডিসন-কমিটি রিপোর্টে দেখা যায় ভারতবর্ষে যে সব স্থানে বোমা পাওয়া গিয়াছে তাহা দুই প্রকারের। একটা আলিপুর টাইপ এবং অপরটা রাজাবাজার টাইপ। আলিপুর টাইপ, যাহা বিখ্যাত আলিপুর বোমার মামলার সময় পাওয়া গিয়াছিল এবং যে মামলায় বারীনবাবু প্রভৃতি দণ্ডিত হইয়াছিলেন,—তাহা অল্প কয়েক জায়গায় ব্যবহৃত হইয়াছিল। রাজাবাজার টাইপ বড়লাটের উপর হইতে আরম্ভ করিয়া মৌলবী বাজার পর্যন্ত বহু স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছিল। রাজাবাজার টাইপ পুলিশ মনে করিত অনুশীলন সমিতির।

আমি এখন শয্যাশায়ী, আমার কাশী হাঁপানীতে পরিণত হইয়াছে কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন ইহা যক্ষ্মারোগ। আমার বন্ধুরা অনবরত সেবা শুশ্রূষা করিতেছে। প্রত্যহ—দিনের পর দিন, হয়তো মায়ের কাছেও এমন যত্ন মিলে না। আমি মনে মনে খুব বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি, মনে করিতেছি আমি সমিতির একটা গলগ্রহ হইয়া পড়িয়াছি। সময় সময় বন্ধুদেয় নিকট প্রস্তাব করিয়াছি একটা কিছু করিয়া মরি। কিন্তু বন্ধুরা আমাকে মরিতে দিবে না, আমাকে

বাঁচাইবেই। গৌরবময় মৃত্যু আমার অদৃষ্টে নাই। আমার অদৃষ্টে আছে কষ্ট ভোগ, তাই মৃত্যু আমার হইল না,—মাঝে মাঝে যমের দক্ষিণ দুয়ার হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। শ্রীযুক্ত নলিনীকিশোর গুহ তখন কলিকাতায় ন্যাশনেল মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র ছিলেন। ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক মহাশয় ফুস্‌ফুসের ব্যাধির বিশেষজ্ঞ ছিলেন। নলিনীবাবু মল্লিক মহাশয়ের প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাই তিনি অল্প টাকায় তাঁহার দ্বারা আমার বুক পরীক্ষা করাইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। নলিনীবাবুর পরিচিত আরও দুই একজন চিকিৎসক আমাকে দেখিয়াছিলেন। একদিন্ আমাকে পরীক্ষা করাইবার জন্য মল্লিক মহাশয়ের বাসায় গিয়াছি। সেই দিন ছাত্রদেরও পরীক্ষা ছিল,তাঁহার নির্দেশানুসারে সকল ছাত্রই আমাকে পরীক্ষা করিতে লাগিল। ছাত্রদের পরীক্ষা ও প্রশ্নবাণে আমার প্রাণান্ত উপস্থিত। কিন্তু ছাত্রেরা আমাকে ছাড়িবে না—আমিও কিছু বলিতে পারি না। কারণ, একে ইহা ভদ্রতাবিরুদ্ধ হইবে, দ্বিতীয়তঃ আমি মল্লিক মহাশয়ের অনুগ্রহপ্রার্থী। আমি তো টাকা দিই না। কিছুদিন চিকিৎসা চলিল, কিন্তু কোন লাভ হইল না। অবশেষে ডাক্তাররা বলিলেন, সমুদ্রের তীরে বায়ু পরিবর্তন করিতে যাইতে হইবে। বন্ধুরা স্থির করিলেন, আমাকে পুরীতে যাইয়া থাকিতে হইবে। দিন স্থির হইল—রাস্তায় attendant হিসাবে নলিনীবাব আমার সঙ্গে চলিলেন। সেবা-শুশ্রূষার জন্য সতীশচন্দ্র-পাকড়াশী ও তারকেশ্বর গুহ চলিল। কিন্তু পুরীতে আমার কোন উপকার হইল না, বরং রোগবৃদ্ধি পাইল। সেখানকার এক ডাক্তার আমাকে ভুবনেশ্বর যাইতে বলিলেন। আমি ভুবনেশ্বর গেলাম। ভুবনেশ্বরেও আমার কোন উপকার হইল না, কিছুদিন থাকিবার পর সেখান হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।

স্বদেশী আন্দোলন বন্ধ হইয়াছে কিন্তু বিপ্লবীদের ধ্বংসাত্মক কাজ বন্ধ হয় নাই। গভর্ণমেণ্ট নরমপন্থী নেতাদের সহিত পরামর্শ

করিলেন, কি ভাবে সন্ত্রাস বাদ বন্ধ করা যায়। নরম পন্থী নেতাদের সহিত বিপ্লবীদের কোন যোগাযোগ ছিল না। স্বদেশী নেতারা ভয়ে, *গভর্ণমেন্টকে খুসী করার জন্য সর্ব্বদা বিপ্লবীদের উপর গালি বর্ষণ করিয়াছে, তাই বিপ্লবীরা তাহাদের সহিত কোন সংশ্রব রাখিতেন না।* স্বদেশী নেতারা কেহ ছিলেন স্বার্থপর, কেহ অতিরিক্ত বিবেচক। আগে চলার সাহস ও ক্ষমতা তাঁহাদের ছিল না, যদিও তাঁহারা ছিলেন খুব প্রতিভাশালী, বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও ধনী। যুবকের দল ছিল নির্ভিক, নিঃস্বার্থপর। তাহারা চাহিত আগে চলিতে—নেতাদের ছিলনা এই আগে চলিবার সাহস, তাই তাঁহারা অচিরেই সরিয়া পড়িলেন। আগে চলিতে গেলে বিপদ আছে, তাই নেতারা চলিলেন নিরাপদ পথে আর যুবকেরা চলিল বিপদসঙ্কুল পথে। বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ করিয়াই স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল—নেতাদের আশা আকাঙ্ক্ষাও বঙ্গভঙ্গ রদ ও সামান্য কিছু শাসন সংস্কারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু যুবকদের আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল অনেক প্রসারিত—তাহারা চাহিত পূর্ণ স্বাধীনতা। যুবকেরা জানিত পূর্ণ স্বাধীনতা আবেদন-নিবেদনে আসিবে না—দুই একটা শাসন সংস্কারের মধ্য দিয়া সে পূর্ণ স্বাধীনতার পথ প্রস্তুত হইবার নয়। তাই প্রগাঢ় আত্মবিশ্বাসের মধ্য দিয়া তাহারা চলিয়াছে, পূর্ণ স্বাধীনতার কণ্টকময় পথে।

নরম পন্থী নেতারা গভর্ণমেন্টকে বুঝাইলেন, বঙ্গ ভঙ্গের প্রতিবাদে এই আন্দোলন সুরু হইয়াছে, এখন বঙ্গ ভঙ্গ রদ হইলেই সন্ত্রাস বাদ আন্দোলন বন্ধ হইবে। পূর্ব্বে বৃটিশ পার্লামেণ্ট ঘোষণা করিয়াছিল, বঙ্গ ভঙ্গ settled fact ইহা রদ হইবে না। এখন এই settled fact un-settled হইতে চলিল। গভর্ণমেণ্ট বঙ্গ ভঙ্গ রদ করিলেন, জাতীয় কংগ্রেস নেতারা সুখী হইলেন কিন্তু বৈপ্লবিক কার্য্য কলাপ বন্ধ হইল না, বড় লাটের উপর বোমা পড়িল।

১৯১২ সনে, প্রকাশ্য দিবালোকে, বড়লাট রাজকীয় শোভা যাত্রায় হস্তী পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যাইতে ছিলেন। দিল্লীর প্রশস্ত রাজপথ, সহস্র সহস্র লোকের সমাবেশ, হঠাৎ বোমার প্রচণ্ড আওয়াজে সকলে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল, বোমা পড়িয়াছে বড়লাটের উপর, হস্তীর মাহুত মৃত, বড়লাট আহত, অজ্ঞান,—চারিদিকে হৈ চৈ। সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রোপচারে বড় লাটের প্রাণ রক্ষা পাইল। বড়লাটের প্রাণ-রক্ষা পাওয়ার জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া, আক্রমণ কারীর প্রতি তীব্র নিন্দা ও ঘৃণা প্রকাশ করিয়া, ভারতের সকল প্রদেশ হইতে প্রকাশ্য সভায় প্রস্তাব পাশ করিয়া, সমবেদনা জানান হইল। সংবাদপত্রে অন্য কোন সংবাদ নাই, শুধু সমবেদনা প্রকাশের সংবাদ। বাসবিহারী বসু দেরাদুন ফরেষ্ট বিভাগে চাকুরী করিতেন, তিনি এক প্রকাশ্য সভায় সমবেদনা প্রকাশ করেন, সভার সভাপতি রাসবিহারী বসুই ছিলেন। বড় লাটের উপর বোমা পড়ায় সরকারী পুলিশের গুপ্ত বিভাগ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, চারিদিকে অনুসন্ধান চলিতে লাগিল, খানাতল্লাসী, গ্রেপ্তার চলিতে লাগিল। প্রকাশ্য দিবালোকে, সহস্র সহস্র লোকের সম্মুখে এরূপ কাণ্ড ঘটিল, বোমা নিক্ষেপকারীর কোন সন্ধান পাওয়া গেলনা। ইহা গভর্ণমেণ্টের গুপ্ত পুলিশ বিভাগের পক্ষে অত্যন্ত কলঙ্কের কথা। অবশেষে পুলিশের গুপ্ত বিভাগ সংবাদ সংগ্রহ করিল, এই বোমা নিক্ষেপকারী অপর কেহ নয়, দেরাদুন সভায় যিনি সভা করিয়া সমবেদনা জানাইয়া ছিলেন, সেই রাসবিহারী বসু। পুলিস রাসবিহাবী বসুকে গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হয় নাই।

পুলিনবাবু ধৃত হইলে পর যাঁহারা বিপ্লব আন্দোলন চালাইয়াছেন তাঁহাদের সকলেই ছিলেন অল্পবয়স্ক যুবক এবং স্কুল কলেজের ছাত্র। এই সকল অল্পবয়স্ক যুবকদের স্কন্ধে যখন দায়িত্বভার চাপিয়াছে তখন তাহাদের প্রতিভা ও কর্মশক্তি অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সব কর্মীদের মধ্যে যাঁহারা প্রতিভা ও দক্ষতার

পরিচয় দিয়াছেন তাঁহারাই সকলের নিকট নেতৃস্থানীয় বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। পুলিনবাবুর পর সমিতির একক নেতৃত্ব ছিলনা, কোন 'কমিটি' ছিলনা, কোন নির্বাচনও হইত না। যাঁহারা নেতৃস্থানীয় ছিলেন তাঁহারাই নিকটে যাঁহারা থাকিতেন তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ চালাইতেন। তখন কাহাকে পরামর্শ-সভায় ডাকা হইল কি কাহাকে পরামর্শ-সভায় ডাকা হইল না ইহা লইয়া কেহ অভিমান করিতেন না। রাসবিহারীবাবু পাঞ্জাবে থাকিয়া মনে করিতেন, তিনি যাহা কিছু করিতেছেন, আমরা তাহা অনুমোদন করিব এবং আমরাও ভাবিতাম আমরা যাহা কিছু করিতেছি তিনি তাহা অনুমোদন করিবেন। আমাদের পরস্পরের মধ্যে একাত্মভাব ছিল, তাই বড় ছোটর কোন দিন কোন প্রশ্ন আসে নাই—যখন যাহার সহিত দেখা হইয়াছে পরামর্শ করিয়াছি। সেদিন আমরা বলিতে পারিতাম আমরা সকলেই নেতা অথবা আমাদের মধ্যে কোন নেতাই নাই—আমরা সকলেই কর্মী। ইহাও বলিতে পারিতাম আমাদের মধ্যে একজন নেতা—প্রয়োজন হইলে আমাদের মধ্য হইতে যে-কোন একজনকে নেতা বলিয়া সম্মুখে ধরিয়া দিতে পারিতাম। মনের কোণে আমাদের সকলেরই সুর ছিল এক—বেসুরা আওয়াজ কোন দিন আমাদের মধ্যে প্রকাশ পায় নাই—যেন আমরা ছিলাম সকলেই একটি সূত্রে গাঁথা। রাসবিহারীবাবু যখন চন্দননগরে থাকিতেন তখন প্রায়ই তিনি আমাদের কলিকাতার আড্ডায় আসিতেন, আমরাও মাঝে মাঝে চন্দননগরে যাইতাম। সমিতির নেতারা প্রত্যেকেই ছোট হইতে দক্ষতা দেখাইয়া বড় হইয়াছেন। প্রথমতঃ প্রত্যেককেই বাড়ীঘর ছাড়িয়া গ্রামে বা মফঃস্বলের কোন ক্ষুদ্র সহরে বসিতে হইয়াছে। সেই সব স্থানে থাকিয়া যাঁহারা কর্মের দ্বারা প্রতিভা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন তাঁহারাই আস্তে আস্তে প্রধান কেন্দ্রে স্থান পাইয়াছেন—তাঁহারাই সকলের নিকট নেতৃস্থানীয়

বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। একদল লোক যখন ধরা পড়িয়াছেন, অপর দল লোক তখন এই ভাবেই তাহাদের স্থান পূরণ করিয়াছেন —কোন ব্যক্তিবিশেষের অভাবের জন্য কোন কাজের ক্ষতি হয় নাই।

আমরা খুব সাধারণভাবে জীবন যাপন করিতাম। কলিকাতা সহরে আমাদের বাসাভাড়ার জন্য ৩।৪ টাকার বেশী খরচ হইত না। খাবারও ছিল অতি সাধারণ—সকালে মুড়ি, দ্বিপ্রহরে ও রাত্রে ডাল-ভাত অথবা মাছের ঝোল ভাত। কোন কোন দিন আমাদের তুইটি তরকারিও হইত, আবার কোন কোন দিন সম্পূর্ণ উপবাসেও থাকিতে হইত। আমাদের বাসায় কোন আস্‌বাব থাকিত না— আস্‌বাবের মধ্যে থাকিত বিছানা, তাহাও অতি সাধারণ। বাসার সমস্ত কাজ আমরা নিজেরাই করিতাম। আমি একবার হবিগঞ্জে গিয়াছিলাম। সেখানকার ভার অনুকূল চক্রবর্তীর উপরে ছিল। সেখানে শুনিলাম, সে রাত্রে মাত্র এক পয়সার ছাতু খাইয়া এক ঘট জল খায়। আমরা কখনও থিয়েটার-বায়স্কোপ দেখিতে যাইতাম না। একবার আমার কয়েকজন সহকর্মী এবং বন্ধু থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিলেন, আমি সেজন্য তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়াছিলাম। তাঁহারা নিজেরা পয়সা খরচ করিয়া থিয়েটারে যান নাই—এক ভদ্রলোক কয়েকখানা পাশ সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তিনি খুব আগ্রহ করিয়া তাঁহাদের থিয়েটারে লইয়া গিয়াছিলেন। একদিন থিয়েটার দেখিলে চরিত্র নষ্ট হইবে ইহা আমি মনে করি না। কিন্তু আমরা যদি বিনা পয়সায় থিয়েটার দেখি, তবে দলের লোকেরা থিয়েটার পয়সা খরচ করিয়া দেখিবে—তখন তাহাদের কিছু বলিতে পারিব না। সকলে মনে করিবে ইহারা সমিতির টাকা থিয়েটার বায়স্কোপ দেখিয়া উড়ায়। আমাদের পান, তামাক, সিগারেট খরচও ছিল না। রাস্তায় আমাদের কুলির প্রয়োজনও হইত না— সাধারণতঃ পায়ে হাঁটিয়াই চলাফেরা করিতাম। কলিকাতায় তখন 'বাস' ছিল না—বিশেষ জরুরী কাজ না থাকিলে ট্রামেও

উঠিতাম না। শ্যামবাজার হইতে কালীঘাট সাধারণতঃ আমরা হাঁটিয়াই যাইতাম। আমি শৈশবে গ্রাম্য থিয়েটার ও যাত্রা দেখিয়াছি, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া থিয়েটার দেখি নাই। জীবনে একবার বায়স্কোপ ও একবার টকী দেখিয়াছি। আমি যখন ১৯১২ সনে প্রথম কলিকাতা যাই তখন শশাংকবাবু দুই আনা খরচ করিয়া বায়স্কোপ দেখাইয়া ছিলেন, মেছুয়াবাজার স্ট্রীটে তখন বায়স্কোপ ঘর ছিল। ইহার ২৬ বৎসর পর, ১৯৩৮ সনে রাজসাহী হইতে নওগাঁ যাই, সঙ্গে রাজসাহীর কংগ্রেস নেতা ৺সুরেন্দ্রমোহন মৈত্র মহাশয় ছিলেন। আমরা নওগাঁর কংগ্রেস নেতা শ্রীযুত রজনী সান্যাল মহাশয়ের বাড়ীতে উঠি। রজনীবাবুর একটি সবাক-চিত্রগৃহ ছিল। আমি পূর্বে শুনিয়াছি 'ছবি কথা বলে,' এই জন্য আমার সবাক-চিত্র দেখিবার মনে মনে ইচ্ছা ছিল। নওগাঁ আসিয়া এই ইচ্ছা পূরণ হইল—রজনীবাবুর অনুরোধে আমরা সবাক চিত্র দেখিতে গেলাম।

এক সময়ে আমাদের হাত দিয়া হাজার হাজার টাকা খরচ হইয়াছে, নিজেদের ভোগবিলাসিতার জন্য তাহা হইতে একটি টাকাও খরচ করি নাই। আমাদের সাধারণতঃ একটা জামার বেশী দুইটা জামা থাকিত না। জামাকাপড় আমরা ধোপাবাড়ী দিতাম না, নিজেরাই জামা কাপড় পরিষ্কার করিতাম। একবার শীতকালে আমি স্থির করিলাম একটি গরম কোট কিনিব। তখন আমার কাশি হইতেছিল, দোকানে গিয়া সস্তা গরম কোটের অনুসন্ধান করিলাম। দোকানে ইঁদুরে কাটা অনেকগুলি তালি দেওয়া কোট ছিল। আমি তাহারই একটি কম দামে কিনিয়া আনিলাম। অসুখবিসুখ হইলে আমরা সাবু-বার্লির উপর নির্ভর করিয়া থাকিতাম, ডাক্তারের ধার বিশেষ ধারিতাম না। অবস্থা খারাপ হইলে একমাত্র ডাক্তারের নিকট যাইতাম। ৺খগেন চৌধুরীর পশ্চিমবঙ্গে থাকিয়া ম্যালেরিয়া ধরিয়াছে, পেটে প্লীহ

হইয়াছে। অনেক কুইনাইন সেবন করিতেছেন, কিন্তু কোন উপকার হইতেছে না। খগেনবাবুকে একদিন ডাঃ ওয়াই, এম, বোসের নিকটে লইয়া গেলাম। আমি পূর্বে কলিকাতা স্বাস্থ্যনিবাসে তাঁহারই চিকিৎসাধীনে ছিলাম। তিনি খগেনবাবুকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া একপ্রকার 'বড়ির' ব্যবস্থা করিলেন। ঔষধ তাঁহার ডাক্তারখানা হইতেই ক্রয় করিলাম এবং ফিরিবার সময় একটি টাকা তাঁহাকে দর্শনী দিলাম। তিনি টাকাটা ফিরৎ দিলেন। আমি বলিলাম, "আমরা খুব গরীব।" তিনি বলিলেন, "আপনা-দিগকে দর্শনীর টাকা দিতে হইবে না, যখন প্রয়োজন হয় আমাদের নিকট আসিবেন।" আমরা তখন কৃতজ্ঞতার সহিত নমস্কার করিয়া টাকা ফেরৎ লইয়া আসিলাম—তখন আমাদের হাতে টাকা ছিল না। যাহোক্, খগেনবাবু এই 'বড়ি' খাইয়াই আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন।

সমিতির সভ্যদিগকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। যাঁহারা দেশ সেবার জন্য বাড়ীঘর ছাড়িয়াছেন তাঁহারা প্রথম শ্রেণীর মধ্যে গণ্য ছিলেন। এই শ্রেণীর অনেকেই বিভিন্ন মামলার পলাতক আসামী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কাজের সুবিধার জন্য নিজবাড়ীতে থাকিতেন, কিন্তু প্রয়োজন অনুসারে বাড়ীঘর ছাড়িতে সর্বদাই প্রস্তুত থাকিতেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে গণ্য ছিলেন সাধারণ সভ্যেরা। ইঁহাদের সম্বন্ধেও এইরূপ আশা করা যাইত যে প্রয়োজন হইলে তাঁহারাও বাড়ীঘর ছাড়িয়া আসিবেন। ইঁহারা ছাড়া আর এক শ্রেণীর সভ্য ছিলেন যাঁহারা ছিলেন সংসারী এবং বাড়ীঘরে থাকিয়া বিপদের সম্মুখীন না হইয়া যতটা পারিতেন সাহায্য করিতেন। আমাদের বহু বাড়ীঘর ছাড়া সভ্য ছিল। উৎসাহী সভ্যদিগকে প্রথমতঃ বাড়ীঘর ছাড়াইয়া গ্রামে বসাইয়া দেওয়া হইত। ইহা ছিল সভ্যদের প্রথম পরীক্ষা। অনেক উৎসাহী সভ্য দেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত, বাড়ী ছাড়িবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত, কিন্তু দেখা গিয়াছে গ্রামে

থাকিবার কিছুদিন পর তাহাদের উৎসাহ কমিয়া গিয়াছে। তাহারা বাড়ী ছাড়িয়াছে দেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ করিতে—সম্ভবতঃ তাহারা ভাবিয়াছে—স্বাধীনতা সংগ্রামের উদ্যোগপর্ব শেষ হইয়াছে। তাহারা এখন ঘোড়ায় চড়িয়া, রাইফেল কাঁধে করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবে, কিন্তু কার্যতঃ দেখিতেছে সেরূপ কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই, তাহাকে পাঠান হইয়াছে একটি ক্ষুদ্র গ্রামে—এখানে সকলেই অশিক্ষিত, শিক্ষিত লোকের বাস এখানে নাই, সে কাহারও সহিত প্রাণ খুলিয়া কথা বলিতে পারিতেছে না, সে রান্না জানেনা অথচ তাহাকে রান্না করিয়া যাইতে হইতেছে। তাহাকে পাঠশালার পণ্ডিতী করিতে হইতেছে—গ্রামের লোকদিগকে সে যাহা বলিতে চাহে তাহারা তাহা এতটুকুও বোঝে না। এই প্রকার পরীক্ষায় যাহারা টিঁকিয়াছে তাহাদের মধ্যে অনেকে একবার জেলে গিয়া দ্বিতীয়বার জেলে যাইবার স্পৃহা রাখে নাই—জেল হইতে ফিরিয়া খুব পিতৃমাতৃভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহা ছিল সভ্যদের দ্বিতীয় পরীক্ষা।

সমিতির সভ্যেরা সাধারণতঃ চরিত্রবান ও ধর্মভাবাপন্ন ছিল। সেই যুগে কোন ছেলেকে উন্নতচরিত্র দেখিলে অভিভাবকগণ মনে করিতেন, সে নিশ্চয়ই সমিতির সভ্য হইয়াছে। ইহা মনে করিয়া তাহাকে বিবাহ দিবার জন্য তাঁহারা অস্থির হইয়া পড়িতেন। পুলিশও এই সংবাদ পাইয়া তাহারা পিছনে লাগিত। অবশ্যই সময় সময় যে ইহার ব্যতিক্রম না ঘটিয়াছে তাহা নয়। কখন কখন কোন সভ্যের চরিত্রদোষ দেখা দিয়াছে, কিন্তু সে তাহার কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তও ভোগ করিয়াছে। আমরা ১৯১০ সনে মেয়ে-সভ্য করিবারও চেষ্টা করিয়াছিলাম—কতকটা অগ্রসরও হইয়াছিলাম। কিন্তু ইহার কুফল দেখিয়া তাহা বন্ধ করিয়া দিলাম। ইহার পর আমাদের সভ্যেরা তাহাদের মা, বোন এবং নিকট আত্মীয়াকে শুধু দলভুক্ত করিতে পারিত, অপরের সহিত তাহাদের কোন সংশ্রব

থাকিত না। আমাদের মেয়ে-সভ্যের মধ্যে অনেকে অনেক সময় সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। সেই যুগে এরূপ একটা অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছিল যে, কোন সহরে কোন যুবক বাড়ী ভাড়া করিতে পারিত না। বিপ্লবী দলের কর্মী বলিয়া তাহাকে সন্দেহ করা হইত। এই সন্দেহ এড়াইবার জন্য কাহারও বৃদ্ধা মাকে আনিয়া বাসায় রাখা হইত এবং তিনি সকল ছেলেকেই নিজের ছেলের মত যত্ন করিতেন। পুলিস কখনও সন্দেহ করিয়া সেই বাসা ঘেরাও করিলে বৃদ্ধাকেও অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে।

সমিতির সভ্যদের মধ্যে অনেকেই আর্থিক ত্যাগও স্বীকার করিয়াছেন। পুলিনবাবু নিজের সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া সমিতির কাজে সেই টাকা ব্যয় করিয়াছেন। পুলিনবাবুর ডিপোরটেশনের পর আশুবাবু (আশুতোষ দাশগুপ্ত) যখন ভার গ্রহণ করিলেন তখন সমিতির খুব আর্থিক দুরবস্থা—বাড়ীঘর ছাড়া সভ্যেরা কখনও আলুসিদ্ধ ভাত খায়, কখনও উপবাসে থাকে। আশুবাবুর বাড়ীর অবস্থা ভাল ছিল না। আশুবাবুর স্ত্রীর এক হাজার টাকার সোনার গহনা ছিল। আশুবাবুর দৃষ্টি এই গহনার উপর পড়িল। তিনি তাহার স্ত্রীর নিকট এই গহনা চাহিলেন। মেয়েদের নিকট গহনা খুব প্রিয় জিনিস, তাহারা সহজে ইহা হস্তচ্যুত করিতে চাহে না। কিন্তু আশুবাবুর স্ত্রী কোন আপত্তি করেন নাই। সোনার অলংকার-গুলি একখানি কাপড়ে বাঁধিয়া স্বামীর হাতে দিয়াছিলেন। আশুবাবুও ইহা বিক্রয় করিয়া প্রাপ্ত অর্থ সমিতির কাজে ব্যয় করিয়াছিলেন। নরেনবাবুও (সেন) যখনই সুযোগ পাইয়াছেন বাড়ী হইতে টাকা আনিয়া সমিতির কাজে ব্যয় করিয়াছেন। ছেলেদের মধ্যেও অনেকে বাড়ী হইতে টাকা আনিয়া দিয়াছে। ইহা ছাড়া সোনারং বোর্ডিং এ যখন অর্থাভাবে শিক্ষক ও ছাত্রেরা উপবাসে রহিয়াছে তখন বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা নিজ নিজ বাড়ী হইতে কেহ

মার কাছে চাহিয়া, কেহ বা চুরি করিয়া বাড়ীর চাউল, চিঁড়া, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি যে যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে তাহাই আনিয়া দিয়াছে। তথাপি একদিকে যেমন ত্যাগের বহু দৃষ্টান্ত আছে অপর দিকে তেমনি স্বার্থপরতার দৃষ্টান্তও আছে। আমাদের হাতে যখন টাকাকড়ি আসিয়াছে তখন কোন কোন বিশ্বাসী গৃহী সভ্যের নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছি। কিন্তু এরূপ সংবাদও পাওয়া গিয়াছে যে তাহার বাড়ীতে চুরি হইয়া গিয়াছে—আমাদের গচ্ছিত অর্থ, তাহার নিজের টাকাপয়সা—এবং অলংকারও সব চোরে লইয়া গিয়াছে, তিনি এখন সর্বস্বান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এবং আমাদের সহিত তাহার সম্বন্ধ পাছে প্রকাশ হইয়া পড়ে এই ভয়ে তিনি চুরির সংবাদ থানায় জানান নাই। অবশ্যই এরূপ ঘটনা খুব কম ঘটিয়াছে।

১৯১৪ সনের প্রথম ভাগে আমি ভুবনেশ্বর হইতে ফিরিয়া আসিয়া, কলিকাতায় এক সাধুর চিকিৎসাধীনে থাকি। সাধুটি একটি বাঙালী কুলীন ব্রাহ্মণ। ইনি স্বামী বালাজী মহারাজ নামে পরিচিত ছিলেন। সাধুর চিকিৎসায় কিছু ভাল আছি। তাঁহার চিকিৎসার নিয়ম ছিল—প্রাতে—৯--১০ টার সময় একঘণ্টা সরিষার তৈল গায়ে মালিশ করিয়া গঙ্গায় ডুবিয়া স্নান করিতে হইবে, অন্ততঃ ৫০।৬০টা ডুব দেওয়া চাই। বৈকালে গড়ের মাঠে গিয়া রোজ হাওয়া খাইতে হইবে। একদিন বৈকাল ৪টার সময় একা ইডেন-উদ্যানে বসিয়া আছি, এমন সময় একটি গুপ্তচর আসিয়া আমার নিকট বসিল। সে সম্ভবতঃ আমাকে একা নীরবে বসিতে দেখিয়া সন্দেহ করিয়াছিল, তাই নানা প্রশ্ন করিতে লাগিল। যখন জানিতে পারিল যে আমার যক্ষ্মাকাশ হইয়াছে, এখানে চিকিৎসার জন্য আসিয়াছি এবং ২।৪ বার কাশিতেও দেখিল, তখন সে একটু সরিয়া বসিল এবং সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আমি বিবাহ করিয়াছি কিনা। আমি বলিলাম, বিবাহ তো একটা করি নাই, দুইটা করিয়াছি এবং দ্বিতীয় স্ত্রীটি নিতান্ত ছেলেমানুষ।

আমি আরও দুঃখ করিয়া বলিলাম, আমার ত সময় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এখন ভাবি ইহাদের কি উপায় হইবে। সে আমাকে খুব বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে বহুবিবাহ অন্যায়। আমিও উত্তর করিলাম, অদৃষ্টের লেখা কেহ খণ্ডাইতে পারে না। অতঃপর সে চলিয়া গেল। গুপ্তচরটা জানিত না যে সে এতক্ষণ যাহার সহিত আলাপ করিতেছিল তাহার নামে ৫ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা আছে। ইহাকেই বলে অদৃষ্টের খেলা।

১৯১৪ সনের প্রায় মাঝামাঝি জার্মান যুদ্ধ সুরু হুইয়াছে, ইংলণ্ড এখন বিপন্ন। মহাত্মা গান্ধী হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক নেতা এই বিপদে ইংলণ্ডকে সাহায্য করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, বিপ্লবীরা ভাবিল ইহাই সুযোগ। এই সুযোগে কিছু না করিতে পারিলে ভারতের স্বাধীনতা লাভ কঠিন হইবে—স্বাধীনতার বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা হয়তো কিছু দিনের জন্য আবার স্তিমিত হইয়া পড়িবে। তাই সকলেই খুব কর্মঠ হইয়া উঠিলেন। রাসবিহারী, কর্তার সিং, ৺জোয়ালা সিং এবং অনুশীলন সমিতির আরও অনেকে উত্তর ভারতের সৈন্য বিগ্‌ড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্বে দিল্লী ষড়যন্ত্রের মামলায় আবধ-বিহারী ও আমীর চাঁদের ফাঁসী হইয়াছে এবং এই সূত্রে রাসবিহারীর নাম প্রকাশ পাইয়াছে। বড়লাটের উপর বোমা পড়ায় রাসবিহারীর নামে সরকার ২৫ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে বহু 'নেটিভ-ষ্টেটের' রাজারাও পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। রাসবিহারীর নামে মোট ১ লক্ষ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছে। রাসবিহারী এখন পলাতক অবস্থায় কাজ চালাইতে থাকিলেন। বাংলা দেশে যাহারা বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার পলাতক আসামী ছিলেন, ইতিমধ্যে তাঁহারা সকলেই ধরা পড়িয়াছেন।

এখন আমার পালা। আমি এখনও সাধুর ঔষধ খাই এবং গঙ্গায় স্নান করি। কিন্তু সাধুর নিকট প্রত্যহ হাজিরা দিবার বিশেষ

অবসর হয় না, অন্য কাজে ব্যস্ত থাকি। সাধুর ঔষধে বিশেষ যে ভাল হইয়াছি তাহা নয়, অসুখ মাঝে মাঝে খুব বৃদ্ধি পায়। মনে হয়, রাত্রি পার হইবে না। কিন্তু আবার কমিয়া যায়। আমি গঙ্গার ঘাটে একটি লোক ঠিক করিয়াছিলাম, তাহাকে প্রত্যহ তিনটি করিয়া পয়সা দিতাম, সে আমাকে তেল মালিস করিয়া দিত। আমি হাঁটিয়াই স্নান করিতে যাইতাম, কিন্তু রাস্তায় তিন-চার বার বিশ্রাম করিতে হইত।

একাদশ পরিচ্ছেদ

অনুশীলন সমিতি ও প্রথম মহাযুদ্ধ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আভাস পাইয়া শ্রীরাসবিহারী বসু অনুশীলন সমিতির গোপন মুখপত্র লিবার্টি (Liberty) কাগজে দেশবাসীকে ভাবী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে প্রথম একটি প্রবন্ধ লিখেন। ইহার পূর্ব্বেই বিদেশের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের জন্য অনুশীলন সমিতির নেতারা শ্রীকেদারেশ্বর গুহকে জার্ম্মেনীতে পাঠান। এদিকে দেশে অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ, বোমা তৈয়ার ও ভারতীয় সৈন্যদিগকে হাত করার চেষ্টা চলিতে থাকে। এই সময় বাংলার অন্যান্য দলও সক্রিয় হইয়া উঠে। সকল দলের কর্মীদিগের মধ্যেই যুদ্ধের এই উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা দিল। আন্তরিকতার সহিত সকলেই বিপ্লবের আয়োজন করিতে লাগিল। গভর্ণমেণ্টও নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকে নাই। বিপ্লবীদিগকে ধৃত করিয়া বিপ্লবী দল পঙ্গু করার চেষ্টা করিল। ঐ সময় বহু বিপ্লবী পলাতক ছিল, পলাতক বিপ্লবীদিগকে ধরাইয়া দেওয়ার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিল। দেশে দেশদ্রোহীর

অভাব ছিল না। বিশ্বাসঘাতক গুপ্তচরের দল অর্থলোভে ক্রমে ক্রমে বহু দেশপ্রেমিক বিপ্লবীকে ধরাইয়া দিল। এই সময় শুধু বাংলা দেশেই ১২শত বিপ্লবী ধৃত হইয়া জেলে আবদ্ধ হইল। বিপ্লব-চেষ্টা তবুও চলিতে লাগিল। শ্রীরাসবিহারী বসু, শচীন্দ্র নাথ সান্ন্যাল, গিরিজা দত্ত, অনুকূল চক্রবর্তী, অমৃত সরকার, পণ্ডিত পরমানন্দ, পৃথ্বি সিং, জোয়াল সিং, সোহন সিং, পণ্ডিত জগৎরাম, বিষ্ণু গণেশ পিংলে, বিনায়ক রাও কাপলে প্রভৃতি অনুশীলন সমিতির নেতারা ও কর্মীগণ লাহোর হইতে ঢাকা পর্যন্ত এবং মধ্যপ্রদেশে সৈন্যদল হাত করারও চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সৈন্য সংগ্রহের জন্য শ্রীরাসবিহারী বসু ও শচীন্দ্রনাথ সান্ন্যাল শ্রীদামোদর স্বরূপকে এলাহাবাদ, দিলা সিংকে কাশী, বিশ্বনাথ পাঁড়ে ও মঙ্গল পাঁড়েকে রামগড়, জব্বলপুর, কর্তার সিং ও পৃথ্বি সিংকে লাহোর, আম্বালা ফিরোজপুর, রাওলপিণ্ডি, বিষ্ণু গণেশ পিংলেকে মীরাট, পণ্ডিত জগৎরামকে পেশোয়ার, পণ্ডিত পরমানন্দকে ঝাঁসী, কানপুর প্রভৃতি স্থানে পাঠাইলেন, সর্দ্দার মদন সিং ও সর্দ্দার হাজারা সিং ২৬নং শিখ রেজিমেণ্টের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিলেন। সর্দ্দার হরনাম সিং মিঞানওয়ালী ছাউনীর সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিলেন।

প্রথম জার্মান যুদ্ধে ইংরাজের উপর্যুপরি ভাগ্য-বিপর্যয়ের ফলে বৃটিশ সৈন্যদিগের মনোবল ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ঐ সময় ভারতীয় সৈনিকদিগের মধ্যে স্বদেশের স্বাধীনতার বাণী প্রচার ফলে সৈনিক দিগের মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল, তাহারা বিদেশী সরকারের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেওয়া অপেক্ষা স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জন করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিল। রাসবিহারীর সংস্পর্শে ভারতীয় সৈনিক দিগের আত্মসম্বিত ফিরিয়া আসিল, তাহারা দেখিল ভারতের স্বাধীনতা তাহাদের হাতের মুঠের মধ্যে। ঐ সময় ভারতে মাত্র ১২ হাজার আনফিট বৃটিশসৈন্য ছিল। ভারতীয়

সৈন্যগণ স্থির করিলেন, তাহারা হঠাৎ বৃটিশ সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়া, পরাজিত ও বন্দী করিয়া, প্রকাশ্য ঘোষণা দ্বারা, জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিবেন। ঐ সময় সৈন্যগণ তাহাদে বন্দুক নিজেদের নিকট রাখিতে পারিত এবং ফোর্টের ভিতর তাহাদের আত্মীয় যাইতে পারিত। রাসবিহারী বোসের নামে যখন বহু সহস্র টাকা পুরস্কার ঘোষণা ছিল, তখন তিনি সৈনিকদের আত্মীয় সাজিয়া ফোর্টের ভিতর গিয়া সৈন্যদের সহিত ভাবী বিপ্লব সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করিতেন, ফোর্টের গেটে রাসবিহারী বিশ্বস্ত ভক্ত পাহারা দিত। এই সব ঘটনা যখন পরে প্রকাশ হইয়া পড়ে, তখন হইতে আর সিপাহিদিগের নিকট বন্দুক রাখিতে দেওয়া হয় না, প্রত্যহ কুচ-কাওয়াজের পর বন্দুক মেগাজিনে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয় এবং ফোর্টের ভিতরে বাহিরের কোন লোক যাইতে পারে না।

ভারতবর্ষে যেমন অনুশীলন সমিতি সশস্ত্র বিপ্লবদ্বারা ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার চেষ্টা করিতেছিল, আবার আমেরিকার গদর পার্টিও ভারতের বাহিরে থাকিয়া ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার চেষ্টা করিতেছিল। গদর পার্টির অর্থ বিপ্লব দল। এই দলের গদর নামে একটী মুখপত্র ছিল। এই পার্টির ,প্রেসিডেণ্ট ছিলেন বাবা সোহন সিং। ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ছিলেন সর্দ্দার কেশর সিং। লালা হরদয়াল ছিলেন সেক্রেটারী। পার্টির প্রধান কেন্দ্র ছিল সানফ্রান্সিসকো। ১৯১৪ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে সর্দ্দার জোয়ালা সিং এর সভাপতিত্বে ষ্টকহলমে এক কনফারেন্স হয়। ঐ কনফারেন্সে এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে ভারতীয় প্রতিনিধি যোগদান করিয়াছিলেন। এই গদর পার্টির কনফারেন্সে স্থির হয় ভারতে বিপ্লবদলের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে হইবে এবং ভারতের বাহিরে ভারতীয় সৈনিকদিগের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে হইবে। এই গদর পার্টির লোকেরা কামাগাটা মেরু ও টসামেরু

জাহাজে ভারদে আসিয়া অনুশীলন নেতা রাসবিহারী বোস ও তাহার দলের সহিত মিলিত হন। এই দলের লোকেরাই সিঙ্গাপুর, হংকং এবং ব্রহ্মদেশে ভারতীয় সৈনিকদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করেন।

বাংলা দেশে মনুশীলন সমিতি ব্যতীত অন্যান্য দলগুলিও ঐ সময় শ্রীযতীন্দ্র নাথ মুখার্জির নেতৃত্বে একত্র হন এবং সশস্ত্র বিপ্লবের চেষ্টা করিতে থাকেন। ঐ সময় তাঁহারা বিদেশ হইতে অস্ত্র-শস্ত্র আমদানীর জন্য শ্রীভূপতি মজুমদার, নরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য (মানবেন্দ্র রায়) প্রভৃতিকে বিদেশে পাঠান। ভূপতি বাবুকে বিদেশগামী জাহাজে গ্রেপ্তার করিয়া সিঙ্গাপুর ফোর্টে আবদ্ধ রাখেন। ঐ সময় অমর সিংও (ইঞ্জিনীয়ার) আবদ্ধ ছিলেন। সিঙ্গাপুর ফোর্টে তাহাদের উপর অকথ্য অত্যাচার হইয়াছিল। জার্ম্মানী হইতে তিন জাহাজ-বোঝাই অস্ত্রশস্ত্র ভারতে আসার কথা ছিল। শ্রীযতীন্দ্র নাথের নেতৃত্বে মিলিত দলগুলি ঐসব জাহাজ হইতে মাল খালাস ও নিরাপদ স্থানে কিভাবে রাখা যায় তার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় চন্দননগরে শ্রীমতিলাল রায়ের বাড়ীতে রাসবিহারী বসু, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অনুশীলন সমিতির অন্যান্য নেতৃস্থানীয়দের সহিত শ্রীযতীন্দ্রনাথের আলাপ-আলোচনা হয়। আলোচনায় স্থির হয় প্রত্যেক দলই পৃথক ভাবে বিপ্লবের চেষ্টা করিবে, অবশ্যই পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা থাকিবে।

১৯১৫ সনে বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা (Supplementary conspiracy case) চলিতে ছিল। ঐ মামলায় শ্রীত্রৈলোক্য নাথ চক্রবর্ত্তী, প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, রমেশচন্দ্র চৌধুরী, মদনমোহম ভৌমিক ও খগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী অভিযুক্ত ছিলেন। ব্যারিষ্টার বি, সি, চ্যাটার্জি, ও উকিল শ্রীশচন্দ্র চ্যাটার্জি ও শ্রীমনোরঞ্জন ব্যানার্জি প্রভৃতি আমাদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। মামলা যখন চলিতেছিল তখন শ্রীশবাবু একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন,

"তোমাদের আর বেশীদিন জেলে থাকিতে হইবে না।" আমরা অবশ্যই তখন কিছু বুঝি নাই, পরে জানিতে পারিয়াছিলাম ১০নং রাজপুত রেজিমেণ্ট আমাদিগকে জেল হইতে মুক্ত করিবে। ঐ সময় শ্রীঅমৃত সরকার, অনুকূল চক্রবর্তী, সতীশচন্দ্র পাকড়াশী প্রভৃতি অনুশীলন সমিতির নেতারা পূর্ববঙ্গে বিপ্লবের আয়োজন করিতেছিলেন। ১০নং রাজপুত রেজিমেণ্ট অনুশীলন সমিতির সংস্পর্শে আসিয়াছিল।

১৯১৫ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারী স্বাধীনতা ঘোষণার দিন ধার্য হইল, কিন্তু নানা কারণে তারিখ পরিবর্তন করিতে হয়। অবশেষে অভ্যুত্থানের সংবাদ প্রকাশ হইয়া পড়ে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যখন ভারতে বিপ্লব আয়োজনের সংবাদ পাইল, তখন চারিদিকে সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিল। সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র তল্লাসী, ধরপাকড়, অত্যাচার, নির্যাতন চলিতে লাগিল। ঐ সময় পণ্ডিত জগৎরাম পেশোয়ারে ধৃত হইলেন। পিংলে বোমা ও পিস্তল সহ মীরাট ক্যাণ্টনমেণ্টে দ্বাদশ অশ্বারোহী বাহিনীর লাইনে ধৃত হইলেন। ৯ম ভুপাল পদাতিক বাহিনীর শিখ হাবিলদার সর্দ্দার হরনাম সিং ফৈজাবাদে ধৃত হন। সর্দ্দার নারায়ণ সিং ও সর্দ্দার মোহনলাল পিস্তল সহ ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত মেইমো ধৃত হন। আরও বহু স্থানে বহু লোক ধৃত হইলেন। গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় সৈন্যদিগকে বিভিন্ন স্থানে পাঠাইয়া ছত্রভঙ্গ করিয়া দিল, এখন চলিতে লাগিল হত্যাকাণ্ড। আম্বালা, ফিরোজপুর, মীরাট প্রভৃতি স্থানে যে সব ভারতীয় সিপাহী বিপ্লবীদিগের সংস্পর্শে আসিয়াছিল, কোর্ট মার্শেল বিচারের প্রহসন করিয়া তাহাদিগকে গুলি করিয়া হত্যা করিতে লাগিল। ইহার পর শুরু হইল বিভিন্ন ষড়যন্ত্র মামলা।

স্বাধীনতা ঘোষণা

সিঙ্গাপুর ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯১৫ সন। অনুশীলন সমিতি ও গদর পার্টির সহযোগিতায় ভারতের সর্বত্র স্বাধীনতা ঘোষণার যে দিন ধার্য্য হইয়াছিল সেই পরিকল্পনা অনুসারে সিঙ্গাপুরের বীর সিপাহীগণ ২১শে ফেব্রুয়ারী স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ভারতীয় সৈন্যগণ ইংরেজ সৈন্যদিগকে পরাজিত করিয়া দুই সপ্তাহ পর্য্যন্ত সিঙ্গাপুর সহর দখল করিয়া রাখেন। কিন্তু পূব পরিকল্পনা অনুসারে অন্য কোথায়ও সামরিক অভ্যুত্থান না হওয়ায় এবং বাহিরের সহিত যোগাযোগ না থাকায় সিঙ্গাপুরের সৈনিকগণ অধিক দিন তাহাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারেন নাই। ইতিমধ্যে বৃটিশ রণতরী ও বৃটিশের মিত্র জাপানের রণতরী আসিয়া পুনরায় অধিকার করে। এই সংগ্রামে বিপ্লবী সৈনিকদিগের অধিকাংশ নিহত হন, কিছু লোক ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করিয়া প্রাণ বিসর্জন দেন, অবশিষ্ট পলায়ন করিয়া ব্রহ্মদেশে ও শ্যামরাজ্যে চলিয়া যাইতে সক্ষম হন।

বর্ম্মা ষড়যন্ত্র—১৯১৫ সন

পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে ব্রহ্মদেশে সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজন হইয়াছিল। আলী মহম্মদ ও কাসেমালী সেখানে বিপ্লবদল গঠন করিয়াছিলেন। ঐ সময় ১৩০নং বেলুচ রেজিমেণ্ট (130th Beluch Regiment) রেঙ্গুনে ছিল। এই রেজিমেণ্টের সহিত বিপ্লবীদের যোগাযোগ স্থাপন হয়। তাহারা স্থির করেন আগামী অক্টোবর মাসে বকরী ঈদের সময় গরু ও বকরীর পরিবর্তে সাহেব কোরবাণী করিয়া ঈদ পালন করিবেন। সোহন লাল পাঠক, মুস্তাফা হোসেন সৈন্যদিগের মধ্যে কাজ করিতে ছিলেন। সোহন লাল মেইমোতে গোলন্দাজবাহিনী সিপাহীদিগের মধ্যে প্রচার করার সময় ধৃত হন। গভর্ণমেণ্ট এই ষড়যন্ত্রের সন্ধান পাইয়া

বহু লোককে ধৃত করেন এবং বর্মা ষড়যন্ত্র মামলা সুরু হয়। এই ষড়যন্ত্রের মামলা মান্দালয় স্পেশাল ট্রাইবুন্যালে হয়। এই মামলায় লালা হরদয়াল, রাসবিহারী বসু, বরকতুল্লা প্রভৃতি নাম প্রকাশ পায়। রাজসাক্ষী বলিয়াছিল, রাসবিহারী বসু তাহাকে একটি ত্রিবর্ণ রঙ্গের পতাকা দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, লাল রং হিন্দুর, নীল রং মুসলমানের, সবুজ রং শিখদিগের। এই মামলায় সোহনলাল, কৃপারাম, হরনাম সিং, কালা সিং, বাসুদেব সিংএর ফাঁসি হয়। চৈৎরাম, কাপুর সিং, হরদিৎ সিং, বদন সিং, গুজর সিং, রামরক্ষা প্রভৃতির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। সোহনলাল বীরের ন্যায় মৃত্যু বরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে লাট সাহেব জেলে গিয়া সোহনলালকে বলিয়াছিলেন, ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তাহার প্রাণদণ্ড রহিত হইবে। উত্তরে সোহনলাল বলিয়াছিলেন, "যদি ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয় তবে ইংরাজ-জাতিই ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, এদেশে তাহাদের কোন অধিকার নাই।" বিদ্রোহী বেলুচ রেজিমেণ্টের প্রায় দুই শ' সৈনিক বিভিন্ন দণ্ডে দণ্ডিত হন।

ব্যাঙ্কক

শ্যামরাজ্যের ব্যাঙ্কক সহরে একটি বিপ্লব-কেন্দ্র ছিল। সর্দার অমর সিং ইঞ্জিনীয়ার প্রধান কর্মী ছিলেন। সর্দার বুড্ডা সিং নামে একজন লক্ষপতি শিখ ব্যবসায়ী এই বিপ্লবদলকে বহু অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। বর্মা ষড়যন্ত্র (দ্বিতীয় দফে) মামলায় তাহাদের এবং আরও কিছু লোকের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। সকলেই পরে আন্দামানে প্রেরিত হন।

লাহোর ষড়যন্ত্র—১৯১৫ সন

এতকাল পাঞ্জাব ছিল সৈন্য সংগ্রহের স্থান (Recruiting ground)। পাঞ্জাবীরা বীরের জাতি। বীর পাঞ্জাবীদিগের

বাহুবলে ইংরেজ জাতি বহু দেশ জয় করিয়াছে, বহু জাতিকে পদানত করিয়াছে। রাজভক্ত পাঞ্জাবীরা বৃটিশের জন্য বহু রক্তপাত করিয়াছে, বহু কষ্ট সহ্য করিয়াছে, প্রতিদানে তাহারা কিছুই পায় নাই। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তাহাদের দ্বারা বহু কাজ হাসিল করাইয়া লইলেও তাহাদের কখনো বৃটিশ সৈন্যদের মর্য্যাদা দেয় নাই, সাদায় কালায় আকাশ-পাতাল প্রভেদ রাখিয়াছে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যখন সংবাদ পাইলেন প্রভুভক্ত পাঞ্জাবীরা বিপ্লব দলে যোগ দিয়াছে, তখন ক্রোধের সীমা রহিল না, ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, বৃটিশের নগ্ন বীভৎসরূপ প্রকাশ পাইল, চারিদিকে চলিতে লাগিল নৃশংস হত্যাকাণ্ড। তখন যুদ্ধ চলিতেছিল, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ, কে কার খবর রাখে। বিভিন্ন কেণ্টনমেণ্টের বিপ্লবী সৈন্যদিগকে হত্যা করিয়া অবশিষ্ট যাহারা ছিলেন তাহাদের বিরুদ্ধে "রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র" এই অভিযোগে মামলা চালান হইল। এই মামলাই লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা নামে খ্যাত। এই লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় তিন দফায় ৯০ জনের ফাঁসির হুকুম হয় এবং ৮০০ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডাদেশ হয়। অবশ্য পরে অনেকের দণ্ড হ্রাস হইয়াছিল। লাহোর ষড়যন্ত্রের মামলায় প্রথম দফায় ২৪ জনের ফাঁসি এবং ২৭ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডাদেশ হইয়াছিল। এই মামলায় কয়েকজন রাজসাক্ষী ছিল, তাহাদের জবানবন্দী হইতে জানা যায় বিপ্লবীরা মীরাট, আগ্রা, কানপুর, এলাহাবাদ, বেনারস, ফিরোজপুর, আম্বালা প্রভৃতি সেনানিবাসে গিয়া সৈনিকদিগকে হাত করিয়া ছিলেন। যাহাদের ফাঁসির হুকুম হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে শ্রীগণেশবিষ্ণু পিংলে, সর্দার জগৎ সিং, সর্দার সুরণ সিং, সর্দার সুবন সিং (২), সর্দার হরনাম সিং প্রভৃতি ছিলেন। যাহাদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে (১) বলবন্ত সিং (২) হরনাম সিং তুন্দ্রা (৩) কেদার সিং (৪) খুসল সিং

(৫) নন্দ সিং (৬) পৃথ্বি সিং (৭) রুলা সিং (৮) সেওয়ান সিং (৯) মোহন সিং (১০) ওয়াসন সিং (১১) ভাই পরমানন্দ (১২) পণ্ডিত পরমানন্দ (১৩) হির্দে রাম (১৪) রামসরণ দাস (১৫) জত্রিৎ রাও (১৬) গুরুমুখ সিং (১৭) জোয়ালা সিং (১৮) শের সিং (১৯) পণ্ডিত জগৎ রাম (২০) নিধান সিং (২১) কেশর সিং (২২) বিশাখা সিং (২৩) রুর সিং (২৪) ভাগ সিং (২৫) কেহের সিং (২৬) উদম সিং (২৭) প্যারা সিং (২৮) কৃপাল সিং (২৯) ইন্দ্র সিং (৩০) লাল সিং (৩১) কালা সিং (৩২) নাথা সিং (৩৩) শিব সিং (৩৪) সজ্জন সিং প্রভৃতি ছিলেন। রাসবিহারী বোস এই মামলার পলাতক আসামী ছিলেন। দণ্ডিত ব্যক্তিদিগের নেতৃস্থানীয় সকলেই আন্দামানে আবার একত্রিত হইয়াছিলেন। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামীর অন্যতম ছিলেন ফেরারী রাসবিহারী বসু।

বেনারস ষড়যন্ত্র—১৯১৫ সন

বেনারস ষড়যন্ত্রের মামলায় বিচারকগণ রায়ে এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়া ছিলেন যে, "কাশীর ষড়যন্ত্র পৃথক কিছু নয়, ভারতব্যাপী সামরিক অভ্যুত্থানের যে প্রয়াস দিল্লী, লাহোর, বেনারস ষড়যন্ত্র তাহারই অঙ্গস্বরূপ। এই ষড়যন্ত্রের প্রধান নেতা রাসবিহারী বোস; শচীন্দ্র নাথ সান্নাল ছিল তাহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ। শচীন সান্ন্যাল ঢাকা অনুশীলন সমিতির সভ্য।" আসামীদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, (১) তাহারা নানা স্থানে সৈন্যব্যারাকে অসন্তোষ উৎপাদন করিয়াছিল। (২) সৈন্যদিগকে বিদ্রোহী করার জন্য উত্তেজিত করিয়াছিল। (৩) বোমা প্রস্তুত করিয়াছিল। (৪) রাজদ্রোহমূলক পুস্তকাদি প্রচার করিয়াছিল। রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র এই মামলার শ্রীশচীন্দ্রনাথ সান্ন্যালের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হইয়াছিল। শ্রীদামোদর স্বরূপ, গণেশলাল, নলিনী মুখার্জ্জি, প্রতাপ সিং, লছমি নারায়ণ, আনন্দ ভট্টাচার্য্য, বঙ্কিম মিত্র, নরেন্দ্র ব্যানার্জি, কালীপদ,

জিতেন্দ্রনাথ সান্ন্যাল বিভিন্ন দণ্ডে দণ্ডিত হন। রবীন্দ্র সান্ন্যাল ও সুরেন্দ্র মুখার্জ্জী মুক্তি পান। জিতেন্দ্র সান্ন্যাল ও রবীন্দ্র সান্ন্যাল শচীন্দ্র নাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। শচীন্দ্রনাথ আন্দামানে প্রেরিত হইয়াছিলেন। আন্দামানে জেল কর্ত্তৃপক্ষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া যাহারা অধিকতর দণ্ডভোগ করিয়াছিলেন, শচীন্দ্রনাথ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। আন্দামানে তাহার বেত্রদণ্ড হইয়াছিল।

দিল্লী ষড়যন্ত্র—১৯১৪ সন

"রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র" এই অভিযোগে আবদ বিহারী, আমির চাঁদ, বালমুকুন্দ ও বসন্ত বিশ্বাসের ফাঁসি হয় এবং বালরাজের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। বালরাজ লাহোর কলেজে পড়িতেন, আমির চাঁদ দিল্লীর সেণ্ট্ যোসেফ স্কুলের শিক্ষক ছিলেন, বালমুকুন্দ যোধপুর রাজকুমারের গৃহশিক্ষক ছিলেন। কলিকাতার বিখ্যাত রাজাবাজার বোমার মামলায় দণ্ডিত শ্রীঅমৃত (শশাঙ্ক) হাজরার বাড়ী খানাতল্লাস করার সময় পুলিশ একটি সাঙ্কেতিক চিঠি পায়। ঐ চিঠিতে দিল্লীর আমির চাঁদ ও প্রফেসার আবদ বিহারীর ঠিকানা ছিল। ঐ সূত্র ধরিয়া পুলিশ বহু স্থানে তল্লাসী করিয়া ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করে। এই মামলায় দুই জন রাজসাক্ষী ছিল। রাসবিহারী ছিল এই ষড়যন্ত্রের নেতা। চারিদিকে যখন খানাতল্লাসী, ধরপাকড় চলিতেছিল, রাসবিহারী বোস তখন বিভিন্ন বেশে দিল্লী, লাহোর, অমৃতসর, কলিকাতা,কাশী প্রভৃতি স্থানে ঘুরাফিরি করিয়া দল গঠন করিতেছিলেন, পুলিশ তাঁহাকে ধরিতে পারে নাই।

বরিশাল ষড়যন্ত্র—১৯১৩-১৪ সন (১২১ ক, ধারা)

"রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র" এই অভিযোগে ৪৭ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বাহির হয়, ৩৭ জন ধৃত হন, অবশিষ্ট পলাতক ছিলেন। সরকার পক্ষের অভিযোগ ছিল, তাহারা সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করিতে ছিল এবং ডাকাতি করিয়া

অর্থ সংগ্রহ করিতেছিল। ইহারা সকলেই ঢাকা অনুশীলন সমিতির সভ্য। এই মামলায় (১) শ্রীনরেন্দ্র মোহন সেন (সোনার গাঁ, আমিনপুর, ঢাকা) প্রভাত সেন—জমিদারের পুত্র। (২) রমেশ চন্দ্র আচার্য্য (বানরীপাড়া, বিক্রমপুর, ঢাকা) (৩) দেবেন্দ্র নাথ ঘোষ (কাউনীয়া, নাজির বাড়ী, বরিশাল) (৪) যতীন্দ্র নাথ রায় (কুশঙ্গল—বরিশাল, ওরফে ফেগু) (৫) যতীন ঘোষ (৬) মুণীন্দ্র ভূষণ রায়। (৭) বীরেন্দ্র বসু (৮) হেমেন্দ্র মুখুটি (৯) রোহিণী গুহ (১০) নিবারণ কর (১১) কুমুদ নাগ (১২) দেবেন্দ্র বণিক (১৩) গোপাল মিত্র (১৪) নিশা কান্ত ঘোষ (১৫) চণ্ডী বসু (১৬) গোপাল মুখার্জ্জি (১৭) চণ্ডী কর (১৮) শশাঙ্ক ঘোষ (১৯) নিশিকান্ত গুপ্ত (২০) নলিনী দাশগুপ্ত (২১) রজনী দাস (২২) নরেন সেন কবিরাজ (২৩) জ্ঞান দাশগুপ্ত প্রভৃতি অভিযুক্ত হন এবং বিচারে ১২ জন বিভিন্ন দণ্ডে দণ্ডিত হন।

বরিশাল ষড়যন্ত্র—২য় দফা—১৯১৪ সন (১২১-ক, ধারা)

এই মামলায় শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী ওরফে কালীচরণ, ওরফে বিরজা, ওরফে হরেন্দ্র, ওরফে মহারাজ, প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, মদন মোহন ভৌমিক, ওরফে কুলদা প্রসাদ রায়, রমেশচন্দ্র চৌধুরী, ওরফে পরিতোষ ও খগেন্দ্র চৌধুরী ওরফে সুরেশ চক্রবর্ত্তী অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিচারে ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী ১৫ বৎসর, মদন ভৌমিক ও অন্যান্য সকলে দশ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ড প্রাপ্ত হন। আপিলে ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী ১০ বৎসর, মদন ভৌমিক ১০ বৎসর, খগেন চৌধুরী ৭ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন এবং প্রতুল গাঙ্গুলী ও রমেশ চৌধুরী মুক্তি লাভ করিয়া জেলে আটক হন।

ঢাকা ষড়যন্ত্র—১৯১০ সন (১২১-ক, ধারা)

ঢাকা অনুশীলন সমিতির নেতা পুলিনবাবুর অধীনে পূর্ব্ববঙ্গে ছয় শত শাখা সমিতি ছিল। সরকার পক্ষের অভিযোগ, পুলিনবাবু

তাহার দলের লোক লইয়া রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র করিতেছেন। এই মামলায় ৪৫ জন ধৃত হন, দশ জন পলাতক ছিল। এই মামলা নিম্ন আদালতে এক বৎসর চলে। মামলা পরিচালনার জন্য উভয় পক্ষে প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার নিযুক্ত হইয়াছিল। সরকার পক্ষে ব্যারিষ্টার মিঃ গার্থ, আপ্টন ও নলিনী গুপ্ত ছিলেন। অনুশীলন সমিতির পক্ষে ছিলেন, ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাস, উকিল শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, প্যারীমোহন ঘোষ, শশাঙ্ক বসু, বিভূ গুহ ঠাকুরতা, নিবারণচন্দ্র মুস্তাফী, বীরেন্দ্রনাথ মজুমদার। এই মামলায় ধৃত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ছিলেন—(১) শ্রীপুলিন বিহারী দাস, (লোন সিং-ফরিদপুর) (২) শ্রীললিত মোহন রায় (জমিদার এবং উকিল—সাটিরপাড়া—ঢাকা), (৩) শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ ঘোষ মোক্তার (টাঙ্গাইল ময়মনসিং), (৪) শ্রীআশুতোষ দাশগুপ্ত (গাড়রগা—বিক্রমপুর—ঢাকা), (৫) শ্রীজ্যোতির্ময় রায় (ঢাকা—মৈশুণ্ডী), (৬) শ্রীপ্রফুল্ল সেন (মধ্যপাড়া), (৭) শ্রীরাধিকা ভূষণ রায় (মানিকগঞ্জ) (৮) শ্রীক্ষীরোদ গুহ, (৯) শ্রীশান্তিপদ মুখার্জি, (১০) শ্রীভূপতি সেনগুপ্ত (মধ্যপাড়া—বিক্রমপুর), (১১) শ্রীনিশিকান্ত মিত্র, (১২) শ্রীনৃপেন্দ্র সেন, (১৩) শ্রীগোবিন্দচন্দ্র সেন (মধ্যপাড়া), (১৪) শ্রীদীনেশচন্দ্র গুহ মুস্তফি (স্বামী তুরীয়ানন্দ), (১৫) শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র রায়, (সিরাজগঞ্জ—পাবনা) (১৬) শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় (ঢাকা), (১৭) শ্রীশচীন্দ্র বন্দোপাধ্যায় (পাঁচগাঁ—বিক্রমপুর), (১৮) শ্রীনলিনী কিশোর গুহ (বজ্রযোগিনী, ঢাকা), (১৯) শ্রীযদুনাথ দাস, (মানিকদী-মহেশ্বরদী-ঢাকা), (২০) শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্তী (গড়বাড়ি—মহেশ্বরদী-ঢাকা), (২১) গুরুদয়াল দাস (সোনার গাঁ), (২২) অক্ষয় কুমার দত্ত (শান্তিনাথ), (২৩) মাণিকচন্দ্র গুহ মুস্তফী, (২৪) প্রমোদ বিহারী দাশগুপ্ত, (২৫) হেমচন্দ্র সেন (মধ্যপাড়া-বিক্রমপুর), (২৬) রজনীকান্ত সেন, (কার্তিকপুর-ফরিদপুর), (২৭) বিজয়চন্দ্র রাহা, (২৮) নিতাইচাঁদ বণিক (ঢাকা), (২৯) অবনী গাঙ্গুলী (আদবাড়ী)

(৩০) যোগেন্দ্র দাশগুপ্ত (কলমা), (৩১) নিশিকান্ত রায়চৌধুরী (উলপুর), (৩২) শশী সরকার, (৩৩) গোপীবল্লভ চক্রবর্তী, (৩৪) গোপাল ঘোষ (ধীপুর), (৩৫) সুরেশচন্দ্র সেন (মধ্যপাড়া বিক্রমপুর), (৩৬) সুরেন রায় (কুণ্ডা)। শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী এই মামলার পলাতক আসামী ছিলেন। এই মামলায় সেসন জজ ৩৬ জনকে বিভিন্ন দণ্ডে দণ্ডিত করেন। আপীলে ১৪ জনের সাজা হয়, তন্মধ্যে পুলিনবাবুর ৭ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ড হয় এবং আশুবাবু ও জ্যোতির্ময় রায় প্রত্যেকে ৬ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড প্রাপ্ত হয়।

মৌলবীবাজার দুর্ঘটনা ১৯১৩ সন

শ্রীহট্ট জিলার অরুণাচল আশ্রমে (জগৎসী) সাধুদের উপর পুলিশের অত্যাচার হইয়াছিল এবং এজন্য মহকুমা হাকিম গর্ডন সাহেব দায়ী ছিলেন। অনুশীলনের নেতারা গর্ডন সাহেবকে শাস্তি দেওয়ার জন্য শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী (চিয়ারা—নেত্রকোনা), শ্রীতারাপ্রসন্ন বল ও শ্রীঅমৃত সরকার (নাগরপাড়া, টাঙ্গাইল)কে পাঠাইলেন। যোগেন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে একটি বোমা ও একটি পিস্তল ছিল। কাঁটা তারের বেড়া পার হওয়ার সময়, ঘোর অন্ধকার রাত্রে, যোগেন্দ্র হোঁচট খাইয়া পড়িয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে বোমা ফাটে, নিজ বোমায় যোগেন্দ্র নিহত এবং অপর দুই জন আহত হয়। যোগেন্দ্রের দেহ ঘটনাস্থলে পড়িয়া থাকে, অপর দুই জন অতিকষ্টে দলের কর্মী লালমোহন দের সাহায্যে পলায়ন করিয়া ঢাকায় আসিতে সক্ষম হয়। যোগেন্দ্রের দেহ সনাক্ত করার জন্য গভর্ণমেণ্ট ১৫ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিল। পুলিশ জগৎসী আশ্রমবাসীদের উপর গুলি চালাইয়াছিল, ফলে আশ্রম-সভ্য ক্যাপ্টেন মহেন্দ্র দে, আই. এম. এস. নিহত হন।

আলিপুর ষড়যন্ত্র—১৯০৮ সন

১৯০৮ সনের জুন মাসে আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা সুরু হয়। এই মামলা আলিপুর বোমার মামলা নামে খ্যাত। মজঃফরপুর ঘটনার পর ২রা মে ৩২নং মুরারীপুকুর রোডের বাগান-বাড়ী তল্লাসী করিয়া পুলিশ বোমার কারখানা আবিষ্কার করে এবং সেখান হইতে বোমা তৈয়ারের মাল-মসলা ও বহু অস্ত্র-শস্ত্র, কাগজ-পত্র উদ্ধার করে। এই বাড়ী শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ ও বারীন্দ্রকুমার ঘোষের পিতা ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষের ছিল। পুলিশ এই বাড়ী হইতে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, হেমচন্দ্র দাস কানুনগো. উল্লাসকর দত্ত, দেবব্রত বসু. উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল, নলিনী গুপ্ত, পূর্ণ সেন, বিভূতি সরকার, ইন্দুভূষণ রায়, পরেশ মৌলিক, বিজয় নাগ, শচীন সেন, শিশির ঘোষ, নরেন বক্সী ও কুঞ্জলাল সাহাকে গ্রেপ্তার করে। ১৫নং গোপীমোহন দত্ত লেন হইতে কানাইলাল দত্ত ও নিরাপদ রায় ধৃত হন। ১৩৬নং হ্যারিসন রোড হইতে নগেন গুপ্ত, ধরণী গুপ্ত, অশোক নন্দী ধৃত হন। ৪৮নং গ্রে ষ্ট্রীট হইতে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, অবিনাশ ভট্টাচার্য, শৈলেন বসু ধৃত হন। ৩০।২নং রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট হইতে হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ ধৃত হন। শ্রীরামপুরে গোস্বামী পরিবারের নরেন গোস্বামী গ্রেপ্তার হয়। বিভিন্ন স্থান হইতে দীনদয়াল বসু, সুধীরকুমার সরকার (খুলনা), কৃষ্ণজীবন সান্যাল (কানসাট—মালদহ), বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, বিজয়রত্ন সেনগুপ্ত. মতিলাল বসু, সুশীল সেন, বীরেন সেন, হেম সেন, (বানিয়াচঙ্গ—সেনপাড়া), ইন্দ্রনাথ নন্দী (কর্ণেল মহেন্দ্র নন্দীর পুত্র), নিখিলেশ্বর রায় মৌলিক, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়চন্দ্র ভট্টাচার্য, বালকৃষ্ণ হরিকানে, প্রভাসচন্দ্র দেব, হরিদাস দত্ত, প্রফেসর চারুচন্দ্র দত্ত (চন্দননগর) গ্রেপ্তার হন।

১৯০৯ সনের ৬ই মে আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার রায় দেওয়া হয়। বিচারক বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও উল্লাসকর দত্তকে মৃত্যুদণ্ড

দেন। উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র দাস, বিভূতি সরকার, বীরেন্দ্র সেন, সুধীর ঘোষ, ইন্দ্রনাথ নন্দী, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, শৈলেন্দ্রনাথ বসু, হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল, ইন্দুভূষণ রায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড প্রাপ্ত হন। পরেশ মৌলিক, শিশির ঘোষ, নিরাপদ রায় দশ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ড, অশোক নন্দী, বালকৃষ্ণ হরিকানে, শিশির কুমার সেন সাত বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ড ও কৃষ্ণজীবন সান্ন্যাল এক বৎসর কারাদণ্ড প্রাপ্ত হন। আপিলে বারীনবাবু ও উল্লাসকর দত্তের মৃত্যুদণ্ড রহিত হয় এবং তৎপরিবর্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। শ্রীঅরবিন্দ মুক্তি পান এবং অনেকের দণ্ড হ্রাস হয়।

রাজাবাজার বোমার মামলা—১৯১৩ সন

এই প্রসিদ্ধ বোমার মামলায় (১) শ্রীশশাঙ্ক শেখর হাজরা (অমৃত হাজরা) মানিকগঞ্জ—ঢাকা, (২) শ্রীদীনেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, ফরিদপুর, (৩) শ্রীচন্দ্রশেখর দে, চট্টগ্রাম, (৪) শ্রীসারদাচরণ গুহ, ইদিলপুর—ফরিদপুর, (৫) শ্রীকালীপদ ঘোষ, (উপেন্দ্র লাল রায় চৌধুরী), শ্রীখগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী (মাণিকগঞ্জ, ঢাকা) অভিযুক্ত হন। বিচারে শ্রীঅমৃত হাজরা ১৫ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ড প্রাপ্ত হন।

দক্ষিণ ভারত বিপ্লব দল

তরুণ সঙ্ঘ

বালগঙ্গাধর তিলক মহারাষ্ট্রদেশে তরুণ সঙ্ঘ স্থাপন করেন। এই সঙ্ঘের প্রধান কর্মীদের মধ্যে দামোদর হরি চাপেকার ও তাঁহার ভ্রাতা বালকৃষ্ণহরি চাপেকার ছিলেন। তিলক যুবকদিগের মধ্যে বীরত্বভাব জাগানোর জন্য শিবাজী উৎসব প্রচলন করেন। তিলকের কাগজ কেশরীতে খুব উত্তেজনাপূর্ণ লেখা বাহির হইত। তিলক কেশরীতে রাজদ্রোহ প্রবন্ধ লেখার জন্য দেড় বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৮৯৬ সনে বোম্বাই ও পুণা সহরে ব্যাপকভাবে প্লেগের উপদ্রব হয়। প্লেগ

নিবারণের জন্য এরূপ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় যাহার ফলে জনসাধারণ অতিষ্ঠ হইয়া পড়ে। চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় এজন্য র‍্যাণ্ড ও আয়ার্ষ্ট নামক দুই জন শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীকে দায়ী মনে করিয়া তাহাদিগকে হত্যা করেন। বিচারে ১৮৯৭ সনে চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের ফাঁসী হয়। চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ই ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রথম শহীদ। ইহার পর তরুণ সঙ্ঘ চাপেকার সঙ্ঘ নামে পরিচিত হয়। লোকমান্য তিলক ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর (সাহেব খুন) সমর্থন করিয়া কেশরীতে দুইটি প্রবন্ধ লিখেন। এই অপরাধে ১৯০৮ সনে তিলকের ৬ বৎসর জেল ও এক হাজার টাকা জরিমানা হয়। তিলক মান্দালা জেলে ছিলেন। বালগঙ্গাধর তিলকের সহিত শ্রীঅরবিন্দের যোগাযোগ ছিল।

অভিনব ভারত সমিতি

সাভারকার ভ্রাতৃদ্বয় চাপেকার সঙ্ঘের সভ্য ছিলেন। পুলিশের দৃষ্টি এড়ানোর জন্য সাভারকার ভ্রাতৃদ্বয় এই সঙ্ঘের নাম অভিনব ভারত সমিতি রাখেন। এই সমিতির নেতা গণেশ দামোদর সাভারকার এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিনায়ক দামোদর সাভারকার ছিলেন এই সমিতির প্রাণস্বরূপ। বিনায়ক দামোদর অসাধারণ প্রতিভাশালী যুবক ছিলেন। তিনি ব্যারিষ্টারী পড়ার জন্য এবং সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র-শস্ত্রের ব্যবস্থার জন্য ১৯০৬ সনে লণ্ডন যান। গণেশবাবুর নেতৃত্বে অভিনব ভারত সমিতি বোম্বাই, পুণা, নাসিক, ঔরঙ্গাবাদ, হায়দ্রাবাদ গোয়ালিয়র প্রভৃতি স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। এই দলের সভ্য নীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারী এবং শঙ্করকৃষ্ণ মাদ্রাজ প্রদেশের কয়েকটি স্থানে দল গঠন করেন। এই দলের সভ্যগণ দেশের জনগণের মনে উৎসাহ সঞ্চারের জন্য কয়েকজন উচ্চপদস্থ অত্যাচারী শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীকে হত্যা করেন। ইতিমধ্যে গণেশ দামোদর সাভারকার একটি কবিতা পুস্তক লেখার জন্য যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন।

১৯০৯ সনের ২১শে ডিসেম্বর নাসিকে জ্যাক্‌সন হত্যা হয়। এই হত্যার জন্য অনন্ত লক্ষণ কানাহারে, কৃষ্ণজী গোপাল কার্ভে ও বিনায়ক নারায়ণ দেশপাণ্ডের ফাঁসি হয় এবং নারায়ণ যোশীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। ১৯১১ সনের ১৭ই জুন মাদ্রাজ প্রদেশের তিনেভেলীর জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট এ্যাস সাহেবকে হত্যা করা হয়। এই হত্যার জন্য বঞ্চি আয়ারের ফাঁসি হয় এবং নীলকণ্ঠ, শঙ্করকৃষ্ণ এবং অন্যান্য ৭ জনের বিভিন্ন কারাদণ্ড হয়। দক্ষিণ ভারতের বিপ্লব-দল দমনের জন্য গভর্ণমেণ্ট কয়েকটি ষড়যন্ত্র মামলা চালায়। ১৯১০ সনে নাসিক ষড়যন্ত্র মামলা সুরু হয়। প্রথম দফায় ৩৫ জন বিপ্লবী অভিযুক্ত হন। দ্বিতীয় দফায় রামচন্দ্র ভাবে, সখারাম রঘনাথ প্রভৃতি কয়েকজন অভিযুক্ত হন এবং তৃতীয় দফায় বিনায়ক দামোদর সাভারকার প্রভৃতি অভিযুক্ত হন। সাভারকার বাবু বিভিন্ন দফায় ৫৬ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আন্দামানে তাঁহার সহিত আমার পরিচয় হয়। তিনি ছিলেন সু-বক্তা, সু-লেখক, সংগঠন ক্ষমতা ছিল অদ্ভুত। আন্দামানে, সেলুলার জেলে, তাঁহার সহিত একত্র থাকার সুযোগ ঘটায় তাঁহার সংগঠন শক্তির পরিচয় পাইয়াছি। তিনি জেল হইতে মুক্তি লাভের পর হিন্দু মহাসভায় যোগদান করিয়া হিন্দু মহাসভার মধ্যে নতুন প্রাণ সঞ্চার করিয়াছিলেন। তিনি যদি হিন্দু মহাসভায় যোগদান না করিয়া জাতীয় কংগ্রেস দলে যোগদান করিতেন, তবে তিনি নির্ব্বিবাদে কংগ্রেস সভাপতি হইতেন এবং স্বাধীনতা আন্দোলনকে অধিকতর শক্তিশালী করিতে পারিতেন। নাসিক ষড়যন্ত্র মামলার পর দক্ষিণ ভারতের বিপ্লব-দলের অস্তিত্ব লোপ পায়। প্রধান প্রধান কর্মীদের ফাঁসি ও দ্বীপান্তরের পর উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে দল আর বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

তৃতীয়বার জেল-দর্শন

১৯১৪ সনের শেষভাগে একদিন আমি গঙ্গার ঘাটে বসিয়া তেল মালিশ করিতেছি, এমন সময় দেখি পুলিশের দারোগা প্রভাত বিশ্বাস মহাশয় আমার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তখন আমার এইরূপ অবস্থা যে দৌড় দিবারও ক্ষমতা নাই। মনে হইল এ যাত্রা আর রক্ষা পাইব না। দারোগাবাবু আমার নিকটে আসিয়া অতি সম্মানের সহিত পায়ে ধরিয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন, কর্তার অনুরোধে গ্রেপ্তার করিলাম এবং তিনি আমাকে একখানা গাড়ীতে উঠাইয়া লইয়া চলিলেন। সঙ্গে কয়েক জন কনষ্টেবলও ছিল। লালবাজার হাজতে আনিয়া আমাকে আটক করিলে আই, বির মধ্যে মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। বহুলোক আমাকে দেখিতে আসিল। এমন কি লোম্যান সাহেব, টেগার্ট সাহেবও আসিলেন। লোম্যান সাহেব আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া দারোগাবাবুকে পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। অবশ্য আমাকে ধরিবার জন্য দারোগাবাবুর কোনই কৃতিত্ব ছিলনা। দারোগাবাবু আই, বি,তে ছিলেন না। সাধারণ পুলিশ বিভাগে ঢাকায় চাকুরী করিতেন। আমাদের দলেরই পুরাণো একটি লোক আই, বি,র বড়কর্তার নিকট আমার সংবাদ দিয়াছিল। লোকটি আমার বাসা চিনিত না কিন্তু আমি যে সাধুর চিকিৎসাধীনে আছি এবং রোজ গঙ্গায় ডুবিয়া স্নান করি তাহা সে জানিত। তাহার সহিত আমাদের বিশেষ সম্পর্ক ছিল না, এই সময়ে সে আমাদের সংশ্রব প্রায় ত্যাগ করিয়াছে। আই,বি,র বড়কর্তা এই গুপ্তচরটির নিকট আমার পরিচিত পুলিশের দারোগা উক্ত বিশ্বাসকে আনাইয়া আমাকে গ্রেপ্তার কারবার আদেশ দিলেন। গোয়েন্দা অফিসে সংবাদ দিয়াই গুপ্তচরটির সম্ভবতঃ

একবার অনুতাপ হইয়াছিল অথবা আমার প্রতি তাহার দয়ার উদ্রেক হইয়াছিল—তাই আমার সহিত দেখা করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। একদিন তাহার সহিত রাস্তায় দেখাও হইয়াছিল। সে বলিয়াছিল, কয়েক দিন হয় প্রভাত বিশ্বাস এখানে আসিয়াছেন। বিশ্বাস মহাশয় যে-বাসায় উঠিয়াছেন, সেই বাসার ঠিকানাও সে আমাকে দিয়া গেল। আমি তাহাকে সন্দেহ করি নাই, সম্ভবতঃ সে নিজে আমার নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িবে এই ভয়েই আর বিশেষ কিছু বলে নাই, শুধু সাবধান হইবার ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছিল। আমি মনে করিয়াছিলাম বিশ্বাস মহাশয় যখন আই, বি,র লোক নহেন তখন নিশ্চয়ই অন্য কাজে আসিয়াছেন। এখন আমাকে একটু সাবধান থাকিলেই চলিবে। কিন্তু আমি যদি তখন কলিকাতা ছাড়িয়া যাই তবে আর ধরা পড়ি না। যাহা হউক, এখন আমার জবানবন্দী লইবার জন্য লোম্যান সাহেব আসিলেন, টেগার্ট সাহেব আসিলেন, আরও অনেকে আসিয়া অনেক প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। আমি সকলকেই বলিলাম, "আমি কিছু বলিব না"। লোম্যান সাহেব বলিলেন—"আমি কয়েকটা প্রশ্ন করিব, তাহার উত্তর চাই" এযাত্রা আমার সঙ্গে একটি চাবি ছিল। লোম্যান সাহেব চাবিটা দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটা কি ?" আমি – "চাবি।"

লো : কিসের চাবি ?

আমি : তালার চাবি।

লো : কিসের তালা ?

আমি : লোহার তালা।

লো : এই তালাটা কিসের জন্য ব্যবহার করিতে ? ইহা কি দরজার তালা, না ট্রাঙ্কের ?

আমি : ইহা দরজারও হইতে পারে, ট্রাঙ্কেরও হইতে পারে।

লো : তোমার জামা কোথায় ?

আমি : জানিনা।

লো: অমৃত হাজরাকে চিন ?

আমি: আমি কি করিয়া তাহাকে চিনিব।

লো: তুমি তাহার বাসায় যাইতে ?

আমি: কেন তাহার বাসায় যাইব। আমার উত্তর শুনিয়া লোম্যান সাহেব রাগে গর্গর্ করিয়া চলিয়া গেলেন। আমি স্নান করিবার সময় ধৃত হই। কাজেই আমার সঙ্গে কাপড়-জামা কিছুই ছিল না, যাহা ছিল স্নানের ঘাটেই রাখিয়া আসিয়াছিলাম—আমার তৈল মালিশকারীর নিকটেই তাহা রহিয়া গিয়াছিল। আমি এখন এক কাপড়ে আছি। একদিন লোম্যান সাহেবকে বলিলাম, আমার কাপড়-জামা নাই। তিনি সেইদিনই সাড়ে সাত টাকা খরচ করিয়া কাপড়-জামা আনাইয়া দিলেন। পরদিন এক 'সার্জ্জেণ্ট' আমাকে বলিল, "তুমি খুব ভাগ্যবান, লোম্যান সাহেব নিজের টাকা হইতে তোমার কাপড়-জামা কিনিয়া দিয়াছেন।" আমি বলিলাম, 'ব্রাহ্মণের দান গ্রহণ করিবার অভ্যাস আছে।'

লোম্যান সাহেব সকলের সহিত খুব মিশিতে পারিতেন। তিনি প্রায়ই আমার সঙ্গে গল্প করিতে আসিতেন। অবশ্য সব সময়েই তাঁর চেষ্টা থাকিত কথার ফাঁকে আমার কাছ হইতে কিছু বাহির করিতে পারেন কিনা। একদিন তিনি বলিলেন, "তোমাদের বীরেন আমার হাত ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।" আমার ধরা পড়িবার কিছুদিন পূর্বে গ্রীয়ার পার্কে কয়েক জন পলাতক বিপ্লবী কর্মী পরামর্শ করিবার জন্য একত্র হয়। পুলিশ পূর্বে ইহার সংবাদ পাইয়াছিল। লোম্যান সাহেব নিজে পুলিশ-বাহিনী লইয়া গ্রীয়ার পার্ক ঘেরাও করেন। বিপ্লবীরা পলাইবার চেষ্টা করিলে পুলিশের সহিত তাহাদের হাতাহাতি হয়। এই অবস্থায় লোম্যান সাহেবের সহিত বীরেন চ্যাটার্জীর ধ্বস্তাধ্বস্তি চলে। লোম্যান সাহেব বীরেনের আটগুণ জোয়ান ছিলেন। কিন্তু বীরেন কুস্তির প্যাঁচ জানিত। কুস্তির প্যাঁচ দিয়া সে লোম্যান সাহেবের হাতের কব্জা মচ্কাইয়া

দিয়াছিল। আমি লোম্যান সাহেবকে বলিলাম, 'বীরেনকে থানায় লইয়া গিয়া পরে নিশ্চয়ই ইহার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। লোম্যান সাহেব বলিলেন, "নিশ্চয়ই না,। বীরেনের সহিত যখন তোমার দেখা হইবে তখন জিজ্ঞাসা করিলে তাহা জানিতে পারিবে।" তিনি আরও বলিলেন, 'তোমাদের কয়েক জন বাঙালী কর্মচারী আমাকে পরামর্শ দিয়াছিল, তাহার বিরুদ্ধে মামলা করিতে। কিন্তু আমি বলিয়াছিলাম ঃ সে যেমন আমাকে মারিয়াছে আমি ও তেমনই তাহাকে মারিয়াছি, সমান সমান হইয়াছে।' আমাদের বাঙালী পুলিশ কর্মচারীবা সম্ভবতঃ ইহা কল্পনাও করিতে পারেন নাই যে, এতবড় একজন ইংরাজ কর্মচারীর উপর হাত উঠাইতে কেহ স্পর্ধা রাখিতে পারে। তাঁহারা হয়ত সাহেবকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নানারূপ পরামর্শ দিয়াছিলেন—তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, লোম্যান সাহেবের জন্ম পরাধীন দেশে হয় নাই, তিনি স্বাধীন দেশের লোক। তিনি আমার নিকট বীরেনের উচ্চ-প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "বীরেন খুব সাহসী, তাহার গায়ে বেশ জোর আছে।" আমাদের দেশী কোন কর্মচারীকে কেহ প্রহার করিলে তিনি এই অপমান চিরকাল মনে রাখিতেন এবং প্রতিশোধ লইবার নানাপ্রকার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু লোম্যান সাহেব সেদিকে যান নাই, তিনি প্রকাশ্যভাবে বীরেনের সাহস এবং শক্তির প্রশংসা করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি যখন ছাত্র ছিলাম তখন কত মারামারি করিয়াছি। যদি তুমি কখনও ইংলণ্ডে যাও দেখিবে ছাত্রেরা রাস্তায় ঘাটে কত মারামারি করিতেছে। তবে আমাদের মারামারি রাস্তা-ঘাটেই শেষ হয়, তোমাদের দেশে উহা অন্যরূপ। কাহারও সহিত বিবাদ হইলে পরে একদিন অন্ধকারে পিছন হইতে মাথায় বাড়ি মারিয়া সে পলাইয়া যাইবে।' এই খানেই স্বাধীন জাতির ও পরাধীন জাতির মনোভাবের পার্থক্য। আমাদের

দেশেও এক সময় এইরূপ বীরের সম্মান ছিল—কিন্তু তখন ভারতবর্ষ ছিল স্বাধীন।

আমার হাতে হাতকড়ি ও কোমরে দড়ি বাঁধিয়া বন্দুকধারী সিপাহীসহ বরিশাল জেলে পাঠান হইল। শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, শ্রীযুক্ত মদনমোহন ভৌমিক, শ্রীযুক্ত রমেশ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত খগেন চৌধুরী ও আমার বিরুদ্ধে এখন বরিশাল (সাপ্লিমেণ্টারী) ষড়যন্ত্র মামলা চলিল। এই মোকদ্দমায় তিনজন "এপ্রুভার" হইয়াছিল এবং এক বৎসরের উপর মামলা চলিয়াছিল। সরকার পক্ষে এই মামলার দরুণ তিন লক্ষ টাকারও অধিক ব্যয় হয়। আমাদের পক্ষে ব্যারিষ্টার ছিলেন মিঃ বি, সি, চ্যাটার্জী ও উকিল ছিলেন শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। বিপক্ষের ব্যারিষ্টার ছিলেন মিঃ এন, গুপ্ত, উকিল ছিলেন ফজলুল হক্ সাহেব ও বরিশালের অন্যান্য প্রধান প্রধান উকিলগণ। বরিশাল জেলে গুর্খা সিপাহী আমাদের পাহারা দিত। আমরা পাঁচজনই একত্র ছিলাম। জেলের আই, এম, এস, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন আমার হাঁপানী হইয়াছে। হাঁপানীর চিকিৎসা চলিল, কিন্তু কোন ফল হইল না। এ্যাপ্রুভাররা বলিল আমি কালীচরণ, বিরজা, হরেন্দ্র প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিলাম। এ্যাপ্রুভার ও সরকারী কর্মচারীদের সাক্ষ্য হইতে ও বিভিন্ন স্থানে খানাতল্লাসী দ্বারা প্রাপ্ত বন্দুক, রিভলভার ও কাগজপত্র হইতে সরকারপক্ষ প্রমাণ করিলেন আমরা রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র করিতেছিলাম। বিচারক আমাদের দোষী সাব্যস্ত করিয়া আমাকে ১৫ বৎসরের দ্বীপান্তর বাস এবং অপর চারিজনের প্রত্যেকের দশ বৎসর দ্বীপান্তর বাস দণ্ডাজ্ঞা দিলেন। আমরা হাসিমুখেই কারাবরণ করিলাম। আদালত হইতে জেলে যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের পায়ে শিকলী-বেড়ি পরাইয়া দিল—কারণ আমাদের সাজা বেশী। সকলেই বলিল সেণ্ট্রাল জেলে গেলেই

আমাদের বেড়ি কাটিয়া দিবে। কয়েক দিনের মধ্যেই আমরা বরিশাল জেল হইতে প্রেসিডেন্সী জেলে চালান হইলাম। এযাত্রা পায়ে বেড়ি, হাতে হাতকড়ি, কোমরে দড়িবাঁধা। সঙ্গে বন্দুকধারী পাহারা আছে। আমরা পাঁচজনেই একসঙ্গে চলিলাম। রাস্তায় যেরূপ সুব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাতে আমাদের মনে বেশ একটু গর্বই বোধ হইল। আশা ছিল, প্রেসিডেন্সী জেলে পৌছিলেই আমাদের বেড়ি খুলিয়া দিবে, কিন্তু দেখিলাম উল্টা ফল ফলিল। প্রেসিডেন্সী জেলে যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের শিক্‌লী-বেড়ী (Link Fetters) কাটিয়া ডাণ্ডাবেড়ি পরাইয়া দিল এবং ৪৪ ডিগ্রিতে বন্ধ করিল।

শ্রীঅরবিন্দ এই ৪৪ডিগ্রিতে কিছুদিন থাকিবার পর শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করিলেন এবং জেল হইতে মুক্ত হইয়া পরে পণ্ডিচেরীতে আশ্রয়লাভ করিয়া আধ্যাত্মশক্তির উৎস সন্ধানে ধ্যানমগ্ন হইলেন। ৪৪ ডিগ্রীর যেরূপ ব্যবস্থা ছিল তাহাতে সাধারণ লোক কিছুদিনের মধ্যেই চোখে সরিষার ফুল দেখিত। একবার মুক্তিলাভ করিলে আর বড় কেহ জেলে যাইবার নাম করিত না—বিপ্লবের পথই পরিত্যাগ করিত। ৪৪ ডিগ্রীকে নির্জন কারাবাস বলা যাইতে পারে। ক্ষুদ্র সেলের মধ্যে সমস্ত দিনরাত্র আবদ্ধ থাকিতে হইত—কাহারও সহিত দেখা হইত না বা কাহারও সহিত কথা বলিবার উপায় ছিলনা, দিনের মধ্যে একবার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সদলবলে আসিয়া দেখিয়া যাইতেন মাত্র। আমাদিগকে চট সেলাইএর কাজ দেওয়া হইয়াছিল। আমরা পাশাপাশি 'সেলে' থাকিয়াও পরস্পরের সহিত কথা কহিতে পারিতাম না। কথা কহিবার জন্য আমাদের মাঝে মাঝে হাতকড়া সাজা হইয়াছে। আমাদের ভাতের মধ্যে ধান ও পাথর কোনটা বেশী ছিল বলা কঠিন। একদিন আমি কবিতা লিখিয়া ফেলিলাম—

"জেলার বেটা বড় খচ্চর
খেতে দেয় ধান আর পাথর···।"

তখন শীতকাল ছিল। আমি হাঁপানীর রোগী কিন্তু একখানা অতিরিক্ত কম্বল চাহিয়াও পাইলাম না তাই আবার কবিতা লিখিলাম—

"সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বড় পাজির পাজি,
বেশী কম্বল দিতে হয়না রাজী—।"

লিখিবার জন্য আমাদের কাগজ-কলম কিছু ছিল না—মুখে মুখেই কবিতা তৈয়ারী করিতে হইত এবং পরে চীৎকার করিয়া পরস্পরকে শুনাইতাম। প্রতুলবাবু রবীন্দ্রনাথে অনুকরণে কবিতা তৈয়ার করিতেন। আমাকে উপলক্ষ করিয়া তিনি একটি কবিতা লিখিয়াছেন—"যদি মহারাজ না আসিত।" কয়েক মাস আমাদের জাল ডিগ্রীতেও (জাল দিয়া ঘেরা cubicle) কাটাইতে হইয়াছিল। লোম্যান সাহেব, টেগার্ট সাহেব প্রায় মাঝে মাঝেই প্রেসিডেন্সী জেলে রাজনৈতিক কয়েদীদের সহিত দেখা করিতে আসিতেন। লোম্যান সাহেব একদিন আমার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। আমি তাঁহাকে প্রশ্ন করিলাম, তিনি যুদ্ধে যাইতেছেন না কেন? তিনি বলিলেন,—"আমি এবং মিঃ টেগার্ট যুদ্ধে যাইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু গভর্ণমেণ্টের অনুমতি পাইতেছি না। গভর্ণমেণ্টের হুকুম উচ্চ কর্মচারীরা স্থান ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না। অবশ্য আমরা এখনও চেষ্টা করিতেছি।" আমি বলিলাম, "যুদ্ধে গেলে আপনার মৃত্যু হইবে, আপনার স্ত্রী-পুত্র আছে। আপনি মোটা বেতনের চাকুরী করিতেছেন। আপনি কেন যুদ্ধে যাইবার জন্য ব্যস্ত?" লোম্যান সাহেব একটু উত্তেজিত হইয়া উত্তর করিলেন, "আজ যদি আমার কলেরায় মৃত্যু হয় তবে কে আমার স্ত্রী-পুত্র দেখিবে? একদিন মরিতেই হইবে।. যদি দেশের জন্য আমার মৃত্যু হয় তবে আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিব।" ইহাই

তো খাঁটি দেশপ্রেম। আমার দেশ এখন বিপন্ন, এখন স্ত্রী-পুত্রের কথা ভাবিলে চলিবে না, প্রাণের মায়া করিলে চলিবে না, সর্বাগ্রে দেশকে রক্ষা করিতে হইবে। স্বাধীন দেশের লোককে ইহা শিখাইতে হয় না, যুক্তির দ্বারা বুঝাইতে হয় না। তাঁহাদের ভিতর খাঁটি দেশপ্রেম আছে এবং এই জন্যই তাঁহারা দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারেন। স্বাধীনতাই দেশবাসীকে দেশপ্রেমিক করিয়া তোলে। ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন ছিল তখন আমাদের দেশেও দেশপ্রেমিকের অভাব ছিল না—সেদিন তাঁহারাও দেশের জন্য প্রাণ দিতে পারিলে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। আজ ভারতবর্ষ পরাধীন, তাই আমরা স্বার্থপর, দুর্বল ও ভীরু হইয়া পড়িয়াছি। আজ আমাদের দেশের কত লোক লোম্যান, টেগার্ট সাহেবের গোয়েন্দা-গিরি করিতেছে। কয়েকদিন পর লোম্যান সাহেব আবার আমার সহিত দেখা করিতে আসিলেন, তিনি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন আমার ভিতর দুর্বলতা আসিতেছে কি না। হাইকোর্টে আমাদের আপীল চলিবে, তাই তিনি বলিলেন, "আশু মুখার্জীকে তোমরা পাইবে না, সে রাজনৈতিক মামলার আসামীদিগকে ছাড়িয়া দেয়, ন্যায় বিচার করে না।" ইহার কয়েক দিন পর আমাদের ব্যারিষ্টার মিঃ বি, সি, চ্যাটার্জী আমাদের সহিত দেখা করিতে আসিলেন, আমি তাঁহাকে এই সংবাদ দিলাম। তিনি আদালতে ইহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পর আরার লোম্যান সাহেব আমার নিকট আসিলেন। আমার তখন হাঁপানীর টান উঠিয়াছে, আমি কথা বলিতে পারি না। তিনি আমাকে ধমক দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি বি, সি, চ্যাটার্জীকে কি বলিয়াছিলাম। আরও বলিলেন, "তোমার উপর এতটা রাগ হইয়াছিল যে, তখন তোমাকে পাইলে আমি গুলি করিতাম।"

একদিন জেলের আই, জি, আসিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আমার হাঁপানী হইয়াছে কিন্তু আমাকে হাঁসপাতালে

লইয়া যায় না, আমাকে দিয়া এখনও কাজ করায়। আমি কোন ঔষধ পাই না, এমন কি সাবু বার্লি পর্যন্ত চাহিয়া পাই না।" তিনি আমার টিকেট হাতে লইয়া "So many names like Puran chore" অর্থাৎ পুরান চোরের মত এতগুলি নাম, বলিয়া টিকেটটা ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে হাইকোর্টে আমাদের আপীল হইয়া গিয়াছে। চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ও আমাদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। আপীলে প্রতুলবাবু ও রমেশ চৌধুরী খালাস পাইলেন, আমার পাঁচ বৎসর কমিয়া দশ বৎসর সাজা হইল। খগেনবাবু ও মদনবাবুর দশ বৎসর দণ্ডাজ্ঞা বহাল রহিল। প্রতুলবাবু খালাস পাইলেন বটে, কিন্তু জেল হইতে মুক্তি পাইলেন না। জেলেই আটক রহিলেন। সেই যুগে প্রত্যেক কয়েদীর গলায় লোহার হাঁসুলী পরাইয়া দিত এবং তাহার মধ্যে একখণ্ড ত্রিকোণাকার কাঠ ঝুলিয়া থাকিত। সেই কাঠে কয়েদীর নম্বর, ধারা, কত বৎসর সাজা ও খালাসের তারিখ ইত্যাদি থাকিত। হাঁসুলী গলার মধ্যে এরূপভাবে আটকাইয়া দিত যে তাহা খোলা যাইত না এবং রাত্রে শুইতে খুব অসুবিধা হইত। সেই যুগে খাবার পাত্র ছিল লোহার থালা ও বাটি।

—

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আন্দামানে

আমাদের এখন আন্দামান যাইবার পালা। সেখানেই এখন নরক গুলজার করিতে হইবে। সাধারণতঃ রোগীদিগকে আন্দামানে পাঠান হয় না। এজন্য সন্দেহ ছিল, আমাকে পাঠান হইবে কি না। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই সে সন্দেহ ভাঙ্গিয়া গেল। আন্দামান যাত্রীদিগকে পূর্বে 'মেডিকেল বোর্ড' স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে। আমি হাঁপানী রোগী ছিলাম, বোর্ড আমাকে পরীক্ষা করিলেন। একজন বলিলেন, ইহার হাঁপানী আছে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলিলেন 'This man must go'. পরে দেখিলাম, আমার টিকিটে লেখা আছে "Has asthma. Vide I. G. Prisons Letter. Fit for travel, আর কোন সন্দেহ রহিল না। এই জেলে আমরা প্রায় নয় মাস কাটাইয়াছি। এখন আন্দামানে যাইতে হইবে। আন্দামান হইতে ফিরিব কি না তার কোন ভরসা নাই, না ফিরিবার সম্ভাবনা বেশী। নির্জন সেলে বসিয়া কত কথাই না মনে হইতেছে, কিন্তু প্রাণের কথাত কাহারও নিকট ব্যক্ত করিবার উপায় নাই। হয়ত চিরকালের জন্য বিদায় লইয়া যাইতেছি। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজন কাহারও সহিত দেখা হইল না, কাহাকেও দুইটা কথা বলিয়া যাইতে পারিলাম না, কাহারও নিকট হইতে বিদায় লইবারও সুযোগ পাইলাম না। যাইবার পূর্বে সেলের দেওয়ালে সুরকী দিয়া লিখিলাম।

"বিদায় দে মা প্রফুল্ল মনে যাই আমি আন্দামানে,
এই প্রার্থনা করি মাগো মনে যেন রেখ সন্তানে।
আবার আসিব ভারত-জননী মাতিব সেবায়,
তোমার বন্ধন মোচনে মাগো যেন এ প্রাণ যায়।

বিদায় ভারতবাসী, বিদায় বন্ধু বান্ধবগণ,
বিদায় পুষ্প-তরুলতা, বিদায় পশু পাখীগণ।
ক্ষমো সবে যত করেছি অপরাধ জ্ঞানে অজ্ঞানে,
বিদায়ং‌দে মা প্রফুল্ল মনে যাই আমি আন্দামানে।"

আমরা জেল হইতে রওয়ানা হইলাম। আমাদের হাতে হাতকড়ি, পায়ে বেড়ি পূর্ব হইতেই ছিল। এখন কোমরে দড়ি বাঁধা হইল এবং আমরা জেল অফিসের সম্মুখে আসিয়া জোড়া জোড়া হইয়া বসিলাম। জেলার সাহেব পরিদর্শন করিতে আসিলেন। আমাকে বলিলেন, 'তুমি সেখানেই মরিবে।' ইহা তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী ছিল কিন্তু এই বাণী সফল হয় নাই। ইহার পর আমরা বন্দুকধারী প্রহরী-বেষ্টিত হইয়া জাহাজে চড়িলাম। ইহা ছিল আমাদের প্রথম সমুদ্র-যাত্রা। যাত্রার সময় আমাদের মনে যে কষ্ট হইয়াছিল তাহা মনে হয় না, যতদূর মনে পড়ে আমরা বেশ হাসিখুশীই ছিলাম। তিন দিন তিন রাত্রি জাহাজে ছিলাম, চতুর্থ দিন বেলা প্রায় দশটার সময় আমরা পোর্ট ব্লেয়ারে পৌঁছিলাম। পথে আমাদের খাইবার ব্যবস্থা ছিল চিঁড়া আর গুড়। কিন্তু এই কয়দিন কেহই খাইতে পারে নাই—জাহাজ এরূপ দুলিতেছিল যে, কেহই বিছানা হইতে মাথা উঠাইতে পারে নাই। উঠালেই বমি হইত। সকালে ও বিকালে হাওয়া খাওয়াইবার জন্য আমাদিগকে জাহাজের উপর লইয়া যাওয়া হইত। ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ যখন উপরে উঠিত তখন মনে হইত উহা আকাশ স্পর্শ করিবে, আবার যখন নীচের দিকে নামিত তখন মনে হইত এইবার উহা পাতালপুরী চলিল। ১৯১৬ সনের মাঝামাঝি আমরা আন্দামান পৌঁছিলাম। সাধারণ কয়েদী সহ আমরা ৯৬ জন ছিলাম। তাহার মধ্যে দশজন ছিল মেয়ে কয়েদী—তাহাদের সঙ্গে ২।৩টি শিশুও ছিল।

স্থান হিসাবে আন্দামান অস্বাস্থ্যকর হইলেও উহার প্রাকৃতিক দৃশ্য খুব সুন্দর। সমুদ্রের মধ্যে পাহাড় এবং পাহাড়ের উপর

সেলুলার জেল। জেলের তেতালা হইতে সমুদ্র ও পাহাড়ের দৃশ্য মনোরম দেখা যাইত। সেলুলার জেলে ৭০০ শত কয়েদী রাখিবার ব্যবস্থা আছে। ৭০০ শত সেল আছে। আন্দামানে ছোট বড় প্রায় ২০০ শত দ্বীপ আছে। সাধারণ কয়েদীদিগকে সেলুলার জেলে তিন মাস হইতে দুই বৎসর রাখা হয়, পরে বিভিন্ন দ্বীপ বা টাপুতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সেখানেও তাহাদিগকে কয়েদীর মতই থাকিতে হয়, সরকারী কাজ করিতে হয় এবং সরকার হইতে তাহারা আহার্য পায়। তবে সেখানে তাহারা জেল হইতে কিছু বেশী স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে। রাজনৈতিক কয়েদীদের জন্য কোন পৃথক ব্যবস্থা হইত না, তাহাদিগকে বরাবর জেলেই থাকিতে হইত। এই আন্দামান জেলের পত্তন রাজনৈতিক বন্দীদের জন্যই হয়—আবার রাজনৈতিক বন্দীদের চেষ্টায়ই এই 'পেনাল সেটেলমেণ্ট' (Penal settlement) উঠিয়া যায়। ১৮৫৭ খ্রীঃ সিপাহী বিদ্রোহের পর এত লোক দণ্ডিত হইয়াছিল যে, ভারতীয় জেলে তাহাদের স্থান সঙ্কুলান হয় নাই। তাই সরকার তাহাদিগকে আন্দামান পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন। আন্দামান তখন আরো অস্বাস্থ্যকর ছিল। বর্তমানে আন্দামানে অনেকগুলি সুন্দব সুন্দর সহর দেখা যায়। এই সহরগুলি সেই রাজনৈতিক কয়েদীদের মৃত স্তূপ হইতে সৃষ্ট। হতভাগ্য কয়েদীরা রৌদ্রে পুড়িয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া, ম্যালেরিয়া, ডিসেনট্রির সহিত লড়াই করিয়া, জঙ্গল কাটিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহরগুলি পত্তন করে। তখন আন্দামানের অবস্থা এরূপ ছিল যে, কেহ আর দেশে ফিরিয়া আসিতে পারিত না—কিছুদিনের মধ্যেই সেখানে তাহাদের জীবন-দীপ নিভিয়া যাইত।

সেলুলার জেলে পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের পায়ের বেড়ি কাটিয়া দিল। মনে হইল পা খুব হালকা হইয়া গিয়াছে—চলিতে ভয় ভয় লাগে। কিছুক্ষণ পর খুব তল্লাসী সুরু হইল কেহ যদি টাকা-পয়সা সঙ্গে লইয়া আসে। আন্দামানে পৈতা রাখিবার

হুকুম ছিল না, তল্লাসী করিয়া আমাদের গলা হইতে পৈতা কাড়িয়া লওয়া হইল। আমরা আপত্তি করিলাম কিন্তু কোন ফল হইল না। শুনিলাম, উপেনবাবু প্রভৃতির পৈতা নাই। শুনিয়া কতকটা আশ্বস্ত হইলাম। ইহার পর বার্মা হইতে বার্মা ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত হইয়া কয়েকজন রাজনৈতিক কয়েদী আসিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে পণ্ডিত রামরক্ষা ছিলেন। রামরক্ষা হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ, তাহার পৈতা লইয়া যাওয়ায় তিনি অনশন ব্রত গ্রহণ করেন। তিন মাস অনশনের পর তাঁহার মৃত্যু হয়, কিন্তু তথাপি তাঁহাকে পৈতা দেওয়া হয়না। আন্দামানে আমরা প্রায় ১০০ শত রাজনৈতিক কয়েদী ছিলাম।

আন্দামানে জেলার ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন সর্বেসর্বা। সেখানে কোন জেল-পরিদর্শক যাইতেন না—চীফ কমিশনার বৎসরে তিন-চারি দিন পরিদর্শন করিতে যাইতেন। চীফ কমিশনারের নিকট কয়েদীদের অভিযোগ করিবার অধিকার ছিল। কিন্তু আগে পিছে বন্দুকধারী সিপাহীসহ এরূপ জাঁকজমকের সহিত তিনি আসিতেন যে, সাধারণ কয়েদীরা কিছু বলিতে সাহস করিত না। আর বলিলেও বিশেষ কিছু লাভ হইত না। কারণ তিনি কয়েদীদের কথা কখনও বিশ্বাস করিতেন না, জেলার, সুপারিণ্টেণ্ডের কথাই বিশ্বাস করিতেন। আন্দামানে প্রত্যেক কয়েদী, বৎসরে একখানা চিঠি বাড়ীতে লিখিতে পারিত ও একখানা চিঠি বাড়ী হইতে পাইতে পারিত। কিন্তু ইতিমধ্যে যদি কোন অপরাধের জন্য তাহার সাজা হইত, তবে সে সেই অধিকার হইতেও বঞ্চিত হইত। আন্দামানের জেলের খাওয়া দেশের জেল হইতে অনেক খারাপ। সস্তা রেঙ্গুন আতপ চাউলের ভাত, সারা বৎসরে দুইবেলা অড়হর ডাল এবং অখাদ্য ঘাস-পাতার তরকারী—ইহাই ছিল নিত্যকার খাদ্য। রাত্রে জেলে কোন আলোর ব্যবস্থা ছিল না, পায়খানার ব্যবস্থাও ছিল অদ্ভুত। রাত্রে প্রত্যেকের সেলে একটি করিয়া মাটির ঘট দেওয়া

হইত; এক সেরের বেশী তাহাতে জল ধরিত না। রাত্রে কাহারও পায়খানার বেগ পাইলে প্রথমতঃ তাহাকে অন্ধকারে পা দিয়া ঘটটি অনুসন্ধান করিয়া তাহার মুখ ঠিক করিয়া পর পর মল ও মূত্র ত্যাগ করিতে হইত। মল ও মূত্র দুইটি একসঙ্গে ত্যাগ করিবার উপায় ছিল না। তাই মূত্রের বেগ বন্ধ করিয়া ঘটের মধ্যে মলত্যাগ করিতে হইবে, মলত্যাগ বন্ধ করিয়া পুনরায় ঘটের মুখ ঠিক করিয়া মূত্রত্যাগ করিতে হইবে। অর্থাৎ একটি বন্ধ করিয়া অপরটি ত্যাগ করিতে হইবে। একসঙ্গে দুইটি ত্যাগ করিলে একটি মাটিতে পড়িবে এবং তাহাতে নিজের কোঠাই নষ্ট হইবে। কারণ ২।৩ মাস পর একদিন মলমূত্র ত্যাগের স্থানে চুন লাগাইবে, আর মলমূত্র মাটিতে পড়িলে মেথর যদি তাহা রিপোর্ট করে তবে বন্দীর সাজা হইবে। জল খরচও সাবধানে করিতে হইবে, বেশী জল খরচ করিলে তাহা গড়াইয়া নিজের বিছানা ভিজাইবে। কিছুদিন পর আমাদের এইসব অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। সাভারকার ভ্রাতৃদ্বয়, বারীনবাবু প্রভৃতি সকলেই একাজে সুদক্ষ ছিলেন। ঘটের মুখ ৩।৪ ইঞ্চির বেশী চওড়া হইবে না। আন্দামানে কয়েদীদের আহারের পরিমাণ যেমন ছিল কম, তাহাদের প্রতি দুর্ব্যবহার হইত তেমনি বেশী। বছরে দুই-একদিন মাছের ঝোল বা মাছসিদ্ধ পাওয়া যাইত।

আন্দামানে প্রত্যেক কয়েদীর "জেল হিষ্টরী" টিকেটে তাহার পূর্বের "হিস্টরী" লেখা থাকিত। আমার টিকেটে লেখা ছিল :—
Previous History,—The accused was one of a gang of Bengali students concerned in a conspiracy; a conspiracy to wage war against the King Emperor and whose oparations extended from the year 1908 to December 1914. He was a member of Anushilan Samity, a society whose object was to overthrow the British rule in India and whose members committed several dacoities to procure money for

the purchase of arms and ammunitions and the carrying out of the business of the society. He was one of the earliest members, took training from the arch anarchist P. Das. He absconded while the Dacca Conspiraey Case was started. He was one of the leaders of the Revolutionary Party—was suspected in 14 murders and dacoities. Very dangerous.

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আমাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া কঠিন কাজের ব্যবস্থা করিলেন। আমি বলিলাম আমার হাঁপানি আছে। তিনি ধমক দিয়া বলিলেন—ইহা আন্দামান। শচীন সান্ন্যালকে ঘানিতে এবং আমাদিগকে নারিকেলের ছোবড়া পিটাইয়া তার বাহির করিতে দিল। ইহা কঠিন কাজের মধ্যে গণ্য। আমাকে হাসপাতালে রাখিত না—তাই অসুখ লইয়াই কাজ করিতে হইত। অসুখের জন্য যাহা খাইতে বলিত খাইতাম। একজন বলিল, কেরোসিন তেল খাইলে হাঁপানি ভাল হয়, একদিন সংগ্রহ করিয়া কিছু কেরোসিন তেলই খাইলাম। কোন উপকার পাইলাম না—অধিকন্তু পায়খানার সহিত কেরোসিন বাহির হইল; এমন কি বায়ুনিঃসরণের সহিত কেরোসিন বাহির হইতে লাগিল। একজন বলিল, হাঁপানির টান উঠিলে মুখে তামাক পাতা রাখিলে আরাম বোধ হইবে। তাহাই করিলাম, কিন্তু আমার ইহাতে মাথা ঘুরাইতে ও বমি হইতে লাগিল। বন্ধুরা তখন জল দিয়া মাথা ধুইয়া দেয়। একদিন হাঁপানির টান এতটা বৃদ্ধি পায় যে, আমাকে ধরাধরি করিয়া হাসপাতালে রাখিয়া আসে এবং পরদিন ডাক্তার হাসপাতালে ভর্তি করিতে বাধ্য হয়। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সেদিন হাসপাতালে যান নাই। পরদিন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আমাকে হাসপাতালে দেখিয়া ডাক্তারকে ধমক দিয়া তিনি নিজেই আমাকে হাসপাতাল হইতে বাহির করিয়া দিলেন। আরো বলিলেন—"দেশে

অশান্তি সৃষ্টি করিয়াছিলে, তাহা মনে নাই, এখন এখানে দুধ খাইতে আসিয়াছ ?" আন্দামানে সাতটা ইয়ার্ড আছে। কয়েদীদের এক ইয়ার্ড হইতে অন্য ইয়ার্ডে যাইবার হুকুম নাই। রাজনৈতিক কয়েদী-দিগকে এই সাত ইয়ার্ডে ভাগ করিয়া রাখা হইয়াছিল, কোন ইয়ার্ডে ৮।১০ জন, আবার কোন ইয়ার্ডে ১৫।১৬ জন থাকিত। প্রেসিডেন্সী জেলে আমরা পাশাপাশি সেলে থাকিতাম, সেখানে না হয় কথা বলিবার নিয়ম ছিল না। কিন্তু এখানে আমরা এক ইয়ার্ডে থাকি, দিনের বেলায় একত্র থাকি, এক বারান্দায় কাজ করি, তথাপি পরস্পর কথা বলিতে পারিব না, পাশাপাশি বসিয়া খাইতে পারিব না, পাশাপাশি পায়খানায় বসিতে পারিব না—প্রত্যেকটি সময় আমাদে পরস্পরের মধ্যে কয়েকজন সাধারণ কয়েদী বসিবে।

আন্দামানের সরকারী বিবরণ হইতে জানা যাইবে যে, সেলুলার জেলে গড়ে প্রতিমাসে তিনটি করিয়া লোক আত্মহত্যা করিয়াছে। মানুষ সহজে আত্মহত্যা করিতে চায় না, কিন্তু সেখানে কয়েদীদের প্রতি এতটা নির্যাতন করা হইত যে, তাহারা তাহা সহ্য করিতে পারিত না; আত্মহত্যা করিয়া সকল নির্যাতনের হাত হইতে মুক্ত হইত। সেলুলার জেলের রাজনৈতিক বন্দীরা ইহার প্রতিকার করিতে বদ্ধপরিকর হইল। এই উপলক্ষে আমরা 'নরম ও গরম' দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়িলাম। সাভারকার ভ্রাতৃদ্বয় ও বারীন-বাবুরা পূর্বে আসিয়াছেন, তাঁহাদের অনেক নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছে, তাঁহারা সংগ্রাম করিয়া কিছু সুবিধাও আদায় করিয়াছেন। এখন তাঁহারা জেলার ও সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের কাছে খুব প্রিয় পাত্র হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা এখন ঐসব সুবিধা ত্যাগ করিয়া আমাদের সঙ্গে আসিয়া সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত নন। পুলিনবাবু কোন গণ্ডগোলে যাইতেন না—কর্তৃপক্ষের প্রিয়পাত্র হইবারও চেষ্টা করিতেন না। স্নেহপরবশ হইয়া তিনি আমাদিগকে বলিতেন, জেলে গণ্ডগোল করিয়া সাজা বাড়াইয়া লাভ কি ? বরং শান্ত

ভাবে থাকিয়া বাহিরে যাইতে পারিলে, আরো দেশের সেবা করিতে পারিবে। তখনও আমার হাঁপানি সারে নাই, এজন্য বন্ধুরা আমাকে গণ্ডগোল করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আমি তখন সারারাত্র কাশিতাম,সময় সময় প্রহরীরা বলাবলি করিত আজ রাত্রে এই বাঙালী মারা যাইবে। শেষরাত্রে যখন একটু তন্দ্রার ভাব আসিত তখন প্রহরীরা আমাকে জাগাইয়া দেখিত আমি বাঁচিয়া আছি কিনা। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট,রাত্রে কফ ফেলার জন্য একটি পাত্র চাহিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা পাইলাম না। জেলার সাহেব বলিলেন, প্রস্রাবের পাত্রে কফ ফেলিও। আমি দেওয়ালের গায়ে কফ ফেলিতাম। আমার শরীর এত দুর্বল ছিল যে, দুই হাত দূরে যাইয়া প্রস্রাব করিতে কষ্ট বোধ হইত। আমার ধারণা হইল প্রেসিডেন্সী জেলের জেলারের ভবিষ্যদ্বাণীই সত্য হইবে, আমি আর দেশে ফিরিয়া যাইতে পারিব না। সময় সময় নির্জন অন্ধকারময় সেলে বহু পূর্ব-স্মৃতি জাগিত। মনে হইত যে-পা এক সময় আমাকে ৮৫ মাইল রাস্তা অনায়াসে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে, ১০৫ ডিগ্রী জ্বরের মধ্যে ৩২ মাইল পাহাড়িয়া রাস্তা বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে, আজ সেই পা দুই হাত রাস্তা আমাকে বহন করিতে অক্ষম। এই অবস্থায় বাঁচিয়া থাকাও বিড়ম্বনা, সারাজীবন পরের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে হইবে, ইহা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়।

সেলুলার সেলে বাঙালী রাজনৈতিক কয়েদী ছিল ২৫।৩০ জন, মারাঠী ৩ জন, ইউ. পি,র অল্প কয়েকজন এবং বাকি সব ছিল পাঞ্জাবের এবং তাহাদের অধিকাংশই ছিল শিখ। ইহার পর 'মার্শাল-ল' কেসে গুজরাট ও আমেদাবাদ হইতেই কিছু লোক আসিয়াছিল। জেলে বিশেষ শ্রেণীর কোন কয়েদী ছিল না, সকলেই সাধারণ শ্রেণীর কয়েদী বলিয়া গণ্য ছিল। ব্যারিষ্টার বিনায়ক দামোদর সাভারকর, প্রফেসার ভাই পরমানন্দ, বারীন ঘোষ, ভাই বুড্ডা সিং (যার Previous Historyতে লেখা ছিল, তিনি

ব্যাঙ্কক-এর একজন প্রসিদ্ধ ধনী ব্যবসায়ী) সকলেরই এক অবস্থা, সকলেই সাধারণ কয়েদী। কয়েদী কর্মচারীদের মধ্যে প্রধান ছিল জমাদার, তাহার অধীনে টিণ্ডেল,তাহাদের অধীনে পেটি অফিসার ও সর্বনিম্নে ওয়ার্ডার ছিল। রাজনৈতিক কয়েদীদের জন্য ৭ ইয়ার্ডে ৭ জন শ্বেতাঙ্গ সৈনিক প্রহরী ছিল। আন্দামানে ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশের কয়েদী ছিল, সেখানে সাধারণ ভাষা ছিল হিন্দী। মেয়ে কয়েদীরা ভিন্ন জেলে থাকিত। তখন সেখানে পুরুষ কয়েদী ১০ বৎসর পর এবং মেয়ে কয়েদী ৫ বৎসর পর বিবাহ করিয়া একত্র বাস করিতে পারিত। সেখানকার নৈতিক অবস্থা খুব শোচনীয় ছিল, যুবক ও স্ত্রীলোক ঘটিত ব্যাপারে প্রায় খুন হইত।

আন্দামানে আমাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিকার হিসাবে জেল আইন অমান্য করা স্থির হইয়া গেল। নরমপন্থীগণ তাহাতে যোগ দিলেন না। বন্ধুদের নিষেধ সত্ত্বেও অসুস্থ শরীরে আমিও আইন অমান্যকারীদের দলই বাছিয়া লইলাম। সেলুলার জেলে আইন অমান্য সুরু হইল। আমরা স্বাধীন, কাহারও কোন হুকুম মানি না, জেলের সাজারও আমাদের কোন ভয় নাই। আমরা এখন পরস্পর কথা বলি, খাবার খারাপ ও কম বলিয়া হৈ চৈ করি, কোন কয়েদীকে কোন জেল কর্মচারী প্রহার করিলে আমরা দলবদ্ধভাবে বাধা দেই। এই সব অপরাধের জন্য আমাদের হাত-কড়ি, বেড়ী সেলবাস প্রভৃতি সাজা হয়। রাত্রে সকলেই সেলে থাকে, দিনের বেলায় সেলের বাহিরে, বারন্দায় বা কারখানায় কাজ করে। যাহাদের সাজা হিসাবে সেলবাস হয় তাহাদের দিনরাত্র সেলেই থাকিতে হয়, শুধু স্নান খাবারের সময় অল্পক্ষণের জন্য সেল হইতে বাহির করে। সেখানে যে-সব শিখ ছিল তাহাদের সকলেরই বয়স প্রায় ৪০ এর উপর, ৫০।৬০ বৎসর বয়সেরও কয়েকজন ছিলেন। বাঙ্গালীদের প্রায় সকলেই ত্রিশ বৎসরের

নীচে ছিলেন। সেলুলার জলে শিখেরা খুব বীরত্ব দেখাইয়াছেন, বহু নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন। একদিন বৈকালে জেলার সাহেব আসিয়াছেন। সকলের কাজ হইয়া গিয়াছে। অমর সিং বারান্দায় পায়চারী করিতেছিলেন, এমন সময় জেলার সাহেব তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন "তুমি বেড়াইতেছ কেন ?" অমর সিং জবাব দিলেন, "আমি কি তোমার বাবার মাথার উপর বেড়াইতেছি ?" এই অপরাধের জন্য অমর সিংয়ের তিন মাস ডাণ্ডাবেড়ী ও সেল সাজা হয়।

একদিন পণ্ডিত পরমানন্দকে টিণ্ডেল জেলারের সম্মুখে হাজির করিয়াছে, অপরাধ সে কথা শুনে না, বে-ফাইলে চলে। জেলার পরমানন্দকে 'মা-বাপ' তুলিয়া গালি দিলেন, পরমানন্দও তৎক্ষণাৎ তাহাকে লাথি মারিয়া ও ঘুষি দিয়া ভূপাতিত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে জমাদার টিণ্ডেলদের লাঠিও তাঁহার উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। অবশেষে অজ্ঞানাবস্থায় পরমানন্দকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। সুপারিণ্ডেণ্টের বিচারে পরানন্দের কুড়ি বেত হয়। এতদিন জেলারের উপর কেহ হাত উঠাইতে স্পর্ধা রাখে নাই। তাই এই ঘটনার পর জেলারের "প্রেসটিজ" (Prestige) অনেকখানি কমিয়া গেল—সাধারণ কয়েদীরা খুব সন্তুষ্ট ও সহানুভূতিশীল হইয়া পড়িল। কিন্তু জেলারের ইঙ্গিতে জমাদার-টিণ্ডেলরাও গণ্ডগোলকারী রাজনৈতিক কয়েদীদিগকে সময় সময় সুবিধামত প্রহার করিত। একদিন সর্দার ভানসিংকে এমন নির্দয়ভাবে প্রহার করিয়াছে যে, তাহার মৃত্যু অবধারিত ছিল। আমরা স্থির করিলাম ইহার প্রতিবাদে জেনারেল ষ্ট্রাইক করিতে হইবে—কেহ কোন কাজ করিব না এবং যে যে সক্ষম প্রায়োপবেশন করিব। প্রত্যেক ইয়ার্ডে গোপনে এই সংবাদ চলিয়া গেল। প্রায় ৭০ জন লোক ধর্মঘটে যোগ দিল। এই অপরাধের জন্য আমাদের প্রত্যেকের ৬ মাস ডাণ্ডাবেড়ী, ৬ মাস সেল, সাত দিন খাড়া হাতকড়ি ও কম-খানা

সাজা হইল। এই সেল-বাসের সময় আমি কুইনাইন খাইতে আরম্ভ করি। সুরেশ সেন মহাশয় মেডিক্যাল গ্রাউণ্ডে দিন আধ সের করিয়া দুধ পাইতেন। তিনি ধর্মঘটে যোগ দেন নাই। প্রত্যহ তিনি তাঁহার দুধ আমার নিকট গোপনে পাঠাইয়া দিতেন, আমি তাহা পান করিতাম। এইরূপ একমাস দুধ পান করিবার পর আমার হাঁপানি সারিয়া গেল।

আমরা গোপনে সংবাদ পাইলাম চীফ-কমিশনার আমাদের সহিত দেখা করিতে আসিবেন। আমাদের বিশ্বাস ছিল, চীফ-কমিশনারের নিকট আবেদন করিলে কোন লাভ হইবে না। তবুও আমরা স্থির করিলাম, আমাদের মধ্যে কয়েক জন খুব শান্তভাবে ভানসিংহের প্রহারের কথা ও জেলের সাধারণ অবস্থা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিবে। প্রত্যেক ইয়ার্ড হইতেই ২।১ জন লোক বলিবার জন্য ঠিক হইল, আমিও তাহাদের মধ্যে একজন ছিলাম। চীফ-কমিশনার যখন আমার সেলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন আমি দাঁড়াইয়া সেখানকার প্রথা অনুসারে তাঁহাকে সেলাম করিলাম। তিনি আমাকে ধমক দিয়া বলিলেন, "তোমরা গণ্ডগোল করিতেছ কেন?" আমি খুব শান্তভাবে বলিলাম, "ভানসিংকে নির্দয়ভাবে প্রহার করা হইয়াছে।" তিনি উত্তর করিলেন, "ভানসিংকে প্রহার করা হয় নাই।" আমি বলিলাম, "ভানসিংয়ের এখনও মৃত্যু হয় নাই, সে এখনও মৃত্যুশয্যাশায়ী আছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে একবার দেখিয়া আসিবেন।" তিনি বলিলেন, "যদি তাহাকে মারিয়াই থাকে, তাহাতে তোমার কি? He is neither your chacha nor your nana (সে তোমার চাচাও নয়, নানাও নয়)।" আমি বলিলাম, "সে আমার সহকর্মী সে আমার বন্ধু।" তিনি বলিলেন, "তোমার নিজের সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে?" আমি বলিলাম, "আমি অসুখে ভুগিতেছি, আমাকে হাসপাতালে রাখা হয় না। একদিন ডাক্তার আমাকে

হাঁসপাতালে ভর্তি করিয়াছিলেন, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁহাকে এজন্য ধমকাইয়াছিলেন।" সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলিলেন, "ইহা মিথ্যা কথা। আমার বেশ মনে আছে সেদিন সে সম্পূর্ণ নীরোগ ছিল।" আমি টিকেট দেখাইয়া বলিলাম—"৩০শে তারিখে আমাকে হাঁসপাতালে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে এবং ডাক্তার আমাকে 'ডিটেন' করিয়াছেন। ৩১শে তারিখে আমার অবস্থা আরও খারাপ ছিল। এই জন্যই ডাক্তার আমাকে ভর্তি করিয়াছিলেন। আপনি কি এখন বিশ্বাস করিতে পারেন যে, একদিনের মধ্যেই আমি সম্পূর্ণ নীরোগ হইয়া গেলাম?" চীফ-কমিশনার তখন "this is your bahana" (এ তোমার বাহানা) বলিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু একটু অগ্রসর হইয়াই দেখিলেন, একজন শিখ সেলের দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া আছে। জেলার তাহাকে দাঁড়াইতে আদেশ দিল কিন্তু সে গ্রাহ্যই করিল না। আরও একটু অগ্রসর হইয়া দেখেন যে একজন শিখ শুইয়া আছে। তিনি তাহাকে ডাকিলে সে তাঁহার 'মা-বাপ' 'চৌদ্দ-গোষ্ঠী' উদ্ধার করিয়া বলিল, "আমার ঘুমের ব্যাঘাত করিও না—এখান হইতে চলিয়া যাও। আমি তো তোমাকে ডাকি নাই, তবে কেন আমাকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছ?" প্রত্যেক ইয়ার্ডেই এইরূপ ব্যাপার হইল।

আমাদিগকে যখন খাইবার সময় ও স্নানের জন্য সেল হইতে বাহির করিত তখন জেলের অপর সকল কয়েদীদিগকে ভিতরে বন্ধ করিয়া রাখিত, যাহাতে কাহারও সহিত আমাদের দেখা না হয়। পাঞ্জাবী শিখেরা ছিলেন খুব বলিষ্ঠ, কাহারো ওজন ২০০ পাউণ্ড, কাহারও বা ২৫০ পাউণ্ড। একজনে একটা আস্ত পাঁঠা খাইতে পারেন। জেলের সাধারণ খাওয়াতেই তাহাদের পেট ভরিত না। তাহার উপর এখন যে কম খাওয়া পাই তাহাতে আমারই পেট ভরে না, তাহাদের কি করিয়া পেট ভরিবে। খাইবার পরে কেহ কেহ বলিতেন, না খাওয়াই ভালো—খাইলে আরো ক্ষুধা বাড়ে।

ইহার পর এক এক জনের ৪০।৫০ পাউণ্ড ওজন কমিয়া গিয়াছিল। আমরা ভাই জোয়ালাসিংকে 'ভাই ঢোল' ও শেরসিংকে 'ভাইহাতি' বলিয়া ডাকিতাম। একদিন হাঁসপাতালে শেরসিংকে এক বালতি দুধ দেখাইয়া ডাক্তার বলিয়াছিলেন সে তাহা খাইতে পারে কিনা। বালতিতে দশ সের দুধ ছিল, শেরসিং তৎক্ষণাৎ বালতিতে চুমুক দিয়া তাহা শেষ করিয়া দিয়াছিল। ডাক্তারও তখন অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তাহার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া সন্তুষ্টও হইয়াছিলেন। এই শেরসিংই একদিন একসের সরিষার তেল খাইয়া হজম করিয়াছিলেন। ব্যাপারটি এই—ফণীবাবু আমার নিকট এক সময় দুই পাতা তামাক পাঠাইয়া এক সের তেল সংগ্রহ করিয়া দিতে সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। আমি তদনুসারে ঘানি-ঘরের একটা লোকের সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম। কিন্তু তেল আনিবার সময় আমি মাল সহ ধরা পড়িয়া গেলাম। টিণ্ডেল আমাকে মালসহ হাজির করিবে এমন সময় শেরসিং আসিয়া টিণ্ডেলকে 'সর্দার' 'জনাব' প্রভৃতি সম্মান-সূচক সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্যাপার কি?" টিণ্ডেল বলিল "এই বাঙ্গালী তেল চুরি করিয়াছে।" শেরসিং বলিল, "তাই নাকি? নিতান্ত অন্যায় কাজ করিয়াছে। দেখি কতটুকু তেল?" এই বলিয়া তিনি টিণ্ডেলের হাত হইতে তেল দেখিবার জন্য বাটীটা হাতে লইয়া এক চুমুকে সবটুকু তেল খাইয়া ফেলিয়া, 'লে শালা' বলিয়া বাটীটা মাটিতে ফেলিয়া দিলেন। টিণ্ডেল দেখিল এখানে বল-প্রয়োগে সুবিধা হইবে না। মালও নাই, সাক্ষীও পাইবে না। সে রাগে গরগর করিতে করিতে চলিয়া গেল। কম খাবারে এই শের সিং জাতীয় লোকের খুব কষ্ট হইয়াছে। কিন্তু কেহ কোন দুর্বলতা দেখায় নাই। এই সময় একদিন বৈকালে আমরা খাইতে বসিয়াছি, এমন সময় জেলার সাহেব পরিদর্শন করিতে আসিলেন। তিনি বৃদ্ধ নাধানসিংকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ক্যায়সা হ্যায় জী?"

আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি নিশ্চয়ই বলিতাম "ভালো আছি।" কিন্তু নাধানসিং উত্তর করিলেন—"কেন? তোমার মেয়েকে বিবাহ দিবে নাকি? তুমি যে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছ, তুমি কি তোমার মেয়ের জন্য বর খুঁজিতেছ? পায়ে বেড়ী, সারা দিনরাত সেলে বন্ধ, খাবার কম, আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ কেমন আছি? ঠাট্টা করিতেছ? লজ্জা করে না নির্লজ্জ বেহায়া? যা, আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যা।" জেলার সাহেব চলিয়া গেলেন। এইসব বুলি শুনিয়া জেলার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এখন অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছেন। কতই বা সাজা দিবেন? সাজা দিলে যেন ইহাদের তেজ আরও বাড়ে।

সেলগুলি আট হাত লম্বা ও পাঁচ হাত চওড়া ছিল, ইহারই মধ্যে আমাদিগকে সারা দিনরাত থাকিতে হইত। সেলে দিনের বেলায় বিছানা রাখিবার হুকুম ছিল না সকালে বিছানা লইয়া যাইত। সেলে আমরা কবিতা লিখিয়া সময় কাটাইতাম। কিন্তু কেহই কবি ছিলাম না। কবি হইবার সাধও ছিল না, কবিতা লিখিতেও জানিতাম না। কবিতার ছন্দ-ব্যাপারে বাধ্য হইয়াই আমরা ছিলাম বিপ্লবী, কবিতা লিখিবার সাধারণ নিয়ম-কানুন মানিয়া চলিতাম না। যাহা খুসী এবং যেভাবে ইচ্ছা আমরা কবিতা রচনা করিতাম। আমরা জানিতাম আমাদের কবিতা কখনও পুস্তকাকারে বাহির হইবে না, বাহির হইলেও কেহ পয়সা দিয়া তাহা কিনিয়া পড়িবে না। কাজেই কবিতা লিখিয়া আমাদের মার খাইবার কোনই ভয় ছিল না। ষ্ট্রাইকারদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল পাঞ্জাবী। তাহারা বাঙ্গালা জানিতেন না। তাই আমি স্থির করিলাম, ইংরাজীতে কবিতা লিখিব। কবিতা লিখিবার জন্য আমাদের কাগজ-কলম ছিল না, কাগজ-কলমের প্রয়োজনও হইত না। আমাদের সম্বল ছিল সেলের মেঝে, দেওয়াল ও সুরকী। আমি প্রথম কবিতা লিখিলাম:—

What have I, how shall I worship thee,
I Know not, Oh God, please tell me ;
I am prisoner, have no flower,
My heart is desert, there's no water ;
I am wandering always in the dark,
Unable to follow the Sage's footmark ;
I heard that you are with the name,
So I always sing your fame.

দ্বিতীয় কবিতা লিখিলাম ঃ—

Murray the Superintendent is a first-class scoundrel,
Unwilling to keep the sickmen in the hospital ;
For nothing, he abuses ; punishes the prisoner
What shall I say of his brutal behaviour.

*　　*　　*　　*

এইরূপ বেপরোয়া ভাবে কবিতা লিখিতে লাগিলাম এবং খাইবার সময় পরস্পরের কবিতা শুনিতাম।

ইতিমধ্যে ভানসিংহের মৃত্যু হইয়াছে, আরো ২।১ জনের মৃত্যু হইয়াছে। আন্দামান হইতে গোপনে দেশে কোন খবর পাঠানো কঠিন ছিল। সেখানে সাধারণ কোন পোষ্টঅফিস ছিল না, সরকারের হাত দিয়া সমস্ত চিঠি যাইত। এক "মহারাজ ব্যতীত অপর কোন জাহাজ আন্দামানে যাইতে পারিত না। এরূপ অবস্থার মধ্যেও আমাদের ষ্ট্রাইকের, ভানসিং ও রামরক্ষার মৃত্যুর এবং সেলুলার জেলের দুরবস্থার কথা 'বেঙ্গলী' সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল এবং সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি কাউন্সিলে এ সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন। সরকার বাহাদুর জানাইলেন,—কতকগুলি দুষ্ট প্রকৃতির লোক গণ্ডগোল করিতেছে। এই ধর্মঘটে কোন নেতা

যোগ দেন নাই এবং ইহাতে তাহাদের কোন সহানুভূতিও নাই। ক্রমে ক্রমে এই সংবাদ আমাদের নিকট পৌঁছিল। আমরা যখন নেতাদিগকে প্রকাশ্যভাবে আমাদের সহিত যোগ দিতে বলিলাম, তখন তাঁহারা যোগ দিলেন না। কিন্তু ধর্মঘট চলিতে লাগিল। অবশেষে ছয় মাস অতীত হইবার পর আমাদের বেড়ী কাটিয়া দিল, কেহ কেহ বেড়ী কাটিতে দিবেন না বলিয়া আপত্তি জানাইলেন—তথাপি কর্তৃপক্ষ জোর করিয়া তাহাদের বেড়ী কাটিয়া দিলেন।

আমরা সেল হইতে বাহির হইলাম। কিন্তু আমাদের সংগ্রাম চলিতে লাগিল আমরা পুনঃ পুনঃ দণ্ডভোগ করিতে লাগিলাম। একদিন ছত্তার সিং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে প্রহার করিলেন। ফলে ছত্তার সিংও যমের দক্ষিণ দ্বার দেখিয়া আসিলেন। তাঁহার প্রতি অনির্দিষ্ট কালের জন্য হাতকড়ি, বেড়ী ও সেল-সাজা হইল। পাঁচ বৎসর পুরা তিনি এই অবস্থায় থাকেন ও পরে তাহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। কিছুদিন পর আমি বাড়ী হইতে চিঠি পাইলাম। আমার মেজদা লিখিয়াছেন, আমি এখানে আমার দুষ্কর্মের ফলভোগ করিতেছি। আমি যেন সদ্ভাবে থাকি, তিনি আমার জন্য অত্যন্ত চিন্তিত ও দুঃখিত আছেন। এতদিন আমি বাড়ীতে কোন চিঠি লিখি নাই—বুঝিলাম সরকার পক্ষ হইতে দাদাকে দিয়া এরূপ চিঠি লেখানো হইয়াছে।

বেপরোয়াভাবে কবিতা লিখিবার মত সব কাজেই আমরা বেপরোয়া ছিলাম। আমাদের সাজার ভয় নাই, প্রাণের মায়া নাই। তাই জেল কর্মচারীরা এখন আমাদিগকে ভয়ের চক্ষে দেখিত। সাধারণ কয়েদীরাও আমাদিগকে সম্মানের চক্ষে দেখিত। জেলের এখন অনেক পরিবর্তন হইয়া গেল, মারপিট কমিয়া গেল —এখন আর আত্মহত্যা হয় না। ইতিমধ্যে পাঞ্জাব ও আমেদাবাদ হইতে 'মার্শাল-ল কেসের' কিছু লোক আসিয়া হাজির হইল।

আসিতেই তাহাদিগকে ঘানিতে দেওয়া হইল। কিন্তু তাহারা সত্যাগ্রহ শিখিয়া আসিয়াছে, এখানেও তাহারা সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিল। তাহারা ঘানি টানিবে না—ঘানি-ঘরে তাহারা শুইয়া পড়িল। জেলারের হুকুমে তাহাদের হাত-পা বাঁধিয়া ঘানির সহিত জুড়িয়া অপর লোককে ঘানি ঘুরাইতে বলিল। এরূপভাবে তাহাদিগকে ঘানির চারিদিকে হেঁচড়াইতে লাগিল যে, তাহাদের পিঠ ও হাত-পায়ের চামড়া উঠিয়া গেল। শীঘ্রই এই সংবাদ আমাদের কানে গিয়া পৌছিল। আমি, ভূপেনবাবু (ঘোষ) ; নাধান সিং প্রভৃতি কয়েক জন হৈ চৈ করিতে লাগিলাম, জেল-কর্তৃপক্ষ গণ্ডগোলের আশঙ্কা দেখিয়া অগত্যা তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিল। গণ্ডগোলকারীদিগকে সেলে আবদ্ধ করা হইল। আমার পূর্বের একটা অপরাধের জন্য তিন মাস ডাণ্ডাবেড়ী ও সেল সাজা চলিতেছিল। আমি জানিতাম যে, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সহিত পরদিন বচসা হইবে। সেইজন্য ঠিক করিয়াছিলাম, হিন্দীতে কথা বলিব। কারণ ইংরাজীতে কথা বলিলে অপরে বুঝিবে না, আমি তাহাকে গালি দিলাম কি প্রশংসা করিলাম। পরদিন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আসিলে আমি সেলাম দিলাম। তিনি আমার সেলের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। আমি পূর্বদিনের ঘটনা সম্পর্কে বলিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, 'জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তুমি না আমি?' আমি বলিলাম, 'জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আপনি, এই জন্যই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—মার্শাল-ল' বন্দীদের উপর এরূপ অত্যাচার করা হইল কেন?" তিনি তখন আমাকে ধমক দিয়া বলিলেন, "চুপ রও শুয়ার কা বাচ্চা।" আমিও তখন দ্বিগুণ আওয়াজে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে ধমক দিয়া বলিলাম—"তুম চুপ রও, কুত্তিকা বাচ্চা।" ইহার পর আমার মুখ হইতে অনর্গল হিন্দী ও পাঞ্জাবী গালি বাহির হইতে লাগিল। ইহাতে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সম্পর্কিত আত্মীয়া কেহই বাদ গেল না। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন। পরে

জানিতে পারিলাম, এই অপরাধের জন্য চারদিন 'পেনাল ডায়েট' (penal diet) সাজা দিয়াছেন। অর্থাৎ তুইবেলা মাত্র এক পাউণ্ড (আধসের) করিয়া লবণহীন ভাতের ফেন খাইতে পারিব, অন্য কোন খাবার পাইব না। আমি যে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে গালি দিয়াছি, এই সংবাদ, অল্পক্ষণের মধ্যেই জেলের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। খাবার সময় পাচক আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমি কি খাইতে চাই, ভাত না রুটি? আমি বলিলাম, 'আমার সাজা হইয়াছে, আমাকে ফেন দাও।' সে বলিল, 'তোমার বাহাত্বরির কথা আমরা শুনিরাছি, চৌকায় আমরা ঠিক করিয়াছি, তোমাকে ফেন খাইতে দিব না। তুমি যাহা খাইতে চাও তাহাই দিব।'— আমি ইতস্ততঃ করিতেছি, এমন সময় খাবারের সঙ্গে যে 'পেট্টী অফিসার' আসিয়াছিল, সে ফেন মাটিতে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "বাঙ্গালী শের হ্যায়, ডবল খানা দাও।" ইহার পর, আমার সেলে অনেকে গোপনে চাটনী ও রুটী পাঠাইতে লাগিল। এত খাবার আসিতে লাগিল যে আমি তাহা বিতরণ করিতে লাগিলাম। আমার চারদিন এইভাবেই কাটিয়া গেল, ফেন একদিনও খাইতে পাইলাম না।

আন্দামানে যাঁহারা গণ্ডগোল করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, আমি তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলাম। বেত ছাড়া, জেলের সমস্ত রকম সাজা আমার হইয়াছে। ক্রস-বার-ফেটার্স (cross bar fetters,সাধারণতঃ বেতের পরিবর্তে লাগান হয়), ডাণ্ডাবেড়ী শিকলী-বেড়ী, খাড়া হাতকড়ি, পিছনে হাতকড়ি, রাত্রে হাতকড়ি, পেনাল ডায়েট, সেল-বাস প্রভৃতি সমস্ত সাজাই আমি ভোগ করিয়াছি। আন্দামানে আমাদের তিন বৎসরের উপর সংগ্রাম চলিয়াছে। বেড়ী পায়ে দিতে দিতে আমাদের পায়ে কড়া পড়িয়া গিয়াছিল। এমন অবস্থায় পৌঁছিয়াছিলাম যে, বেড়ী পায়ে দিয়া আমরা দৌড়াইতে পারিতাম। মাঝে মাঝে কম্বলের কোর্ত্তাকে

ফুটবল বানাইয়াও বেড়ী পায়ে দিয়া খেলিয়াছি। আমরা সময় সময় ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বহু তর্ক করিয়াছি—ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে কিরূপ গভর্ণমেণ্ট হইবে, রাজধানী কোথায় থাকিবে, রাষ্ট্রভাষা কি হইবে ইত্যাদি। আমাদের মধ্যে হিংসা অহিংসা, আমিষ ও নিরামিষ ভোজন লইয়াও তর্ক হইয়াছে। আমিষ ভোজন সম্পর্কে কেশর সিং বলিয়াছিলেন, মাছ-মাংস আমরা কেন খাইব না? ইহাদের দ্বারা দেশের কি উপকার হইতেছে যে তাহাদিগকে খাইলে দেশের অনিষ্ট হইবে? পাঠার যদি জজ ম্যাজিষ্ট্রেট হইবার সম্ভাবনা থাকিত অথবা যদি দেশভক্ত হইয়া ইহারা দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতে পারিত তবে তাহাদিগকে হত্যা করিয়া উদর পূর্ণ করিলে অন্যায় হইত। সেরূপ সম্ভাবনা যখন নাই তখন কেন তাহাদিগকে খাইব না? আমাদের আহারের জন্যই তাহাদের সৃষ্টি করা হইয়াছে।

আমরা গোপনে সংবাদ পাইলাম জেল-কমিশন আসিতেছে এবং জেল কর্তৃপক্ষ চেষ্টায় আছেন যাহাতে আমাদের সহিত তাঁহাদের দেখা না হয়। আমাদের বিশ্বাস ছিল, তাঁহারা নিশ্চয় জেলে আসিবেন। তাই প্রত্যেক ইয়ার্ডেই সংবাদ দেওয়া হইল, তাঁহারা যে ইয়ার্ডেই যাইবেন সেই ইয়ার্ডেই চীৎকার করিয়া তাঁহাদিগকে ডাকিয়া কথা বলিতে হইবে। যথাসময়ে জেলকমিশন জেলের মধ্যে আসিলেন এবং রাজনৈতিক বন্দীদের সহিত আলাপও হইল। তাঁহারা বলিলেন, অতীতে কি হইয়াছে আমরা সে বিচার করিতে আসি নাই। জেল সংশোধন কি ভাবে হইতে পারে তাহা লিখিয়া তোমরা আমাদিগকে জানাও। তোমাদের দরখাস্ত সাত খানার বেশী যেন না হয়, আর লেখা যেন এক রকম না হয়। আমাদের তরফ হইতে সাতখানা দরখাস্ত গেল তাহাতে ছিল :—পেনাল সেটেল্‌মেণ্ট উঠাইয়া দিতে হইবে, দেশের জেলের মত তিনমাস অন্তর চিঠি লেখার অনুমতি দিতে হইবে, পৈতা ও ধর্মের চিহ্ন রাখিতে দিতে হইবে, ফাঁসী

উঠাইয়া দিতে হইবে এবং শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে ইত্যাদি। জেল-কমিশন আমাদের দরখাস্ত পাইয়াই আদেশ দিলেন, তিন মাস অন্তর চিঠি লিখিতে পারিবে এবং পৈতা ও ধর্মের চিহ্ন রাখিতে পারিবে।

গভর্ণমেণ্ট যখন দেখিতে পাইলেন এখানে তিন বৎসরের উপর অনবরত গণ্ডগোল চলিতেছে, তখন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং জেলারকে বদলী করিয়া দিলেন। নূতন জেলার ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আসিয়া সুনাম অর্জনের জন্য আমাদের সহিত খুব সদয় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। জেলেও শান্তি স্থাপিত হইল। ইতিমধ্যে যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, গভর্ণমেণ্ট "অ্যামনেষ্টি" (amnesty) ঘোষণা করিয়াছেন, আন্দামান হইতে বারীণবাবুর দল, শচীন্দ্রনাথ সান্যাল ও কয়েকজন শিখ—মোট কুড়িজন মুক্ত হইলেন। জেলে প্রেস ছিল। পূর্বে বারীণবাবু প্রেসের ফোরম্যান ছিলেন। তিনি যাইবার পর এখন জগৎরাম প্রেসের ফোরম্যান হইলেন। আমরাও প্রেসের কাজে আসিলাম। জেলখানায় অল্পবয়স্ক কয়েদীদের উপর খুব উৎপীড়ন হয়। তাই একদিন জেলার পণ্ডিত জগৎরামকে বলিলেন, 'বাচ্চা' ফাইলের লোকদিগকে প্রেসের কাজে দিব। তাহারা তোমাদের নিকট থাকিলে কেহ তাহাদের উপর জুলুম করিতে পারিবে না। 'বাচ্চা ফাইলে' ৭০টি তরুণ ছিল। তাহারা প্রেসের কাজে আসিল—আমি তাহাদের শিক্ষক হইলাম। প্রাতে ১০টা পর্যন্ত প্রেসের কাজ হইত এবং দ্বিপ্রহরে খাইবার পর লেখাপড়ার কাজ হইত। বাচ্চা ফাইলে ব্রহ্মদেশের এবং ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেরই তরুণ কয়েদী ছিল। কিছুদিন পর পেনাল সেটেলমেণ্ট উঠিয়া যায় এবং আমরা বাঙ্গালীরা সর্বপ্রথম আলীপুর জেলে চালান হই। ইহা ১৯২১ সালের শেষভাগে।

আন্দামানে যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত গণেশ দামোদর সাভারকর, শ্রীযুক্ত বিনায়ক দামোদর সাভারকর

(ব্যারিষ্টার), নারায়ণ যোশী প্রো-ভাই পরমানন্দ, সর্দ্দার জবালা সিং, পৃথি সিং, গুরুমুখ সিং, ছত্তর সিং, নিধান সিং, কেশর সিং, বুড্ডা সিং, শের সিং, অমর সিং, বিশাখা সিং, রুর সিং, সোহন সিং, নন্দ সিং, ভান সিং, কেহের সিং, পণ্ডিত পরমানন্দ, পণ্ডিত জগৎরাম, পণ্ডিত রামসরণ দাস, পণ্ডিত রামরক্ষা, চৌধুরী বোগ্‌গামল, মহাশয় রতনচাঁদ, মোহম্মদ মোস্তাফা, আলী আহম্মদ, কাসেম, শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দাস, শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র ব্যানার্জ্জি, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল হাজরা, শ্রীত্রৈলোক্য নাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত মদনমোহন ভৌমিক, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সান্ন্যাল, শ্রীযুক্ত আশুতোষ লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জ পাল, শ্রীযুক্ত গোবিন্দ কর, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত যতীন নন্দী, শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বোস, শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রলাল রায়, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র সান্ন্যাল, শ্রীযুক্ত নিখিলচন্দ্র গুহ, শ্রীযুক্ত অনুকূল চ্যাটার্জ্জি, শ্রীযুক্ত সুরেন বিশ্বাস প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

রাউলাট বিল, সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ আন্দোলন

সরকার বাহাদুর যখন দেখিলেন বিপ্লবীরা এত কালের বিশ্বাসী সৈন্যদিগকেও হাত করিতে সক্ষম এবং জার্মাণীর সহিত বন্দোবস্ত করিয়া তিন জাহাজ বোঝাই অস্ত্রশস্ত্র আমদানীর ব্যবস্থা করাও তাহাদের দ্বারা সম্ভব হইয়াছে, তখন তাঁহাদের ঘুম ভাঙ্গিল। সরকার চিন্তা করিয়া দেখিলেন, শুধু দমননীতি দ্বারা দেশ-শাসন চলিবে না, সঙ্গে সঙ্গে শাসনভারও দেশবাসীর হাতে দিতে হইবে। ইংলণ্ড চিরকালই রাজনীতিতে রক্ষণশীল এবং তাহার ফলে আমেরিকা হারাইয়াছে, আয়ারলণ্ড হারাইয়াছে এবং ভারতবর্ষও হারাইতে বসিয়াছে। মর্লে-মিণ্টো রিফর্মের পরিবর্তে, ১৯০৯ সালে যদি "মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড রিফর্মস্" দিত, অথবা "মণ্টেগু চেমসফোর্ড রিফর্মের পরিবর্তে যদি তখন বর্তমান প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন দিত, তাহা হইলে দেশের লোক এতটা সন্তুষ্ট হইত যে, কোন প্রকার বিরুদ্ধ আন্দোলন করাই কঠিন হইত।

মহাযুদ্ধের শেষে সরকার দুইটি কমিশন বসাইলেন, একটি দমন-নীতি প্রবর্তনের জন্য "রাউলাট কমিটি" ও অপরটি শাসন-সংস্কারের জন্য, ইহাকে "মণ্টেগু চেমসফোর্ড" কমিটি বলা যাইতে পারে। রাউলাট কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন রাউলাট সাহেব, এজন্য ইহার নাম "রাউলাট" কমিটি—ও তাঁহারা যে আইনের খসড়া তৈয়ার করিয়াছিলেন তাহা 'রাউলাট বিল" নামে খ্যাত হইয়াছে। এই কমিটির অপর নাম 'সিডিসন কমিটি।' এই কমিটির কাজ ছিল বিপ্লব আন্দোলন কতটা প্রসার লাভ করিয়াছে ও ইহার শক্তি কতটুকু ইত্যাদি অনুসন্ধান করা এবং কি ভাবে এই আন্দোলন দমন করা যাইতে পারে তাহা স্থির করা। "সিডিসন কমিটি

রিপোর্টে” বিপ্লব আন্দোলনের কতটা ইতিহাস আছে, ইহা অবশ্যই এক পক্ষের কথা। বিপ্লব আন্দোলনের প্রকৃত ইতিহাস দেশের স্বাধীনতা লাভের পূর্বে লেখা সম্ভবপর নয়। সিডিসন কমিটির পক্ষেও সকল কথা জানা সম্ভবপর হয় নাই। এই কমিটি বিপ্লব আন্দোলনের বিস্তৃত আলোচনা করিয়া এই আন্দোলন দমন করিবার জন্য কতকগুলি নূতন আইনের খসড়া তৈয়ার করিলেন। সরকার তখন তাহা পাঞ্জাব প্রদেশে জারী করার ব্যবস্থা করিলেন। দেশে রাউলাট বিলের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন সুরু হইল। মহাত্মা গান্ধী হইতে আরম্ভ করিয়া দেশের বড় বড় চিন্তাশীল নেতারা দেখিলেন যে, এই বিল আইনে পরিণত হইলে দেশের জাতীয় আন্দোলন সমূলে বিনষ্ট হইবে। তাই তাঁহারা ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। মহাত্মা গান্ধী পূর্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালাইয়াছিলেন—এখন তিনি তাঁহার সত্যাগ্রহ অস্ত্র লইয়া ভারতের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। সত্যাগ্রহ আন্দোলন জোরে চলিতে লাগিল। পাঞ্জাব ও বোম্বাই প্রদেশে “মার্শাল ল” জারী হইল, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ঘটিল। অহিংস সত্যাগ্রহীরা বেশীদিন অহিংস থাকিতে পারিল না। পুলিশ ও সৈন্যেরা তাহাদের উপর লাঠি-চার্জ ও গুলি চালাইতে লাগিল। উত্তেজিত জনসাধারণ তখন ক্ষিপ্ত হইয়া কয়েকটা সহর অধিকার করিয়া কোর্ট জ্বালাইয়া দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে দুই-একজন কর্মচারীকেও শেষ করিয়া দিল। কিছুদিনের মধ্যেই সরকার এই আন্দোলন দমন করিয়া দিলেন। চারিদিকে ধরপাকড় সুরু হইল। বহুলোকের জেল ও অনেকের ফাঁসীর আদেশ হইয়া গেল।

সরকার দমন-নীতির প্রয়োগ দ্বারা বিপ্লব আন্দোলন দমন করিলেন সত্য, কিন্তু দেশবাসীর মনের বিপ্লব দমন করিতে পারিলেন না। তাহাদের প্রাণে ক্রমশঃ আগুন জ্বলিতে লাগিল। শক্ত

শত যুবকের আত্মত্যাগ ও নির্যাতন ভোগ ব্যর্থ হয় নাই। তাহাদের ধ্বংসস্তূপ হইতে নূতন ভারত সৃষ্টি হইল, দেশে নূতন জাগরণ আসিল, দেশবাসী প্রাণের 'অব্যক্ত ব্যথা এখন স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিতে শিখিল। গভর্ণমেণ্টের দমন-নীতি ব্যর্থ হইল,—'মণ্টেগু-চেমস-ফোর্ড রিফর্ম' এর চাল ব্যর্থ হইয়া গেল। এখন হইতে সুরু হইল নূতন আন্দোলন। ইহা পূর্ব দুই আন্দোলন হইতে বৃহৎ ও ব্যাপক,—ইহাই "নন-কো-অপারেশন" বা অসহযোগ আন্দোলন। এই আন্দোলন শুধু যুবকদের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না,—ইহা দেশের জনসাধারণের আন্দোলন। গভর্ণমেণ্ট দেশবাসীকে সন্তুষ্ট করার জন্য যে "রিফর্ম" দিলেন, সর্বসাধারণ তাহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে লাগিল। নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করিলেন, সরকারের সহিত কোনরূপ সহযোগ করা হইবে না; আদালত বয়কট, স্কুল-কলেজ বয়কট ও নূতন শাসন-সংস্কার বয়কট করিতে হইবে এবং নূতন কাউন্সিলে কেহ যাইতে পারিবেন না। তখন খিলাফৎ আন্দোলন চলিতেছিল। দলে দলে মুসলমানগণ এই আন্দোলনে যোগ দিলেন। এই আন্দোলন ছিল ভারতব্যাপী এবং ইহাতে প্রায় পঁচিশ হাজার লোক জেলে যায়। ইহার পূর্বে কখনও রাজনৈতিক অপরাধে এত অধিক লোক জেলে যায় নাই। গভর্ণমেণ্ট দমন-নীতি চালাইলেন, বড় বড় নেতা ও কর্মীরা জেল ভর্তি করিতে লাগিলেন। মহাত্মা গান্ধী ঘোষণা করিলেন, ৩১শে মার্চের মধ্যে এক বৎসরে স্বরাজ লাভ হইবে।

আন্দামান হইতে ১৯২১ সালের শেষভাগে আমরা আলীপুর জেলে স্থানান্তরিত হওয়ার পর "হোম মেম্বার" স্যার হিউ ষ্টিফেনসন, যিনি পরে গভর্ণর হইয়াছিলেন, আমাদের সহিত দেখা করিতে আসেন। তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি আন্দামানে খুব Trouble দিয়াছ, তোমার বিরুদ্ধে আমাদের নিকট অনেক অভিযোগ আসিয়াছে, আশাকরি এখানে শান্তভাবে থাকিবে। আমি উত্তরে

বলিয়াছিলাম, আমরা সেখানে জেলকর্তৃপক্ষের অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছি মাত্র। আলীপুরের জেলের জেলার ছিলেন বড় 'রায়ণ' সাহেব। আমরা তাঁহার সদয় ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম এবং কিছুদিনের মধ্যেই আদর্শ কয়েদী বলিয়া গণ্য হইলাম। ঐ সময় বম ইয়ার্ডে ছিলেন, অমৃত লাল হাজরা (মানিক গঞ্জ ১৫ বৎসর) ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী (ময়মনসিং ১০ বৎসর) মদন ভৌমিক (ঢাকা ১০ বৎসর) খগেন চৌধুরী (মানিকগঞ্জ ৭ বৎসর) আশুতোষ লাহিড়ী (পাবনা ১০ বৎসর) গোপেন্দ্র লাল রায় (পাবনা ১০ বৎসর) ফণীভূষণ রায় (কুষ্টিয়া ১০ বৎসর) প্রফুল্ল চন্দ্র রায় (শ্রীহট্ট ৮ বৎসর) মথুর চক্রবর্তী (কুমিল্লা ৮ বৎসর) সুধীর মজুমদার (পাবনা ৮ বৎসর) অতুল দত্ত (কুমিল্লা ৮ বৎসর) নিকুঞ্জ পাল (কুমিল্লা ১০ বৎসর) গোবিন্দ কর (ঢাকা ১০ বৎসর) হরি চৈতন্য দে (বরিশাল ১০ বৎসর) নরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ চৌধুরী (নোয়াখালী যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর) সত্য বসু (বরিশাল যাবজ্জীবন) যতীন নন্দী (ময়মনসিং যাবজ্জীবন) অনুকুল চ্যাটার্জী (হুগলী যাবজ্জীবন) ভূপেন ঘোষ (কলিকাতা যাবজ্জীবন) নিখিল গুহ রায় (ফরিদপুর যাবজ্জীবন) সুরেন্দ্র বিশ্বাস (বরিশাল যাবজ্জীবন) নরেন ব্যানার্জী (ফরিদপুর ১০ বৎসর) মোহিনী বসু (ফরিদপুর ৮ বৎসর)। বম ইয়ার্ডে শ্বেতাঙ্গ প্রহরীর ব্যবস্থা ছিল।

অসহযোগ আন্দোলনের ফলে বাঙ্গালা দেশের জেলসমূহ এখন সত্যাগ্রহীদের দ্বারা ভর্তি হইয়া গেল,—আর লোক রাখার জায়গা রহিল না। এই আন্দোলনে মেয়েরাও অগ্রসর হইয়া আসিলেন এবং নির্যাতন ভোগ করিলেন। অবশেষে সরকার আর কাহাকেও জেলে পাঠাইতেন না, প্রহার করিয়া ছাড়িয়া দিতেন, অথবা লরী বোঝাই করিয়া রাত্র ১২টার সময় পনের-বিশ মাইল দূর কোন এক জায়গায় তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়া আসিতেন। জেলে যদি অল্প কয়েক জন রাজনৈতিক কয়েদী থাকে তবে তাহাদের উপর

আইন-কানুন চালানো বা বলপ্রয়োগ করা সহজ হয়, কিন্তু বহু লোক হইলে তাহা আর চলেনা। আলীপুর জেলে আমরা "বম, ইয়ার্ডে" (Bomb yard) ছিলাম। সত্যাগ্রহীরা যখন প্রথম আসিতে লাগিলেন, তখন আমরা তাহাদের সঙ্গে মিশিতে পারিতাম না। কিন্তু যখন বহু লোকের সমাগম হইল, তখন দলে দলে যুবকেরা দেওয়াল টপকাইয়া ইয়ার্ডে আসিতে লাগিলেন। অবশেষে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাদিগকে তাহাদের সহিত মেলামেশার সুযোগ দিলেন। বাঙ্গালা দেশের সমস্ত বড় বড় নেতৃবৃন্দ আলীপুর জেলে ছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, মৌলানা আক্রাম খাঁ, মৌলানা মুজিবর রহমান, পীর বাদসা মিঞা, ফরিদপুর চান্দমিয়া সাহেব, (করাটিয়া) জমিদার শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, শ্রীযুক্ত ত্রিপুরা চৌধুরী, কবি নজরুল, প্রোঃ নৃপেন ব্যানার্জি, প্রোঃ জে, এল, ব্যানার্জি, মহিমচন্দ্র দাস, (চট্টগ্রাম) বসন্ত কুমার মজুমদার (কুমিল্লা) সতীন সেন (বরিশাল) কিরণ শঙ্কর রায়, (জমিদার তেওতা) ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, (কলিকাতা) চিররঞ্জন দাস, (দেশবন্ধুর পুত্র) বসন্ত লাল মুড়ারকা, পদ্মরাজ জৈন, মূল চাঁদ আগড়ওয়ালা, হীরা লাল লোহিয়া, হাজী আবদুর রশীদ খান, (নোয়াখালী) নগেন্দ্রকুমার গুহ রায়, (মোক্তার, নোয়াখালী) হেমন্ত সরকার, ঈশান চক্রবর্তী (রংপুর) প্রভৃতি নেতারা সেখানে ছিলেন। আলিপুর জেলে তখন প্রায় ছয়শত সত্যাগ্রহী কয়েদী ছিলেন। নেতাদের প্রত্যেকেই বম্ ইয়ার্ডে আসিয়া আমাদের সাথে দেখা করিয়া গিয়াছেন। আমরাও পরে তাঁহাদের ইয়ার্ডে গিয়া সকলের সহিত আলাপ করিয়াছি। নেতাদের প্রত্যেকেই আমাদিগকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন এবং তাঁহাদের বাড়ী হইতে যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য আসিত আমরা তাহার ভাগ

পাইতাম। আমরা সাত-আট বৎসর যাবৎ জেলে আছি, বাহিরের খাদ্যদ্রব্য চোখে দেখি নাই। এখন আমাদের কাছে সব জিনিষই নূতন মনে হইতে লাগিল। কলা, কমলা, রসগোল্লা, চিড়াগুড় প্রভৃতির স্বাদ আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এখন মনে হইতে লাগিল আমরা বাঙ্গলাদেশে এবং জেলের বাহিরে আছি, আমরা পূর্বে কখনও ইয়ার্ডের বাহিরে যাইতে পারি নাই। এখন সর্বত্র বেড়াই এবং কত লোকের সহিত কত গল্প ও আলোচনা করি তাহার ঠিক নাই। আমাদের দিন কিভাবে যে কাটিয়া গেল তাহা টের পাইলাম না।

অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই যুবকের দল আমাদের বাধ্য হইয়া পড়িল। ইহাতে কোন কোন উপ-নেতার গাত্রদাহ হইতে লাগিল। তাহারা গিয়া দেশবন্ধুকে বলিলেন, বোম ইয়ার্ডের লোকেরা হিংসার কথা বলিয়া ছেলেদের মাথা বিগড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে। দাশ মহাশয় তাহাদের কথায় প্রথমে কর্ণপাত করেন নাই, পরে একদিন তাহাদিগকে বলিলেন, "ইহাদের কথা যখন আমার মনে হয়, তখন আমার সকল অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া যায়।" ইহার পর আর কেহ দাশ মহাশয়ের নিকট আমাদের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে সাহস পায় নাই। আমরা দাশ মহাশয়ের ভক্ত ছিলাম। তিনি আমাদিগকে খুব স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। একদিন তিনি আমাকে এবং শশাঙ্কবাবুকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহার পাশে বসাইয়া খাওয়াইয়া ছিলেন। সুভাষবাবু আমাদের পরিবেশণ করেন। আলিপুর জেলে সুভাষবাবুর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। পরে ১৯২৫ সনের প্রথম ভাগে রাজবন্দী অবস্থায় আমরা একসঙ্গে ব্রহ্মদেশে প্রেরিত হই ও মান্দালয় জেলে একত্র থাকি।

ঐ সময় বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলগুলি অসহযোগ আন্দোলন-কারিদের দ্বারা ভর্ত্তি-ছিল, তাহাদের মধ্যে ছিলেন তমিজউদ্দিন খাঁ (ফরিদপুর স্পীকার জাতীয় পরিষদ) গিয়াসুদ্দিন আহম্মদ (জামালপুর

ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী) আবু হোসেন সরকার (রংপুর ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী) আস্রাবউদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী (কুমিল্লা ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী) মুজিবর রহমান ফুলপুরী (সম্পাদক কৃষক ময়মনসিং) মৌলানা আলতাব হোসেন (ময়মনসিং)। অসহযোগ আন্দোলনের সময় স্কুল-কলেজ ভাঙ্গার সাথে সাথে কিছু জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। জেলে আমি শ্রীযুক্ত শাসমলের সহিত জাতীয় বিদ্যালয় সম্বন্ধে প্রায়ই আলোচনা করিতাম। আমি বলিয়াছিলাম, স্বদেশী আন্দোলনের সময় বহু জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল—কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটিও টিঁকে নাই এবং ঐ সকল বিদ্যালয় হইতে একটিও মানুষ বাহির হয় নাই। জাতীয় বিদ্যালয়গুলি যদি সরকারী বিদ্যালয়ের অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত হয় তবে সে বিদ্যালয়ের দেশে কোন প্রয়োজন নাই। জাতীয় বিদ্যালয়ের কাজ হইবে ছেলেদিগকে দেশপ্রেমিক করিয়া তোলা। জাতীয় বিদ্যালয়ে পড়িয়া যদি জাতীয় ভাব না জাগে, দেশপ্রেম না জন্মে, তবে সে শিক্ষা জাতীয় শিক্ষাই নহে। জাতীয় বিদ্যালয়ের ছেলেরা যদি দেশের কাজে না আসে, তাহাদের যদি অপর দশজনের মত চাকুরীই করিতে হয়, তবে জাতীয় বিদ্যালয়ের কোন প্রয়োজন নাই। জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্ররা দেশপ্রেমিক, নির্ভীক ও চরিত্রবান হইবে। তাহারা এরূপ শিক্ষা পাইবে যে, তাহার ফলে তাহারা দেশের সেবায় নিযুক্ত হইবে এবং প্রয়োজন হইলে দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিবে। এজন্য সর্বপ্রথমে প্রয়োজন কতকগুলি পুস্তক। আমাদের দেশে জাতীয় বিদ্যালয়ের উপযুক্ত কোন পাঠ্য পুস্তক নাই। শৈশব হইতে ছেলেদের কোমল প্রাণে দেশপ্রেমের বীজ বপন করিতে হইবে,—এজন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতেই জাতীয় শিক্ষা আরম্ভ করা দরকার। বীরেন্দ্রবাবু আমাকে বলিলেন যে, তাঁহার মেদিনীপুর জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনা আছে ও আমার উপর তিনি সংগঠনের ভার দিবেন। তিনি আমাকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তক লিখিতে উপদেশ দিলেন। আমি

প্রথম ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চম ভাগ পর্যন্ত লিখিলাম। আমার পাণ্ডুলিপি তিনি মাঝে মাঝে দেখিতেন এবং যে-সব জায়গায় পরিবর্তন করিতে বলিতেন, এবং আমি তাহা পরিবর্তন করিয়া দিতাম আমার লেখার কথা ইতিমধ্যে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল এবং একদিন হেমেন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় দাশ মহাশয়কে এই সংবাদ দিলেন। দাশ মহাশয় এই সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং খাতাগুলি দেখিতে চাহিলেন। আমি খাতাগুলি দাশ মহাশয়কে দিলাম। তিনি তাহা পড়িয়া বলিলেন, "আমার একটি প্রাইমারী এডুকেশন স্কীম আছে, খাতাগুলি তুমি আমাকে দাও।" আমি খাতাগুলি দাশ মহাশয়কে দিলাম। সুভাষবাবুও ইহা জানিতেন। দাশ মহাশয় মুক্ত হওয়ার সময় খাতাগুলি সঙ্গে লইয়া যান। অবশ্য আমার নিকটও আর এক কপি ছিল।

বন্যায় এখন আবার ভাঁটা পড়িল, ন'মাসে স্বরাজের তারিখ অর্থাৎ ৩১শে মার্চ পার হইয়া গেল, কিন্তু স্বরাজ আসিল না। অনেকেই নিরাশ হইয়া পড়িল। পূর্বে প্রায় সকলেই বিশ্বাস করিত ৩১শে মার্চের পর আর কাহাকেও জেলে থাকিতে হইবে না, আমাদিগকেও মহাত্মা গান্ধী জেল হইতে বাহির করিয়া লইয়া যাইবেন। কিন্তু কার্যতঃ সেরূপ কিছুই হইল না। সত্যাগ্রহীরা সকলেই জেল হইতে একে একে বাহিরে গেল, কেহই পুনরায় ফিরিয়া আসিল না,—শুধু আমরাই জেলে রহিলাম। এই সময় আমি গীতার ভাষ্য লিখিতে আরম্ভ করিলাম। জেলে আমি স্বামী কৃষ্ণানন্দ, তিলক মহারাজ, বঙ্কিমবাবু এবং আরও অনেকের গীতার অনুবাদ পাঠ করিয়াছি। তাঁহারা গীতাভাষ্যে পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন খুব, কিন্তু আমার পছন্দ হয় নাই। আমি গীতার শঙ্করভাষ্যও দেখিয়াছি। আমার মনে হইল, সকলেই নিজ নিজ মত গীতার মধ্য দিয়া চালাইয়া দিয়াছেন। আমার ইচ্ছা হইল, আমিও আমার মনোমত গীতার ভাষ্য লিখিব,—আমি গীতার রাজনৈতিক ব্যাখ্যা

করিলাম। গীতা আমাদের দেশে সকলেই পড়েন, এমন কি, গীতা পাঠ না করিলে হিন্দুর শ্রাদ্ধ কার্য্য সমাপ্ত হয় না। আমার মতে গীতার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, কোন সময় গীতার সৃষ্টি হইয়াছে এবং শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ শুনিয়া অর্জুন কি করিলেন। যখন উভয় পক্ষের সৈন্য যুদ্ধার্থ প্রস্তুত, তখন অর্জুন দেখিলেন এই যুদ্ধে বহু লোক ক্ষয় হইবে,—আত্মীয়-স্বজনদিগকে হত্যা করিতে হইবে এবং ভারত বীরশূন্য হইয়া পড়িবে। তিনি স্থির করিলেন যুদ্ধ করিবেন না। শ্রীকৃষ্ণ তখন অর্জুনকে বলিলেন, "তুমি ক্লীবত্ব পরিত্যাগ কর, ইহা তোমার মত লোকের শোভা পায় না।" তিনি তখন সমস্ত বেদ বেদান্ত মন্থন করিয়া জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগের আলোচনা করিয়া অর্জুনকে ইহাই বুঝাইলেন, "তোমার পৈত্রিক রাজ্যের পুনরুদ্ধার করাই তোমার একমাত্র ধর্ম।" শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে অর্জুনের সংশয় দূর হইল। তিনি "আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে" বলিয়া গাণ্ডীব উত্তোলন পূর্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ শ্রবণ করিয়াঅর্জুন জ্ঞানমার্গ অবলম্বন পূর্বক কোন নির্জন পাহাড়ের উপর যাইয়া ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া থাকেন নাই, অথবা ভক্তিমার্গ অবলম্বন পূর্বক গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া প্রেম বিতরণ করেন নাই,—তিনি যুদ্ধ করিয়াই পৈত্রিক রাজ্যের পুনরুদ্ধার সাধন করিলেন,—আমার নিকট ইহাই গীতার সারমর্ম। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন প্রকৃত উপদেষ্টা, আর অর্জুন ছিলেন উপযুক্ত শ্রোতা,—তাই গীতার উপদেশ কার্যকরী হইল ও দেশে হইল ধর্মরাজ্য স্থাপন। আমাদের দেশে যাঁহারা গীতা পাঠ করেন তাঁহাদের মধ্যে কয়জন বলিতে পারেন "আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে—আমি এখন আমাদের পিতৃরাজ্যের উদ্ধার সাধনে নিযুক্ত হইব,—দেশে ধর্মরাজ্য স্থাপন করিব এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করিব?" আমাদের দেশে সাধারণতঃ সাধু-সন্ন্যাসী হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই গীতা পাঠ করেন এবং মনে মনে গর্ব বোধ করেন যে বহু পুণ্য

সঞ্চয় করিলেন। আমিও ছোটবেলায় গীতাপাঠ করিয়া এরূপ মনে করিতাম। আমার দাদামহাশয় প্রত্যহ দিবানিদ্রার পর বৈকালে কাশীরাম দাসের মহাভারত পাঠ করিতেন। আমি "কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান" অথবা এই অধ্যায় পাঠ করিলে এরূপ পুণ্য হইবে ইত্যাদি শুনিয়া ভাবিতাম এত সস্তায় যখন পুণ্য সঞ্চয় হয় তখন আমি ইহা হইতে বঞ্চিত হইব কেন? দ্বিপ্রহরে আমার দাদামহাশয় যখন শুইয়া থাকিতেন তখন আমি তাঁহার মহাভারত খানা চুরি করিয়া পড়িতাম এবং মনে মনে গর্ববোধ করিতাম এই ভাবিয়া যে বহু পুণ্য সঞ্চয় করিলাম। এখন বুঝি বই পড়িলেই পুণ্য সঞ্চয় হয় না। মরুভূমিতে বসিয়া "জল জল" চীৎকার করিলেই জল পাওয়া যায় না, কষ্ট করিয়া জল সংগ্রহ করিতে হয়। আমরা চাই সহজে পুণ্য সঞ্চয় করিতে। কষ্ট করা প্রবৃত্তি নাই, তাই আমাদের পুণ্য সঞ্চয় হয় না, দুঃখও মোচন হয় না। আলিপুর জেলে আমি গীতার চারিটি অধ্যায়ের ব্যাখ্যা করি। আমি গীতার শ্লোকে সাধারণ ব্যাখ্যা লিখিয়া 'ভাবার্থে' আমার মত গীতার মধ্য দিয়া—অর্থাৎ "শ্রীকৃষ্ণের এই শ্লোক বলার এই অভিপ্রায় ছিল" এই ভাবে চালাইয়া দিয়াছি। ১৯২৪ সনে মুক্ত হইবার পর আমি মাত্র অল্প কয়েক মাস বাহিরে ছিলাম। কাজেই এই দিকে মন দিতে পারি নাই।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কারামুক্তি ও শিক্ষকতা

১৯২৪ সনের প্রথম ভাগে মুক্তির পূর্বে আমাকে আলিপুর জেল হইতে ময়মনসিংহ জেলে পাঠান হয়। সেখান হইতে মুক্ত হইয়া বার বৎসর পর বাড়ী যাই। বাড়ী গিয়া যখন আমি প্রথম মেজদাকে প্রণাম করিলাম, তিমি তখন আমার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। আমার পরিচয় দেওয়ার পর বাড়ীতে ও গ্রামে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। গ্রামে ও আশে-পাশের গ্রামের বহু লোক আমাকে দেখিতে আসিল, অনেকের সাথেই তখন আবার নূতন করিয়া পরিচয় হইল। লোক-জন রাস্তাঘাট সবই আমার কাছে নূতন ঠেকিল। বার বৎসরের ব্যবধান কম নয়, ইহার মধ্যে অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। বাড়ীতে আমি তুই তিন দিনের বেশী থাকিতে পারিলাম না। বাড়ী আসার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুদের তাগিদ আসিল। তাহাদের সহিত দেখা করার জন্য ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি হইয়া কলিকাতা গেলাম। মদনবাবু পূর্বে মুক্ত হইয়া কলিকাতায় একটি মেস খুলিয়াছিলেন। আমি সেখানেই উঠিলাম। ইতিমধ্যে আবার ধরপাকড় সুরু হইয়া গেল। একদিন আমি দাসমহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, "দক্ষিণ কলিকাতা জাতীয় বিদ্যালয়" এর অবস্থা বিশেষ ভাল নয়, তুমি কিছুদিন সেখানে থাক। ভাবিলাম, একটা হাইস্কুল আমার হাতে আসিবে,ইহা মন্দ কি, আমি রাজী হইলাম। ঐ স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন চণ্ডীবাবু। তিনি এম, এ, বি, এল। চণ্ডীবাবু, স্কুলের সেক্রেটারী এবং আরও তুই-একজন স্কুল কমিটির সভ্য দাশমহাশয়ের মুখে আমার প্রশংসা শুনিয়া আমাকে খুব আদর যত্ন করিয়া স্কুলে লইয়া গেলেন। প্রথম দিন স্কুলে যাইয়া ছাত্রদের

চেহারা দেখিয়া আমার মনে হইল, ইহা কি আমার পূর্বের মাইনর স্কুল? আমি গত দশ বৎসরের মধ্যে ছোট ছেলে দেখি নাই। এখন দেখিলাম এই দশ বৎসরে ছেলেদের পুষ্টি-বৃদ্ধি অসম্ভব রকম কমিয়া গিয়াছে। আমি ছেলেদের জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা কোন্ ক্লাসে পড়ে। কেহ বলিল, সেকেণ্ড ক্লাস, কেহ বা থার্ড ক্লাস। আমার কিন্তু মনে হইল, ইহারা পড়ে ফিপথ ক্লাসে বা তারও নীচে, উপরে ত নয়ই। আমিও এক সময় হাইস্কুলে পড়িয়াছি, কিন্তু এমন চেহারার ছেলে ত' দেখি নাই। একটি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার বয়স কত। উত্তরে সে বলিল ষোল বৎসর। আমি তাহাকে বলিলাম, তোমার বয়স কিছুতেই ষোল হইতে পারে না—এগার বৎসর। সে বলিল, আমি তবে স্যার, সেকেণ্ড ক্লাসে কি করিয়া পড়ি। আমার মনে হইতে লাগিল, এই দশ বৎসরে দেশ কতটা গরীব হইয়া পড়িয়াছে। এই যে দেশের ছেলের পুষ্টি-বৃদ্ধি কমিয়া গিয়াছে, ইহার কারণ দেশের দারিদ্র্য। এইভাবে যদি কয়েক পুরুষ চলে, তবে আমাদের প্রবাদ বাক্য সফল হইবে,—লোকে 'কোটা দিয়া বেগুন পাড়বে।' আমাকে এক বন্ধু বলিয়াছিলেন, আমার মা-বাপ আমাকে যাহা খাওয়াইয়াছেন, আমি তাহা আমার ছেলেমেয়েদিগকে খাওয়াইতে পারিব না,—আর আমি যাহা তাহাদিগকে খাওয়াইয়া গেলাম, তাহারা তাহাদের ছেলেমেয়েদিগকে তাহা খাওয়াইতে পারিবে না। ইহা অতি সত্য কথা। পঁচিশ বৎসর পূর্বে দেশের যেরূপ স্বচ্ছল অবস্থা ছিল, এখন তাহা নাই, দেশ ক্রমশঃই গরীব হইয়া পড়িতেছে; এরূপ ভাবে আর কত দিন চলিবে?

আমি মনে করিয়াছিলাম, দক্ষিণ কলিকাতা জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ করিয়া বেতন লইব না, কারণ বিদ্যা দান করাই উচিত, বিক্রয় করা উচিত নয়। আমাদের প্রাচীন ভারতে শিক্ষাকেন্দ্র ছিল মুনিঋষিদের তপোবন। সেখানে বিদ্যা বিক্রয়

করা হইত না, দান করাই হইত। আমাদের দেশীয় টোলে এখনও এই প্রথা বর্তমান আছে। আমি মদনবাবুর মেসে খাই, থাকি, পয়সা লাগে না, কিন্তু সার্পেণ্টাইন লেন হইতে প্রত্যহ হাঁটিয়া হরিশ মুখার্জী রোডে (৪।৫ মাইল) যাওয়া-আসা খুব কষ্টকর। ট্রাম ভাড়ার জন্য আবার কাহার নিকটই বা হাত পাতি। একদিন আমি বীরেন্দ্র শাসমল মহাশয়ের সাথে দেখা করিতে যাই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কি করি। তিনি আমার নিকট সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, আপনি আমার বাসায় ডাল-ভাত খাইবেন, থাকার জায়গা কম, একটু অসুবিধা হইবে। আমি আশ্বস্ত হইলাম, তাঁহার বাসা স্কুলের পাশেই ছিল, ইহার পর শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের বাসায় আমার একটা আড্ডা হইল।

গড়পাড়া মাইনর স্কুলের মাষ্টারী করার চৌদ্দ বৎসর পর আবার মাষ্টারী সুরু করিলাম। এখানেও আমি তিন মাস মাষ্টারী করিয়াছি। এই স্কুলে ফার্ষ্ট ক্লাসে একটি এবং সেকেণ্ড ক্লাসে বিশ-পঁচিশটি ছাত্র ছিল এবং এই সেকেণ্ড ক্লাসই ছিল আমার প্রিয় ক্লাস। স্কুলে আমার প্রথম দিনই হেডমাষ্টারবাবু আমাকে বলিলেন, আপনি যে ক্লাসে যে বিষয় ইচ্ছা পড়াইতে পারেন এবং কোন ক্লাসে কোন বিষয় পড়াইবেন, তাহা বলুন। আমি দেখিলাম আমার পক্ষে ইতিহাস পড়ান সহজ হইবে। আমি বলিলাম, উপরের চারি ক্লাসে ইতিহাস পড়াইব এবং ফিপথ্ ক্লাসে পড়াইব ইংরাজী। 'ইনফ্যাণ্ট' ক্লাসেও একঘণ্টা পড়াইতে চাহিলাম। চণ্ডীবাবু ও অন্যান্য শিক্ষকগণ ইহাতে কোন আপত্তি করিলেন না। এখানে নিশ্চিন্তমনে আমি শিক্ষকতার কাজ করিতে লাগিলাম। এখানে ইনস্পেক্টর মহিম বোস মহাশয়ের স্কুল পরিদর্শনের আতঙ্ক নাই, ফার্ষ্ট ক্লাসের ছেলেকে অঙ্ক কষানোরও ভয় নাই। আমি এখন ইতিহাস পড়াই। ইতিহাস পড়াইতে আমার কোন বেগ পাইতে হয় না। জেলখানায় আমি বহু ইতিহাস পড়িয়াছি। গ্রীস, রোম, ইংল্যাণ্ড ও সমগ্র ইউরোপের ইতিহাস

এবং অন্যান্য যায়গার আরও অন্যান্য ইতিহাস পড়িয়াছি। আমি রমেশ দত্তের ঋগ্বেদের অনুবাদ, কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত, মূল রামায়ণের অনুবাদ, বাইবেল, ধম্মপদ, কোরাণ ইত্যাদি সবই পড়িয়াছি। আন্দামানে অধ্যাপক বালকৃষ্ণ দেবের হিন্দীতে 'ভারতবর্ষ কা ইতিহাস' পড়িয়াছিলাম, তাহাতে প্রাচীন ভারতের গৌরবময় কাহিনী ছিল, তাহাতে প্রাচীন ভারতের যুদ্ধজাহাজ 'বেগিণী', 'মন্থরা' ইত্যাদির কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে। ইতিহাস পড়াইবার সময় আমি ছেলেদিগকে, বিশেষতঃ ফার্ষ্ট ক্লাস ও সেকেণ্ড ক্লাসে গ্রীক ও রোমানদের বীরত্ব-কাহিনী, তাহাদের দেশপ্রেম এবং প্রাচীন ভারতের গৌরবময় ইতিহাসের কথা বলিতাম। আমি বলিতাম, প্রাচীন ভারতে আমাদের যুদ্ধজাহাজ, হাওয়াই জাহাজ ও বেতারবার্তার প্রচলন ছিল; ভারতবাসী সর্বপ্রথমে আমেরিকা আবিষ্কার করে, জাপান আবিষ্কার করে; ভারতীয় বাণিজ্যপোত পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ করিত। আমার ছাত্ররা আমার নিকট এইসব গল্প শুনিয়া খুব উৎসাহের সহিত বাড়ী যাইয়া তাদের অভিভাবকদের নিকট বলিত, "আমাদের আন্দামান-ফেরৎ এক নূতন মাষ্টার আসিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন প্রাচীন ভারতে আমরা এতটা উন্নত ছিলাম।" ছাত্রদের অভিভাবকদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাহা বিশ্বাস করিতেন, কেহ কেহ বা করিতেন না। তাহারা প্রতিবাদ করিয়া বলিতেন, তোদের মাষ্টার এইসব গাঁজাখুরি গল্প কোথা হইতে পাইলেন—হয় নজীর দেখাইতে হইবে নতুবা বিশ্বাস করি না। তখন ছাত্রদের মধ্যে কেহ কেহ তাহাদের অভিভাবকদের নিকট অপদস্থ হইয়া আমাকে ধরিল নজীর দেখাইতে হইবে। কয়েকটি ছাত্র আমাকে খুবই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল, "স্যার, আপনি কোথায় এই সব পাইয়াছেন, তাহার নজীর দেখাইতে হইবে।" বাড়ী গেলে সকলে ঠাট্টা করে ও বলে, "আজ তোদের আন্দামান-ফেরৎ মাষ্টার কোন গাঁজাখুরি গল্প করিলেন?" নজীর

আমার পকেটে ছিল না। আমি নজীর কোথা হইতে দেখাইব। আমার এত টাকা বা সময় নাই যে, আমি সেই সব বই ক্রয় করিয়া তাহাদের দেখাইয়া আমার কথার সত্যতা প্রমাণ করিতে পারি। আমি ছেলেদিগকে কতকগুলি পুস্তকের নাম করিয়া বলিলাম, তাঁহাদিগকে বলিও, তাঁহারা যেন বাজার হইতে এই সব বই ক্রয় করিয়া পড়েন। অবশ্য আমার এই কথায় ছেলেরা বা তাহাদের অভিভাবকগণ কেহই সন্তুষ্ট হয় নাই।

আমি ছাত্রদিগকে খুব স্বাধীনতা দিতাম। আমার ছাত্ররা কখনও কখনও বলিত, স্যার, আজ আমাদের পড়া বন্ধ; আমরা আজ আপনার কাছ থেকে আন্দামানের গল্প শুনিব। আবার কখনও তাহারা বলিত, আজ আমরা বক্তৃতা দিব; অথবা রচনা লিখিব। আমি তাহাদের ফরমাইস মত কাজ করিতাম। পঞ্চম শ্রেণীতে পড়াইবার সময় মাঝে মাঝে যখন দেখিতাম ছেলেদের পড়ার দিকে মন নাই, তখন তাহাদিগকে বলিতাম, তোমরা দরজা বন্ধ করিয়া পাঁচ মিনিট দুষ্টামি কর,—তোমরা যাহা খুসি তাহাই করিতে পার, কিন্তু কথা বলিতে পারিবে না, গণ্ডগোল হইলে অপর ক্লাসের ক্ষতি হইবে। তাহারা ধাক্কাধাক্কি ও মাটিতে গড়াগড়ি করিত, এবং তাহাদের মুখে আনন্দের চাপাহাসি ফুটিয়া উঠিত। আমি বসিয়া তামাসা দেখিতাম। আবার কিছুক্ষণ বাদে তাহাদিগকে মিনিট পাঁচেক বিশ্রাম করিতে বলিতাম। তারপর আবার পড়া সুরু হইত। আমার মনে হইত, অত্যধিক পড়ার চাপে ছেলেরা এখন শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাদাদের মন আমোদ-প্রমোদের দিকে চালিত করিলে আবার সতেজ হইবে ও পড়ায় মন বসিবে।

'ইনফ্যাণ্ট' ক্লাসের ছাত্রেরা দুই-তিন দিন যাইতে না যাইতেই আমাকে চিনিয়া ফেলিল এবং আমাকে তাহাদেরই দলের একজন বলিয়া মনে করিয়া লইল। আমি স্থির করিয়াছিলাম, ছেলেদিগকে

কখনও প্রহার করিব না, খুব আদর করিয়া ডাক দিব। যখনই আমি 'ইনফ্যাণ্ট' ক্লাসের দরজায় সম্মুখে যাইতাম, ছাত্ররা তখনই একসঙ্গে দৌড়াইয়া আসিয়া কেহ আমার হাত, কেহ জামা, কেহ বা কাপড় ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইয়া আমাকে চেয়ারে বসাইয়া দিত এবং একসঙ্গে সকলেই বই লইয়া আসিয়া আমার নিকট পড়া দেওয়ার জন্য ভিড় করিত। আমার নিকট পড়া দেওয়ার আর একটা কারণ ছিল। পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট পড়া দিলে মার খাইবার ভয় ছিল, কিন্তু আমার নিকট সেই ভয় ছিল না। আমার ক্লাসে এত গণ্ডগোল হইত যে অপর ক্লাসে পড়ানো অসুবিধা হইত। ছাত্ররা আমার কোন কথা শুনিত না, গণ্ডগোল করিতে নিষেধ করিলে তাহারা গ্রাহ্যই করিত না, ধমক দিলে তাহারা হাসিত। কিন্তু মাঝে মাঝে যখন পণ্ডিত মহাশয় বেত্র হস্তে দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া ধমক দিয়া বলিতেন, "এখানে কি বাঁদর নাচ হচ্ছে", তখন সকলেই ভয়ে চুপ হইয়া যাইত, কাহারও মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইত না। আবার যে-ই মাত্র পণ্ডিত মহাশয় চলিয়া যাইতেন, আস্তে আস্তে গণ্ডগোল সুরু হইত। কিছুতেই আমি গোলমাল বন্ধ করিতে পারিতাম না,—উপরের ক্লাসেও গণ্ডগোল হইত, হেডমাষ্টার মহাশয়েরও এ সম্বন্ধে বদনাম ছিল। অন্যান্য মাষ্টার মহাশয়েরা আমাকে খাতির করিয়া কিছু বলিতেন না, কিন্তু হেডমাষ্টার সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ করিতেন যে, তিনি ক্লাস পরিচালনা করিতে জানেন না।

স্কুলে ছাত্ররা চরকায় সূতা কাটিত। আমি সূতা কাটিতে জানিতাম না, তাহাদের সহিত বসিয়া সূতাকাটা অভ্যাস করিতাম, ছাত্ররা আমার সূতা কাটা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইত এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করিত –'স্যার, আপনি এতবড় স্বদেশী, আন্দামান-ফেরত, আপনি সূতাকাটা জানেন না ?' সম্ভবতঃ তাহারা মনে করিত, যে সূতাকাটা জানে না সে আবার কিসের স্বদেশী। একদিন আমাদের স্কুলে

গোপীনাথ সাহার ফাঁসী উপলক্ষে শোকসভা হইল। স্কুলের ছাত্রেরা হেডমাষ্টার মহাশয়ের নিকট একখানা লিখিত দরখাস্তে জানাইল যে, তাহারা ঐ দিনের সভায় তাহাদের নূতন আন্দামান-ফেরত মাষ্টার মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিতে চায়। অন্যান্য শিক্ষকগণও আমার বক্তৃতা শুনিতে চাহিলেন। আমি ইহাতে বড়ই বিপদে পড়িলাম। বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যাস আমার নাই, পূর্বে কোন সভায়ও যোগ দেই নাই। অন্যভাবে গড়া আমরা। কিন্তু সকলেই নাছোড়বান্দা হইয়া ধরিল, আমার বক্তৃতা শুনিবে। যথাসময়ে সভা আরম্ভ হইল। চণ্ডীবাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। সভায় স্কুলের ছাত্র এবং শিক্ষকগণ ছাড়া অন্য কোন লোক উপস্থিত ছিল না। চণ্ডীবাবু আমাকে বক্তৃতা করিতে বলিলেন,— আমি বলিলাম, পরে বলিব। ক্রমাগত 'পরে পরে' করিতে করিতে যখন সকল বক্তার বক্তৃতা শেষ হইল, তখন বাধ্য হইয়া আমাকে দাড়াইতে হইল। আমি পাঁচ মিনিট বলিয়া বসিয়া পড়িলাম। এই হইল আমার প্রথম বক্তৃতা। আমি যেভাবে এবং যাহা বলিলাম, সেজন্য নিজেই লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। সকলেই ভাবিয়াছিল আন্দামান-ফেরৎ বিপ্লবী না জানি কি বলে, কিন্তু আমার বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই নিরাশ হইয়া পড়িল।

আমি যখন দক্ষিণ কলিকাতা জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ করি, তখন যতীন দাস মাঝে মাঝে আমার সহিত দেখা করিয়াছে, আমিও সময় সময় তাহাদের বাড়ী গিয়াছি, মাঝে মাঝে রাত্রে সেখানে কাটাইয়াছি। যতীনের সেবা-যত্ন ভুলিবার নয়। যতীন ছিল নির্ভীক, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। ৬৩ দিন অনশনের ফলে জেলে যতীনের মৃত্যু হয়। পূর্বে রাজনৈতিক বন্দীদের জেলে কোন শ্রেণী-বিভাগ ছিল না, সকলকেই সাধারণ কয়েদীর মত থাকিতে হইত। যতীনের অনশনের ফলে দেশব্যাপী যে তীব্র আন্দোলন দেখা দেয় তাহারই ফলে জেলে শ্রেণী-বিভাগ

হয়। অবশ্যই যতীন চাহিয়াছিল, সকল রাজনৈতিক বন্দীকে একটা বিশেষ শ্রেণী বলিয়া গণ্য করিতে। যতীন অনুশীন সমিতির সভ্য ছিল। যতীন দাসের মৃত্যুর পর তাহার শবের শোভাযাত্রায় প্রায় দুই লক্ষ লোকের সমাবেশ হইয়াছিল।

আমরা মাঝে মাঝে স্কুলের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিতে বাহির হইতাম। একদিন প্রাতে আমি, কুলদাবাবু এবং আরও দুইজন শিক্ষক চণ্ডীবাবুর বাসায় গেলাম। আমরা একসঙ্গে বাহির হইব, চণ্ডীবাবু তখনও নিদ্রিত ছিলেন। আমি চণ্ডীবাবুর বাবাকে বলিলাম,একটু অনুগ্রহ করিয়া চণ্ডীবাবুকে ডাকিয়া দিন। চণ্ডীবাবুর বাবা ছিলেন একজন বড় ডাক্তার। তিনি বলিলেন, সে যখন এখন পর্যন্ত ঘুমাইয়া আছে, তখন আমি তাহাকে জাগাইতে পারিব না। তার ঘুমাইয়া থাকার অর্থ তার system এখনও ঘুম চায়। চণ্ডীবাবুর 'সিষ্টেম' যে কতক্ষণ ঘুম চাহিবে তাহার কোন স্থিরতা নাই -- সেটা বেলা দশটা পর্যন্তও হইতে পারে। আমি সেই বাসার একটি ছেলেকে বলিলাম. শীঘ্র চণ্ডীবাবুকে জাগাইয়া দিতে। সে চণ্ডীবাবুকে জাগাইয়া দিল—আমরা একসঙ্গে বাহির হইলাম। স্থানীয় কয়েক জন ভদ্রলোকের নিকট হইতে কিছু সংগ্রহ করিয়া আমরা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের নিকট গেলাম। শরৎবাবু আমাদের নিকট স্কুলের অবস্থা শুনিয়া দেড়শত (১৫০)টাকার একখানা চেক দিলেন। এত টাকা যে পাইব তাহা আমরা কল্পনাই করি নাই।

দক্ষিণ কলিকাতা জাতীয় বিদ্যালয়ে তখন শিখ ও হিন্দুস্থানী ছাত্র অনেক ছিল এবং তাহাদের জন্য একজন হিন্দুস্থানী পণ্ডিত ছিলেন। উনি যখন অনুপস্থিত থাকিতেন, তখন আমিই তাহাদিগকে হিন্দী এবং গুরুমূখী পড়াইতাম। মাঝে মাঝে আমি দেশবন্ধুর সাথে দেখা করিতাম। আমার লিখিত খাতাগুলি সম্বন্ধে আমি তাঁহাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করি নাই,—ভাবিয়াছিলাম যখন তিনি সুবিধা মনে

করেন, তিনি নিজেই তাহার ব্যবস্থা করিবেন। তিনি নানা কাজে ব্যস্ত থাকিতেন, শরীরও তাঁহার অসুস্থ ছিল। বীরেন্দ্রবাবুকে (শাসমল) একদিন তাঁহার মেদিনীপুরের প্রাইমারী শিক্ষার পরিকল্পনার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন, তাহা তিনি ভুলেন নাই। শিক্ষকতার কাজ আমার খুব ভাল লাগিয়াছিল,কিন্তু বেশী দিন একাজে থাকিতে পারি নাই। পুলিশ আমার পিছনে লাগিয়াই ছিল—সর্বদা আমার গতিবিধি লক্ষ্য করিত। এদিকে বহু লোক বিচারে আটক হইয়াছে। আমার চারিদিকে একটু যাওয়ার প্রয়োজন। তাই স্থির করিলাম, গ্রীষ্মের বন্ধের পর আর স্কুলে আসিব না। আমার হাতে টাকা ছিল না। স্কুল বন্ধের কয়েক দিন পূর্বে আমি হেডমাষ্টার মহাশয়কে বলিলাম, আমি একমাসের বেতন চাই। আমি তিনমাস মাষ্টারী করিয়াছি। পূর্বে বেতনের টাকা চাই নাই—এখন বাধ্য হইয়া বিশ টাকা গ্রহণ করিলাম। বন্ধের পর আর স্কুলে আসি নাই। পুলিশ এখন অনুসন্ধান করিতে লাগিল আমি কোথায় আছি।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

জাল নোট তৈয়ার

আমরা টাকা তৈয়ার করা ও নোট জালের চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কোনটাতেই আশানুরূপ সফল হই নাই। আমরা ছাঁচ তৈয়ার করাইয়া, রূপা গালাইয়া ছাঁচের মুখ দিয়া তাহা ঢালিয়া দিয়াছি টাকা ঠিকই হইয়াছে কিন্তু ছাঁচের মুখের খাঁজকাটা ঠিক হইত না, একটু লক্ষ্য করিলেই তাহা ধরা পড়িত। টাকার আওয়াজও ঠিক হইত না।

আমরা নোট জাল করিয়াছি, আমাদের নোট বাজারেও কিছুদিন চলিয়াছে কিন্তু জল-ছাপ ঠিক না হওয়ায় তাহা ধরাও পড়িয়াছে। আমাদের ১০০ টাকা ও ১০ টাকার নোটের ব্লক ছিল। ১৯২৪ সনে মুক্তির পর আমি কিছু দিন ঢাকাতে ও পরে ময়মনসিংহ সহরে নোট জাল করিয়াছি। ঢাকায় আমাদের একটি বি, এস, সি, ক্লাসের ছাত্র আমাকে সাহায্য করিত। তখন ঢাকাতে অনুশীলন সমিতির কাজ চালাইতেছিল বর্তমান "নমামি'র" লেখক শ্রীমান জিতেশচন্দ্র লাহিড়ী। জিতেশ আমাদের বাসার এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিল। আমরা নোটের কাগজ খসখসে করার জন্য এসিডে ভিজাইয়া পার্চমেন্ট (parchment) করিয়া সেই কাগজ ব্লকে ছাপাইয়াছি। আমাদের জল-ছাপ ঠিক হইত না, এক সপ্তাহের মধ্যেই দাগ পড়িয়া যাইত। একদিন আমাদের টাকার খুব প্রয়োজন, রান্না বন্ধ, আমি তখন নূতন ছাপান একশ টাকার একটি নোট দিলাম, আমার নোট লইয়া একটি যুবক মুদী দোকানে গিয়া নোট ভাঙ্গাইয়া চাউল-ডাইল খরিদ করিয়া লইয়া আসিল। মুদি কয়েক দিন পর টের পাইল ইহা জাল নোট। তখন ঐ নোটের জল-ছাপ বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে, একটু লাল রং ধরিয়াছে। সে ভয়ে তখন

একথা আর প্রকাশ করে নাই, কারণ জানাজানি হইলে পুলিশ তাহাকে টানাটানি করিবে।

এই জাল নোট তৈয়ারের কেন্দ্র কিছুদিন পর ঢাকা হইতে ময়মনসিংহ সহরে স্থানান্তরিত হয়। আমি তখন আত্মগোপন করিয়া আছি। আমাদের নোট তৈয়ার করার জন্য একটি বাসা ভাড়া করা হয়। সেই বাসায় আমাদের দলের কয়েকটি বিশ্বাসী কলেজের ছাত্র থাকিত। আমাদের বাসায় ঠাকুর চাকর ছিল না, নিজেদেরই সব কাজ করিতে হইত। ঐ বাসায় আমি এবং প্রবোধ দাশগুপ্ত থাকিতাম। আমরা দ্বিপ্রহরে নোট তৈয়ার করিতাম, দিনের বেলায় বাহির হইতাম না। একদিন সন্ধ্যার পর আমি বাহির হইয়াছি, আমার পকেটে আমার তৈয়ারী একটি দশ টাকার নোট ছিল। আমি কয়েক জনের সহিত দেখা করিয়া রাত্র দশটার সময় বিনয় চৌধুরীর বাসায় যাই, বিনয় তখন কলেজের ছাত্র। বিনয়ের সহিত আলাপ করিতে করিতে রাত্রি প্রায় ১১টা, তখন বিনয় বলিল, "এত রাত্রে কোথায় যাইবেন, এখানেই শুইয়া পড়ুন।" আমি বিনয়ের সহিত এক লেপের তলে শুইয়া আছি, কিছুক্ষণ পর কেন যেন ইচ্ছা হইল পকেটের নোটটা নষ্ট করিয়া ফেলি। আমি তখন উঠিয়া একটা ম্যাচ ধরাইয়া নোটটা পোড়াইয়া ফেলিলাম। শেষ রাত্রে ঐ বাসা পুলিশ ঘেরাও করিয়াছে, আমার জন্য নয়, ঐ বাসায় অস্ত্র-শস্ত্র আছে কিনা দেখার জন্য। পরদিন প্রাতে আমি এবং বিনয় ধৃত হই। ঐ বাসায় আপত্তিকর কোন জিনিষ পাওয়া যায় নাই।

আমার ধৃত হওয়ার পরে নোট জালের কেন্দ্র সোনারগাঁ স্থানান্তরিত করা হয়, সেখানে প্রবোধ দাশগুপ্ত ও শচীন্দ্র চক্রবর্তী নোট তৈয়ার করিত। কিছুদিন পর প্রবোধ ও শচীন্দ্র নোট জালের প্রেস, ব্লক, জাল নোট প্রভৃতি সহ ধৃত হয়। ইহার পর তাহাদের বিরুদ্ধে জাল নোট তৈয়ারের অভিযোগে ঢাকায় মামলা হয়। ঐ মামলায় প্রবোধ ও শচীন পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

এই জাল নোট দ্বারা গভর্ণমেণ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই, ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে দেশের সাধারণ লোক। এই অনিচ্ছাকৃত বঞ্চনার জন্য আমরা মনে মনে বেদনা বোধ করিতাম। ডাকাতি আমরা ছাড়িয়া দিয়াছি, এখন দল চালানোর টাকা আসে কোথা হইতে ? আমরা "জল-ছাপ" উন্নত করার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু সফল হই নাই।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

জেলে চতুর্থ বার

ইতিমধ্যে আমার নামে তিন আইনের ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে। পুলিশ আমার অনুসন্ধান করে। আমি কলিকাতা,ঢাকা,ময়মনসিংহ, কুমিল্লা সর্বত্রই যাতায়াত করি। আই,বি,র লোকের সাথে রাস্তায় দেখাও হয়। তাহারা আমাকে দেখিয়াও চিনিতে পারে না,— আমি মনে মনে হাসি। পূজার পর কয়েক দিন ধরিয়া ময়মনসিং আছি। ওখানকার আই, বি, ইনস্পেক্টার, সাব ইনস্পেক্টার প্রত্যেক-কেই চিনি, কিন্তু তাহারা আমাকে চিনিত না। কাজেই প্রকাশ্য ভাবেই আমি চলাফেরা করিতাম। ১৯২৪ সালের নভেম্বর মাসে একদিন রাত্রে ঘুরিতে ঘুরিতে প্রায় এগারটার সময় ননীর বাসায় যাই। 'ননী' (বিনয় চৌধুরী)আই, এস, সি পড়িত। তাহার সাথে কিছুক্ষণ গল্প করার পর মনে হইল এত রাত্রে আর কোথায় যাই। আমি তাহার বিছানায় তাহার সাথে শুইয়া পড়িলাম। এদিকে পুলিশ ঠিক করিয়াছে শেষ রাত্রে এবাড়ী তল্লাসি করিবে,—আমার জন্য নয়, অস্ত্র-শস্ত্র বা অন্য কিছু যদি পায়। আমি পূর্বে কোন সন্দেহ করি নাই। নিশ্চিন্ত মনে শুইয়া আছি, শেষরাত্রে পুলিশ বাড়ী ঘেরাও করিল। প্রাতে

পুলিশ দরজা ধাক্কা দিতে লাগিল,—ননী দরজা খুলিয়া দিল। আমাকে দেখাইয়া পুলিশ ননীকে জিজ্ঞাসা করিল, ইনি কে? উত্তরে ননী বলিল, আমার কাকা—বাড়ী হইতে আসিয়াছেন। যে কাকার বাসায় ননী থাকিত তিনি একজন সরকারী স্কুল মাষ্টার। আমি মনে করিলাম, পুলিশ যখন ননীর কাকাকে আমার কথা জিজ্ঞাসা করিবে, তিনি তখন অবশ্যই বলিবেন, আমাকে চিনেন না। আমি তাই পলাইবার চেষ্টায় রহিলাম। ননীর উপরই পুলিশের নজর খুব বেশী ছিল। এই সুযোগে আমি আস্তে আস্তে রাস্তার দিকে অগ্রসর হইলাম। দারোগাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় যান? আমি বলিলাম, মুখ ধুইতে। তিনি বলিলেন, শুনুন। আমি দিলাম ভোঁ দৌড়। আমার সঙ্গে সঙ্গে কয়েক জন পুলিশ দৌড় দিল। কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর একটি কর্দ্দম যুক্ত খাল সম্মুখে পড়িল, আমি একলাফে খাল পার হইয়া গেলাম, কিন্তু সিপাহীদের খাল পার হইতে কয়েক মিনিট বিলম্ব হইল, আমি ইতিমধ্যে তাহাদের দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেলাম। আমি তখন বহু দূর চলিয়া গিয়াছি। পিছনে ফিরিয়া যখন দেখিলাম রাস্তায় লোক নাই, তখন সাধারণভাবে বিভিন্ন রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিলাম। এক রাস্তা হইতে অপর রাস্তায় আসিয়া হঠাৎ দেখিলাম, আমার সম্মুখে একদল পুলিশ—তাহারা আমারই অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছে। এখন আমাকে পাইয়া মহানন্দে তাহারা আমাকে ননীর বাসায় লইয়া গেল। পুলিশ ইনস্পেক্টার আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি দৌড় দিলেন কেন? আমি বলিলাম, আমি দৌড় দিব কেন? আমি রাস্তা দিয়া যাইতে ছিলাম, আমাকে ধরিয়া লইয়া আসিয়াছে। ননী বলিল, কাহাকে লইয়া আসিয়াছেন? ইনি ত রাত্রে এখানে ছিলেন না। একে আমি চিনি না। ননীর কাকা বলিলেন, তিনি আমাকে চিনেন না। ইনস্পেক্টার বাবু আমার নাম জিজ্ঞাসা করায়

আমি বলিলাম, পুলিশের লোককে আমি খুব ঘৃণা করি, কাজেই আমি কোন কথা বলিব না। তাহাদের সন্দেহ হইল আমি একজন পলাতক আসামী। ননী কিছুই স্বীকার করিল না এজন্য তাহাকেও গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া গেল এবং আমার বিষয় জানিবার জন্য ননীকে নানা প্রকার প্রশ্ন করিতে ও নানা হিতোপদেশ দিতে লাগিল। ননী বলিল, 'আপনারা কেন আমার পিছনে লাগিয়াছেন, পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, আমি কিছু জানি না।' সে আমাকে দেখাইয়া বলিল, 'এই ভদ্রলোককে ত একটা প্রশ্নও করিতেছেন না।' তাহারা বলিল, যে নিজের নামই বলে না, তাহাকে আবার কি জিজ্ঞাসা করিব? আই. বি-র কর্মচারীরা চারিদিক হইতে লোক আনাইয়া আমাকে সনাক্ত করাইতে লাগিল; অবশেষে প্রমাণ হইল, আমি ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী। সেইদিনই আমাকে কলিকাতা চালান দিল। ননীকে থানায় রাখিয়া তাহার পিতাকে টেলিগ্রাম করিয়া আনান হইল। ননীর পিতা শ্রীযুক্ত তারিণী চৌধুরী মহাশয় ঈশ্বরগঞ্জে ওকালতি করিতেন। ননী তাঁহার একমাত্র পুত্র। তিনি জানিতেন, ননী দুর্বলতা দেখাইলে তাহাকে ছাড়িয়া দিবে, পুলিশ তাঁহাকে এই জন্যই আনাইয়াছে। কিন্তু ননীর পিতা তাহার সহিত দেখা করিয়া বলিলেন, 'তুমি কোন রকম দুর্বলতা দেখাইয়া কাহারও সর্বনাশ করিও না বা বিশ্বাসঘাতকতা করিও না।' পিতার মুখ হইতে সচরাচর এরূপ কথা বাহির হয় না। ননী কোন প্রকার দুর্বলতা দেখাইল না, ফলে তাহাকে বিনাবিচারে চারি বৎসর আটক থাকিতে হইল। ননী এখন প্রফেসার।

দশ বৎসর জেল খাটার পর দশ মাসও বাহিরে থাকিতে পারিলাম না। ১৯২৪ সনের শেষভাগেই আবার ধৃত হইলাম। ময়মনসিংহ হইতে আমাকে কলিকাতায় 'ইলিশিয়াম রো'তে (এখন লর্ড সিংহ রোড) লইয়া যাওয়া হইল, এবং সেখানে

আই, বি-র বড় বড় কর্মচারীরা আমাকে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিয়া আবার আলীপুর জেলে পাঠাইয়া দিলেন। এখন আমি কয়েদী নই—সম্মানিত অতিথি,—ষ্টেট প্রিজনার। এখন আর জেলার, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অফিসে গেলে পূর্বের মত দাঁড়াইয়া থাকিতে হয় না—বসার জন্য চেয়ার পাই। ইতিমধ্যে আমার বড় ভাইপো শ্রীমান জিতেন্দ্র আমার সাথে দেখা করিতে আসে। সে তখন "বেঙ্গল টেকনিক্যাল"-এ পড়ে। আমাদের দেখা হওয়ার সময় মহম্মদ ইউসুফ নামে একজন আই, বি, ইন্সপেক্টর উপস্থিত ছিলেন। তিনি আদেশ দিলেন, আমরা দূর হইতে পরস্পরকে দেখিতে পারিব, কিন্তু কথা বলিতে পারিব না, কারণ শ্রীমান তাহার দরখাস্তে লিখিয়াছিল "I wish to see my uncle". এবং ইহাই মঞ্জুর করা হইয়াছে। দরখাস্তে দেখা করার কথা আছে,—কথা বলার অনুমতি দেওয়া হয় নাই; কাজেই আমরা কেবল দেখাই করিতে পারিব। কিন্তু কথা বলিতে পারিব না। আমি রাগ করিয়া চলিয়া গেলাম। ইহার একমাস পর, ১৯২৪ সনের শেষভাগে, আমি মেদিনীপুর জেলে স্থানান্তরিত হই। ওখানে যাইয়া বাঙ্গলা সরকারের নিকট আমার ভাইপোর সহিত দেখা করার সময় যে ঘটনা ঘটিয়াছিল,—অর্থাৎ দেখা করিতে পারিব, কথা বলিতে পারিব না,—তাহা লিখিয়া জানাই। আমার ঐ দরখাস্তে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে একটু তীব্র সমালোচনাও ছিল—কিন্তু ঐ দরখাস্তের আমি কোন উত্তর পাই নাই। ইহার কিছুদিন পর ১৯২৫ সনের জানুয়ারী মাসের শেষভাগে ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত মান্দালয় জেলে স্থানান্তরিত হই। মেদিনীপুর জেল হইতে আমি হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছি এবং তথা হইতে আমাকে লালবাজার লইয়া যায়। সেখানে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ ও মদনমোহন ভৌমিক প্রভৃতির সহিত মিলিত হই। তারপর আমরা সকলে একসঙ্গে রেঙ্গুনগামী জাহাজে

গিয়া উঠি। আমাদের সঙ্গে গেলেন স্বয়ং লোম্যান সাহেব। জাহাজে আমরা তিন দিন ছিলাম এবং খুব আনন্দে কাটাইয়াছি। আন্দামান যাওয়া ও আসার সময়ে সমুদ্রে খুব ঢেউ ছিল, কিন্তু এবার আর ঢেউ নাই। সমুদ্রবক্ষ হইতে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত খুব ভাল দেখা গেল। জাহাজে আমরা সকালে ও বিকালে বেড়াইতাম। আই, বি, র দারোগাবাবুরা আমাদিগকে চোখে চোখে রাখিতেন, বন্দুকধারী প্রহরীও ছিল। একদিন বিকালে আমি ও সত্যেনবাবু বেশ দ্রুতগতিতে বেড়াইতেছি, দারোগাবাবু একটু দূরে বসিয়াছিলেন—এমন সময় লোম্যান সাহেব উপরে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া দারোগাবাবুর খুব ভয় হইল। তিনি যে দূরে আছেন, লোম্যান সাহেব বুঝি তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা হইলে তাহার চাকুরী যাইবে! পরে তিনি অপর দারোগাবাবুদিগকে বলিতেছিলেন, 'মহারাজের (আমি) সহিত সত্যেনবাবুর দেখা হইলে তাঁহাদের ভ্রমণের গতি এত দ্রুত হয় যে, তাঁহাদিগকে অনুসরণ করিতে ঘোড়ার প্রয়োজন হয়।' তিনি দুঃখ করিয়া বলিলেন, আমাদের জন্য তিনি মারা যাবেন। আমি তাঁহাকে আশ্বস্ত করার জন্য বলিলাম, 'আপনি কোন চিন্তা করিবেন না—লোম্যান সাহেবের সহিত আমার খাতির আছে,—যদি তিনি আপনাকে কিছু বলেন, তবে, আমি আপনার জন্য সুপারিশ করিব।' উত্তরে তিনি বলিলেন, 'বেশ পরামর্শ দিলেন, আপনি যদি সুপারিশ করেন তবে এখুনিই আমার চাকুরী যাইবে—আর বিলম্ব হইবে না'।

রেঙ্গুন হইতে আমরা মান্দালয় জেলে যাই। মান্দালয় জেল মান্দালয় ফোর্টের ভিতর এবং রাজা থিবোর প্রাসাদের নিকট। মান্দালয় জেলে আমরা তেরজন একত্র ছিলাম। সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্র স্বদেশী আন্দোলনের সময় ঢাকায় থাকিয়া পড়িতেন এবং অনুশীলন সমিতির একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। মান্দালয় জেলে পৌছানর পরই সুভাষবাবু বলিয়াছিলেন, মহারাজের সিট

আমার পাশে থাকিবে এবং সুভাষবাবুর পাশে আমার থাকার সৌভাগ্য হইয়াছিল। সুভাষবাবুর জন্ম বড় ঘরে, শৈশব হইতে তিনি সুখে লালিত পালিত হইয়াছেন। কিন্তু দেশের জন্য দুঃখ-কষ্ট বরণ করিতে তিমি কাহারও অপেক্ষা পশ্চাৎপদ ছিলেন না। তিনি অম্লানবদনে সকল কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। তিনি সকল অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। খাওয়া-দাওয়া ব্যাপারে কোন আপত্তি নাই তাঁহার—যাহা পান তাহাই খান। চাকর-বাকরদের উপরও তাঁহার ব্যবহার খুব সদয়, কখনও কটু কথা বলেন না। কাহারও অসুখ হইলে তিনি নিজে সারারাত্রি জাগিয়া সেবা করিতেন। একবার টেনিস খেলিতে যাইয়া আমি পড়িয়া যাই—তাহাতে হাঁটুর চামড়া উঠিয়া যায় ও ঘা হয়। সুভাষবাবু প্রত্যহ নিজহাতে আমার ঘা নিমপাতা সিদ্ধ জল দ্বারা ধোয়াইয়া দিতেন। খেলা, হৈ চৈ, আমোদ-প্রমোদ সবটাতেই তাঁহার বেশ উৎসাহ ছিল। কয়েদীরা খালাসের সময় সুভাষবাবুর কাছে কাপড় জামা চাহিত। তিনি কাহাকেও 'না' বলিতে পারিতেন না। সুভাষবাবুর মত লোককে জেলখানায় সঙ্গী হিসাবে পাওয়া খুব সৌভাগ্যের বিষয়।

মান্দালয় জেলে আমরা পূজার টাকার জন্য অনশন করি। অনশন ব্রতে সকলেরই খুব উৎসাহ ছিল। চৌদ্দ দিন অনশন করার পর সরকার আমাদের দাবী স্বীকার করিলেন, এবং আমরা অনশন ভঙ্গ করিলাম। মান্দালয় জেল হইতে আমাকে ইনসিন জেলে পাঠান হয়,—ইনসিন জেল হইতে পুনরায় মান্দালয় জেল ও পরে মিঞ্জান জেলে যাই। মিঞ্জান জেলে আমরা দুই জন ছিলাম। ব্রহ্মদেশের বিখ্যাত দস্যুনেতা সামফে সেই জেলে ছিল। আমাদের কাজকর্ম ব্রহ্মদেশীয় কয়েদীরাই করিত, সুতরাং কাজ চালাইবার উপযুক্ত কিছু কিছু ব্রহ্মভাষা শিখিয়াছিলাম, আমরা মাঝে মাঝে গোপনে সামফের সহিত দেখা করিয়া ব্রহ্মভাষায়

১৬৩

কম করিতাম। সে আমাদের খুব বাধা হইয়া পড়িল।

পর সামকের ফাঁসী হইয়া গেল; আমরা তখন ইনসিন জেলে চলিয়া গিয়াছি। দ্বিতীয় বার যখন আমি মান্দালয় জেলে যাই, লোম্যান সাহেব তখন আমাদের মন পরীক্ষার জন্য সেখানে যান। তিনি একে একে সকলকে আফিসে ডাকাইয়া আলাপ করিলেন। আমি তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, আমাকে কেন আটক রাখা হইয়াছে? তিনি বলিলেন "পাছে তোমরা হিংসামূলক কার্য আরম্ভ কর।" আমি বলিলাম, 'আমি বা আমার বন্ধুদের মধ্যে কেহ হিংসামূলক কার্য করে নাই।' লোম্যান বলিলেন "আমি এইরূপ রিপোর্ট পাইয়াছি যে, তোমরা হিংসামূলক কার্য করাব জন্য পরামর্শ করিতেছিলে।" আমি বলিলাম, "হিংসামূলক কার্য করা এমন কোন কঠিন কাজ নয় যাহার জন্য আবার পরামর্শ করিতে হইবে,—আপনি কি মনে করেন যে, আমরা ইচ্ছা করিলে দু-চার-দশটা ডাকাতি বা খুন করিতে পারিতাম না?" তিনি বলিলেন, তোমার অতীতের যেরূপ ইতিহাস আছে, তাহাতে বিশ্বাস করি, ইচ্ছা কবিলে তাহা করিতে পারিতে;—পাছে তোমরা দেশে অশান্তিব সৃষ্টি কর এজন্য তোমাদিগকে আটক রাখা হইয়াছে। ইহা সাবধানতামূলক (precautionary) ব্যবস্থা। তিনি আমাকে প্রশ্ন করিলেন, দেশে যে যুবকদের মধ্যে হিংসামূলক কার্য করার প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে তাহা দমন করা যায় কি কবিয়া, এবং এ সম্বন্ধে তোমার মত কি? আমি বলিলাম, ইহা হিংসামূলক কার্য করার প্রবৃত্তি নয়, দেশকে স্বাধীন করার প্রবৃত্তি। আপনারা ভারতবর্ষকে যদি স্বাধীনতা দেন, তবেই ইহার দমন হইতে পারে—শুধু দমননীতি দ্বারা ইহা বন্ধ হইবে না। তিনি বলিলেন, 'আমরা যদি ভারতবর্ষ ছাড়িয়া চলিয়া যাই, তবে তোমরা কি দেশ রক্ষা করিতে পারিবে? তোমরা নিজেরা নিজেরা মারামারি, কাটাকাটি করিয়া ধ্বংস হইবে'। তিনি ইংরেজগণ ভারতবর্ষের কি কি উপকার করিয়াছেন, ইংরাজ রাজত্বে ভারতবর্ষ

কতটা উন্নত হইয়াছে এবং কিভাবে আমাদিগকে আস্তে আস্তে উন্নত করিয়া স্বরাজ দেওয়া হইতেছে,ইত্যাদি মামুলি গদ বলিলেন। ইহার কয়েকমাস পর,—সম্ভবতঃ ১৯২৭ সনে ইন্সপেকটর নরেশ চন্দ্র দত্ত কতকগুলি সর্ত লইয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন,আমরা যদি ঐ সর্তগুলি মানিয়া চলিতে রাজী হই, তবে গভর্ণমেণ্ট আমাদিগকে মুক্তি দেওয়ার কথা বিবেচনা করিবেন। আমাকে যখন তিনি ডাকাইলেন, আমি বলিলাম, আমার তিনটি সর্ত আছে—গভর্ণমেণ্ট যদি এই সর্ত তিনটি পালন করিতে রাজী হয়, তবে আমি গভর্ণমেণ্টের সর্তগুলি বিবেচনা করিয়া দেখিব। তিনি আমার সর্ত তিনটি জানিতে চাহিলেন। আমি জানাইলাম—(১) আমাকে যে বিনা বিচারে আটক করা হইয়াছে এজন্য গভর্ণমেণ্টকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে (২) আমাকে যে অবৈধভাবে আটক করা হইয়াছে সেজন্য গভর্ণমেণ্টকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে ; এবং (৩) গভর্ণমেণ্টের এই প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে যে ভবিষ্যতে আমাকে আর বিরক্ত করিতে পারিবে না। ইন্সপেকটর বাবু আমার কথা শুনিয়া খুবই আশ্চর্যান্বিত হইলেন। সম্ভবতঃ উনি ভাবিলেন,আমার মাথা খারাপ হইয়াছে। আমার বক্তব্য লিখিতে তিনি ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। আমি বলিলাম, আমার বক্তব্য আপনি নোট করিয়া যান, নতুবা লোম্যান সাহেবের সাথে আমার যখন দেখা হইবে আমি তখন ইহা বলিয়া দিব। তিনি আমার তিন সর্ত লিখিয়া লইয়া গেলেন। ইহার পর সত্যেনবাবু জেল হইতে মুক্ত হইয়া আমার তিন সর্ত সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৯২৮ সনের মধ্যভাগে আমি ইনসিন জেল হইতে কলিকাতা স্থানান্তরিত হই, এবং কলিকাতা হইতে পুলিশ পাহারায় আমাকে নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত হাতিয়া দ্বীপে অন্তরীণ করা হয়। তখন বর্ষাকাল ছিল। প্রত্যহ জল কাদা ভাঙ্গিয়া আমার থানায় যাইয়া হাজিরা দিতে হইত। মাসিক ভাতাও ছিল আমার অত্যন্ত

কম। কিছুদিন পর আমি বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টকে আমার অসুবিধা জানাইয়া একখানা দরখাস্ত করি, কিন্তু কোন উত্তর পাই না। ইহার পর গভর্ণমেণ্টকে আর একখানা দরখাস্তে জানাইলাম যে, আমাকে যদি আটক রাখিতে হয় তবে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে ; নতুবা আমাকে আটক রাখিতে পারিবে না এবং আমিও গভর্ণমেণ্টের আদেশ পালন করিতে বাধ্য থাকিব না। আমার যদি কষ্ট করিয়াই থাকিতে হয়, তবে আমি অন্তরীণে আবদ্ধ থাকিয়া কষ্ট ভোগ করিব না—অন্যভাবে কষ্ট ভোগ করিব। আপনারা হয়ত আমাকে জেলের ভয় দেখাইবেন, কিন্তু সে ভয় আমার নাই। ইহার কিছুদিন পর ইন্সপেক্টর প্রভাত বিশ্বাস আসিলেন আমার সহিত দেখা করিতে। তিনি যেদিন আসিয়াছিলেন সেদিন অত্যন্ত বৃষ্টি হয়। তাঁহাকে জুতা হাতে করিয়া আমার বাসায় আসিতে হইল। ইহাতেই সম্ভবতঃ তিনি আমার অবস্থাটা বুঝিতে পারিলেন। তিনি বলিলেন, আপনি যদি আমাদের ডি, আই, জি,র নিকট দরখাস্ত করিতেন, তবে তাড়াতাড়ি প্রতিকার হইত। যাহা হউক, আপনি এখন কোন গণ্ডগোল করিবেন না—আমার রিপোর্টের উত্তরের অপেক্ষা করিবেন। তাঁহার রিপোর্টে সুফল ফলিল—আমার ভাগ্য পরিবর্তন হইল। সরকার হইতে উত্তর আসিল, আমাকে আর থানায় হাজিরা দিতে হইবে না এবং মাসিক ৬০ টাকা ভাতা পাইব। ইহার কিছুদিন পর, ১৯২৮ সনের শেষভাগে কলিকাতা কংগ্রেসের পূর্বে অন্তরীণ হইতে মুক্ত হইলাম।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

মুক্তির পর

মুক্তির পর হাতিয়া হইতে চট্টগ্রাম যাই। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত তখন চট্টগ্রামে কলিকাতা কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য করার জন্য গিয়াছিলেন। আমি সেনগুপ্ত মহাশয়ের বাসায় উঠিলাম। সেনগুপ্ত যে কয়দিন চট্টগ্রামে ছিলেন, আমি সেখানেই ছিলাম। আমরা সেনগুপ্তের সহিত কংগ্রেসের অর্থ সংগ্রহের জন্য বাহির হইতাম। তিনি স্থানীয় বড় বড় হিন্দু ও মুসলমান ব্যবসায়ী, উকিল-মোক্তার,জমিদার প্রভৃতি অনেককেই অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য করিলেন। তিনি ছিলেন খুব অমায়িক। চট্টগ্রামে দেখিলাম তাঁহার অসাধারণ প্রতিপত্তি;—হিন্দু-মুসলমান সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করে। সেনগুপ্তের বাসায় তখন কংগ্রেস কর্মী ও আমরা প্রায় ২০।৩০ জন লোক প্রত্যহ নিমন্ত্রণ খাইতাম—খাওয়ার ব্যবস্থাও থাকিত প্রচুর। চট্টগ্রামে রাজবন্দীদিগকে মানপাত্র দেওয়া হইল। সেই সভার সভাপতি ছিলেন সেনগুপ্ত। আমি চট্টগ্রামেই প্রথম মানপত্র পাই। আমরা যে-ভাবে গড়া,তাহাতে সভা-সমিতিতে যাওয়া,মানপত্র পাওয়া, শোভাযাত্রা, করতালি,গলায় মালা নেওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে অভ্যস্ত ছিলাম না। আমরা জানিতাম, আমাদের মিলিবে বন্দুকের গুলি, বেয়নেটের খোঁচা, গলায় ঝুলিবে ফাঁসীর দড়ি,—আমাদের জন্য কাহারও এক ফোটা চোখের জলও পড়িবে না—সকলেই বিপথগামী বলিয়া দিবে গালি। এখন দেখিতেছি অবস্থা অন্য রকম। আমার কেমন লজ্জা বোধ করিতে লাগিল—মনে হইল, আমরা যেন রাজপুত্রের দল, স্বয়ম্বর সভায় বসিয়া আছি। আমার অবস্থা নববধূর শুভ পরিণয়ের সময় যেরূপ হয়, মনে মনে আনন্দ কিন্তু লজ্জায় আনত বদন,—ঠিক সেইরূপ হইয়াছিল। ইহার পর এ পর্যন্ত নানা

স্থানে বহু মানপত্র পাইয়াছি—বহু ফুলের মালা গলায় পরিয়াছি, আমার জন্য বহু শোভাযাত্রা হইয়াছে—বহু জয়ধ্বনি শুনিয়াছি এবং বহু সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছি। এখন আর আমার সেই রকম লজ্জা হয় না। আমি প্রথম সভাপতি হই ফরিদপুর জিলা যুব সম্মিলনীর নড়িয়া অধিবেশনে। ফরিদপুর জিলা রাজনৈতিক সম্মিলনীর সভাপতি ছিলেন সেনগুপ্ত মহাশয়। আমি একবার চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত নীলা পাহাড়ে মোহিনী ভট্টাচার্যের সহিত দেখা করিতে যাই—সেখানে তাহার একটি কৃষি-ফার্ম ছিল। নীলা চট্টগ্রাম হইতে ষ্টীমারে যাইতে হয়। আমি পূর্বে মোহিনীকে স্টেশনে উপস্থিত থাকার জন্য চিঠি লিখিয়াছিলাম। সে আমার চিঠি পায় নাই। আমি ষ্টেশনে পৌঁছিয়া জানিতে পারিলাম, মোহিনীর ফার্ম এখান হইতে দশ-বার মাইল দূর। নৌকায় যাইতে হইবে এবং পরে মাইল তিনেক হাঁটিয়া যাইতে হইবে। স্টেশনে আমার তুইটি ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় ঘটে—একটি দারোগা পুত্র ও অপরটি দারোগার ভ্রাতুস্পুত্র। তাহাদের একটি কৃষিফার্ম ছিল। উহা মোহিনীর ফার্ম হইতে তুই মাইল দূর। তাহারা আমাকে তাহাদের নৌকায় সঙ্গে লইয়া চলিল। তাহাদের সহিত আমার রাস্তায় আলাপ-পরিচয় বিশেষ কিছু হয় নাই। দ্বিপ্রহরে আমাদের নৌকা তাহাদের বাসার কাছে পৌঁছিল। আমি তাহাদের আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। খাওয়া-দাওয়ার পর বৈকালে আমি মোহিনীর বাসার উদ্দেশ্যে চলিলাম.তাহারাও ভদ্রতা করিয়া রাস্তা দেখাইয়া দেওয়ার জন্য সঙ্গে চলিল। আমরা ফরেষ্ট অফিসের পাশ দিয়া যাইতেছিলাম। ফরেষ্টার বাবু আমাদিগকে যাইতে দেখিয়া দারোগার পুত্রকে ডাক দিলেন। আমরা ফরেষ্ট অফিসে যাইয়া বসিলাম। আমি মোহিনীর সাথে দেখা করিতে যাইতেছি শুনিয়া ফরেষ্টার বাবু বলিলেন, মোহিনীবাবু এক সময় স্বদেশী দলে ছিলেন—বহু বৎসর জেলে কাটাইয়াছেন,কিন্তু এখন ওসব ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং বেশ অর্থ উপার্জন করিতেছেন।

আমার দাদা আদিত্য দত্ত একজন স্বদেশী দলের পাণ্ডা ছিলেন। তিনিও বহু বৎসর জেলে কাটাইয়াছেন, কিন্তু এখন আর স্বদেশীর নাম করেন না। ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী নামে একজন খুব বড় স্বদেশী ছিল, আমি তাহাকে দাদার সহিত দেখিয়াছি। তখন আমার বয়স অল্প ছিল—সে আমাকে খুব স্নেহের চক্ষে দেখিত। তাহারও এখন দাদার অবস্থা হইয়াছে ; সবাই এখন ঘর লইয়াছে।' দারোগার পুত্রও বলিল, তাহার বাবা যে থানায় ছিলেন, সেই থানায় অনেক রাজবন্দী ছিল—এখন সকলেই ঘর লইয়াছে। আমি চুপ করিয়াছিলাম। তাহারা আলোচনায় ঠিক করিল, বাঙ্গালীর হুজুগ বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। আমি উঠিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় ফরেষ্টার বাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার সাথে ত পরিচয় হইল না—আপনার বাড়ী কোথায় ? আমি বলিলাম, ময়মনসিংহ জেলায়। তাঁহার মনে তখন সন্দেহ হইয়াছে—একটু আশ্চার্যান্বিত হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার নাম ?—আমার নাম বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিলেন। তাঁহার মনের অবস্থা তখন অবর্ণনীয়, আনন্দ, বিস্ময়, লজ্জায় অভিভূত। আমার সেইদিন আর মোহিনীর ফার্মে যাওয়া হইল না—পরদিন বৈকালে সেখানে গেলাম।

মোহিনীর সহিত ১৫ বৎসর পর দেখা। সে আমাকে প্রথমতঃ চিনিতে পারে নাই। তাহার ওখানে আমি দুই-তিন দিন ছিলাম। মোহিনীর বাসা একটা ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর অবস্থিত। প্রাকৃতিক দৃশ্য বেশ সুন্দর। সেই জায়গায় জলবায়ু বেশ ভাল এবং খাদ্যদ্রব্য বেশ সস্তা। আমার বহুদিনের একটা ইচ্ছা ছিল যে, কোন একটা স্বাস্থ্যকর স্থানে একটা হাসপাতালের ব্যবস্থা করা। বহু রাজনৈতিক কর্মী সুদীর্ঘকাল কারাবাসের পর ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া বাহিরে আসে—তাহাদের দাঁড়াইবার কোন স্থান থাকে না। জেলের

বাহিরেও অনেক কর্মীর স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায়—তাহাদেরও বিশ্রামের কোন স্থান নাই। যদি একটা হাসপাতালের মত থাকে, তবে তাহারা কিছুদিন সেখানে থাকিয়া সুস্থ হইয়া পুনরায় দেশের সেবায় নিযুক্ত হইতে পারে। আমি মোহিনীকে আমার সঙ্কল্পের কথা জানাইলাম। সে তাহার ফার্মের কতকটা অংশ ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হইল এবং বলিল, সে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে কিছু কাঠ সংগ্রহ করিয়া দিবে। এখন বাকি ব্যবস্থার জন্য অর্থের প্রয়োজন,—অর্থ পাই কোথায়। কিছুদিন পর আমি কুমিল্লা যাই। সেখানে 'লেবার হাউসে' থাকি। আমি 'লেবার হাউসের' কয়েক জনকে সঙ্গে লইয়া কুমিল্লার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী দাতা শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের সহিত দেখা করি। তিনি আমার প্রস্তাব শুনিয়া বলিলেন, বহুলোক তাঁহার নিকট হইতে টাকা নেয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেহ টাকার হিসাব দেয় না। তিনি প্রথমতঃ সাহায্য করিতে রাজী হইলেন না—পরে এক বৎসর পর দেখা করিতে বলিলেন। তিনি ব্যবসায়ী লোক, সম্ভবতঃ আমার আন্তরিকতা পরীক্ষা করার জন্য এরূপ বলিয়াছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এক বৎসর পর কখন দেখা করিব? তিনি বলিলেন, এই মাসের, এই তারিখ, এই সময়, এইখানেই দেখা করিবেন। তখন সম্ভবতঃ জ্যৈষ্ঠ মাস ছিল। কিন্তু পরবর্তী জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্বেই আমি ধৃত হই, এবং তাহার পর একে একে বহু জ্যৈষ্ঠ অতীত হইয়াছে। আমি বহুকাল কারাগৃহে আবদ্ধ—আমার সঙ্কল্প আর কাজে পরিণত হয় নাই।

১৯২৪ সনের নভেম্বর মাসে ধরা পড়িয়া চারি বৎসর জেল-বাসের পর আবার ১৯২৮ সনে মুক্ত হইয়া বাহিরে আসিয়া আমার লিখিত গীতাভাষ্যের খাতাখানা পাইয়াছিলাম এবং এইদিকে পুনরায় মন দিয়াছিলাম।

১৯২৮ সনে মুক্ত হওয়ার পর গীতার প্রথম খণ্ড আমি চারি অধ্যায়ে প্রকাশ করিয়াছিলাম। প্রবাসী, আনন্দবাজার প্রভৃতি পত্রিকায় ইহার সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। গীতা ছাপাইয়া আমি আর্থিক লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত হই নাই,—ছাপার খরচ আমার উঠিয়া গিয়াছিল। অল্পদিন পর ১৯৩০ সালে পুনরায় ধৃত হই এবং দীর্ঘ নয় বৎসর পর জেল হইতে ফিরিয়া বাকী বইগুলির কোন খোঁজ পাই নাই। ১৯৩০ সনে ধৃত হওয়ার পর আমি গীতার বাকি অধ্যায়গুলি ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম। ১৯৩৮ সনের শেষভাগে জেল হইতে মুক্ত হইয়া দেশের যেরূপ অবস্থা দেখিলাম তাহাতে গীতা প্রকাশ করার ভরসা হইল না। তখন মনে হইল এত বড় বই বেশী বিক্রয় হইবে না—আমিই ক্ষতিগ্রস্ত হইব ;—বিশেষতঃ বই ছাপাইবার টাকাও আমার ছিল না।

১৯২৯ সনে আমি একদিন সুভাষবাবুকে বলিয়াছিলাম, আমার আলীপুর জেলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য লিখিত খাতাগুলি পাইয়াছি—এখন যদি সেগুলি কলিকাতা কর্পোরেশন স্কুলে পাঠ্য করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন, তবে আমার কিছু আর্থিক সুবিধা হয়। বাড়ী ছাড়ার পর হইতে, আমার খরচ চিরকালই আমার বন্ধু-বান্ধবরা চালাইয়া আসিয়াছেন। বাড়ীর সঙ্গে আমার বিশেষ কোন সংশ্রব ছিল না। কলিকাতা বহুবাজার স্ট্রীটে একটা মেস ছিল। শ্রীমান কেদারেশ্বর সেন সেখানে একটা সম্পূর্ণ কোঠা ভাড়া করিয়া থাকিত। আমি তখন কেদারের নিকটই থাকিতাম। আমার খাওয়া-খরচ কেদারই চালাইত। আমার প্রস্তাব শুনিয়া সুভাষবাবু কর্পোরেশনের এডুকেশন অফিসার ক্ষিতীশপ্রসাদের (K. P. Chatterjee) নিকট একখানা ভাল সুপারিশ পত্র লিখিয়া দিয়া আমাকে তাঁহার বাসায় যাইয়া দেখা করিতে বলিলেন। আমি পরদিন সুভাষবাবুর চিঠি ও খাতাগুলি লইয়া এডুকেশন অফিসারের তখনকার বাসায় যাইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিলাম। তিনি

খাতাগুলি দেখিতে চাহিলেন। আমি খাতাগুলি তাঁহাকে দিলাম। তিনি আর একদিন আসিয়া দেখা করিতে বলিলেন, আমি সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া আসিলাম। ইহার পর আমি প্রায়ই তাঁহার বাসায় যাই, দুই-তিন ঘণ্টা অপেক্ষার পর তিনি নীচে নামিয়া আসেন এবং আর একদিন আসিতে বলেন। একদিন তিনি বলিলেন, এক লেখকের এতগুলি বই পাঠ্য তালিকাভুক্ত করিতে পারিব না, আমাদের কমিটি রাজী হইবে না এবং অন্যান্য গ্রন্থকারগণ হৈ চৈ করিবে, আমি দুই-একখানা বই পাঠ্য-তালিকা-ভুক্ত করিয়া দিব। আমি ইহাতেই সন্তুষ্ট হইলাম। তিনি দুই-একখানা বইয়ের দুই এক জায়গায় কিছু পরিবর্তন করিয়া দিতে বলিলেন, আমি তাহাই করিয়া দিলাম। ইহার পরও আমি তাহার বাসায় যাই এবং বহুক্ষণ অপেক্ষার পর ফিরিয়া আসি ও মনে মনে চটি। আমি জানিতাম, গ্রন্থকারদের বই পাঠ্য-তালিকাভুক্ত করিতে বহু বেগ পাইতে হয়,—বহু মাল-মশলা খরচ করিতে হয়,—তৈল মর্দনও করিতে হয় বহু, এবং কয়েক জোড়া জুতার তলীও বদলাইতে হয়। কিন্তু আমার ধাত অন্য রকমের, দীর্ঘকাল ইহা পোষাইল না। আমার মনে হইল, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে আমার কোন বেগ পাইতে হয় নাই। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সুভাষবাবুর সহিত দেখা করিতে এতক্ষণ বসিয়া থাকিতে হয় না, আর একজন এডুকেশন অফিসারের সহিত দেখা করার জন্য এতক্ষণ বসিয়া থাকা অত্যন্ত অসহ্য ও অপমানকর। একদিন প্রাতে সাতটা হইতে দশটা পর্যন্ত বসিয়া আছি, তিনি উপর হইতে বলিয়া পাঠাইলেন, তাঁহার অফিসে যাইয়া দেখা করিতে। আমি পূর্বেই সংবাদ লইয়াছিলাম যে, তিনি কোন কাজ করিতেছিলেন না। আমি তাঁহার উপর চটিয়া গেলাম এবং এক টুকরা কাগজে শুধু ইহা লিখিয়া পাঠাইলাম—"আমি বহুবাজার ষ্ট্রীট হইতে পায়ে হাঁটিয়া এতদূর রাস্তা আসিতে পারিলাম, আর

আপনি উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিতে পারিলেন না, তিন ঘণ্টা আমাকে বসাইয়া রাখিলেন? ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।” তিনি আমার উপর ভীষণ চটিয়া গেলেন এবং বীরদর্পে নীচে নামিয়া আসিয়া বলিলেন, “কিছু হবে টবেনা, ও কিছু হয় নাই, আপনি চলে যান।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “আমার খাতা ফেরৎ পাইব কি? তিনি বলিলেন, “আমার অফিস হইতে নেওয়াইয়া লইবেন।” আমি কর্পোরেশনের একজন শিক্ষককে (অমূল্য অধিকারী) পাঠাইয়া আমার খাতাগুলি ফেরৎ আনাইলাম। অফিসে ধমক খাইলে কেরাণীবাবুদের যেমন গিন্নীর উপর রাগ হয়, আমারও তেমনি রাগ হইল এই খাতাগুলির উপর। আমি এই খাতাগুলি নষ্ট করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম, এখন আর কাহারও অনুগ্রহপ্রার্থী হইতে হইবে না। ইহার কিছুদিন পর, সুভাষবাবুকে এই ঘটনা জানাইয়াছিলাম। তিনি শুনিয়া খুব দুঃখিত হইয়াছিলেন।

১৯২৯ সনে আমি পুলিশকে ফাঁকি দিয়া ব্রহ্মদেশে যাই এবং সেখানে প্রায় তিন মাস থাকি। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত যখন রেঙ্গুনে গিয়াছিলেন, তখন আমি তাঁহার সহিত দেখা করি ও আমার বন্ধুদের তাঁহার সহিত পরিচয় করাইয়া দেই। পুলিশ চারিদিকে আমার অনুসন্ধান করিতেছিল—ব্রহ্মদেশের পুলিশের নিকটও সংবাদ গিয়াছিল, আমি সেখানে আছি কিনা অনুসন্ধান করার জন্য। ওখানকার পুলিশ পাঁচ-সাত দিন এদিক ওদিক খবর লইয়া রিপোর্ট দিল, আমি ওখানে নাই। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ চক্রবর্তী তখন রেঙ্গুনে ছিলেন—তিনি আমার কোন সংবাদ জানিতেন না,—আমিও তাঁহার সহিত দেখা করি নাই। পুলিশ তাঁহার নিকট যাইয়া আমার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, সে রেঙ্গুনে আসিলে ত আমার বাসায়ই উঠিবে—সে ত আসে নাই। পূর্বে ব্রহ্মদেশে আসিয়াছি সরকারের অনুগ্রহে, এখন আসিয়াছি স্বাধীন ভাবে। আমি কিছুদিন রেঙ্গুনে থাকিয়া

পরে ওখান হইতে ষ্টীমারে মান্দালয় যাই। মান্দালয় ষ্টীমারে যাইতে এক সপ্তাহ লাগে, আমি মান্দালয় যাওয়ার সময় মাঝে মাঝে কোন কোন ষ্টেশনে নামিয়া সেই সহরে দুই-চারিদিন করিয়া কাটাইয়াছি। ইরাবতী নদীর দুই ধারে মাঝে মাঝে সুন্দর পাহাড় সুন্দর সহর,কত সুন্দর সুন্দর মন্দির—প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই মনোরম। জেলে আমি সামান্য কিছু ব্রহ্মভাষা শিখিয়াছিলাম,এখন নির্ভয়ে এবং বেপরোয়াভাবে তাহাই চালাইতে লাগিলাম। আমি পূর্বে মান্দালয় জেলে ছিলাম—এখন কয়েক দিন যাবৎ মান্দালয় সহরে আছি। ব্রহ্মদেশীয় রাজনৈতিক ভাবাপন্ন লোকদের সহিত আলাপ করি। অবশ্যই তাহাদের সাথে আলাপ করার সময় দো-ভাষী থাকে,কারণ অনেকেই ইংরেজী বা হিন্দী জানেন না, আমারও তাদের ভাষায় আলোচনা করার মত বিদ্যা ছিল না। একদিন মান্দালয় ফোর্ট ও রাজা থিবোর প্রাসাদ দেখিয়া আসিলাম। দূর হইতে জেলও দেখিলাম, কিন্তু নিকটে যাই নাই। একদিন আমার পরিচিত কয়েক জন বাঙ্গালী মেই মো বেড়াইতে যাইবে। মেই-মো ব্রহ্মদেশের দার্জিলিং ; অনেকে বলে দার্জিলিং হইতেও সুন্দর। ইহা মান্দালয় হইতে ৪০ মাইল দূর, ভাড়া একটাকা চারি আনা। তাহারা আমাকেও সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিল। সেখানে আমার পরিচিত লোকজন কেহ ছিল না এবং আমার কোন কাজও ছিল না,তাই আমি তাহাদিগকে বলিলাম, ছবিতে মেই-মোর অনেক দৃশ্য দেখিয়াছি, এখন পয়সা খরচ করিয়া সেখানে যাইয়া নূতন কি দেখিব ? তাহারা বলিল, 'আপনার পয়সা খরচ হইবে না !' আমি বলিলাম, 'তোমাদের পয়সাই বা বৃথা খরচ করাইব কেন ?'

মান্দালয় হইতে রেঙ্গুন আমি ট্রেনে যাব ঠিক করিলাম। পূর্বে আমি প্রহরী-বেষ্টিত হইয়া এই লাইনে যাতায়াত করিয়াছি। রেল-লাইনের দুই ধারে মাঝে মাঝে পাহাড় এবং পাহাড়ের চূড়ায় সুন্দর সুন্দর মন্দির আছে, দৃশ্য খুবই মনোরম। ট্রেনে রওয়ানা হইয়া

আমি মাঝে মাঝে দুই চারি জায়গায় নামিয়া বন্ধুদের সহিত দেখা করিলাম। অবশেষে টাঙ্গু সহরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। টাঙ্গু ষ্টেশন বেশ বড়, সহরও ছোট নয়। টাঙ্গুতে আসিয়া এক মেসে উঠি। একদিন প্রাতে প্রায় দশটার সময় টাঙ্গু রেল-ষ্টেশনে একজন রেল-কর্মচারীর সহিত দেখা করিতে গেলাম। আমার সহিত একজন স্থানীয় ভদ্রলোক ছিলেন। ষ্টেশনে যাওয়ার পর একজন বাঙ্গালী আই, বি, সাব ইন্সপেক্টর আমাকে নমস্কার জানাইয়া "কি ত্রৈলোক্য বাবু, কেমন আছেন" বলিয়া প্রশ্ন করিলেন। আমি ইনসিন জেল হইতে যখন কলিকাতা চালান যাই তখন তিনি আমাকে রেঙ্গুন ষ্টেশনে দেখিয়া চিনিয়া রাখিয়াছিলেন। আমি উত্তরে বলিলাম, 'ভাল আছি'। তিনি প্রশ্ন করিলেন আমি কবে, কেন এবং কোথা হইতে এখানে আসিয়াছি,—ও এখানে আসার উদ্দেশ্য কি? আমি বলিলাম, 'গতকল্য রেঙ্গুন হইতে এখানে আসিয়াছি, এখানে আমার পরিচিত কেহ নাই—বর্তমানে একটা হোটেলে উঠিয়াছি, এখানে কোন ব্যবসার সুবিধা হয় কিনা, সেই চেষ্টায় আছি। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তিনি কোন প্রকার সুবিধা করিয়া দিতে পারেন কিনা? তিনি বলিলেন, তিনি নিশ্চয় আমাকে সাহায্য করিবেন। আমি বলিলাম, তবে আজ দ্বিপ্রহরে আপনার বাসায় যাইব। তিনি খুব সন্তুষ্ট হইলেন। আমি দ্বিপ্রহরে, খাওয়ার পরই চম্পট দিলাম এবং রাত্রে পেগু সহরে নিশ্চিন্ত মনে এক বন্ধুর বাসায় কাটাইলাম। আমি পেগুতে ৩।৪ দিন থাকিয়া রেঙ্গুন যাই এবং কিছুদিন পর সেখান হইতে চট্টগ্রামে পৌঁছি। এখানে কয়েকদিন থাকার পর ১৯৩০ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতা ফিরিয়া আসি এবং পুলিশ অনুসন্ধান করিতে থাকে।

ভগৎ সিং ও এসেম্বলী বম

১৯২৮ সনে কলিকাতা কংগ্রেসের সময় ভগৎ সিং কলিকাতা আসিয়া আমাদের সহিত দেখা করিয়াছিল। ঐ সময় তাহার নামে ওয়ারেণ্ট ছিল, সে ছিল পলাতক আসামী। ভগৎ সিং এর সহিত লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত রামশরণ দাসও ছিলেন। রামশরণ দাস আমার বন্ধু ছিলেন, আন্দামানে আমরা একত্র ছিলাম। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রমোহন সেন-এর আপার সার্কুলার রোড-এর বাসায় এক রাত্রে ভগৎ সিং,রামশরণ দাস ও আমাদের মধ্যে আলাপ আলোচনা হয়। ঐ আলোচনার সময় শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন। ভগৎ সিং এর ধারণা ছিল, পাঞ্জাব ঘুমাইয়া আছে, পাঞ্জাবকে জাগাইতে হইলে শক্ত আঘাত দিতে হইবে, জমকাল (sensational) কিছু করিতে হইবে। ভগৎ সিং আমাদের নিকট কিছু বোমা ও পিস্তল চাহিল। আমরা ১৯২০ সনের পর হিংসাত্মক কর্মানুষ্ঠান ছাড়িয়া দিয়াছি। আমাদের মতে দেশ জাগিয়াছে, এখন লোকদেখান কিছু (demonstration) করার প্রয়োজন নাই, এখন প্রয়োজন গণ-আন্দোলনের মারফৎ জনগণের বৈপ্লবিক চেতনা জাগান। ব্যাপক সংগ্রামের জন্যই সংগঠন প্রয়োজন। দল সবল না হইলে, সন্ত্রাসবাদমূলক কাজ আরম্ভ করিলে, গভর্ণমেণ্টের দিক হইতে যে চাপ আসিবে, সেই চাপ দল সহ্য করিতে পারিবে না, অল্প দিনের মধ্যে দল ভাঙ্গিয়া যাইবে। ভগৎ সিং বলিল, "পাঞ্জাব অনেক পেছনে পড়িয়া আছে, পাঞ্জাবকে জাগাইতে হইবে, পাঞ্জাবের লোক ভাব-প্রবণ, জমকাল (sensational) কোন কাজ দেখিলেই তাহারা লাফাইয়া উঠিবে, ঝাঁপাইয়া পড়িবে। আপনারাও ত সন্ত্রাসমূলক কাজ করিয়াছেন। আমরা পাঞ্জাবে বিপ্লবী দল গঠনের চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু কিছুই করিতে পারি নাই।" ভগৎ সিং সন্ত্রাসমূলক কাজ (Terrorism) আরম্ভ করার অনুমতি দেওয়ার জন্য আমাদের নিকট অনেক অনুনয়-বিনয় করিল,

অনেক নজির দেখাইল। অবশেষে ভগৎ সিং আমাকে বলিল, ‘আপনি রামশরণ বাবুকে জিজ্ঞাসা করুন, আমি ঠিক কথা বলিতেছি কিনা। আপনি নিজে একবার পাঞ্জাব গিয়া পাঞ্জাবের অবস্থা দেখিয়া আসুন।’ আমি বলিলাম, ‘এখন কোন সন্ত্রাসমূলক কাজ হইলে ধর-পাকড় সুরু হইবে, ষড়যন্ত্র মামলা হইবে, এপ্রুভার হইবে, দল ভাঙ্গিয়া যাইবে,—ইহা আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা। ভগৎ সিং বলিল, আমাদের এমন সব যুবক আছে, তাহাদিগকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করিলেও "টু" শব্দ করিবে না। আপনি আমার সঙ্গে চলুন, তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখুন।” ভগৎ সিংএর কথার মধ্যে সরলতা ছিল, আন্তরিকতা ছিল। অল্পবয়স্ক যুবক—তাহার কথায় এবং আন্তরিকতা দেখিয়া আমরা সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলাম। আমি রামশরণ বাবুকে বলিলাম, আগামী লাহোর কংগ্রেসের সময় আপনি কংগ্রেসে যোগদান করিয়া সুভাষবাবুর ভলান্টিয়ার বাহিনীর মত একটি কংগ্রেসের ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়িয়া তুলুন। আপনার অতীত ইতিহাস আছে, আপনি বহু বৎসর জেলে ছিলেন, আপনি চেষ্টা করিলে কংগ্রেসের মধ্যে নিজের স্থান করিয়া লইতে পারিবেন এবং ভগৎ সিং যাহাতে ভলান্টিয়ার বাহিনীর চার্জে থাকিতে পারে সে ব্যবস্থা করিবেন। আমি ভগৎ সিংকে বলিলাম, তুমি পাঞ্জাবের বিভিন্ন জিলা হইতে পাঁচ হাজার ভলান্টিয়ার সংগ্রহ করার চেষ্টা কর। এই দল হইবে তোমার ভাবী বিপ্লবের প্রধান সম্বল। পাঞ্জাবীরা সামরিক জাতি। অনেকের আত্মীয়-স্বজন সৈন্যবিভাগে আছে। যদি তুমি একটি ভাল ভলান্টিয়ার দল গড়িয়া তুলিতে পার, তবে তাহাদের দ্বারাই একটা অভ্যুত্থান সম্ভব করিতে পারিবে। আমরা ভগৎ সিংকে খুসী করার জন্য কয়েকটা পিস্তল ও বোমা দিলাম। আমি পরে রামশরণ দাসকে বলিলাম, এখন এই পিস্তল বোমা ব্যবহার করিবেন না। ভগৎ সিং খুসী হইয়া পাঞ্জাব চলিয়া গেল। ভগৎ সিং প্রথমে দল

গঠন করার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু কোন সাড়া না পাইয়া নিরাশ হইয়া পড়িল। তখন তাহার এই ধারণাই বদ্ধমূল হইল, পাঞ্জাবকে জাগাইতে হইলে চমকপ্রদ কিছু করিতে হইবে, নতুবা পাঞ্জাবের যুবকদিগের মোহ নিদ্রা ভাঙ্গিবে না। কিছুদিন পর দেখা গেল, পাঞ্জাব এসেম্বলীতে বোমা পড়িয়াছে। এই বোমা নিক্ষেপের উদ্দেশ্য ছিল, "চমকপ্রদ কিছু করিলে পাঞ্জাবের যুবকেরা জাগিবে।" ভগৎ সিং ইহা জানিত, এই বোমা নিক্ষেপ দ্বারা বা কতিপয় সাহেব খুন দ্বারা দেশের স্বাধীনতা আসিবে না। ভগৎ সিং বিশ্বাস করিত, ইহাদ্বারা দেশ এগিয়ে যাবে, দেশের যুবকদিগের মধ্যে আসিবে নব-জাগরণ। দেশপ্রেমিক বীর ভগৎ সিং ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়া দেশের যুবকদিগের মধ্যে নূতন প্রাণের সঞ্চার করিয়াছিল। ধন্য ভগৎ সিং।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

জেলে পঞ্চম বার

১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে রাজসাহীতে একটি পলিটিক্যাল ওয়ার্কার্স কনফারেন্স হয়। আমি উহার সভাপতি নির্বাচিত হই। আমি যে সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলাম, তাহা কিন্তু আমি জানিতাম না। আমি মফঃস্বলে ছিলাম—আমার অভিভাষণ লেখা হয় নাই। কনফারেন্স-এর কর্মকর্তারা কলিকাতায় টেলিগ্রাম করিয়া ও চিঠি লিখিয়া নিশ্চিন্ত ছিল। কেদার সেনগুপ্ত ও রবিবাবু (রবীন্দ্র-মোহন সেন) আমার নিকট সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাও আমি পাই নাই, কারণ আমি কোন নির্দিষ্ট স্থানে ছিলাম না। আমি রাজসাহী কনফারেন্সে যাইব, ইহা পূর্ব হইতেই স্থির ছিল।

কনফারেন্সের পূর্বদিন আমি রাজসাহী ষ্টেশনে পৌঁছি। সেখানে পৌঁছিয়া প্রথম সংবাদ পাই যে আমি সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছি, আমার জন্য ফুলের মালা ও মোটর লইয়া অভ্যর্থনা সমিতির কর্মকর্তারা হাজির। আমি মহা বিপদে পড়িলাম। আমার অভিভাষণ লেখা হয় নাই—বক্তব্য মুখে বলিতে হইবে,—অথচ আমি বক্তৃতা দিতে জানি না। লেখার একটা সুবিধা আছে, নিজে না পারি, অপর কেহ লিখিয়া দিতে পারে। তাহা নিজ নামে চালাইয়া দিতে পারিব। কিন্তু মুখে বলিতে হইলেই ত বিপদ। আমার ভয় হইতে লাগিল। প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্স, কত জায়গা হইতে কত লোক আসিয়াছে, এখন আমি তাহাদের কাছে কি বলিব? প্রথমতঃ আমি রাজি হইলাম না,—তাহারাও আমাকে রেহাই দিবে না, অগত্যা বাধ্য হইয়া রাজি হইলাম। সেইদিন রাত্রি দুইটা পর্যন্ত অনেকের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া শুইতে গেলাম। গরমের জন্য ভাল ঘুম হইল না, বক্তৃতার চিন্তাও মন হইতে দূর করিতে পারিলাম না। শেষরাত্রে সংবাদ পাইলাম, পুলিশ বাড়ী ঘেরাও করিয়াছে। প্রাতে আমাকে গ্রেপ্তার করিল। আমাকে যখন গ্রেপ্তার করিল, সর্বপ্রথম আমার ইহাই মনে হইল যে, বক্তৃতা দেওয়া হইতে রক্ষা পাইলাম। ঐ সময় রাজশাহীতে প্রাদেশিক কংগ্রেস কনফারেন্স ডাকা হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে যুব কনফারেন্স, কর্ম্মী-কনফারেন্স, শ্রমিক কনফারেন্স হইবে। সভাপতি বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী, প্রতুল চন্দ্র গাঙ্গুলী, ত্রৈলোক্য নাথ চক্রবর্ত্তী, বঙ্কিমচন্দ্র মুখার্জি। সকলেই ভাবিল, কনফারেন্সের কাজ পণ্ড করার জন্য চারিজন সভাপতিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। আমাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া সদর হাকিমের বাংলায় লইয়া যাওয়া হইল—সেখানে বহুলোক সমবেত হইয়াছিল। এমন সময় কলিকাতা হইতে বীরেন দাশগুপ্ত আসিয়া সংবাদ দিলেন, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হইয়াছে—কলিকাতায় বহু বাড়ী খানাতল্লাসী হইয়াছে ও

বহু লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। আমরা রাজসাহী সেণ্ট্রাল জেলে চলিলাম। আমাদের সাথে বিরাট শোভাযাত্রা—পুলিশ বাহিনী সঙ্গে সঙ্গে আছে, পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্বয়ং আমাদের সাথে আস্তে আস্তে মোটর চালাইয়া যাইতেছেন। এমন সময় দুইটি মেয়ে ভিড় ঠেলিয়া, জাতীয় পতাকা হস্তে আমাদের দুই পাশে আসিয়া বিভিন্ন ধ্বনি করিতে করিতে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল, ইহারা দুইজনই আমাদের মেয়ে স্বেচ্ছাসেবিকাদের ক্যাপ্টেন। কিছুদিন পর জিতেশ (লাহিড়ী) যখন ডেটিনিউ হইয়া জেলে আসিল, তখন সে বলিল, "আপনাদের গ্রেপ্তার হওয়ার পর মীরা মৈত্র ও হেনা ভট্টাচার্য ভুলিয়া গিয়াছিল যে তাহারা মেয়ে--আমি দেখিলাম, তাহারা দুইহাতে ভিড় ঠেলিয়া আপনাদের দিকে যাইতেছে।"

জেলে আমাদিগকে একা একা বেশীদিন এই অবস্থায় থাকিতে হয় নাই। আবার দেশপ্রেমের বন্যা আসিল, সিভিল ডিস্ওবিডিয়েন্স বা আইন অমান্য আন্দোলন সুরু হইল। এবার বন্যার বেগ অন্যান্য বারের অপেক্ষা অনেক প্রবল। জেল ভর্তি হইতে আরম্ভ করিল। একদল লোক আইন-অমান্য করিয়া জেলে আসিল ও সরকার অপর আর এক দলকে বিনা বিচারে আটক করিয়া রাখিতে লাগিলেন। এইবার বাঙ্গালা দেশে প্রায় চারি হাজার লোক বিনা বিচারে আটক রহিল---বৈপ্লবিক মামলায় প্রায় এক হাজার লোক দণ্ডিত হইল এবং আইন অমান্য করিয়া বাঙ্গালা দেশের প্রায় পনর ষোল হাজার লোক জেলে গেল। অসহযোগ আন্দোলনের সময় সমস্ত ভারতবর্ষ হইতে মোট পঁচিশ হাজার লোক জেলে গিয়াছিল, কিন্তু আইন অমান্য আন্দোলনের সময় ভারতবর্ষ হইতে একলক্ষ লোকের অধিক জেলে গেল। আরও কয়েক লক্ষ লোক যাইতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু সরকার তাহাদিগকে না ধরিয়া শুধু প্রহার করিয়া ছাড়িয়া দিত। দেশ ক্রমে ক্রমে যে স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতেছে ইহাই তাহার প্রমাণ।

গভর্ণমেণ্ট দমননীতি অবলম্বন পূর্বক অসহযোগ আন্দোলন দমন করিয়াছিলেন, কিন্তু দেশবাসীর স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা দমন করিতে পারেন নাই—ইহা এখন বিরাট "আইন-অমান্য আন্দোলন"-রূপে দেখা দিল। এই আন্দোলনে সরকার পক্ষ অমানুষিক নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছে এবং দেশের যুবকেরাও তাহার প্রতিশোধ লওয়ার চেষ্টা করিয়াছে। এই আন্দোলনও সরকার "দমননীতি" অবলম্বন পূর্বক দমন করিয়া দিলেন। দমন-নীতি জেলের ভিতরও চলিল—বিভিন্ন জেলে লাঠি চার্জ হইল। এই আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধী, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু তিন আইনে জেলে আটক হন। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু হইতে আরম্ভ করিয়া লক্ষাধিক লোক দণ্ডিত হন। ইউরোপের 'রাজনীতি' তখন বৃটিশের অনুকূলে ছিল না। তাই বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্ট ভারতবাসীদের সহিত একটা রফা করিয়া দেশে শান্তি স্থাপনের প্রয়াসী হইলেন। ইংল্যাণ্ডের রাজনীতি-বিশারদগণ সম্ভবতঃ ভাবিয়াছিলেন যে,ভারতের প্রতিনিধিগণ গোলটেবিলে এক সঙ্গে বসিতে পারিলেই সন্তুষ্ট হইয়া দেশে ফিরিয়া যাইবেন, কিন্তু কার্যতঃ তাহা হইল না। জাতীয় কংগ্রেস ভারতের স্বাধীনতা দাবী করিল। তখন ইংরেজের কূটনীতি চলিতে লাগিল, বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হইল—অনেক ভুঁইফোঁর নেতার আবির্ভাব হইল,—বাকবিতণ্ডা হইল অনেক,—কোন সমস্যারই সমাধান হইল না—প্রতিনিধিরা বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। ব্রহ্মদেশকে এই সময় ভারতবর্ষ হইতে পৃথক করিয়া দেওয়া হইল। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, ভারতবাসীকে কিছু না দিলে অশান্তি আরও বৃদ্ধি পাইবে। তাই হাতে অনেক রক্ষা-কবচ রাখিয়া প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দিলেন—কিন্তু দেশবাসী ইহাতে সন্তুষ্ট হইল না।

রাজসাহী জেলের জেলার ছিলেন সুরেন গুপ্ত। তিনি খুব বিচক্ষণ লোক ছিলেন। তিনি যতদিন সেখানে ছিলেন, ততদিন রাজসাহী জেলে কোন গণ্ডগোল হয় নাই। জেলে যখন বহুলোকের আমদানী হইল, তখন "মেয়ে ইয়ার্ড" খালি করিয়া সেখানে আইন-অমান্যকারীদিগকে থাকিতে দিল এবং মেয়েদিগকে অন্য একটা ছোট ইয়ার্ডে স্থানান্তরিত করিল। ইতিমধ্যে একদিন কতিপয় ইরাণী মেয়ে গ্রেপ্তার হইয়া জেলে আসিল। জেলারবাবু তখন আইন-অমান্যকারী-দিগকে মেয়ে ইয়ার্ড ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তাহারা রাজী হইল না। জেলারবাবু বলিলেন, আমি আপনাদিগকে জানাইয়া রাখিলাম, অবশ্যই আপনারা শেষ পর্যন্ত এই স্থান ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইবেন। তাহারা বলিল, আপনার যত সিপাহী আছে সকলকে লইয়া আসিবেন। জেলারবাবু বলিলেন আমি এমন সিপাহী পাঠাইব যে তাহাদিগকে দেখিয়া আপনারা ভয়ে পলাইয়া যাইবেন। সকলেই মনে করিল আজ লাঠি-চার্জ হইবে। বৈকাল পাঁচটার সময় দেখা গেল, একজন জমাদাব ২৫।৩০ জন ইরাণী মেয়েকে "মেয়ে ইয়ার্ডের" মধ্যে জোড়া জোড়া করিয়া বসাইয়া গেল,—তাহাদের সাথে ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে ও নিজেদের জিনিষপত্র কিছু কিছু ছিল। তখন আইন-অমান্যকারীরা মহা ফ্যাসাদে পড়িল, এবং "জেলার বেটা বড় চালাকী করিল" বলিতে বলিতে নিজ নিজ বিছানা-পত্র সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া আসিল। পনের মিনিটের মধ্যে "মেয়ে ইয়ার্ড" খালি হইয়া গেল—ইরাণী মেয়েরা তাহা দখল করিয়া লইল।

একদিন পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাকে জেল অফিসে ডাকাইয়া আমার বিরুদ্ধে কতকগুলি অনির্দিষ্ট অভিযোগ শুনাইলেন ; যেমন, "আমি অস্ত্র আমদানীর ষড়যন্ত্র করিয়াছি।" পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই সব অভিযোগের উত্তরে আমার কি বলার আছে। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগের উত্তরে আমি একটি লিখিত পাল্টা অভিযোগ করিয়া জবাব দিলাম। আমার জবাব এই—

This morning the Superintendent of Police, Rajshahi showed me some charges ridiculous and farcical. These are meant to hoodwink the innocent public by a farcical show of trial by un-named Judges, whose existence is open to serious doubts.

(1) I charge you Stanely Jackson with your successor Hugh Stepheson for conspiring with F. I. Lowman. Tegart, Mc Kenty, Colson. Nalini Majumdar and others in Calcutta and other parts of the Province to commit treasonable offences against Indian National Congress.

(2) I charge you Stanely Jackson and your subordinates for murdering innocent Indians in different parts of Bengal.

(3) I charge you Stanely Jackson for arresting innocent people and illegally detaining them in Jail.

(4) I charge you Stanely Jackson for looting the properties of innoeent people in the name of searches.

(5) I charge you Stanely Jackson for shooting innocent people in the name of quelling riots.

You are asked to answer the above charges. The charges along with your answers will be submitted before the National Tribunal.

Trailokya Nath Chakravorty
10. 6. 30.

এই পত্রের আমি কোন উত্তর পাই নাই। আমি এবং প্রতুলবাবু রাজসাহী জেল হইতে বহরমপুর জেলে চালান গেলাম। আমাদিগকে মোটরে নাটোর স্টেশনে আনা হইল। স্টেশনে আমরা আমাদের ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মচারীকে বলিলাম, আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে যাইব, অন্য গাড়ীতে উঠিব না—আমরা সত্যাগ্রহ

করিলাম। পুলিশ কর্মচারী বলিলেন, তিনি ইণ্টার ক্লাসের ভাড়া পাইয়াছেন, এখন কি করিয়া আমাদিগকে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে লইয়া যাইবেন। ইতিমধ্যে ট্রেন আসিল। এই গাড়ীতে রংপুর জেল হইতে একদল আইন-অমান্যকারী বন্দী খুব হৈ চৈ করিয়া দমদম ক্যাম্প জেলে যাইতেছে। পুলিশ কর্মচারী আমাদিগকে এই সংবাদ দিলেম। তাহারা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে যাইতেছিল। আমরা তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর কথা ভুলিয়া গিয়া তাড়াতাড়ি তাহাদের সাথে মিলিত হইলাম,—গাড়ী ছাড়িয়া দিল। পরদিন আমরা বহরমপুর জেলে পেঁছিলাম। বহরমপুর জেলে কিছুদিন পূর্বে আইন-অমান্য-কারীদের উপর লাঠিচার্জ হইয়া গিয়াছে। আমাদের রাজসাহী জেল ত্যাগের পর জেলার সুরেন গুপ্ত অন্যত্র বদলি হইয়া যান। নূতন জেলারের ব্যবহারে রাজসাহী জেলে গণ্ডগোল হইতে লাগিল। ফলে সেখানেও লাঠি চার্জ হয় এবং জেলার আইন-অমান্যকারীদের হাতে মার খান। বহরমপুর জেলে কেদার ডেটিনিউ অবস্থায় ছিল। কিছু দিন পূর্বে মাত্র সে অনশন ভঙ্গ করিয়াছে—তাহার স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। আমি এবং প্রতুলবাবু কয়েক মাস বহরমপুর জেলে থাকার পর "বক্‌সা ক্যাম্প" জেলে স্থানান্তরিত হই। "বক্‌সা ক্যাম্প" পাহাড়ের উপর অবস্থিত। ইহা একটি পুরাতন ফোর্ট। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য খুব মনোহর—অবশ্য খাওয়ার বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। ঐখানে আমাদের সংখ্যা প্রায় দেড়শতের উপর ছিল। বাঙ্গালা দেশের প্রায় সকল বিপ্লবীদের নেতা এবং প্রধান কর্মীরা এখানে ছিলেন।

১৯৩১ সনে হিজলী ক্যাম্প জেলে ডেটিনিউদের উপর গুলি চলে ফলে প্রায় একশত ডেটিনিউ আহত এবং সন্তোষ মিত্র (কলিকাতা) ও তারকেশ্বর সেনগুপ্ত (গৈলা) নিহত হন। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বক্‌সা ক্যাম্পের সকল ডেটিনিউ অনশন ব্রত গ্রহণ করেন। আমাদের যুবকদের জীবনীশক্তি যে কত কমিয়া

গিয়াছে, এই অনশনের সময় তাহা দেখিতে পাইলাম। আমরা যাহারা বয়স্ক ছিলাম, সপ্তম দিনেও ঘুরিয়া ফিরিয়া সকলের সংবাদ লইয়াছি—কিন্তু যুবকের দল সকলেই প্রায় শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছিল। এই বক্সাতে দশ বৎসর পর আমার আবার হাঁপানী দেখা দিল। প্রায় তিন মাস শয্যাশায়ী ছিলাম,—'সোয়ামীন ইনজেকশনে' আবার সারিয়া উঠিলাম। এখানে আমি গীতার বাকি অধ্যায়গুলির ব্যাখ্যা লিখি। ১৯৩১ সনে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত গোলটেবিল বৈঠকের সময়ে তাঁহার বিলাতে যাওয়ার পূর্বে, এখানে আসিয়া আমাদের সাথে দেখা করিয়া যান। তিনি সকল দলের নেতৃস্থানীয় লোকের সহিতই আলাপ-আলোচনা করেন। এই সময় দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, বিপ্লবীদের সহিত গভর্ণমেণ্টের কোন প্রকার আপোষ হইতে পারে কিনা। তিনি এই সম্বন্ধে বাঙ্গলার গভর্ণরের সহিত দেখা করিয়া আলাপ করিয়াছিলেন এবং এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, গভর্ণমেণ্টের সহিত আমাদের কয়েকজন প্রতিনিধি প্রত্যক্ষভাবে আলাপ-আলোচনা করিবে। সেনগুপ্ত চলিয়া যাওয়ার পর দুই-একখানা চিঠির আদান-প্রদান হইয়াছিল, কিন্তু তাহা আর বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই।

বিংশ পরিচ্ছেদ

মাদ্রাজের বিভিন্ন জেলে

১৯৩১ সনের শেষভাগে আমাদিগকে তিন আইনের বন্দী করিয়া মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত বিভিন্ন জেলে পাঠান হইল। আমি এবং প্রতুলবাবু ভেলোর জেলে, রমেশবাবু ও রবিবাবু কেনান্নুর জেলে স্থানান্তরিত হইলেন। প্রোঃ এন্ জি, রঙ্গ এবং মালাবার বিদ্রোহের নেতা নারায়ণ মেনন ভেলোর জেলে আমাদের সঙ্গে একত্র ছিলেন। আমরা নারায়ণ মেননের নিকট হইতে মালাবার বিদ্রোহের অনেক ঘটনা জানিতে পারিলাম। মেনন খুব অমায়িক লোক ছিলেন। তিনি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। ভেলোর জেলে আমরা কয়েক মাস ছিলাম। ইহার কিছুদিন পর প্রতুলবাবুকে এবং আমাকে কেনান্নুর জেলে পাঠান হইল। কেনান্নুর যাওয়ার সময় ট্রেন হইতে মালাবারের বেশ সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়। কেনান্নুর জেল তখন আইন-অমান্যকারী বন্দীদের দ্বারা ভর্তি ছিল। সেখানে নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে ছিলেন কর্ণাটকের সদাশিব রাও, রামন মেনন্, দামোদর মেনন, তরুণ নেতাদের মধ্যে ছিলেন, বর্তমানে কম্যুনিষ্ট নেতা শঙ্কর নাম্বুদ্রিপাদ, এ, কে গোপলন, কৃষ্ণ পিলে প্রভৃতি। নাম্বুদ্রিপাদ, গোপালন, কৃষ্ণ পিলে কংগ্রেস কর্ম্মী ছিলেন। জেলে আমাদের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, জেলের বাহিরে গিয়া কম্যুনিষ্ট দল ভুক্ত হন। মাদ্রাজ প্রদেশে তিনটি ভাষা প্রচলন আছে, অন্ধ্রদেশে তেলেগু, মাদ্রাজে তামিল এবং মালাবারে মালয় আলম। কানাড়ী ভাষাও চলে। প্রধান তিন ভাষা প্রায় সকলেই জানে, চট্টগ্রামে যেমন নিজস্ব ভাষা এবং বাংলা ভাষা। এই প্রদেশের লোক সরিষার তৈল ব্যবহার করে না। তাহারা তিল তৈল এবং নারিকেল তৈল ব্যবহার করে। তরকারী বেশী পদ হয়

না। সাধারণতঃ "রসম, সম্ভারম" হয়। তাহাদের প্রত্যেক তরকারী-তেই তেঁতুল থাকিবে এবং ঝালও বেশী থাকিবে। আমরা কংগ্রেস নেতাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতাম, তাহারাও মাঝে মাঝে আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন। আমরা ছিলাম ষ্টেট্ প্রিজনার, আমাদের খাদ্য এবং হাত খরচের টাকা ছিল বেশী, এজন্য আমাদের সুবিধা ছিল। একদিন সদাশিবরাও আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদের দেশী রন্ধন দ্রব্য খাওয়াইলেন, তাহার মধ্যে ছিল মুগ ডাইলের মিষ্টান্ন। আমরা প্রত্যহ, সকালে তৃতীয় শ্রেণীর রাজনৈতিক বন্দীদিগকে কফি খাওয়াইতাম। মধ্যপ্রদেশের কুর্গ অঞ্চলে প্রচুর কফি হয়। সেখানে সাধারণ লোক কফি খায়। উচ্চস্তরের লোক চা পান করেন। আমরা কফি বীজ বাজার হইতে ক্রয় করিয়া আনিয়া কফি পাউডার তৈয়ার করাইতাম। দানা গুলি ভাজিয়া, পিষিয়া গুঁড়া করিলেই কফি পাউডার হইল। আমাদের কয়েদী ফালতুরা (পরিচর্য্যায় নিযুক্ত কয়েদী) পাউডার তৈয়ার করিতে জানিত। ইহাতে খরচ খুব কম পড়িত। আমরা প্রত্যহ বড় দুই বালতি কফি তৈয়ার করাইয়া বিতরণ করিতাম। আমরা তাহাদের বিড়ি সরবরাহও করিয়াছি।

কংগ্রেস বন্দীদের মুক্তির পর আমরা একদিন জেলারকে পুত্রকন্যা সহ খাওয়ার নিমন্ত্রণ করিলাম। আমাদের রান্নার জন্য বাংলা দেশ হইতে একজন বাঙ্গালী পাচক (কয়েদী) পাঠান হইয়াছিল, মালয়ালী কয়েদী পাচকও ছিল। আমরা রসম, সম্ভারম, বড়া প্রভৃতি সেই দেশীয় খাদ্য এবং বাংলা দেশীয় খাদ্য রান্না করাইয়াছি। আমি রসগোল্লা ও পানতোয়া তৈয়ার করিয়াছি। মাছ, মাংস ও সেই দেশীয় মিষ্টির ব্যবস্থা ছিল। আমাদের জিনিস পত্রের অভাব ছিলনা, ব্যবস্থা ভালই হইয়াছিল। জেলার তাহার ছোট বড় ৫।৬টি পুত্রকন্যাসহ দ্বিপ্রহরে ভোজন করিতে আসিয়াছেন। টেবিল, চেয়ারে খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। রমেশবাবু তামিল এবং মালয়ালম ভাষা

ভাল জানিতেন, প্রতুলবাবুও মন্দ জানিতেন না, আমি এবং রবিবাবু কাজ চালানোর মত জানিতাম। আমরা ছেলে মেয়েদের সহিত তাহাদের ভাষায় আলাপ করিতে লাগিলাম। তাহারা আমাদের মুখে তাহাদের মাতৃভাষা শুনিয়া বেশ আমোদ উপভোগ করিল। তাহার পর খাওয়ার পালা। আমাদের দেশী রান্না ছেলে মেয়েদের পছন্দ হইতেছে না। এক একটা পদ মুখে দিয়া বলিতে লাগিল "নাল্লা ইল্লেহ" (ভালনয়) রসগোল্লা, পানতোয়া মুখে দিয়া "নাল্লা ইল্লেহ" বলিয়া ফেলিয়া দিল। জেলার অবশ্যই আমাদের সহিত গল্প করিতে করিতে সকল পদই খাইলেন। ইতিমধ্যে রমেশবাবু পেটে একটা অপারেশনের জন্য কয়েম্বোটর জেলে স্থানান্তরিত হইলেন। তিনি কয়েকদিন বার্লি পথ্য করিয়াছেন, একদিন প্রাতে ডাক্তার বলিলেন, To-day you will get জবর্শী পায়সম। রমেশবাবু মনে মনে খুসি, আজ মাদ্রাজী পায়েস খাইবেন। জবর্শী অর্থ তিনি জানিতেন না। যাহা হউক মিষ্টান্নত। খাবার সময় দেখিলেন পাচক দুধসাগু লইয়া আসিয়াছে। আমাদের তখন ছিল স্টেট্ প্রিজনারী মেজাজ। রমেশবাবু দুধ-সাগু দেখিয়া চটিয়া গেলেন। বাবুর্চিটিকে ধমক দিয়া বলিলেন একি আনিয়াছ? ড্রেনে ফেলিয়া দাও। বাবুর্চি বলিল, ডাক্তার যাহা নির্দেশ দিয়াছেন, তাহাই আনিয়াছি। ইহার উপর আর কোন কথা চলে না। বৈকালে ডাক্তার আসিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন পায়সম্ কেমন উপভোগ করিলেন? রমেশবাবু পূর্ব্বেই চটিয়া ছিলেন, ডাক্তারের উক্তি তাঁহার নিকট বিদ্রূপের মত মনে হইল, ষ্টেট্ প্রিজনারী মেজাজ, ডাক্তারকে তিনি ধমকাইতে লাগিলেন, ডাক্তার অপ্রস্তুত। পরে তিনি বাবুর্চিকে ডাকাইয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি খাবার দিয়াছিলে? পাচকের উত্তর শুনিয়া ডাক্তার বলিলেন This is জবর্শী পায়সম্। মাদ্রাজের লোকেরা সাগু দানার মিষ্টান্ন খায়। জবর্শী

অর্থ সাগুদানা। তাহারা অবশ্যই দুধ সাগুর মিষ্টান্নে তেজপাতা কিস্‌মিস্ পেস্তা বাদাম দেয়। আমরা প্রাতে চা'র সহিত সেই দেশীয় খাদ্য ইট্‌লি দোসে উপমা খাইতাম। ইট্‌লি দোসে টকঝাল চাট্‌নী সহ খাইতে হয়, চাট্‌নী নারিকেলের প্রস্তুত। মালাবারে প্রচুর নারিকেল হয়।

কেনান্নুর জেলে আইন-অমান্যকারীদিগের উপর দুইবার লাঠি চার্জ হয়। দ্বিতীয়বার লাঠি চার্জের পরও বহুদিন পর্যন্ত তাহাদের উপর নির্যাতন চলে। একবার আইন-অমান্যকারীদিগকে ঘরের ভিতরে বন্ধ করিয়া তাহাদের সম্মুখে তিনজন নেতৃস্থানীয় লোককে বেত মারা হয়। সেই সময় আইন-অমান্যকারীগণ খুব সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিল। তাহারা বেপরোয়া হইয়া উঠিল ;— কোন প্রকার শাস্তির ভয়ে পিছপাও হইল না। আমাদের উপরও কর্তৃপক্ষ অসদ্ব্যবহার করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে চিকিৎসার জন্য রমেশবাবু ও রবিবাবু মাদ্রাজ জেলে গেলেন,—আমি ওখানে একা রহিলাম। জেল-কর্তৃপক্ষ নির্বুদ্ধিতা বশতঃ আমাকে 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা দেওয়া বন্ধ করিলেন, যদিও ইহা গভর্ণমেণ্টের অনুমোদিত ছিল। এখন আমার সুযোগ ঘটিল—সঞ্জীবনী পত্রিকা বন্ধ করার জন্য এবং জেলখানায় আইন-অমান্যকারীদের উপর যে সমস্ত অত্যাচার হইতেছে তাহা উল্লেখ করিয়া ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট একখানা দরখাস্ত করিলাম। পরদিন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আমাকে অফিসে ডাকাইয়া বসিতে চেয়ার দিলেন না। তিনি মুখ বিকৃত করিয়া আমার দরখাস্তের জন্য তিরস্কার করিলেন। আমিও পাল্টা তাঁহাকে ধমক দিলাম। আমি তিন আইনের বন্দী, আমাকে তিনি অফিসে বসার জন্য চেয়ার দিতে বাধ্য, এই কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়ার পর, তিনি বলিলেন, এখন তুমি বসিতে পার। আমি বসিলাম না—চলিয়া আসিলাম। তখন বেলা প্রায় এগারটা। আমি আমার ইয়ার্ডে আসিয়া ভারত-গভর্ণমেণ্টের নিকট একখানা

দরখাস্ত করিয়া জানাইলাম যে, আমি সঞ্জীবনী পত্রিকার জন্য এবং জেল কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদ স্বরূপ অনশন ব্রত গ্রহণ করিলাম। ইহাতে জেলার ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পরদিন একটু নরম হইলেন। তাঁহারা আমার নিকট পুনঃ পুনঃ আসিয়া সঞ্জীবনী গ্রহণ করিতে এবং আমার দরখাস্ত ফেরৎ নিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ইহাতে আমি দমিলাম না। এতদিন ধরিয়া কংগ্রেস-কর্মীদের উপর যে-সব অত্যাচার হইয়াছে, আমি তাহা ভুলি নাই। আমি তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিলাম না—আমার অনশন চলিতে লাগিল।

একদিন জেলের বে-সরকারী পরিদর্শক (নন-অফিসিয়াল ভিজিটার) রাও সাহেব আমার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। আমি তাঁহার নিকট সমস্ত কথা বলিলাম। তিনি আমার কথা শুনিয়া আমাকে জানাইলেন যে,আমি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অফিস-ঘরে ছাতা মেলিয়া প্রবেশ করিয়াছি—ইহা ভদ্রতাবিরুদ্ধ। তখন বুঝিলাম সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিজের দোষ ঢাকার জন্য একটা মিথ্যা মামলা সৃষ্টি করিয়াছেন। আমি বলিলাম, "আমার কি মাথা খারাপ হইয়াছে, যে, আমি অফিস-ঘরে ছাতা মেলিয়া প্রবেশ করিব? কেহ পাগল না হইলে ছাতা মেলিয়া দোতালার উপর উঠে না। ঘরে প্রবেশ করার পূর্বে আমি তাঁহার অনুমতি লইয়া প্রবেশ করিয়াছি।" ইহার পর আসিলেন জজ সাহেব,---তারপর ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবও আসিলেন। সকলকেই আমার বক্তব্য বলিলাম। কিন্তু অফিস হইতে গোপনে সংবাদ পাইলাম যে,প্রত্যেকেই নিজ নিজ রিপোর্টে লিখিয়া গিয়াছেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কোন দোষ নাই---আমিই দোষী, আমি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অফিস ঘরে ছাতা মেলিয়া প্রবেশ করিয়াছিলাম,—তিনি আমার ছাতাটা বাহিরে রাখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, ইহাতে আমি চটিয়া গিয়া তাঁহাকে অপমান করিয়াছি। সঞ্জীবনীও তাঁহারা আমাকে দিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাহা গ্রহণ করি নাই।

ভারত গভর্ণমেণ্ট এখন আমার কথা বিশ্বাস করিবেন না, বে-সরকারী পরিদর্শক রাও সাহেব, জিলা জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কথা বিশ্বাস করিবেন! এই ভাবেই সরকার সকল সংবাদ লইয়া থাকেন, প্রকৃত ঘটনা কিছুই জানিতে চান না। আইন-অমান্যকারীদের সম্বন্ধেও গভর্ণমেণ্ট এরূপেই সংবাদ পাইয়াছেন। একজন সাহেব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিথ্যা কথা বলিতে পারেন না, কাজেই তাঁহার মিথ্যা কথাও সত্য হইয়া গেল। আর কয়েদীরা ত মিথ্যা কথা বলিয়াই থাকে,—তাহাদের কথা বিশ্বাস করা যায় না। গভর্ণমেণ্ট যদি প্রকৃত ঘটনা জানার চেষ্টা করিতেন এবং অপরাধী সরকারী কর্মচারীকে শাস্তি দিতেন, তবে গভর্ণমেণ্টের কোন ক্ষতি হইত না, পরন্তু বিদ্বেষ-বহ্নিও দেশে এতটা প্রবল হইত না। ১৯১৪ সনে আমি ধৃত হওয়ার পর কথাপ্রসঙ্গে লোম্যান সাহেবকে বলিয়াছিলাম 'দেশে অশান্তির সৃষ্টি আপনারা করাইতেছেন,—সরকারী কর্মচারী মিথ্যা মামলা সাজাইয়া, নিরীহ লোকদের উপর অত্যাচার করিয়া দেশে অশান্তির বীজ ছড়াইতেছে।' তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমার সাটিরপাড়া নৌকা-চুরির মামলা যে মিথ্যা ছিল, আমরা পরে তাহা জানিতে পারিয়াছিলাম। আমি আমার ডিপার্টমেণ্ট রিফর্ম করার চেষ্টায় আছি, কিন্তু ভাল লোক পাই না।"

আমার সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের নির্দেশ আসিল যে, অজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত যেন "ফোর্স ফিডিং" (forced-feeding) না করানো হয়। আমি প্রথম প্রথম দিন কয়েক তিন চারি গ্লাস করিয়া জল পান করিতাম এবং প্রত্যহ স্নান করিতাম। শেষ দিকে জল পান করার ইচ্ছা হইত না,—জোর করিয়া এক গ্লাস জল পান করিতাম। এই ভাবে পনের-ষোল দিন চলিল, আমি এ পর্যন্ত শয্যাশায়ী হই নাই,—হাঁটিয়া যাইয়াই প্রস্রাব করি—অবশ্য বেশী দূর চলা-ফিরা করি না, পাছে জেল-কর্তৃপক্ষ আমার নামে বদনাম রটায় যে আমি নিশ্চয়ই গোপনে খাই, নতুবা কি করিয়া চলা-ফিরা করি। একদিন

মেডিক্যাল-অফিসার আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তিনিও একজন শ্বেতাঙ্গ ছিলেন,—আমি কি হইলে অনশন ত্যাগ করিতে পারি। আমি বলিলাম, কংগ্রেসী লোকদের উপর যদি অত্যাচার বন্ধ হয় এবং তাহাদের খাওয়ার ব্যবস্থা ভাল হয়—অর্থাৎ জেল-কর্তৃপক্ষ যদি বেশী চুরি না করে, তবেই আমি অনশন ভঙ্গ করিতে পারি। মেডিক্যাল-অফিসার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সহিত আলাপ করিয়া এ সম্বন্ধে আমাকে মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিলেন। আমি সতর দিন পর অনশন ভঙ্গ করিলাম। ইহার কিছুদিন পর আমি 'ত্রিচিনপলি' জেলে স্থানান্তরিত হইলাম। রমেশবাবু ও রবিবাবু মাদ্রাজ হইতে সেখানে গেলেন। প্রতুলবাবু পূর্ব হইতেই সেখানে ছিলেন। আমরা এখানে আবার চারিজন একত্র হইলাম।

ত্রিচিনপলি জেলেও বহু আইন অমান্যকারী বন্দী ছিলেন এবং অনেকের সাথে আমাদের বন্ধুত্ব হয়। রমেশবাবু তামিল-অধিবাসীদের মত তাহাদের ভাষায় কথা বলিতে পারিতেন। প্রতুলবাবুও তামিল ভাষা বেশ শিখিয়াছিলেন। রবিবাবু ও আমি কাজ চালানোর মত ভাষা শিখিয়াছিলাম। এইখানে আমরা প্রায় তুই বৎসর থাকি। তারপর ভেলোর জেলে চালান যাই। ভেলোর জেলে তখন আইন-অমান্যকারী কোন বন্দী ছিল না,—সকলেই মুক্ত হইয়া গিয়াছিল। মাদ্রাজে তখন কংগ্রেস-গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমাদের কেনান্নুর জেলের বন্ধু মালাবার নেতা শ্রীযুক্ত রামন মেনন মন্ত্রী হইয়াছেন, জেল এবং কোর্ট তাঁহার অধীন। তিনি ১৯৩৭ সনের আগষ্ট মাসে আমাদিগকে দেখিতে আসিলেন। আমরা পূর্বেই তাঁহার আসার সংবাদ পাইয়া চেয়ার সাজাইয়া রাখিয়াছিলাম। তাঁহার সহিত জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং জেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টও আসিলেন। তিনি আমাদিগকে দেখিয়া আনন্দে তুই হাত বাড়াইয়া রমেশবাবু ও রবিবাবুকে জড়াইয়া ধরিয়া ফিস্ ফিস্ করিতে করিতে ঘরে

ঢুকিলেন এবং চেয়ারে না বসিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এই অবস্থা দেখিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবেন কিনা বুঝিতে না পারিয়া দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মেনন তাঁহাদিগকে বাহিরে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। আমরা বারান্দায় কয়েকখানা চেয়ার পাঠাইয়া দিলাম। তাঁহারা বারান্দায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন—আর আমরা ভিতরে গল্প করিতে লাগিলাম। শ্রীযুক্ত রামন মেনন কিছুদিন আগে এই জেলে এই ইয়ার্ডেই কয়েদী অবস্থায় ছিলেন, আর এখন তিনি মন্ত্রী। জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেট সকলেই তাঁহাকে সেলাম দিতেছে।

এইখানে আমি কারা-সংস্কার (reforms) সম্পর্কে লিখিতে আরম্ভ করিলাম! তখন প্রায় চব্বিশ বৎসর আমি জেলে কাটাইয়াছি। আমি বঙ্গদেশ, মাদ্রাজ ও ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন জেলে ছিলাম—আন্দামানেও অনেকদিন কাটাইয়াছি। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের জেলসমূহের অবস্থাও আমার বন্ধুদের কাছে শুনিয়াছি। বহু বৎসর আমি সাধারণ কয়েদীর মত ছিলাম, স্পেশাল ক্লাস কয়েদীও ছিলাম, ডেটিনিউ, ষ্টেট-প্রিজনার এবং অন্তরীণাবদ্ধও ছিলাম। আমি জেলের প্রায় সমস্ত রকম সাজা ভোগ করিয়াছি। জেল সম্বন্ধে আমার প্রায় সমস্ত রকম অভিজ্ঞতাই আছে। আমি জেলের 'সুপার' হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ কয়েদী পর্যন্ত সকলের সহিত মিশিয়াছি। জেলে কিভাবে কি হয়, প্রায় সকল খবরই রাখি। বহু জায়গায় কংগ্রেস-গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সব জায়গায়ই কারা-সংস্কারের কথা উঠিবে। আমি মনে করিলাম, আমার অভিজ্ঞতার কথা এখন লিপিবদ্ধ করিলে কাজে লাগিবে। প্রথমতঃ আমি জেলের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে লিখিলাম। তারপর লোকে অপরাধ করে কেন, জেলের সাধারণ অবস্থা, জেল-কর্মচারীরা কিভাবে চুরি করে,—কয়েদীদের প্রতি কিজন্য,

কি ভাবে নির্যাতন হয়, গভর্ণমেণ্ট কিরূপে সংবাদ পান, জেলে যুবক, বালক ও মেয়ে কয়েদীদের অবস্থা কিরূপ এবং আমার মন্তব্যে কিভাবে কারা-সংস্কার হইতে পারে তাহা লিখিলাম। আমি কোন ব্যক্তি বিশেষের নামে বা বিশেষ কোন জেলের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করি নাই, কাহারও নামে কিছু বলিও নাই, কেবল সাধারণ ভাবে জেলের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছি। আমি মুক্তির কিছুকলে পর, ১৯৩৯ সনে আমার খাতাখানা প্রবাসীতে ছাপানর জন্য শ্রদ্ধেয় রামানন্দবাবুকে দিয়াছিলাম। তিনি তাহা পড়িয়া প্রবাসীতে বাহির করিতে সম্মত হইয়াছিলেন এবং আমাকে "চ্যাপটার (Chapter) গুলি সাজাইয়া দিতে বলিয়াছিলেন। আমি বলিলাম, আমি সর্বদা ঘুরাফিরা করি, আমার সময় মোটেই নাই এবং আমার দ্বারা এই কাজ ভাল হইবে না। ইহাতে তিনি সব ঠিক করিয়া দিতে রাজী হইলেন। ইহার কয়েক মাস পর আমি পুনরায় ধৃত হই এবং খাতাখানার কোন খোঁজ করিতে পারি নাই। আমি জেলে থাকিতেই রামানন্দবাবুর মৃত্যু হয়।

১৯৩৫ সনে বাংলার বিপ্লবী নেতাদিগকে ভারতের বিভিন্ন জেল হইতে মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত হিজলী জেলে একত্র করা হয়। তাহাদের মধ্যে ছিলেন, প্রোঃ জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, রমেশচন্দ্র আচার্য্য, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, রবীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, পূর্ণচন্দ্র দাস, ভূপতি মজুমদার সত্যরঞ্জন গুপ্ত, প্রতুলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত, মনোরঞ্জন গুপ্ত, অরুণচন্দ্র গুহ, ভূপেন দত্ত, রসিকলাল দাস, জীবনলাল চ্যাটার্জ্জি। ১৯৩৬ সনে বাংলার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেব হিজলী জেলে গিয়া বিপ্লবী নেতাদের সহিত দেখা করেন। তিনি প্রাতে ১১টার সময় হিজলী জেলে উপস্থিত হন, প্রহরী বাহিরে রাখিয়া ভিতরে প্রবেশ করেন। তিনি রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে অবস্থান করেন। পান-ভোজনাদি একত্রই

সম্পন্ন হয়। তিনি সারাদিন বন্ধুভাবে আলাপ আলোচনা ও গল্প করেন। তিনি জানিতে চাহিয়াছিলেন, আমাদের মনের পরিবর্ত্তন হইয়াছে কিনা। তিনি আমাদের কতকগুলি সুযোগ সুবিধা দিয়া যান। পূর্ব্বে রাজবন্দীরা সরকার অনুমোদিত সংবাদ পত্র ছাড়া অন্য কোন সংবাদ পত্র পাইত না। খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেব আমাদের অনুরোধে সকল জাতীয়তাবাদী সংবাদ পত্র রাজবন্দীদের জন্য মঞ্জুর করেন। তিনি আমাদের অনুরোধে নির্দেশ দেন, রাত্রে আমাদের দরজা বন্ধ করা হইবে না, আমরা খোলা থাকিব।

বাংলার অর্থসচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার হিজলী জেলে গিয়া আমাদের সহিত দেখা করেন। তিনিও প্রাতে ১১ টার সময় আসিয়াছিলেন, সারাদিন একত্র ছিলেন, একত্র আহার করিয়াছিলেন। তিনি আমাদের জন্য প্রচুর মিষ্টি এবং ফল আনিয়াছিলেন। ইহার পর ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্কর রায়, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হিজলী জেলে গিয়া বিপ্লবী বন্দীদের সহিত দেখা করেন। মহাত্মা গান্ধীও হিজলী জেলে গিয়া বিপ্লবী নেতাদের সহিত দেখা করেন। গভর্ণমেণ্ট মহাত্মা গান্ধীর মাধ্যমে চেষ্টা করিয়াছিলেন বিপ্লবীদের মনের পরিবর্ত্তন করিতে। মহাত্মা গান্ধীর আগমন সংবাদ আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছিলাম। মহাত্মা গান্ধীকে সাদরে অভ্যর্থনা করার জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম। তাঁহার বসার স্থান ফুল দিয়া সাজান হইল, ফুলের তোড়া তৈয়ার করা হইল। তিনি নির্দিষ্ট সময়ে হিজলী জেলে উপস্থিত হইলেন। আমরা সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলাম। তিন ঘণ্টা আলাপ আলোচনা হইল, সেখানে জেলের কোন কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিল না। মহাত্মা গান্ধী চাহিয়াছিলেন আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আমাদের মতের পরিবর্ত্তন করিতে। তিনি চাহিয়াছিলেন, আমরা যেন হিংসানীতি পরিত্যাগ করিয়া মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা নীতিতে বিশ্বাসী হইয়া দেশের স্বাধীনতার কাজে অগ্রসর হই।

বিপ্লবীরা যদিও মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা-নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না, তবুও তাহারা মহাত্মা গান্ধীর অহিংস সংগ্রামে যোগদান করিয়াছেন, খাঁটি সত্যাগ্রহীর ন্যায় পুলিশের লাঠি চার্জের সম্মুখীন হইয়াছেন, কোন প্রকার দুর্ব্বলতা দেখায় নাই বা হিংসা প্রকাশ করে নাই। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন মহাত্মার অহিংসা আন্দোলন দেশকে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর করিবে। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছিলেম, আমরা যদি এই প্রতিশ্রুতি দেই (মৌখিক) হিংসায় আমাদের বিশ্বাস নাই, আমরা অহিংসনীতিতে বিশ্বাসী, তবে মহাত্মা গান্ধী আমাদের মুক্তির জন্য গভর্ণনেণ্টকে সুপারিশ করিবেন এবং আশা করা যায়, গভর্ণমেণ্ট সকল রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দিবেন। বিপ্লবীরা অহিংসা-নীতিতে বিশ্বাসী নন। তাঁহারা মনে করেন সশস্ত্র বিপ্লব দ্বারাই ভারতের স্বাধীনতা আসিবে। বিপ্লবী নেতারা মহাত্মা গান্ধীর সহিত এক মত হইতে পারিলেন না। মহাত্মা গান্ধী আমাদের নিকট হইতে বিদায় লওয়ার সময় বলিলেন, "ইহার পর আমি আবার তোমাদের এখানে আসিয়া তিন দিন তোমাদের সঙ্গে একত্র থাকিব এবং তোমাদিগকে আমার মতে আনিব।" মহাত্মা গান্ধীর সহিত সকলেই খুব সম্মানের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়াছিলেন। ইহার কয়েকমাস পর আমরা সংবাদ পাইলাম, মহাত্মা গান্ধী আমাদের সহিত দেখা করিবেন। এ-যাত্রা তিনি হিজলী আসিতে পারিবেন না, তিনি অসুস্থ, প্রেসিডেন্সী জেলে দেখা করিবেন। আমাদিগকে প্রেসিডেন্সী জেলে স্থানান্তরিত করা হইল। প্রেসিডেন্সী (কলিকাতা) জেলে বেলা ৩টার সময় মহাত্মা গান্ধীর সহিত আবার আমাদের দেখা হইল। আলাপ আলোচনা সুরু হইল। আলাপ আলোচনায় কেহ কাহাকেও স্ব-মতে আনিতে পারিলেন না, প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতে অটল রহিলেন। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে ২ঘণ্টা আলাপ হইয়াছিল, মহাত্মা গান্ধী হাসি মুখেই বিদায় লইলেন।

১৯৩০ সনের পর বিপ্লব আন্দোলনে দণ্ডিত বন্দীদিগকে আন্দামানে পাঠান হইয়াছিল। আন্দামানে রাজনৈতিক বন্দীরা দুইবার অনশন ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ফলে কয়েক জনের মৃত্যু হয়। আন্দামানের বন্দীদিগকে দেশে ফিরাইয়া আনার জন্য ও সকল বন্দীদিগকে মুক্ত করার জন্য দেশে আন্দোলন চলিতেছিল।

আমরা মহাত্মাজীকে অনুরোধ করিয়াছিলাম, তিনি যেন আমাদের মুক্তির জন্য চেষ্টা না করিয়া আন্দামানের এবং ভারতের দণ্ডিত সকল রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য চেষ্টা করেন। প্রেসিডেন্সী জেল হইতে আবার আমাদিগকে হিজলী জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। অবশেষে ১৯৩৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে যাঁহারা বিনা বিচারে আটক ছিলেন, সকলেই মুক্তি লাভ করেন।

একবিংশতি পরিচ্ছেদ

অনুশীলন-সমিতি ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ

১৯৩৯ সনে যখন দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধের আভাস পাওয়া গেল, তখন অনুশীলন-সমিতির নেতারা সক্রিয় হইয়া উঠিলেন, ভাবী বিপ্লবের আয়োজন করিতে লাগিলেন। জাতীয়-কংগ্রেস নেতা সুভাষচন্দ্র বসু বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন ছিলেন, তাই অনুশীলন-সমিতির নেতাগণ সুভাষবাবুর সহিত ভাবী বিপ্লব সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করেন। অবশেষে স্থির হইল সুভাষবাবুর নেতৃত্বে বিপ্লবের ব্যবস্থা হইবে। জাতীয় কংগ্রেস-নেতারাও ভাবী মহাযুদ্ধের আভাস পাইয়াছিলেন, তাঁহারাও স্থির করিলেন, এই বিশ্ব-যুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করিতে হইবে—সশস্ত্র বিপ্লব দ্বারা নহে, অন্য ভাবে, অর্থাৎ কিছু চাপ দিয়া, দর কষাকষি করিয়া আপোষে। ভুলাভাই দেশাই ঐ সময় ইংলণ্ডে ছিলেন, তিনি এক বিবৃতিতে বলিলেন, জাতীয় কংগ্রেস সরকারের সহিত আপোষ করিতে চায়। কংগ্রেস-নেতারা ভাবিলেন, প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধে গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা দ্বারা কিছু পাওয়া যায় নাই, এ যাত্রা একটু শক্ত হইবেন, কিছু চাপ দিবেন, আগে কিছু না দিলে সহযোগিতা করিবেন না। সুভাষবাবু এবং অনুশীলন-সমিতির নেতাদের চিন্তাধারা অন্যরূপ ছিল। তাঁহারা জানিতেন, আপোষে দেশের স্বাধীনতা আসে না, সংগ্রাম দ্বারাই স্বাধীনতা অর্জন করিতে হয়। সুভাষবাবু তাই আপোষ-বিরোধী আন্দোলন শুরু করিলেন। সুভাষবাবু ছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট। তিনি আপোষ-বিরোধী, তাই কংগ্রেস-নেতারা তাঁহাকে সহ্য করিতে পারিলেন না, দেশব্যাপী সুভাষবাবুর জনপ্রিয়তা থাকা সত্ত্বেও, কংগ্রেস-নেতাদের অপকৌশলের ফলে সুভাষবাবু পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

অনুশীলন-সমিতির নেতারা ভাবিয়াছিলেন, দেশব্যাপী গণ-আন্দোলন শুরু করিতে করিতে সময়ে ইহাকেই সশস্ত্র বিপ্লব-আন্দোলনে পরিণত করা যাইবে। অনুশীলন-সমিতির নেতাদের মধ্যে এরূপ কোন নেতা ছিলেন না, যিনি সমগ্র ভারতবর্ষে পরিচিত। সমগ্র ভারতব্যাপী খ্যাতি না থাকিলে সমগ্র ভারতবর্ষে বিপ্লবের নেতৃত্ব চলে না, সুভাষবাবুর সে খ্যাতি ছিল, তাই অনুশীলন-সমিতির নেতারা সুভাষবাবুকে সম্মুখে রাখিয়া ভারতব্যাপী বিপ্লবের আয়োজন করিতে লাগিলেন। সুভাষবাবু কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত হইয়া ফরওয়ার্ড ব্লক নামে নূতন দল করিলেন এবং সমস্ত বিপ্লবী দল ও কর্মীদিগকে একত্র করার চেষ্টা করিলেন। সুভাষবাবু দেশবাসীর মধ্যে সংগ্রামের মনোভাব জাগরণের জন্য আপোষ-বিরোধী আন্দোলন শুরু করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আইন অমান্য করিয়া সভা সমিতি করার নির্দেশ দিলেন। স্থির হইল রামগড়ে আপোষ-বিরোধী কনফারেন্স হইবে। রামগড় কনফারেন্সে বিভিন্ন প্রদেশের বিপ্লবী নেতাদিগকে একত্র করা হইবে স্থির হইল। বিপ্লবী-নেতারা যাহাতে একত্র বসিয়া আলাপ-আলোচনা করিতে পারে, একত্র থাকিতে পারে, সেই ব্যবস্থা করার জন্য শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র আচার্যকে রামগড় প্যাণ্ডেল ও বাসগৃহ তৈয়ার করার সময় পাঠান হইল। রামগড় কনফারেন্সের পূর্বে রমেশবাবুকে মান্দ্রাজ প্রদেশে পাঠান হইল আমাদের বিপ্লবী বন্ধুদিগকে সংবাদ দেওয়ার জন্য। রমেশবাবু সকলের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া রামগড়ে একত্র হওয়ার কথা বলিয়া আসেন।

আমি সুভাষবাবুর সহিত ইউ, পি, ভ্রমণ করিয়া দিল্লী এবং পাঞ্জাব যাই। দিল্লীতে কিছুদিন শঙ্করলালের ১৬নং বড় খাম্বা রোড-এর বাড়ীতে ছিলাম। সেখানে আমাদের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মী ছিলেন সুশীল ভট্টাচার্য। কাশীর ভারপ্রাপ্ত কর্মী ছিলেন বীরেন ভট্টাচার্য। ১৯৪০ সনের প্রথম ভাগে সুভাষবাবু যখন দিল্লী ছাত্র-কন্‌ফারেন্সের

সভাপতিত্ব করিতে যান, তখন দিল্লীতে ফরওয়ার্ড ব্লকের কমিটি মিটিং ছিল। শঙ্করলালের বাড়ীতে মিটিং হয়, আমি ঐ মিটিংএ উপস্থিত ছিলাম। সেই মিটিংএ পাঞ্জাবের ডাঃ সত্যপাল, সীমান্ত প্রদেশের নেতা আকবর শা প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। সুভাষবাবু এবং আমরা সকলেই শঙ্করলালের ১৬নং বড় খাম্বার বাড়ীতে ছিলাম। সুভাষবাবু যাহাদের বিপ্লব দলে টানা যাইতে পারে মনে করিতেন, তিনি আমার উচ্চ প্রশংসা করিয়া, আমার সহিত তাঁহাদের পরিচয় করাইয়া দিতেন এবং আমাকে একান্তে বলিতেন, ইহার সহিত খুব ভাব করিয়া লউন। সীমান্ত প্রদেশের নেতা আকবর শা সম্বন্ধে বলিলেন, "ইনি খুব ভাল লোক, আপনি এঁকে দলে টানিয়া আনুন।" সুভাষবাবুর ইঙ্গিতে, শঙ্করলালের বাড়ীতে, একটি কোঠায় আমার এবং আকবর শা'র থাকার ব্যবস্থা হইল। আকবর শা খুব সরল, স্বদেশপ্রেমিক এবং নির্ভীক লোক ছিলেন। আমি কয়েক দিনের মধ্যেই আকবর শা'র সহিত খুব খাতির জমাইয়া লইলাম। তিনি সুভাষবাবুর অন্ধ ভক্ত ছিলেন। আমার সহিত আলাপ-আলোচনায় আকবর শা সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী হইলেন।

প্রথম জার্মান-যুদ্ধের সময় অনুশীলন-সমিতির নেতারা ভারতীয় সৈন্যদিগকে দলে টানিয়া আনিয়াছিলেন, সৈন্যগণই ছিল সশস্ত্র বিপ্লবের প্রধান সম্বল। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধের আভাস পাইয়া অনুশীলন-সমিতির নেতারা সর্বত্র নির্দেশ দিলেন পুলিশের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে হইবে, সৈন্যদিগের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে হইবে। আমি আকবর শা'র সহিত সৈন্য সংগ্রহ সম্বন্ধে আলাপ করিলাম। তিনি বলিলেন, "পাঠান-সৈন্য যে সব স্থানে আছে, তাহার সংবাদ লউন, আমি তাহাদিগকে হাত করার চেষ্টা করিব। পাঠান সৈন্য দেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধাচরণ করিবে না।" আকবর শা'কে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "যদি কোন লোক ভারতের বাহিরে, আফগানিস্থানের মধ্য দিয়া যাইতে চায় তবে

আপনি বৃটিশ-সীমানা পার করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিবেন কি না?" তিনি বলিলেন, "দো-ভাষীর সাহায্যে সে ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। পায় হাঁটিয়া যাইতে খুব কষ্ট হইবে, সময় লাগিবে অধিক, ঘোড়া হইলে সহজ হইবে, অবশ্যই টাকা কিছু বেশী খরচ হইবে।"

আমি ঐ সময় পুলিশের দৃষ্টি এড়াইয়া ইউ. পি., পাঞ্জাব ভ্রমণ করিতেছিলাম। আমি দিল্লী হইতে লাহোর এবং অমৃতসর যাই। লাহোর আমাদের দলের সভ্য শ্রীইন্দ্রচন্দ্র নারাং এর বাড়ীতে উঠি। অমৃতসরে আমি চৌধুরী বোগ্‌গা মলের বাড়ীতে ছিলাম। বোগ্‌গা মল পাঞ্জাব মার্শাল ল' কেসে দণ্ডিত হইয়া আন্দামান প্রেরিত হইয়াছিলেন; আন্দামানে তাঁহার সহিত আমার বিশেষ বন্ধুত্ব হয়। চৌধুরী বোগ্‌গা মল একজন ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। চৌধুরীজীর সহিত আমার সশস্ত্র বিপ্লব সম্বন্ধে আলাপ হয় এবং এইরূপ স্থির হয়, রামগড় কনফারেন্সের পর আমি বৈপ্লবিক কাজ চালাইবার জন্য যখন গা-ঢাকা দিব, পাঞ্জাবে তিনি আমার নিরাপদে থাকার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। ইহার পর আমি লাহোরে বাবা রুর সিং-এর সহিত দেখা করি। তিনি জাতিতে শিখ এবং এম. এল, এ. হইয়াছিলেন। তিনি প্রথম মহাযুদ্ধের সময় রাসবিহারী ও শচীন সান্ন্যালের সহিত সশস্ত্র বিপ্লবের চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং ১৯১৫ সনের লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া আন্দামানে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ১৯৪০ সনের জানুয়ারী মাসে আমি বাবা রুর সিংকে বলিলাম, "সুভাষবাবুর সহিত আমাদের স্থির হইয়াছে, এখন সশস্ত্র বিপ্লবের ব্যবস্থা করিতে হইবে, এখন সুভাষবাবুই আমাদের নেতা। আপনার এখন শিখ-সৈন্যদিগকে আমাদের দলভুক্ত করিতে হইবে।" বাবা রুর সিং বহু বৎসর জেলে থাকার ফলে এবং জেল হইতে বাহির হওয়ার পর জনসেবায় নিযুক্ত থাকার জন্য শিখ-সমাজে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল এবং তাঁহার

মত একজন দরিদ্রের এম.এল.এ, হওয়া এজন্যই সম্ভবপর হইয়াছিল। বাবা রুর সিং বলিলেন, "শিখ-সৈন্যদের মধ্যে কয়েক জন অফিসার আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আগামী যুদ্ধে তাঁহাদের কি কর্তব্য হইবে। কয়েকজন সৈনিকও আমাকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। এতদিন আপনাদের সহিত কোন যোগাযোগ করিতে না পারায় আমি তখন কোন উত্তর দিতে পারি নাই।" আমি বলিলাম, "আপনি তাহাদের সংবাদ লইবেন এবং তাহাদের দ্বারা বিভিন্ন রেজিমেণ্টে সংবাদ পাঠাইবেন প্রস্তুত থাকার জন্য।" আমি লাহোরে ডাঃ সত্য পালের বাড়ীতেও গিয়াছিলাম।

আমি লাহোর হইতে হামিরপুর জিলার রথ গ্রামে পণ্ডিত পরমানন্দের সহিত দেখা করিতে যাই। পণ্ডিত পরমানন্দ প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আমেরিকা হইতে "কোমাগাটা মারু" জাহাজে দেশে আসিয়াছিলেন এবং রাসবিহারী ও শচীন সান্ন্যালের সহিত সশস্ত্র বিপ্লব-আয়োজনে বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আন্দামানে তিনি খুব বীরত্ব দেখাইয়াছেন এবং অনেক অত্যাচার-নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন। আন্দামানে তিনি আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। অপ্রত্যাশিত ভাবে পরমানন্দের বাড়ীতে পৌঁছানয় তিনি খুবই খুসী হইলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "এখন পূর্ব অভিজ্ঞতা লইয়া কাজে নামিয়া যাও, রাজপুত এবং অন্যান্য রেজিমেণ্ট হাত করার ব্যবস্থা কর।" তিনি রাজী হইলেন। পরমানন্দ জাতিতে রাজপুত ছিলেন। আমি সেখানে কয়েক দিন থাকিয়া নাগপুর যাই।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক-সঙ্ঘের (R. S. S.) অধিনায়ক শ্রীকেশব হেড্‌গেওয়ার আমাদের অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন। তিনি যখন ১৯১০ সনে কলিকাতা ন্যাশনেল মেডিক্যাল কলেজে পড়িতেন, তখন তিনি বীর সাভারকারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নারায়ণ দামোদর সাভারকার, ডাঃ এথলে (সাতারা) এবং আরও কিছু মহারাষ্ট্রদেশীয় যুবক, ন্যাশনেল মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র আমাদের বিপ্লব-দলে

যোগ দিয়াছিলেন। "বাংলায় বিপ্লববাদ" পুস্তকের লেখক শ্রীনলিনী-কিশোর গুহ ঐ সময় ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে পড়িতেন, তিনি তাঁহাদিগকে দলে টানিয়া আনেন। আমার পলাতক অবস্থায় আমি ২।১ বার তাঁহাদের ছাত্রাবাসে ছিলাম। ১৯৪০ সনে আমি হঠাৎ তাঁহার নাগপুরের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হই এবং জিজ্ঞাসা করি "কালীচরণ দা'র কথা মনে আছে কি?" তিনি আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার ভলান্টিয়ার-বাহিনীর সংখ্যা কত?" তিনি বলিলেন, "৬০০০০ হাজার।" আমি বলিলাম, "এই ষাট হাজার সৈন্য লইয়া আপনাকে ভাবী বিপ্লবে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে।" আমি তাঁহার নিকট সব কথাই বলিলাম, সুভাষবাবুর কথাও বলিলাম। কেশব হেড্‌গেওয়ার উত্তরে বলিলেন, "এই ষাট হাজার ভলান্টিয়ার-এর মধ্যে বহু অল্পবয়স্ক ছেলে আছে, বিশেষতঃ আমি সে ভাবে তাহাদিগকে গড়িয়া তুলি নাই। আপনারা এতদিন আমার কোন খোঁজ খবর লন নাই, আজ হঠাৎ বলিলেন, 'ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে, ইহা কি প্রকারে সম্ভবপর হয়?" আমি বলিলাম, "এরূপ সুবর্ণ সুযোগ আর আমাদের জীবনে আসিবে না, এই মহাযুদ্ধের সুযোগ আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে। আপনি আপনার বিশ্বস্ত লোকদিগকে এই ভাবে গড়িয়া তুলুন, অপর সব উত্তেজনার মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িবে।" আমি তাঁহার সহিত আলাপ শেষ করিয়া কাশী যাই। নাগপুর সহরে হেডগেওয়ারের একখানা ছোট্ট বাড়ী ছিল, আমি সেই বাড়ীতে ছিলাম।

হিন্দু-মহাসভার অন্যতম নেতা শ্রীগণেশ দামোদর সাভারকার (বীর সাভারকারের বড় ভাই) তখন কাশী ছিলেন। আন্দামানে আমরা একত্র ছিলাম, তিনি বেশ বাংলা ভাষা শিখিয়াছিলেন, আমিও তাঁহার নিকট মারহাট্টি ভাষা শিখিতাম। আমি তাহাকে গণেশ দা' বলিয়া সম্বোধন করিতাম। আমি গণেশ দা'কে ভাবী বিপ্লবের

কথা বলিয়া জিজ্ঞাস করিলাম, "হিন্দু মহাসভা আমাদের সহিত যোগ দিবে কিনা?" গনেশবাবু বলিলেন "গাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছে, এখন গাড়ীর পেছনে পেছনে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে দৌড়াইয়া কোন লাভ আছে কি?" তিনি আরও বলিলেন, "সময় চলিয়া গিয়াছে, এখন বৃথা চেষ্টা করিয়া কোন লাভ নাই।" অতঃপর আমি কাশীতে শ্রীশচীন্দ্রনাথ সান্ন্যালের সহিত দেখা করিয়া ভাবী বিপ্লবের প্রস্তুতির জন্য বাড়ী ছাড়ার কথা বলিলাম, তিনি রাজী হইলেন। শচীন্দ্রনাথ বিবাহ করিয়াছিলেন, তিনি বাড়ীর ব্যবস্থা করিতে পারিলেই বাহির হইবেন বলিলেন। বাংলার বাহিরে অনুশীলন-সমিতির যাহারা নেতৃস্থানীয় ছিলেন তাঁহাদের সকলেই সৈন্য-সংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

অনুশীলন-সমিতির নেতাবা প্রধান প্রধান কর্মীদিগকে নির্দেশ দিলেন, বন্দুক পিস্তল যেখানে যাহা পাওয়া যায়, দাম যাহা হউক, সংগ্রহ করিতে হইবে। আমি যখন দিল্লী ছিলাম, সুভাষবাবুও তখন দিল্লী ছিলেন। দিল্লীতে আমাদের ভারপ্রাপ্ত কর্মী সুশীল ভট্টাচার্য আমাকে বলিলেন "দিল্লী ফোর্ট হইতে বন্দুক পিস্তল সংগ্রহ করা যায়, যদি কিছু অর্থ ব্যয় করিতে পারেন।" আমি সুভাষবাবুকে এই সংবাদ দিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, "কত টাকা দিতে পারিবেন?" সুভাষবাবু বলিলেন, "এখন দশ হাজার টাকা দিতে পারিব, পরে আরও দিব?" সুশীলকে বলিলাম, "প্রথম কিস্তিতে দশ হাজার টাকা দিব, এই দশ হাজার টাকার মাল পাইলে দ্বিতীয় কিস্তিতে আরও দশ হাজার টাকার মাল খরিদ করিব।" আমি স্থির করিলাম, আমি দিল্লী থাকিয়া এই মাল সংগ্রহের ব্যবস্থা করিব। সুশীল একটি বাট্‌পাড়ের পাল্লায় পড়িয়াছিল, তাই এই প্রয়াস সফল হয় নাই।

আমি ইউ. পি., পাঞ্জাব হইতে কলিকাতা ফিরিয়া আসিলাম এবং সুভাষবাবুর সহিত দেখা করিয়া সকল ঘটনা বলিলাম। আমি

ইউ. পি. পাঞ্জাবের সকল বিপ্লবী-নেতাদিগকে রামগড় উপস্থিত হইতে বলিয়াছিলাম। পুলিশ যাহাতে আমার গোপন প্রয়াস সম্বন্ধে কোন সন্দেহ না করিতে পারে পারে, সেজন্য আমি হাওড়া এবং কলিকাতার উপর কয়েকটি স্থানে আপোষ-বিরোধী সভায় সভাপতিত্ব করি। ইহার পর আমি চট্টগ্রাম যাই। আমি চট্টগ্রামে আইন অমান্য করিয়া বক্তৃতা দেওয়ার জন্য যাই নাই,আমি চট্টগ্রাম গিয়াছিলাম বৈপ্লবিক কাজের জন্য—চট্টগ্রাম বন্দর এবং পাহাড় জঙ্গলের অবস্থা জানার জন্য। আমি পুলিশের সন্দেহ এড়ানোর জন্য প্রকাশ্য সভায় যাই এবং দুর্ভাগ্যক্রমে ধৃত হই। আমার ধৃত হওয়ার পরও আমাদের আরদ্ধ বৈপ্রবিক চেষ্টা চলিতেছিল। কলিকাতায় আমাদের বিশেষ বন্ধু সর্দার নিরঞ্জন সিং তালিবের মারফৎ একটি শিখ-রেজিমেণ্ট আমাদের সংস্পর্শে আসিয়াছিল। শ্রীরবীন্দ্রমোহন সেন তাহাদের প্রতিনিধিগণকে সুভাষবাবুর সহিত গোপনে দেখা করাইয়া দিয়াছিলেন। সুভাষবাবু তাঁহাদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া দল গঠন করিতে এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত থাকিতে নির্দেশ দিলেন। এই রেজিমেণ্টটি সম্পর্কে সন্দেহ হওয়ায় কিছুদিনের মধ্যে এই রেজিমেণ্টটিকে কলিকাতা হইতে সরাইয়া লইয়া যাওয়া হয়। কিছুদিন পর সুভাষবাবুও ধৃত হইলেন। একে একে অনুশীলন সমিতির নেতা ও কর্মীগণ সকলেই ধৃত হইলেন ; অপর বিপ্লবী-দলের নেতা ও কর্মীগণও ধৃত হইলেন।

সুভাষবাবু জেলের বাহিরে থাকিতেই চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইংরেজ বিরোধী রাষ্ট্রগুলির সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে। এজন্য তিনি শঙ্করলালকে জাপান পাঠাইয়াছিলেন। শঙ্করলাল ব্যবসা উপলক্ষ্য করিয়া জাপান গিয়াছিলেন। সুভাষবাবু জেলে সংবাদ পাইলেন, বিদেশ হইতে সংবাদ আসিয়াছে, তাঁহার এখন ভারতের বাহিরে যাইতে হইবে। তিনি এখন জেলে আবদ্ধ, তাঁহার বিদেশ যাওয়া কিরূপে সম্ভবপর? সুভাষবাবু একটি উপায় উদ্ভাবন

করিলেন। তিনি জেলের দাবী-দাওয়া লইয়া অনশন শুরু করিলেন। এই অনশনে জেলে অবস্থিত অনুশীলন-সমিতির সকল সভ্য এবং অন্যান্য দলের যাহারা ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কিছু লোক সুভাষবাবুর সহিত যোগ দিলেন। এই অনশনে সুভাষবাবু যখন দুর্বল হইয়া পড়িলেন, তখন গভর্ণমেণ্ট একটু বিচলিত হইয়া পড়িলেন। ডাক্তারের রিপোর্ট সুভাষবাবু ও প্রতুলবাবুর সহায়ক হইল। নাজিমুদ্দিন-গভর্ণমেণ্ট স্বাস্থ্যের জন্য সুভাষবাবু ও প্রতুলবাবুকে মুক্তি দিলেন। গভর্ণমেণ্ট ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবের পথ রুদ্ধ করিয়া দিল, বিপ্লবীরা জেলে, সুভাষবাবু নিখোঁজ কিন্তু ভারতবাসীর স্বাধীনতার পথ রুদ্ধ করিতে পারে নাই,—তাহা ভিন্নরূপে প্রকাশ পাইল,—আগষ্ট বিপ্লবরূপে দেখা দিল।

কংগ্রেস-নেতারা যুদ্ধকালে প্রথমে সংগ্রামের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু বৃটিশের আপোষহীন মনোভাবের ফলে কংগ্রেস সংগ্রামের পথ গ্রহণ করিল। জমি প্রস্তুত ছিল, মহাত্মা গান্ধীর "ভারত ছাড়" আহ্বান ভারতের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করিল, স্বাধীনতার জন্য সমগ্র ভারতের সেই গণ-আন্দোলন অভূতপূর্ব ছিল। জাতীয় কংগ্রেসের সকল নেতা এবং বিপ্লবী-নায়কগণ জেলে। ভারতের বিপ্লবী-জনগণই তখন স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইতে লাগিলেন, স্থানে স্থানে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করলেন। ঐ সময় ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ-গভর্ণমেণ্টের এজেণ্টের কাজ করিয়াছে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করিয়াছে, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভারত উদ্ধার অভিযানের নিন্দা প্রচার করিয়াছে, বৃটিশের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে "জন যুদ্ধ" বলিয়া দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করিয়াছে। একটা রাজনৈতিক দলের এরূপ স্বদেশদ্রোহিতা ও জাতির প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

আগষ্ট-আন্দোলন কালে একমাত্র ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির সভ্য ছাড়া ভারতের সকল রাজনৈতিক দলের সভ্যরাই এখন জেলে।

দেশে কোন প্রকাশ্য আন্দোলন নাই, ভীষণ দুর্ভিক্ষ চলিতেছে। চাউলের মণ ৬০ টাকা, ৭০ টাকা, ৮০ টাকা, এমনকি একশ' টাকা পর্যন্ত দাম উঠিয়াছে, সহস্র সহস্র লোক অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দেশে যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল তাহা নহে, এই দুর্ভিক্ষ ছিল মানুষের সৃষ্টি। গুদাম ভরা চাউল, মানুষ না খাইয়া মরিতেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংলণ্ড এবং আমেরিকা জয়ী হইয়াছে সত্য, কিন্তু বৃটিশ-সিংহের কোমর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, ইংলণ্ড এখন খুব দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, ইংলণ্ডের আত্মরক্ষা করাই কঠিন। এদিকে ভারতবর্ষে প্রকাশ্য কোন আন্দোলন নাই সত্য, কিন্তু ভারতবাসীর মন বিদ্বেষে ভরপুর। পরাধীনতা ও অত্যাচারের জ্বালা অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের 'ভারত তথা দিল্লী' চল অভিযান ও আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের নিদর্শনে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহ-ভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে, পুলিশ-বাহিনীতেও অসন্তোষ, শ্রমিক অসন্তোষ, ডাক বিভাগে ষ্ট্রাইক, (Postal Strike), বিমানবাহিনীতে ষ্ট্রাইক (R. I. A. F. Strike), নৌ-বিদ্রোহ (R. I. N.) শুরু হইল—ভারতের আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন।

ইংলণ্ডের এখন খুবই দুর্দিন, শিল্প অঞ্চলগুলি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, ইংলণ্ড ঋণ জালে জড়িত। আবার রুশিয়াও প্রবল হইয়া উঠিতেছে, এখন ইংলণ্ডের আত্মরক্ষাই কঠিন। এখন ইংলণ্ডকে যদি বাঁচিতে হয় তবে তাহার বাহিরের সমস্ত শক্তি (Resources) ইংলণ্ডে পুঞ্জীভূত (Concentrate) করিতে হইবে। ইংলণ্ডের বাজার নষ্ট হইয়া গিয়াছে, ভারতবর্ষ-বিদ্রোহ ভাবাপন্ন থাকিলে ইংলণ্ডের মাল সেখানে বিক্রী হইবে না। ইংলণ্ড দেখিল ভারতবর্ষকে অধীনতা পাশে আবদ্ধ রাখিতে হইলে ইংলণ্ডের স্বাধীনতা বিপন্ন হইবে, কারণ ভারতীয় সৈন্য-বাহিনী এবং পুলিশ-বাহিনীর উপর আর নির্ভর করা চলে না, ভারতবর্ষে এক বিরাট বৃটিশ-সৈন্য-বাহিনী রাখিতে

হইবে—যাহা অসম্ভব। কিন্তু ইহার পরিবর্তে ভারতবর্ষকে যদি স্বাধীনতা দেওয়া যায়, ভারতের সহিত মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হওয়া যায়, তবেই তাহা বৃটিশের পক্ষেও শুভ। বৃটিশের আলাপ-আলোচনা শুরু হইল, ইংরাজের ভেদনীতির খেলা চলিতে লাগিল, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হইল, ভারত দ্বি-খণ্ডিত হইল, উৎপত্তি হইল দুইটি সার্বভৌম রাষ্ট্র—ভারত ও পাকিস্তান। ক্ষমতা হস্তান্তরের এই প্রয়োজনবোধ হইতেই কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতৃবর্গের সঙ্গে বৃটিশ-শক্তির মীমাংসার প্রয়াস আরম্ভ হইল কিন্তু ইংরেজের ভেদনীতির ফলে যে সাম্প্রদায়িকতা দেখা দিয়াছিল; ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তাবনায় তাহা ভয়াবহরূপে আত্মপ্রকাশ করিল এবং শেষ পর্যন্ত ভারত খণ্ডনের ভিত্তিতে বৃটিশ ক্ষমতা হস্তান্তর করিল। ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বাধ্যায়ে ক্রীপ্স্-দৌত্য, মন্ত্রী-মিশন এবং মাউণ্টব্যাটেনের শেষ প্রচেষ্টা জানাইবে ইতিহাস, ইহা আমার আলোচ্য নহে। ভারত ও পাকিস্তান দুইটি সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠিত হইল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

জেলে ষষ্ঠ বার

মুক্ত হইয়া দেশের অবস্থা কি ভয়াবহ হইয়াছে তাহা দেখিয়া মনে অত্যন্ত পীড়া অনুভব করিলাম। ২৫।৩০ বৎসর পূর্বে ইহা কেহ কল্পনাই করিতে পারে নাই যে দেশের অবস্থা এইরূপ শোচনীয় হইয়া পড়িবে। বহুদিন পর্যন্ত আমি বাঙ্গলা দেশের বহু শহরে ও বহু গ্রামে ঘুরিয়াছি, ইউ. পি., পাঞ্জাবেও বেড়াইয়া আসিয়াছি, মাদ্রাজ প্রদেশের সংবাদও জানি। জমিদার, তালুকদার, মহাজন, ব্যবসায়ী, সকলের অবস্থাই শোচনীয়। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক, কৃষক-মজুরদের ত কথাই নাই; কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলের অবস্থাই শোচনীয়। পূর্বে ভারতবর্ষের অবস্থা এরূপ ছিল না। যে ভারতের অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা এক সময় জগৎবাসীর নিকট কিংবদন্তী স্বরূপ ছিল,—যে ভারত অফুরন্ত অন্নের জন্য অন্নপূর্ণার সন্তান বলিয়া গণ্য হইত, যে ভারতের লোকদের ধারণা ছিল "মুখ দিয়াছেন যিনি অন্ন জুটাবেন তিনি" অর্থাৎ আহারের জন্য কোন চেষ্টার প্রয়োজন নাই, আপনা হইতে ইহা জুটিবে; আজ সেই ভারতবাসীর পেটে অন্ন নাই, দেহে বস্ত্র নাই, হাতে পয়সা নাই। সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা ভারতবর্ষ, যে ভারতবর্ষ এক সময়ে পৃথিবীর স্বর্গরাজ্য বলিয়া গণ্য ছিল, আজ সেই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছে—আজ ভারতের চারিদিকে দুর্ভিক্ষের সংহার-মূর্তি দেখা যাইতেছে, আজ কত মাতা-পিতা শিশু সন্তানদের ক্ষুধার তাড়নায় ক্রন্দন করিতে দেখিয়া নীরবে অশ্রু বর্ষণ করিতেছেন। পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ আছে কি, যে দেশের লোকের এইরূপ শোচনীয় দুরবস্থা? লাহোর হইতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত আমি যত জায়গায় গিয়াছি সর্বত্রই একই কথা শুনিয়াছি, টাকা, পয়সা,

চাকুরী, ব্যবসার ব্যবস্থা করিয়া দিন, ঘরে খাওয়া নাই, পরনে কাপড় নাই, ছেলের পড়ার ব্যবস্থা করিয়া দিন, মেয়ের বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া দিন ইত্যাদি। ছেলেদের যদি খাবারের ব্যবস্থা না থাকে তবে কি করিয়া তাহারা দেশের কাজ করিবে? ত্রিশ বৎসর পূর্বে যখন মফঃস্বলে গিয়াছি, তখন এইসব প্রশ্ন কেহই উত্থাপন করে নাই, সকলেই কাজের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছে। তখন কাহাকেও বাড়ী ছাড়িতে বলিলে তৎক্ষণাৎ রাজী হইত, কারণ সে জানিত তাহার অভাবে তাহার বৃদ্ধ মাতাপিতা না খাইয়া মরিবে না। কিন্তু এখন কাহাকেও বাড়ী ছাড়ার কথা বলিলে, সঙ্গে সঙ্গে সে জিজ্ঞাসা করিবে, তাহার বাড়ীতে অন্ততঃ মাসিক দশ টাকা সাহায্য করিতে পারিব কিনা? আমাদের অনেক বড় বড় ও ভাল ভাল কর্মী বাড়ীর আর্থিক দুরবস্থার জন্য দেশের কাজ ছাড়িয়া অর্থ উপার্জন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। দেশ ক্রমে ক্রমে যেরূপ ধ্বংসের দিকে চলিয়াছে,—যদি এই ভাবে আরও কিছুদিন চলে,—যদি কোন পরিবর্তন না হয়; তবে ভবিষ্যতে দেশবাসীর যে কি শোচনীয় অবস্থা হইবে তাহা কল্পনার অতীত। এই সমস্যার সমাধান বড়ই কঠিন। দেশের রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তন না হইলে এই সমস্যারও সমাধান হইবে না। ছেলেদের চাকুরীর জন্য আমরা অনেকদিন অনেকের পিছনে ঘুরিয়াছি, কিন্তু বিশেষ কোন সুবিধা করিতে পারি নাই।

ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার পর আমরা অনুশীলন-সমিতির প্রতিজ্ঞাপত্র ও নিয়মাবলী নষ্ট করিয়া ফেলি। তখন হইতে সমিতির সভ্য-দিগকে প্রতিজ্ঞা করান বন্ধ হইয়া যায়। ইহার পর যখন অন্যান্য দলের সহিত আমাদিগের একত্র হওয়ার প্রশ্ন উঠিল, আমরা তখন কার্যতঃ সমিতির নামও উঠাইয়া দিলাম। ১৯২০ সনের পর আমরা ক্রমশঃ সাম্যবাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ঐ সময় অনুশীলনের কয়েকজন সভ্যাকে শ্রমিক সংগঠনের জন্য নিযুক্ত করা

হয়। শচীন্দ্রনাথ সান্যাল ১৯২০ সনে আন্দামান হইতে মুক্তিলাভের পর কিছুকাল জামসেদপুর শ্রমিক-সঙ্ঘের সম্পাদক ছিলেন। অনুশীলনই সর্ব প্রথমে শ্রমিক সংগঠনে হাত দেয়। উত্তর ভারতের "হিন্দুস্থান রিপাব্লিকান পার্টির" জন্ম হয় ১৯২৪ সনে কলিকাতায় —ইহার স্রষ্টা শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, প্রতুলবাবু ও আমি ছিলাম। পরবর্তী যুগে উত্তর ভারতে অনুশীলন-সমিতি "হিন্দুস্থান সোসালিষ্ট রিপাব্লিকান পার্টি" নামে পরিচিত ছিল। ভগৎ সিং আমাদের সভ্য ছিল। ১৯২৮ সনে কলিকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় ভগৎ সিং পলাতক অবস্থায় আমাদের সহিত দেখা করিয়া গিয়াছিল। ভগৎ সিং খুব সাহসী এবং উৎসাহী যুবক ছিল। তাঁহার ফাঁসীর সময় সমস্ত ভারতবর্ষব্যাপী আন্দোলন হইয়াছিল।

১৯২৮ সনে আমাদের মুক্তির পর বাঙ্গলা দেশের সকল দল-গুলিকে লইয়া একটা দল করার চেষ্টা হইয়াছিল। এইরূপ স্থির হইল অনুশীলন-সমিতির প্রতিনিধি শ্রীনরেন্দ্রমোহন সেন থাকিবেন, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করায় যদি নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করিতে সম্মত না হন, তবে তাঁহার স্থলে ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (মহারাজ) থাকিবেন এবং সংযুক্ত পার্টির অর্থাৎ অনুশীলন ব্যতীত অপর দলগুলির প্রতিনিধি শ্রীযাদুগোপাল মুখার্জি থাকিবেন। নরেনবাবু সম্মত না হওয়ায় অনুশীলন-প্রতিনিধি শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী ও সংযুক্ত দলের প্রতিনিধি শ্রীযাদুগোপাল মুখার্জি হইলেন। কাজও কিছুদূর অগ্রসর হইল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়। অবশ্যই যুক্ত নেতাদের মধ্যে কোন বিরোধ সৃষ্টি হয় নাই। ইহার পর যুক্তদল নিজদিগকে যুগান্তর বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করেন, ইহাই নূতন যুগান্তর দল কিন্তু তাহাও স্থায়ী হয় নাই, শেষ পর্যন্ত "যার যার তার তার" দলই রহিয়া গেল। ১৯৩০ সনে ধৃত হওয়ার পর বক্সা ক্যাম্পে যাইয়া আমাদের দলের সকলকে আমরা সাম্যবাদী পুস্তক পড়িতে উপদেশ দেই এবং ক্লাস করিয়া আমরা

সাম্যবাদী পুস্তক পাঠ করিতে থাকি। মাদ্রাজ প্রদেশের জেলেও আমরা সকলকে ঐ কথা বলি। আমাদের ইচ্ছা ছিল, মুক্তির পর বাহিরে যাইয়া ভারতবর্ষে একটা 'সোসালিষ্ট' পার্টি দাঁড় করাইব।

ইতিমধ্যে আমি ১৯৩৯ সনের ডিসেম্বর মাসে উত্তর ভারত ভ্রমণ করার জন্য কলিকাতা হইতে রওয়ানা হই। তখন ইউরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাঁধিয়া গিয়াছে। সুভাষবাবু দিল্লী ছাত্র-কনফারেন্সের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন, তিনি আমাকে তাঁহার সহিত দিল্লীতে দেখা করিতে বলিয়াছিলেন। আমি যখন কলিকাতা হইতে রওয়ানা হই, তখন গুপ্তচর-বিভাগের লোক আমাকে অনুসরণ করার জন্য আমার সঙ্গে যাইতেছিল। আমি কলিকাতা হইতে প্রথম কাশী যাই এবং সেখানে কয়েকদিন থাকি। পুলিশের গুপ্তচর আমার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল। আমি এক দিন কাশী হইতে লক্ষ্ণৌর দিকে রওয়ানা হই, পুলিশের গুপ্তচরও আমাকে অনুসরণ করিতেছিল কিন্তু ফৈজাবাদ ষ্টেসনে গুপ্তচর আমাকে হারাইয়া ফেলে। ইহার পর আমি প্রায় দুই মাসের অধিককাল পুলিশের অজ্ঞাতসারে ইউ, পি. ও পাঞ্জাবে স্বাধীনভাবে ভ্রমণ করি।

দিল্লীতে আমি সুভাষবাবুর সহিত দেখা করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে 'ফরওয়ার্ড ব্লকে'র কর্ম-কর্তাদের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। সুভাষবাবুর ইউ, পি, ভ্রমণের সময় আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। ইউ, পি, ভ্রমণের সময় দেখিয়াছি, তিনি কতটা জনপ্রিয় ছিলেন। ইউ, পি, ভ্রমণের সময় শুনিয়াছিলাম সেখানকার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি হইতে গোপন সার্কুলার দেওয়া হইয়াছে যে, সুভাষবাবুর সম্বর্ধনায় যেন কেহ যোগদান না করে। ইহা সত্য কি মিথ্যা তাহা জানি না, তবে ইহা সত্য যে ইউ, পি,-র কংগ্রেস-নেতাদের কেহ সম্বর্ধনায় যোগ দেন নাই। তৎসত্ত্বেও সুভাষবাবু ইউ, পি,-র যে সব স্থানে গিয়াছেন সহস্র সহস্র লোক

তাঁহাকে দেখার জন্য ভিড় করিয়াছে। সুভাষবাবু অধিকাংশ স্থানে মোটরযোগেই ভ্রমণ করিয়াছেন। আগ্রা যাওয়ার সময় আমরা মোটরযোগে রওয়ানা হইয়াছিলাম। আগ্রার ময়দানে বৈকাল পাঁচটার সময় সভা হইবে ঘোষণা করা হইয়াছিল। তখন ছিল মাঘ মাস। সুভাষবাবু যে রাস্তা দিয়া যাইবেন তাহা পূর্বেই ঘোষণা করা হইয়াছিল। আমরা দেখিলাম রাস্তার স্থানে স্থানে গ্রামের লোক তোরণ সাজাইয়া সুভাষবাবুকে দেখার জন্য ফুলের মালা ও খাদ্যদ্রব্য সহ অপেক্ষা করিতেছে। প্রত্যেক স্থানেই মোটর থামাইতে হইয়াছে। এই ভাবে আমরা রাত্রি ৯টার সময় আগ্রা পৌছাই। আমাদের বিশ্বাস ছিল আমরা সভাস্থলে যাইয়া দেখিব, ময়দান শূন্য। এই মাঘ মাসের প্রচণ্ড শীতের রাত্রে কাহারও সভায় উপস্থিত থাকার উৎসাহ থাকিবে না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমরা দেখিলাম ২৫।৩০ হাজার লোক এই উন্মুক্ত ময়দানে সুভাষবাবুর বক্তৃতা শোনার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তাহারা বিকাল ৪টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত সুভাষবাবুর জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তাঁহাকে না দেখিয়া তাহারা গৃহে ফিরিয়া যাইবে না। ইহাকেই বলে জনপ্রিয়তা। সুভাষবাবুকে দেখার জন্য লোকের কি ভিড়? তিনি উর্দুতে এক ঘণ্টা বক্তৃতা দেন।

আমি ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগে কলিকাতায় ফিরিয়া আসি এবং কলিকাতায় কয়েক দিন থাকার পর পূর্ববঙ্গের দিকে রওয়ানা হই। আমি ঢাকা, ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা হইয়া ১০ই মার্চ চট্টগ্রাম পৌছাই। আশরফ উদ্দিন চৌধুরী সাহেব পূর্বেই চট্টগ্রাম পৌছিয়াছিলেন। আমার চট্টগ্রাম যাওয়ার সংবাদও তাঁহারা জানিতেন এবং এই উপলক্ষে সভার ব্যবস্থা হইয়াছিল। তখন বাংলাদেশে প্রকাশ্য সভা বে-আইনী হইলেও অনেক জায়গায়ই সভা হইয়াছে, কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। কলিকাতা হইতে চট্টগ্রামের দিকে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে আমি হাওড়ায়

এক প্রকাশ্য সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলাম। পুলিশ-কর্মচারীরাও সেই সভায় উপস্থিত ছিল, আমাকে গ্রেপ্তার করা হয় নাই। আমি চট্টগ্রামে আইন অমান্য করিয়া সভা করার জন্য যাই নাই।

আমরা চট্টগ্রাম পৌঁছানর পূর্বদিন সেখানে সভা হইয়াছিল এবং চৌধুরী সাহেব বক্তৃতা দিয়াছিলেন। পরদিন বৈকালে সভায় আমার উপস্থিত হইতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। সেই দিন সভায় আমি উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, একটি তরুণ বন্ধু সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বসিয়া আছেন, চৌধুরী সাহেব বক্তৃতা দিতেছেন, একটি শূন্য চেয়ার পড়িয়া আছে। আমি সভায় উপস্থিত হইয়া স্থানীয় বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মীদের সহিত বসিয়া পড়িলাম কিন্তু তাঁহারা আমাকে জোর করিয়া সভাপতির পাশের শূন্য চেয়ারে ঠেলিয়া বসাইয়া দিলেন। আমার চেয়ারে উপবিষ্ট হওয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যে এক জন পুলিশ-কর্মচারী ঘোষণা করিলেন, এই সভা বে-আইনী এবং সভাপতি, চৌধুরী সাহেব ও আমাকে গ্রেপ্তার করিলেন। চেয়ারে বসিবার শাস্তি একেবারে হাতে হাতে মিলিল।

১৯২৮ সনে মুক্তির পর আমি চট্টগ্রামে যাইয়া, চট্টগ্রামের গৌরব, বাংলার জনপ্রিয় নেতা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের বাড়ীতে ছিলাম। ৺যতীন্দ্রমোহন ছিলেন নির্ভীক দেশপ্রেমিক, বাংলাদেশ তাঁর নির্ভীকতার পরিচয় বহুবার পাইয়াছে। যতীন্দ্রমোহনের চট্টগ্রামের যুবকগণও নির্ভীক দেশপ্রেমিক। চট্টগ্রামের সহিত আমার প্রথম পরিচয় ১৯১০ সনে, আমার অজ্ঞাতবাসের সময়। এ যাত্রা আমাদের ধৃত হওয়ার পর চট্টগ্রামের যুবকদের নির্ভীকতার পরিচয় নূতন করিয়া পাওয়া গেল। আমরা ধৃত হইয়া নিরাপদে ছিলাম কিন্তু পুলিশের লাঠির ঘা পড়িল চট্টগ্রামের যুবকদের মাথার উপর। আমাদের ধৃত হওয়ার পর এক সপ্তাহ পর্যন্ত চট্টগ্রামের নির্ভীক যুবকের দল আইন অমান্য করিয়া শোভাযাত্রা করিয়াছে, সভা করিয়াছে, পুলিশের লাঠি চার্জের সম্মুখীন হইয়াছে। জেলখানায়

আমরা তাহাদের বীরত্ব ও নির্যাতন ভোগের সংবাদ পাইয়াছি। যুবকের দল লাঠির ঘা খাইয়াছে, তাহাতে দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে; তাহারা প্রফুল্লচিত্তেই সকল অত্যাচার সহ্য করিয়াছে, কিন্তু পুলিশের লাঠির ঘা শুধু যুবকদের দেহের উপর পড়ে নাই, আমাদের মনেও সে আঘাত লাগিয়াছে। পরাধীন জাতির এইসব নির্যাতন ভোগ করিতেই হয়। বিচারে আমাদের এক বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ড হইল। আমি চট্টগ্রাম জেল হইতে ঢাকা জেল হইয়া মেদিনীপুর জেলে স্থানান্তরিত হই।

রামগড় কংগ্রেসে যাওয়ার আমাদের খুব ইচ্ছা ছিল, আমরা জামিনের চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু তাহা পাই নাই। রামগড় কনফারেন্স অতিরিক্ত বৃষ্টির জন্য সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে নাই। বাংলার বাহিরে আমাদের পরিচিত যে সব বন্ধু ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে রামগড় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহারা এবং বাংলার বিশিষ্ট বন্ধুরা রামগড়ে একত্র মিলিত হইয়া ভারতের বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের (Revelutionary Socialist Party) পত্তন করেন।

আমার ধারণা ছিল এক বৎসর জেল খাটার পর আমাকে ছাড়িয়া দিবে কিন্তু আমাকে ছাড়া হয় নাই, সিকিউরিটি-বন্দী হিসাবে হিজলী জেলে পাঠান হইল। পূর্বে আমরা ধৃত হইয়া বেশী দিন সকলের সহিত একত্র থাকিতে পারি নাই। আমাদিগকে পৃথক করিয়া বাংলার বাহিরে চালান দেওয়া হইত, কিন্তু এ যাত্রা সে ব্যবস্থা হয় নাই। আমাদের ক্যাম্প জীবনের অভিজ্ঞতা ছিল না, এ যাত্রা বহু লোকের সহিত একত্র থাকায় বহু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। অনেকের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছি। জেলে একত্র না থাকিলে লোকের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না।

হিজলী জেল হইতে আমরা ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত হই। ঢাকা জেলে আমরা এক হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দেখিয়াছি,

জেলের ইতিহাসে, পৃথিবীর কোন স্থানে, ফ্যাসিষ্ট বন্দী শিবিরে—কোথাও সম্ভবতঃ এরূপ বর্বরোচিত ঘটনা ঘটে নাই। ঢাকা জেলে প্রায় তিনশত গুণ্ডা সিকিউরিটি-বন্দী ছিল। তাহাদিগকে বিনা বিচারে আটক রাখা হইয়াছিল। গুণ্ডা সিকিউরিটি বন্দীরা বিনা বিচারে আটক থাকার জন্য কোনই বিশেষ সুবিধা পাইত না, তাহাদিগকে কাজ করিতে হইত এবং তাহারা সাধারণ কয়েদীর মত ব্যবহার পাইত। পুরাতন জেল কর্মচারীদিগের মনোবৃত্তি সর্বদা অপরাধকারীদের (ক্রিমিন্যালদের) সহিত থাকার জন্য ক্রিমিন্যাল হয়। তাহারা হয় হৃদয়হীন, মায়া দয়া তাহাদের কিছুই থাকে না। সাধারণ কয়েদীদের পক্ষ সমর্থন করার কেহ থাকে না, তাই জেল-কর্মচারিগণ তাহাদের উপর যথেচ্ছ ব্যবহার করে। ঢাকা জেলের গুণ্ডা কয়েদীরা জেল কর্তৃপক্ষের নিকট কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা চাহিয়াছিল, তাহারা বলিয়াছিল, তাহারা কয়েদী নয়, বিনা বিচারে আটক আছে, তাহাদের ভাল খাওয়া ও বিড়ির ব্যবস্থা না করিলে তাহারা কাজ করিবে না। তাহাদের এই দাবী জেল কর্তৃপক্ষের সহ্য হইল না।

গুণ্ডা সিকিউরিটি-বন্দীদিগকে এক ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। পরদিন প্রাতে তাহাদের কয়েক জন প্রতিনিধি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট তাহাদের অভিযোগ নিবেদন করার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। তাহাদিগকে সুপারের সম্মুখে লইয়া যাওয়া হইল, সুপার তাহাদিগকে ধমকাইলেন, গালি দিলেন, সুপারের সহিত তাহাদের বচসা হইল। শ্বেতাঙ্গ সুপারিণ্টেণ্ট কৃষ্ণকায় কয়েদীর অবাধ্যতায় উত্তেজিত হইয়া সেখানেই কয়েকজনকে গুলি করিয়া হত্যা করিলেন। এই ঘটনায় অন্যান্য কয়েদীরা উত্তেজিত হইয়া ঢিল ছুঁড়িতে লাগিল। এই ঘটনায় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব বন্দুকসহ সদলবলে উপস্থিত হইয়া তাহাদের উপর গুলি চালাইতে আদেশ দিলেন। হত্যাকাণ্ড চলিতে লাগিল। এই হত্যাকাণ্ডের

সময় অনেকে প্রাণভয়ে গাছের উপর উঠিয়াছিল, তাহাদিগকে গুলি করিয়া মারা হইল, অনেকে পায়খানায় লুকাইল, তাহাদিগকে গুলি করিয়া হত্যা করিল,কেহ কেহ তাহাদের ইয়ার্ডের প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া অপর ইয়ার্ডেলাফাইয়া পড়িল,সেখানে জেলের কয়েদী মেট পাহারা তাহাদের লাঠি দ্বারা প্রহার করিয়া হত্যা করিল। প্রায় ৫০ জন লোক হত হইল, সকলেই আহত হইল, অক্ষত কেহ ছিল না।

গুণ্ডা সিকিউরিটিরা আমাদের পাশের ইয়ার্ডেই ছিল, আমাদের ৫নং ব্যারাকের দোতালা,তেতালা হইতে সবই দেখা যাইত। আমরা এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কেহ অন্য প্রকার বলিলেই তাহা বিশ্বাস করিব না। এই হত্যাকাণ্ডের পর জেল কর্ত্তৃপক্ষ মোটেই অনুতপ্ত হয় নাই, বরং ইহাকে মূলধন করিয়া আরও লাভের চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাদের সে চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে, তাহাদের পদোন্নতি ও উপাধি লাভ হইয়াছে। জেল কর্তৃপক্ষ ইহাই প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন, কয়েদীরা বিদ্রোহ করিয়াছিল, তাহারা গুলি করিয়া বিদ্রোহ দমন করিয়াছেন মাত্র। প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক সাহেব এবং জেলের আই,জি, এই ঘটনার তদন্ত করিতে গিয়াছিলেন —তাঁহারা সকল কথাই শুনিয়াছেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ঢাকা জেলের হত্যাকাণ্ডের বিতর্কের সময় প্রধানমন্ত্রী হক সাহেব প্রকাশ্য তদন্তের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন কিন্তু তিনি তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারেন নাই। শেষ পর্যন্ত প্রকৃত অপরাধীদিগের কোন শাস্তি হয় নাই। গভর্ণমেণ্ট নিরপেক্ষ তদন্ত দ্বারা যদি অপরাধীর দণ্ডের ব্যবস্থা করিতেন তবে সম্ভবতঃ কোন ক্ষতি হইত না। সম্ভবতঃ শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী জড়িত আছেন বলিয়াই তাহা হয় নাই।

১৯৪০ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নিরাপত্তা রক্ষার্থে যখন ব্যাপক ভাবে দেশসেবকদের গ্রেপ্তার করিয়া সিকিউরিটি-বন্দী হিসাবে জেলে পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তখন তাহাদের উপর সাধারণ কয়েদীর মত ব্যবহার করা হইয়াছিল, পরে তাঁহাদিগকে দ্বিতীয় শ্রেণীর

কয়েদীর অধিকার দেওয়া হয়। সিকিউরিটি-বন্দীগণ ইহার প্রতিবাদ স্বরূপ ১৯৪০ সালের নভেম্বর মাসে সুভাষবাবুর নেতৃত্বে প্রেসিডেন্সী জেলে অনশন ব্রত অবলম্বন করেন। আলীপুর সেণ্ট্রাল জেল, হিজলী স্পেশাল জেল প্রভৃতি জেলেও বন্দীরা এই সময় অনশন করেন। এই অনশন ব্রতের সময় অনুশীলন-সমিতির ৬০ জন সভ্য এবং অপর দলের আটজন সভ্য সুভাষবাবুর সহিত অনশন করিয়াছিলেন। অবশিষ্ট সিকিউরিটি-বন্দীগণ সুভাষবাবুর অনশন ধর্মঘটে যোগ দেন নাই—তাঁহারা অনশন ধর্মঘটীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিবার জন্য পাঁচ দিন একবেলা উপবাস করিয়াছিলেন। এই অনশন ধর্মঘট ২৩ দিন স্থায়ী হইয়াছিল। এই অনশনের সময় সুভাষবাবু ও প্রতুলবাবুর অবস্থা আশঙ্কাজনক হইয়া পড়ে এবং এজন্য তাঁহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হয়। এই অনশন ব্রতের ফলে সিকিউরিটি-বন্দীদের অবস্থার কিছু উন্নতি হয়।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

আগষ্ট বিপ্লব ও তাহার পর

বিগত ৪০ বৎসর যাবৎ, স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে অনুশীলন-সমিতির সভ্যগণ স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইয়া আসিয়াছেন। যখনই স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক আসিয়াছে, অনুশীলন-সমিতির সভ্যগণ তখনই সংগ্রামের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। জাতীয় কংগ্রেসের স্বাধীনতার সঙ্কল্প গ্রহণ করার পর হইতে অনুশীলন-সমিতির সভ্যগণ আন্তরিক ভাবে কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছেন। ১৯৩০ সনে জাতীয় কংগ্রেস যখন আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করিল তখন অনুশীলন-সমিতির সভ্যগণ ঐ আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়েন। তাঁহারা আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিয়া শুধু কারাবরণ করেন নাই, লাঠি চার্জের সম্মুখীনও হইয়াছেন। বিপ্লবীরা দেখাইয়াছেন, তাঁহারা যেমন প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে জানেন, পিস্তল ছুঁড়িতে পারেন—আবার খাঁটি সত্যাগ্রহীর ন্যায় নীরবে লাঠির আঘাতও সহ্য করিতে পারেন।

সুভাষবাবু যখন জাতীয় কংগ্রেসকে আপোষ মনোভাব পরিত্যাগ করিয়া সংগ্রামশীল করার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন অনুশীলন সমিতির সভ্যগণ সুভাষবাবুর পাশে দাঁড়াইয়াছিলেন। অনুশীলনের সভ্যগণ সুভাষবাবুর নির্দেশে আইন অমান্য করিয়া সভা করিলেন, কারাবরণ করিলেন—সুভাষবাবুর স্বপ্ন সফল করার চেষ্টা করিলেন।

১৯৪২ সনের ৯ই আগষ্ট, মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তারের ফলে ভারত ব্যাপী যে গণ-বিক্ষোভ সৃষ্টি হয় তাহাই আগষ্ট বিপ্লব। সিপাহী-বিদ্রোহের পর ভারতবর্ষে এতবড় বিপ্লব আর দেখা যায় নাই। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধের ফলে পৃথিবীর শোষিত, নির্যাতিত জনসমূহের একদিকে যেমন দুঃখ-কষ্টের মাত্রা

বৃদ্ধি পাইল আবার তাহাদের মনে আত্মবিশ্বাস ও স্বাধীনতা লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিল। পৃথিবীর সর্বত্রই পরাধীম জাতিগুলি স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করিতে লাগিল—ভারতবাসীও নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিতে পারে না। আইন-সভার অন্তঃসারশূন্যতা দেশবাসী উপলব্ধি করিয়াছে, ভারতবাসী শিশু নয়—চুষি কাঠি লইয়া খেলা করার অবস্থা পার হইয়াছে, মেকী আইন-সভার মায়া তাহারা কাটাইয়াছে, তাহারা চায় প্রকৃত ক্ষমতা হাতে পাইতে। ভারতবাসী জানে প্রকৃত ক্ষমতা একমাত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়াই আসিবে,—বৃটিশ-মন্ত্রীসভার অনুগ্রহের দানে নয়। আগষ্ট বিপ্লব ভারতের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল।

অনুশীলনের সভ্যগণ, যাহারা বাঙ্গলা দেশে বা বাঙ্গলার বাহিরে ছিলেন,সকলেই সক্রিয়ভাবে এই স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়াছেন। কেহ কেহ পুলিশের গুলিতে হত হইয়াছেন, কেহ কেহ ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়াছেন,বহুলোক কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন,লাঠির আঘাত সহ্য করিয়াছেন এবং বহুলোক নানাভাবে নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন। জেলের ভিতরে যাহারা পূর্ব হইতেই আবদ্ধ ছিলেন তাঁহারাও এই স্বাধীনতা সংগ্রামকে আন্তরিকতার সহিত সমর্থন করিয়াছেন।

স্বাধীনতা সংগ্রাম যখন চলিতেছিল তখন কমুনিষ্ট পার্টি দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে জনযুদ্ধ বলিয়া প্রচার করিয়া দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করিয়াছে। তাহারা ভারতের স্বাধীনতাকে প্রাধান্য দেয় নাই, রুশিয়ার বন্ধু বলিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকেই তখন কার্যতঃ সমর্থন করিয়াছেন। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধ ভারতবাসীর জনযুদ্ধ ছিল না।

আগষ্ট বিপ্লবের সময় ভারতবাসী অসীম বীরত্ব, আত্মত্যাগ ও নির্যাতন ভোগের পরিচয় দিয়াছে—তাহারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে সংগ্রাম করিয়াছে। একটা নিরস্ত্র জাতি কিভাবে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত প্রবল প্রতাপশালী গভর্ণমেণ্টকে পঙ্গু করিতে পারে তাহা তাহারা

দেখাইয়াছে। এই স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় সুসভ্য বৃটিশ-জাতির স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। একটা সুসভ্য জাতি অপর জাতির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা দমন করার জন্য কতটা নিষ্ঠুর হইতে পারে—দমন-নীতির মধ্য দিয়া তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ভারতের ঘটনাবলী প্রকাশ হইলে জার্মান বর্বরতা, জাপানী বর্বরতা তাহার নিকট ম্লান হইয়া পড়িবে—আদিম যুগের অসভ্য বর্বর জাতিও এই সব ঘটনাবলী শুনিলে লজ্জায় মাথা হেঁট করিবে।

আমাদের বিজয়ী মিত্রপক্ষ পরাজিত অক্ষশক্তির নেতৃবৃন্দকে যুদ্ধ অপরাধী বলিয়া গ্রেপ্তার করিয়াছেন, মিত্রপক্ষের বন্দী-সৈন্যদিগের উপর যেসব অক্ষশক্তির কর্মচারী অত্যাচার করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ, তাহাদিগকেও গ্রেপ্তার করিয়াছেন। শত্রুপক্ষের পরাজিত বন্দীদের অপরাধ প্রমাণ করিতে বিজয়ী মিত্রপক্ষের কোন বেগ পাইতে হয় না, তাহাদের অপরাধ প্রমাণ হইয়াছে এবং তাহারা চরম দণ্ড ভোগ করিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে কি জেলে বা জেলের বাহিরে, নিরস্ত্র দেশপ্রেমিকদিগের উপর এবং দেশের জনসাধারণের উপর সুসভ্য বৃটিশ-গভর্ণমেন্টের কর্মচারিগণ যে সব অত্যাচার করিয়াছে তাহার বিচার কে করিবে? পরাধীন জাতির বিচার করার ক্ষমতা নাই। বিচারালয়ে যাইয়াও তাহাদের কোন লাভ নাই, কারণ তাহাদেরই নিকট বিচার প্রার্থনা করিতে হইবে, যাহারা অবিচার করিয়াছে। পরাধীন জাতি সুবিচার পায় না—তাই ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া থাকে; শত শত বৎসরের অত্যাচার-অবিচারের সুবিচার তাহারাই করিবে যখন তাহাদের সুদিন আসিবে।

আমরা যখন জেলে আবদ্ধ ছিলাম তখন ঢাকা সহরে এবং মহেশ্বরদী পরগণায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। বর্তমান সভ্যতার যুগে পৃথিবীতে কেহ সাম্প্রদায়িকতার কথা কল্পনা করিতে পারে না,—একমাত্র পরাধীন ভারতেই ইহা সম্ভবপর। পরাধীনতার নিত্য সহচর হিসাবে ইহা থাকিবে এবং যখনই স্বাধীনতার প্রশ্ন উঠিবে তখনই

সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন দেখা দিবে ও সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হইবে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় সাধারণ গরীব লোক। তাহারাই মৃত্যু বরণ করে, তাহারাই উপবাসী থাকে, তাহাদেরই জেল হয়, মামলা চালাইতে তাহাদের বাড়ী ঘর বিক্রয় করিতে হয়। যাহারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধায় তাহারা বড়লোক, তাহাদের গায়ে আঁচড়ও লাগে না। এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে তাহারা লাভবানই হয়। আর লাভবান হয় গুণ্ডা শ্রেণীর লোক। যাহারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধায় তাহারা এবং গুণ্ডা শ্রেণীর লোক কেহই মরে না ; সাধারণ লোক, যে কিছুই জানে না, কোন অপরাধ করে নাই—এই শ্রেণীর লোকই প্রাণ হারায়।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানো যেমন কঠিন নয়, আবার দাঙ্গা বন্ধ করাও কঠিন নয়। দাঙ্গা যে বন্ধ হয় না, ক্রমাগত দিনের পর দিন চলিতে থাকে, তাহার কারণ গভর্ণমেণ্টের দুর্বলতা। গভর্ণমেণ্ট দাঙ্গা বন্ধ করার জন্য যদি কৃত-নিশ্চয় হন এবং একটু শক্ত হন তবে দাঙ্গা বেশীদিন চলিতে পারে না। কিন্তু দাঙ্গাকারীদের মনে যদি এই ভরসা থাকে যে গভর্ণমেণ্ট তাহাদের পিছনে আছেন, তাহাদের কোন ক্ষতি হইবে না এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি তাহারা দেখিতে পায়, দাঙ্গা বন্ধ করার জন্য গভর্ণমেণ্টের আন্তরিকতা নাই, তাহা হইলে দাঙ্গা বন্ধ হইবে না, বহুদিন চলিবে।

দাঙ্গা কাহারা বাধায় গভর্ণমেণ্টের তাহা জানা উচিত। গভর্ণমেণ্ট যদি তাহাদের উপর কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেন, যদি তাহাদের সুদীর্ঘ কারাদণ্ড ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন তাহা হইলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ হইবে। জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের মনে যদি এই ভয় থাকে দাঙ্গা বন্ধ করিতে না পারিলে তাঁহাদের অকর্মণ্যতার জন্য তাঁহাদের চাকুরি থাকিবে না, তাহা হইলেও দাঙ্গা বন্ধ হইবে। দেশের জনসাধারণের মনে যদি এই বিশ্বাস জন্মে,

দাঙ্গার ফলে তাহারা শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে, লাভবান হইতেছে অপর এক শ্রেণীর লোক ; তাহারা কতিপয় বড়লোকের জন্য প্রাণ দিতেছে—প্রতারিত হইতেছে, তাহা হইলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ হইবে। দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষভাব নাই, স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট লোক সময় সময় দেশের জনসাধারণের অজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ধর্মের নামে তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া কার্য হাসিল করে। দেশের জনসাধারণ আর অধিক দিন প্রতারিত হইবে না।

এই কয় বৎসর বাঙ্গালার উপর দিয়া দুর্ভিক্ষ, মহামারী বস্ত্রসঙ্কট প্রভৃতি গিয়াছে, লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে অচিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করিয়াছে, লক্ষ লক্ষ নরনারী বস্ত্রের অভাবে উলঙ্গ, অর্ধ-উলঙ্গ রহিয়াছে,—আমরা সে দৃশ্য দেখি নাই, দেশবাসীর এই দুর্দিনে তাহাদের সেবা করার সুযোগ পাই নাই। হয়তো আমরা বিশেষ কিছু করিতে পারিতাম না, অন্ততঃ আমাদের মনে একটা সান্ত্বনা থাকিত যে আমরা দেশবাসীর বিপদের সময় তাহাদের পাশে দাঁড়াইয়া, তাহাদেরই মত একজন ভুক্তভোগী হইয়া, তাহাদের সেবা করার চেষ্টা করিয়াছি। বাঙ্গালার এই দুর্ভিক্ষ, বস্ত্র-সঙ্কট মনুষ্যকৃত, ইহার জন্য দায়ী প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রীমণ্ডলী, লোভী ব্যবসায়ীগণ এবং সর্বোপরি দায়ী বিদেশী গভর্ণমেণ্ট। পরাধীনতা যতদিন থাকিবে নিত্য নূতন সমস্যা দেখা দিবে, দেশবাসীদের আরও অনেক দুর্ভোগ ভুগিতে হইবে। ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই আছে—পরাধীনতার সহচর হিসাবে তাহারা চিরকাল লাগিয়াই থাকিবে।

যুদ্ধরত দেশগুলিতে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বস্ত্র-সঙ্কটের কথা শুনা যায় নাই। জার্মানী বা জাপানের অধিকৃত দেশে খাদ্যাভাব বা বস্ত্রাভাবের কথা শুনা যায় নাই বরং অধিকৃত দেশে প্রচুর খাদ্যশস্য ছিল এরূপ প্রমাণই পাওয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে শস্য নষ্ট হইয়াছিল এরূপ কোন কথা উঠে নাই। ভারতবর্ষে

খাদ্যের অভাব ছিল না, যথেষ্ট খাদ্যশস্য গুদামে মজুত থাকা সত্বেও লক্ষ লক্ষ লোক না খাইতে পাইয়া মৃত্যু বরণ করিয়াছে। লক্ষ লক্ষ মণ চাউল, ডাইল, আটা গুদামে পচিয়া নষ্ট হইয়াছে—কিন্তু মানুষকে খাইতে দিয়া তাহাদের প্রাণ বাঁচান হয় নাই। কোন স্বাধীন দেশে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইলে দেশে বিপ্লব হইত, গভর্ণমেণ্টের পরিবর্তন ঘটিত। কোন স্বাধীন দেশে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইলে দেশের জনসাধারণ গভর্ণমেণ্টকে দায়ী করিত, অপরাধীর শাস্তি হইত, তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইত। কিন্তু পরাধীন দেশে কেহ দায়ী হয় না। পরাধীন দেশে বিদেশী সরকারের আওতায় পুষ্ট মন্ত্রিমণ্ডলী ও ধনী ব্যবসায়ী সম্প্রদায় যাহারা বিদেশী সরকারের স্তম্ভস্বরূপ, তাহাদের কোন অপরাধই অপরাধের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না, কারণ তাহাদের সবচেয়ে বড় গুণ তাহারা বিদেশী সরকারের অনুরক্ত। একমাত্র স্বাধীন ভারতই সকল সমস্যা সমাধান করিবে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁহার রাজনৈতিক প্রতিভাবলে বুঝিতে পারিয়াছিলেন দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী এবং তিনি ইহাও জানিতেন যে ভারতবর্ষে একটা বৈপ্লবিক আবহাওয়া চলিতেছে। তাই তিনি দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধের সুযোগ গ্রহণের জন্য ভারতের বিপ্লবী-শক্তিগুলিকে সংহত করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম কল্পনায় ছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ভারতবর্ষেই হইবে। অনুশীলন-সমিতি সুভাষবাবুর নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। সুভাষবাবু ছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি কিন্তু কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তাঁহার সহিত একমত না হওয়ায় তিনি দেশে বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই। অবশেষে তিনি যখন দেখিলেন, সুযোগ চলিয়া যাইতেছে, তখন তিনি রাসবিহারী বসুর পথ অবলম্বন করিলেন—তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিলেন। তিনি এই আশায় ভারতবর্ষ ত্যাগ করিলেন যে, যদি ভারতের

বাহিরে যাইয়া ভারতের স্বাধীনতার জন্য কিছু করিতে পারেন। ইহার সুযোগও মিলিল। বৃটিশ-সৈন্যদেব পুনঃ পুনঃ পরাজয়ের ফলে বৃটিশ-গভর্ণমেণ্টের শক্তির উপর ভারতীয় সৈন্যদের বিশ্বাস নষ্ট হইল। আবার বৈষম্যমূলক ব্যবহারের ফলে বৃটিশ-গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় সৈন্যদের সহানুভূতি হারাইল। সর্বোপরি ভারতীয় সৈন্যগণ পৃথিবীর স্বাধীন জাতির সংস্পর্শে আসিয়া মর্মে মর্মে ইহাই অনুভব করিতে লাগিল, "আমরা পরাধীন, পথিবীর স্বাধীন জাতি-সমূহের ঘৃণার পাত্র।" তাহারা দেখিল পৃথিবীর সব জাতিই নিজ নিজ দেশের স্বাধীনতার জনা যুদ্ধ করিতেছে, প্রাণ বিসর্জন দিতেছে, আর কেবল তাহারাই গোলামীর জন্য প্রাণ দিতেছে। তাহারা দেখিতে পাইল স্বাধীন জাতিসমূহের মধ্যে প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা নাই, এক দেশ, এক জাতির বন্ধনে তাহারা আবদ্ধ, তখন তাহাদের মধ্যেও দেশাত্মবোধ জাগিল, তাহারাও স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে বদ্ধ পরিকর হইল।

বিপ্লবী-নেতা রাসবিহারী বসু ১৯১৫ সনের ভারতের বিপ্লব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পরে, জাপানে যাইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকেন নাই। তিনি ভারতের স্বাধীনতার জন্য জমি প্রস্তুত করিতেছিলেন এবং জাপানে "স্বাধীন ভারত সঙ্ঘ" (India Independence League) প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রাসবিহারী বসু তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ও সংগঠন শক্তি-প্রভাবে জাপানবাসীদের ও জাপানী সেনাপতিমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়া-ছিলেন। জাপানে রাজপরিবার, সেনাপতিমণ্ডলী ও জনসাধারণের উপর তাঁহার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তিনি তাঁহার সেই প্রভাব ভারতের স্বাধীনতার কাজে লাগাইয়াছিলেন। অনুশীলন-সমিতির আর একজন সভ্য স্বামী সত্যানন্দ (তাহার পূর্ব নাম ছিল প্রফুল্ল সেন.বাড়ী ফরিদপুর জেলায়) শ্যামে থাকিয়া রাসবিহারীবাবুর সহযোগে ভারতের স্বাধীনতার জন্য কাজ করিতেছিলেন। দ্বিতীয়

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের আভাষ তাঁহারা পাইয়াছিলেন। বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসুর পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল, তিনি সেই পূর্ব অভিজ্ঞতা লইয়া কার্যে অবতীর্ণ হন। শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসু ও স্বামী সত্যানন্দ পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। স্বামী সত্যানন্দ ১৯৩৬ সনে শ্যাম দেশের রাজধানী ব্যাঙ্ককে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের শাখা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শ্যাম দেশে তাঁহার বিশেষ প্রভাব ছিল। ১৯৩৭ সনে টোকিওতে শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে এক সম্মেলন হয়। সেই সম্মেলনে স্বামী সত্যানন্দ, গিয়ানী প্রিতম সিং প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহারা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইতে বদ্ধপরিকর হন।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৃটিশের পরাজয় ঘটিলে, বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে স্বামী সত্যানন্দ পুরী, গিয়ানী প্রিতম সিং প্রভৃতি দেশপ্রেমিক বিপ্লবী নেতাগণ বন্দী ভারতীয় সৈন্যগণকে ভারতের স্বাধীনতার জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। তাঁহাদের চেষ্টায়ই প্রথম "আজাদ হিন্দ ফৌজ" গড়িয়া উঠে। ১৯৪২ সনের ২৮শে হইতে ৩০শে মার্চ পর্যন্ত রাসবিহারী বসুর নির্দেশে টোকিওতে 'স্বাধীন-ভারত-সঙ্ঘের' এক সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে যোগ দিবার জন্য ব্যাঙ্কক হইতে কয়েকজন প্রতিনিধি বিমানযোগে রওয়ানা হন। তাহাদের মধ্যে স্বামী সত্যানন্দ পুরী, গিয়ানী প্রিতম সিং ও ক্যাপ্টেন মহম্মদ আক্রাম খাঁ ছিলেন। পথিমধ্যে বিমান দুর্ঘটনায় তাঁহাদের মৃত্যু হয়।

প্রথম "আজাদ হিন্দ ফৌজ" ভাঙ্গিয়া গেলে, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসুর চেষ্টায় নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে জার্মানী হইতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আনানো হয়। বিপ্লবী-নেতা রাসবিহারী বসু নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর উপর সমস্ত দায়িত্বভার অর্পণ করিয়া নেতাজীর সহকর্মী হিসাবে কাজ করিতে থাকেন। শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসু "আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের" সর্বোচ্চ পরামর্শ-দাতা ছিলেন।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় পদার্পণ করিলে অনুশীলন-সমিতির সভ্যগণ যাহারা মালয়, ব্রহ্মদেশ ও অন্যান্য স্থানে পূর্ব হইতেই ছিলেন তাঁহারা সকলেই নেতাজীর নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিযুক্ত হন। নেতাজী অনুশীলন-সমিতির কয়েকজন সভ্যকে ভারতবর্ষে পাঠাইয়াছিলেন—ডাঃ পবিত্র রায় তাঁহাদের অন্যতম। পবিত্রবাবু কয়েকজন বন্ধুসহ ধৃত হন এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অবস্থায় আলীপুর জেলে অনুশীলন-সমিতির নেতৃস্থানীয় শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলীর নিকট নিম্নলিখিত চিঠিখানা লিখিয়াছিলেন :

"দাদা, নানা জনের নানা অভিমত থাকা সত্ত্বেও সর্বাগ্রে ও সর্বপ্রথম আমরা জানাইতে চাই যে, জাপানে বা জাপানীদের তরফ থেকে কোন কাজ করার ইচ্ছা বা প্রচেষ্টা নিয়ে আমরা এদেশে আসিনি, বা ওদেশে যে বিরাট সর্বভারতীয় আন্দোলন গড়ে উঠেছে তার পেছনেও এমনধারা কোন চিন্তা বা পরিকল্পনা নেই। ওদেশে এবং এদেশে আমাদের যা কিছু কর্মপ্রচেষ্টা এবং যারা এদেশে আমাদের এই কর্মপ্রচেষ্টার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন বা সাহায্য করেছেন, আমাদের বা তাঁদের কারুর এমন ধারা কোন ধারণার পিছনে ছুটে চলবার কোন ইঙ্গিত নেই। এটা নিশ্চয় জানবেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে ও তাহারই আশু সমাধানের জন্য আমাদের যা কিছু কর্মধারা।

"১৯৪২ সনে পূর্ব এশিয়ায় ইংরেজের পরাজয়ের ফলে তখনকার সমগ্র রাজনৈতিক আবহাওয়া সম্পূর্ণ বদলে যায়। যে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিকল্পনা এতদিন ধরে শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসু টোকিও বসে করে আসছিলেন হঠাৎ অতর্কিতে তার সুযোগ এলো। রাসবিহারী বসু এবং আপনাদের পরিচিত যে দুইজন বাঙালী বহুকাল যাবৎ ব্যাঙ্ককে অজ্ঞাতবাস করছিলেন এবং যারা সমগ্র শ্যামদেশের উপর ভারতীয় রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন এবং অবাঙ্গালী

পূর্ব ভারতীয় যাঁরা সমগ্র পূর্ব এশিয়ায় নানা জায়গায় রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন প্রভাবশালী লোক ছিলেন এবং পূর্ব বিপ্লব-যুগের (১৯১৫) যাঁহারা ছিলেন, সেই সব নেতাগণ যাঁদের মাতৃভূমির জন্য ত্যাগ ও দুঃখবরণ আজ বেশীর ভাগ ভারতবাসীর কাছে অজ্ঞাত—এমন সব নির্যাতিত নেতৃস্থানীয় প্রভাবশালী ভারতীয়গণ আন্তর্জাতিক যে সুযোগ আপনি তাঁদের সামনে এসে পৌঁছে গেল তাকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করলেন। তাহারই ফলে সৃষ্টি হ'ল ১৯৪২-এর গোড়ার দিকে 'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ'। এই লীগের আদর্শ—উদ্দেশ্য ভারতের স্বাধীনতা, বিশেষ করে এই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সুযোগ—জাপান এই সুযোগের স্রষ্টা। তাই লীগের সঙ্গে তার খানিকটা সম্বন্ধ রাখতে হলো। যে সম্বন্ধ রাখতে হলো, সে সম্বন্ধ শুধু রাজনৈতিক। ইংরেজ জাপানের শত্রু এবং তাই ইংরেজ ভারতবাসী হিসেবে আমাদের শত্রু। জাপান চায় তার যুদ্ধ জয়ের নীতির দিক থেকে ইংরেজের ধ্বংস। আমরাও চাই ভারতের দিক থেকে তার ধ্বংস। জাপান ও লীগের এই চিন্তাধারার ঐক্যই তাদের রাজনৈতিক সম্পর্কের যোগসূত্র। এছাড়া জাপানের ভারতবর্ষের উপরে রাজনৈতিক কোন মতলব ছিল না বা নেই। এটা সত্য ও অতি সত্য। বিশেষ করে যেখানে আমরা দেখেছি যে জাপান বর্মা ও ফিলিপাইন অধিকারের পর সেই সব দেশের স্বাধীনতা দান করেছে ও সেই সব দেশের লোকের হাতে শাসন ভার ছেড়ে দিয়েছে। এছাড়া ছোট ছোট বিজিত দেশের প্রতি ইংরেজের পূর্বকার ব্যবহার (রাজনৈতিক) ও জাপানের বর্তমান ব্যবস্থা তুলনা করে আমরা জাপানের পররাষ্ট্র-নীতির যে পরিচয় পেলাম, তাতে ভাবীকালে ভারতের প্রতি তাদের ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহের কোন অবকাশ রইল না। আমি ব্যক্তিগত ভাবে মালয়ের বর্মার নিজস্ব শাসন-প্রণালী দেখেছি এবং যুদ্ধ থাকাকালীন ওখানকার শাসন-ব্যবস্থা যেরূপ

আত্মনিয়ন্ত্রণ লাভ করলো তাতে আমরা জাপানীদের অবিশ্বাস করবার যুক্তিযুক্ত কোন কারণ খুঁজে পাইনি। এরপর আমাদের অস্থায়ী সরকার (Provisional Government) স্থাপিত হবার সঙ্গে সঙ্গে যখন আন্দামান ও নিকোবর সম্পূর্ণ পরিচালনার ভার আমাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হলো তখন জাপানীদের কোন গূঢ় উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহ করবার আমাদের আর কিছু থাকলো না। আমি ব্যক্তিগত ভাবে আন্দামানে ও নিকোবরে গিয়েছি ও সেখানে দেখে এসেছি এবং আমাদের তখনকার জন্য যদিও সেখানে জাপানী সেনা রয়েছে তবুও সেখানে "প্রভিসনাল গভর্ণমেণ্টের" কর্ণেল লোকনাথন স্থানীয় শাসন পরিচালনা করছেন।

"যদি ১৯৪২ সালের মাঝামাঝি 'লীগ' তার কাজ শুরু করেছিলো তবুও প্রশ্ন হ'তে পারে যে ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনের সময় ঐ দেশ হ'তে 'লীগের' কোন সাড়া পাওয়া গেল না কেন? তার কারণ তখন 'লীগের' নিজস্ব সৈন্যবাহিনী ৫০।৬০ হাজারের বেশী হয় নাই এবং তারা সবাই ভূতপূর্ব বন্দী ইংরেজ-সৈন্যদলের পরিত্যক্ত অংশ মাত্র। জাপানীরা তখন 'লীগের' আন্দোলনকে ভারতের মধ্যে একটা নৈতিক সমর্থন লাভ করবার জন্য বিশেষ জোর দেয় এবং 'লীগ'ও তখন ভারতে সেই আবহাওয়া সৃষ্টি করার জন্য তার কাজ চালাবার সিদ্ধান্ত করে।

"এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে সুভাষবাবুকে ওদেশ হতে আনবার জন্য সমস্ত ভারতবাসীর পক্ষ থেকে একটা বিশেষ দাবী করা হয় এবং তারই ফলে ১৯৪৩ সনের মাঝামাঝি সময়ে সুভাষবাবু এসে 'লীগের' নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করেন। সুভাষবাবু আসার ফলে সমস্ত আবহাওয়ার দ্রুতপরিবর্তন হয়। **Indian National Army** গঠিত হয়। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে দিনের পর দিন দ্রুত হাজার হাজার ভারতীয় **I.N.A.** বাহিনীতে যোগদান করতে আরম্ভ করেন। আপনারা জানেন বোধ হয় একটি নারী-বাহিনীও

গঠিত হয়। পূর্ব এশিয়ার ভারতবাসী মাত্রই নিজেদেরকে উজাড় করে এরই পেছনে এসে দাঁড়ান। তাঁদের অর্থে সামর্থ্যে এবং পিতাপুত্র জননী-ভগিনী তাঁদের প্রাণ উৎসর্গ করার জন্য এতটুকু দ্বিধা করেন নি। এই আই, এন,-এর সমগ্র খরচ, তার সাজ-পোষাক, তার খোরাক, বেতন সমস্ত ভারতবাসীর অর্থে পুষ্ট। কিভাবে মানুষ সুভাষবাবুর হাতে সর্বস্ব দেবার জন্য উন্মত্ত হয়েছিল আমার একদিনকার অভিজ্ঞতা জানাচ্ছি। পেনাং-এর এক সভায় অল্প সময়ের মধ্যে জনসাধারণ থেকে প্রায় তিন লক্ষ ডলার অর্থাৎ ২০ লক্ষ টাকা আই, এন, এর জন্য আমি সুভাষবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে উঠ্‌তে দেখেছি। এমনি করে দিনের পর দিন পূর্ব্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে আই, এন, এর জন্য কোটি কোটি টাকা স্বেচ্ছায় এসেছে।

"১৯৪৩ সনের নভেম্বর মাসে "প্রভিসনাল গভর্ণমেণ্ট" গঠিত হয় এবং সাথে সাথে ভারতবর্ষের স্বাধীনতায় অনুপ্রাণিত হয়ে দলে দলে লোক এসে সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করতে সুরু করে —আমরা অবশ্য এর বহু পূর্বেই যোগদান করেছিলাম। আমরা অর্থাৎ "অনুশীলন সমিতির" যে কয়জন ওখানে ছিলাম সকলে সমবেত হয়ে নিজেদের মধ্যে বিশেষ বিবেচনা এবং পরামর্শ করে একমত হয়ে এর সাথে দলগতভাবে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত করে সকলেই যোগদান করলাম। হয়ত আপনাদের মধ্যে কেউ না কেউ তাদের চিনতে পারবেন এমন কয়েক জনের নাম জানালাম।

"স্বামী সত্যানন্দ পুরী বহুকাল ব্যাঙ্ককে ছিলেন। যদিও তিনি গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করতেন, তবুও সন্ন্যাসের মূলমন্ত্র ছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। জন্মভূমির পূর্ণস্বাধীনতায় আত্মবিসর্জনে তিনি সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। সমগ্র শ্যামদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট তিনি ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় রাজনৈতিক গুরু বা নেতা। ব্যাঙ্ককের রাজদরবারেও তাঁর একটি বিশিষ্ট আসন ও প্রভাব

ছিল। ১৯৪২ সালে রাসবিহারী বসু প্রথম স্বামীজীর ওখানে আসেন এবং সমগ্র এশিয়াকে কেন্দ্র করে "ইণ্ডিয়া লীগ" গঠনের প্রথম পরিকল্পনা তাঁর (স্বামীজীর) ওখানে হয়। এজন্য ব্যাঙ্ককেই 'লীগের' হেড কোয়ার্টার প্রথম স্থাপিত হয়।

"শ্রদ্ধেয় রাসবিহারী বসু যে দু-জনের একান্ত সাহায্যে 'লীগকে' সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান রূপে গড়ে তুলেছিলেন, তাঁদের একজন এই স্বামী সত্যানন্দ পুরী ও অপর জন শ্রদ্ধেয় প্রিয়তম সিংজী। কিন্তু আজ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে স্বামীজী ও সিংজী কেহই আর ইহজগতে নাই। ১৯৪২ সালে আগষ্ট মাসে টোকিও সম্মেলনে যাবার পথে বিমান দুর্ঘটনায় আরো কয়েকজন স্বদেশপ্রেমিক ভারতীয়ের সাথে তাঁরা মারা যান। এঁদের মৃত্যুতে 'লীগ' পরিকল্পনার যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছিল আজো তার পূরণ হলো না।

"বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর কথা লিখতে গেলে একটা বিরাট ইতিহাস লিখতে হয়। তাও এখন সম্ভব নয়। আমার সাথে তাঁর তিন চার দিন যে আলাপ হয়েছিলো, তার থেকে একটা কথাই শুধু স্পষ্ট করে বুঝেছিলাম যে স্বাধীন ভারতে ফিরে আসবার একটা প্রবল আগ্রহ তাঁর মধ্যে সদাসর্বদাই ছিলো। তিনি ভারতের বহু রাজনৈতিক নেতাদের কথা আমাদের সঙ্গে আলাপে বলেছিলেন। বিশেষ করে বিপ্লব যুগের কারো কথা তিনি ভুলেন নাই।...... আপনাদের মধ্যে যাদের তিনি দেখেছেন তাদের কারুর কথাই এতটুকু বিস্মৃত হন নাই; বরং আমাদের সাথে সে-সব পুরানো স্মৃতি আলোচনা করবার কালে বালকসুলভ আনন্দে মেতে উঠতেন। বয়স যথেস্ট হয়েছিল, কিন্তু উৎসাহ ছিল প্রচুর। নেতাজী সুভাষবাবু আসবার পর সমগ্র দায়িত্ব ও কর্মভার স্বেচ্ছায় ও সানন্দে নেতাজীর উপর তুলে দিয়ে রাসবিহারীবাবু অসুস্থ শরীরে জাপানে ফিরে যান। আমার সাথে সেই তাঁর শেষ দেখা। আমরা আসবার পূর্বে নেতাজী সুভাষবাবুর কাছ থেকে আদেশ ও উপদেশ নিয়ে

এসেছিলাম। তাঁর সাথে ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনার সময় তিনি আপনার উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন এবং তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে, আমাদের প্রয়োজনীয় সাহায্য সহায়তা আপনার কাছ থেকে আসবেই। আমাকে ঐ সময়ে পাঠাবার বিশেষ কারণ ছিলো যাতে আপনার সাথে এ সম্পর্কে পাকাপাকি আলাপ আলোচনা করে আমরা কাজে অগ্রসর হতে পারি। আমি আসবার পূর্বে বাঙ্গলাদেশের সমগ্র আবহাওয়াকে রাজনৈতিক ভাবে বিশ্লেষণ করে আপনার সাথে কথা বলার গুরুত্ব, প্রয়োজন আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। আপনি আপনার সমস্ত শক্তি দিয়ে একাজে এগিয়ে আসবেন এবং ভারতের ভিতর থেকে আপনাদের সমগ্র সাহায্য পাওয়া যাবে এ বিশ্বাস আমি নেতাজীর মধ্যে দেখেছিলাম। ওখানকার সম্পূর্ণ পরিস্থিতি পরিষ্কার করে আপনাকে জানাবার হুকুম আমার উপর ছিল। দুঃখের কথা, বহু চেষ্টা করেও এসব কথা আপনাকে জানাবার কোন পথ বা সুযোগ করতে পারিনি। দীর্ঘকাল বাঙ্গালার বাইরে থেকে এবং এসে পর্যন্ত গুপ্তভাবে অবস্থান করবার চেষ্টাতে আমরা পূর্বপরিচিত কোন বন্ধুর সহিত দেখা করতেই পারিনি। মোটামুটি কিছুটা আপনাকে জানান গেল; আপনি বুঝতে পারেন, সব কথা এভাবে লেখা যায় না এবং এভাবে লিখিত আলোচনাও করা চলে না। তবুও যতটা সম্ভব লিখে জানালাম। বিদায়—জয় হিন্দ।"

এখন একটা প্রশ্ন এই, নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসু বিদেশী গভর্ণমেণ্টের সাহায্য গ্রহণ করিয়া অন্যায় কাজ করিয়াছিলেন কি?

আমারা যদি পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে তাকাই, যদি আমরা পৃথিবীর পরাধীন জাতিসমূহের স্বাধীনতার ইতিহাস আলোচনা করি তবে আমরা দেখিতে পাই, প্রত্যেক পরাধীন জাতি বিদেশী গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছে। যদি তাহারা

বিদেশী সাহায্য গ্রহণ না করিত, তবে তাহারা স্বাধীন হইতে পারিত না। বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ যদি অন্যায় হয়, তবে জর্জ ওয়াশিংটন লেনিন, সান-ইয়াৎ-সেন, ডি-ভ্যালেরা, পিলসুডস্কী সকলেই অন্যায় করিয়াছেন। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে সেকথা বলে না, সেই সব দেশের অধিবাসীগণ সে কথা বলিবে না—আমেরিকার অধিবাসীগণ স্বীকার করিবে না, জর্জ ওয়াশিংটন ভুল করিয়াছিলেন। জেনারেল দ্য-গল ও মার্শাল টিটো বিদেশী সাহায্য গ্রহণ করিয়া অন্যায় করিয়াছিলেন কি ? বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রচার বিভাগ জেনারেল দ্য-গল ও মার্শাল টিটোকে কুইসলিং না বলিয়া তাহাদের দেশপ্রেমের প্রশংসা করিয়াছিল কেন ?

দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধের সময় ইংলণ্ড ও আমেরিকা, জার্মানী ও জাপানের অধীনস্থ জাতিসমূহকে পরাধীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার জন্য উৎসাহিত করে নাই কি ? সেই সব পরাধীন জাতিকে সশস্ত্র বিপ্লব করার জন্য বৃটিশ ও আমেরিকান গভর্ণমেণ্ট অস্ত্র-শস্ত্র ও অর্থ দ্বারা সাহায্য করে নাই কি ? বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রচার বিভাগ, জার্মান, কবলিত রাষ্ট্রসমূহের অধিবাসীদের ধ্বংসাত্মককার্য —সন্ত্রাসবাদমূলক কার্যকে দেশপ্রেমিকদের বীরত্বব্যঞ্জক কার্য বলিয়া উচ্চ কণ্ঠে প্রশংসা করে নাই কি ? তাদের ধ্বংসাত্মক কার্য যদি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের চোখে, দেশপ্রেমিকের কার্য বলিয়া গণ্য হয় তবে আগস্ট বিপ্লবীদের ধ্বংসাত্মক কাজ দেশপ্রেমিকদের বীরত্ব-ব্যঞ্জক কার্য বলিয়া গণ্য হইবে না কেন ?—আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগ্রাম ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বলিয়া গণ্য হইবে না কেন ?

ইংলণ্ডের অধিবাসীরা তাহাদের স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিয়া অন্যায় করিয়াছিল কি ? ইংলণ্ডের অধিবাসীদের যদি তাহাদের স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিবার অধিকার থাকে তবে ভারতবাসীব তাহাদের স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিবার অধিকার থাকিবে না কেন ? বৃটিশ সৈনিকগণ তাহাদের

স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যদি যুদ্ধ করিতে পারে, তবে ভারতীয় সৈন্যগণ তাহাদের স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতে পারিবে না কেন? যে নীতি ইংলণ্ডের পক্ষে খাটিবে সেই নীতি ভারতবর্ষের পক্ষে খাটিবে না কেন? যে নীতি ইংলণ্ডের শত্রুপক্ষের দেশে প্রযোজ্য, সেই নীতি ইংলণ্ডের অধীনস্থ দেশে প্রযোজ্য হইবে না কেন?

এখন প্রশ্ন এই, বিদেশী গভর্ণমেণ্ট পরাধীন জাতির বিপ্লবীদের সাহায্য করে কেন? স্বাভাবিক অবস্থায় কোন রাষ্ট্র, সে রাষ্ট্র যতই উদার হউক না—কোন পরাধীন জাতিকে সাহায্য করে না। কারণ এরূপ সাহায্য করায় তাহার নিজের বিপদ আসিতে পারে—অপর রাষ্ট্রের সহিত সংঘর্ষ হইতে পারে। একটা পরাধীন জাতির মুক্তির জন্য কোন রাষ্ট্রই নিজের ঘাড়ে বিপদ ডাকিয়া আনিবে না। কিন্তু একটা রাষ্ট্রের সহিত যখন অপর রাষ্ট্রের যুদ্ধ বাধে স্বেচ্ছায় প্রত্যেক রাষ্ট্র তাহার শত্রুর অধীনস্থ দেশে বিপ্লব করিবার জন্য সেই দেশের বিপ্লবী দলকে সাহায্য করে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভারতের বিপ্লবী দলের সহিত জার্মান গভর্ণমেণ্টের এই সন্ধি হইয়াছিল—"জার্মান গভর্ণমেণ্ট ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করিবে, ভারতবর্ষে বিপ্লব করিবার জন্য জার্মান গভর্ণমেণ্ট অস্ত্র-শস্ত্র, অর্থ ও বিশেষজ্ঞ দ্বারা সাহায্য করিবে।" এখন প্রশ্ন এই যে—এই সাহায্য করিবার পিছনে জার্মানীর কি স্বার্থ ছিল? জার্মানী জানিত তাহার প্রধান শত্রু ইংলণ্ড এবং ইংলণ্ডের শক্তির মূল ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষে যদি বিপ্লব হয়, ভারতবর্ষ যদি ইংলণ্ডের হস্তচ্যুত হয়, তবে ইংলণ্ড দুর্বল হইবে এবং সহজেই জার্মানী ইংলণ্ডকে পরাজিত করিতে পারিবে। জার্মানীর সাহায্যে যদি ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়, তবে ভারতবর্ষ জার্মানীর মিত্র রাষ্ট্র হইবে এবং পৃথিবীতে জার্মানীর কোন ভয় থাকিবে না। জার্মানীর ইহাই ছিল বড় স্বার্থ বা লাভ।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসু বিদেশী সাহায্য গ্রহণ করিয়া পৃথিবীর ইতিহাস অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পথ—স্বাধীনতার পথ—সশস্ত্র বিপ্লবের পথ। এই পথেই পৃথিবীর পরাধীন জাতিসমূহ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাস এই পথেরই নির্দেশ দেয়। তাহাদের পথ যদি ভুল হয় তবে পৃথিবীর ইতিহাস ভুল।

ভারতের স্বাধীনতার জন্য যখন এই সমস্ত বীরগণ মৃত্যুপথ বরণ করিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন তখন ভাগ্যের পরিহাসে আমি তাহাদের পাশে দাঁড়াইতে পারি নাই। ইংরেজের বন্দীশালায় জীবন কাটিবে ইহাই ছিল কপালের লেখা।

অবশেষে ১৩শে মে (১৯৪৬) দমদম সেণ্ট্রাল জেল হইতে বেলা ১২টার সময় মুক্তি পাইলাম। ঐ সময় দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া গরম ছিল, যাহাতে সাম্প্রদায়িক কোন গণ্ডগোল না হয় সেজন্য আমি আমার রাজনৈতিক বন্ধুদিগকে সঙ্গে লইয়া শান্তি স্থাপনের জন্য বিভিন্ন স্থানে যাইতে ছিলাম। ইতিমধ্যে সংবাদ পাইলাম নওগাঁয় (শ্রীহট্ট) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। আমি নওগাঁ যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া কুমিল্লা গিয়া কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দত্তের সহিত দেখা করি ; তাহার সহিত আলাপ করিয়া হবিগঞ্জ রওয়ানা হই। আমি পূর্ব্বে কখনও হবিগঞ্জ যাই নাই, সেখানে আমার পরিচিত কোন লোকও ছিল না। আমি শায়েস্তাগঞ্জ ষ্টেশন হইতে হবিগঞ্জের গাড়ীতে উঠিলাম, তখন বেলা প্রায় ১১টা হইবে। গাড়ীতে এক ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হয়, তিনি হবিগঞ্জ সহরে থাকেন, তাহার সহিত কথা প্রসঙ্গে আমার হবিগঞ্জ যাওয়ার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলাম এবং ইহাও বলিলাম, হবিগঞ্জে আমার পরিচিত কেহ নাই এবং উঠারও কোন স্থান নাই। তিনি আমাকে তাহার বাসায় লইয়া গেলেন এবং বৈকালে কংগ্রেস নেতা ও এম, এল, এ সুরেশ চন্দ্র বিশ্বাসের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। সেইদিন রাত্রে এক

ঘরোয়া বৈঠক হয়। প্রায় ৪০।৫০ জন লোক উপস্থিত ছিল। আমি দাঙ্গা সম্বন্ধে তাহাদের বক্তব্য শুনিয়া বলিলাম, আমি দাঙ্গা বিধ্বস্ত অঞ্চলে যাইব,এখন আমার সঙ্গে কে কে যাইবেন ? সকলেই কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট সুরেশবাবুর দিকে চাহিলেন, তিনি বলিলেন "আমার অনেক শত্রু আছে, আমার যাওয়া উচিত হইবে কি ?" আমি বলিলাম, আপনার যাওয়ার প্রয়োজন নাই, আর কে কে যাইতে প্রস্তুত ? আমি ৩।৪ জন সঙ্গী চাই। সভা নিরুত্তর। তখন ছিল বর্ষাকাল,দাঙ্গা কয়েক দিন পূর্ব্বে হইয়াছে, দাঙ্গা বিধ্বস্ত অঞ্চলে লোক চলাচল বন্ধ, নৌকা যোগে যাইতে হয়। সভা নিস্তব্ধ, এমন সময় ঘরের এক কোন হইতে এক ভদ্রলোক উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আমি যাইতে প্রস্তুত,যদি আমাকে দয়া করিয়া সঙ্গে লইয়া যান।" তিনি বলিলেন, "আমি সংবাদ পাইয়াছি, আমার গ্রাম বিধ্বস্ত হইয়াছে, আমার ভাই আহত হইয়াছে।" পরে জানিতে পারিলাম, তিনি ভাদিগিরার জমিদার, অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বিনোদ বর্মন রায়। বিনোদবাবু আমাকে গোপনে বলিলেন, "আমার নিজের নৌকা আছে এবং পাশকরা বন্দুক আছে।" বিনোদবাবুকে পাইয়া আমি খুব খুসী হইলাম। বন্দুকের কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম। আমি বিনোদবাবুকে বলিলাম, যত বেশী পারেন কার্ত্তুজ সঙ্গে লইবেন। পর দিন প্রাতে আমরা রওয়ানা হইলাম, সঙ্গে যথেষ্ট কার্ত্তুজ আছে, ভয়ের কোন কারণ নাই। আমরা ভাদিগিরা যাইবার পথে দুই একটা বিধ্বস্ত গ্রামের সংবাদ লইয়া বৈকালে ভাদিগিরা বিনোদ বাবুর বাড়ী পৌছিলাম। বিনোদবাবুর ছোট ভাই, সাব রেজিষ্টার, আহত হইয়া হবিগঞ্জ হাসপাতালে ছিলেন। অপর ভাই কালুবাবু বাড়ী ছিলেন। গ্রামের শোচনীয় অবস্থা দেখিলাম। পরদিন প্রাতে খাওয়া দাওয়ার পর নৌকা যোগে নওগাঁ রওয়ানা হইলাম। আমরা বৈকালে নওগাঁ পৌছিলাম। নৌকা ঘাটে ভিড়ার পূর্ব্বে দেখিলাম একজন গুর্খা সিপাহী বন্দুক

কাঁধে করিয়া টানে টহল দিতেছে, আমরা চিন্তিত হইলাম, নৌকা ঘাটে ভিড়িল, এমন সময় গুর্খা সিপাহী বিনোদ বাবুকে সেলাম দিল, আমরা নিশ্চিন্ত মনে টানে উঠিলাম। বিনোদবাবু যখন সিলেট সহরে হাকিম ছিলেন, গুর্খা সিপাহী তাহাকে দেখিয়াছে, এখন পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ তাহাকে সেলাম দিল।

অপরিচিত দুইজন ভদ্রলোক দেখিয়া গ্রামের কয়েকজন লোক আমাদিগকে এক জায়গায় বসিতে দিলেন; গ্রামের কয়েকজন লোক উপস্থিত হইল। আমরা আমাদের পরিচয় দিয়া তাহাদের অবস্থা জানিতে চাহিলাম কিন্তু তাহারা আমাদের নিকট বিশেষ কিছু বলিতে চাহিলেন না। ইতিমধ্যে একটি যুবক, কলেজের ছাত্র উঠিয়া গিয়াছিল। ঐ সময় আনন্দবাজার পত্রিকা "স্বাধীনতা সংখ্যায়" যে সব স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ফটো বাহির হইয়াছিল, তাহার মধ্যে আমার ফটোও ছিল। ঐ যুবকটি কলিকাতা কলেজে পড়িত, বাড়ী আসার সময় এক কপি স্বাধীনতা সংখ্যা ক্রয় করিয়া লইয়া আসিয়াছিল, সে আমার পরিচয় পাইয়া স্বাধীনতা সংখ্যার ফটোর সহিত আমার চেহারা মিলাইয়া সকলকে এই সংবাদ দিল এবং বলিল, ভয়ের কোন কারণ নাই। তাহারা তখন সকল ঘটনা ব্যক্ত করিল। ঘটনার বিবরণ এই ঃ—ঘটনাটি অতি সামান্য, দুই সম্প্রদায়ের দুইজনের ব্যক্তিগত ঝগড়া গ্রাম্য বিবাদে পরিণত হইল এবং গ্রাম্য বিবাদ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পরিণত হইল। গ্রাম্য ঝগড়ায় কৈবর্ত্তরা একটা মুসলমান পাড়ায় আগুন লাগাইয়া দেয়, ফলে কয়েকটা বাড়ী পুড়িয়া যায়। এই সংবাদ অতিরঞ্জিত ভাবে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং একটা ভয়ানক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। চারিদিকে নানা প্রকার গুজব রটিতে থাকে। উত্তেজনা বৃদ্ধি করার লোকের অভাব হয় না, স্বার্থ সংশ্লিষ্ট লোকেরা তিলকে তাল করিয়া প্রচার করিতে লাগিল, সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রতিশোধ লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। দলে দলে লোক

নৌকা বোঝাই করিয়া নওগাঁ দখল করার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিল।

এদিকে নওগাঁর কৈবর্ত্ত সম্প্রদায়ের লোকেরাও নিশ্চিন্ত ছিলনা, ভাবী বিপদের আশঙ্কা তাহারাও করিতেছিল। তাহারা তখন দেশ ত্যাগের কল্পনা করে নাই, তাহারা স্থির করিল, গ্রামে থাকিয়াই আক্রমণকারীদিগকে বাধা দিবে, গ্রাম রক্ষা করিবে। তাহারা ব্যূহ রচনা করিয়া আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিল। নওগাঁ একটি দ্বীপের মত ক্ষুদ্র গ্রাম, চারিদিকে জল। গ্রামবাসীরা গ্রামের চারিদিকে জলের মধ্যে, পাড় হইতে ১৫।২০ হাত দূর বাঁশ পুতিয়া ব্যূহ রচনা করিল, বাঁশ ও সুপারী গাছের ফলি করিয়া বল্লম তৈয়ার করিয়া ও ইটের টুকরা করিয়া আত্ম-রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইল। পাহারার ব্যবস্থা ছিল। প্রহরীর ইঙ্গিতে হঠাৎ চারিদিকে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, গ্রামের সমর্থ ব্যক্তি সকলেই চারিদিকে নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াইয়া গেল, তখনও দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হয় নাই,আকাশ পরিষ্কার ছিল। কয়েক সহস্র আক্রমণকারী প্রায় একশত নৌকায় নওগাঁ আক্রমণ করিল খণ্ড-যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কোন পক্ষেই বন্দুক ছিলনা। আক্রমণকারীদের অসুবিধা ছিল, তাহাদের প্রত্যেক নৌকা বোঝাই লোক ছিল ; নিক্ষেপ করার মত অস্ত্র বিশেষ ছিল না, গ্রামের লোক বৃক্ষের আড়ালে থাকিয়া কুইচ বল্লম, ইটের টুকরা প্রভৃতি তাহাদের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল, নৌকা বোঝাই লোক থাকায় আক্রমণকারীরা আহত হইতে লাগিল। কৈবর্ত্ত মেয়েদের মধ্য কান্নাকাটি নাই, কাহারও মধ্যে ত্রাসের চিহ্ন নাই, সকলেই গ্রাম রক্ষার কাজে ব্যস্ত। সংগ্রাম যখন চলিতেছিল, মেয়েরা এবং ছোট ছেলেরা চারিদিকে ঘুরিয়া সংগ্রামকারীদিগকে পান, তামাক খাওয়াইয়াছে, জল খাওয়াইয়াছে, চিড়া-মুড়ি খাওয়াইয়াছে অস্ত্র সরবরাহ করিয়াছে। মধ্যাহ্ন অতিক্রম করিয়াছে, আক্রমণকারীদের নৌকা পাড়ে ভিড়াইতে

পারিতেছে না, প্রবল বাঁধা পাইতেছে, তাহারা আহত হইতেছে, ক্ষুধায় কাতর হইয়াছে, অবশেষে আক্রমণকারীরা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। তাহারা পলায়ন করার সময় কয়েকটা গ্রাম বিধ্বস্ত করিয়া চলিয়া গেল। নওগাঁর অধিবাসীরা সন্ধ্যার পর তাহাদের অর্থ দলিল-পত্র এবং মেয়েলোকদিগকে বিভিন্ন গ্রামে পাঠাইয়া দিল, পাহারা দেওয়ার জন্য বৃদ্ধ বৃদ্ধার দল এবং কিছু যুবক গ্রামে রহিল। ইতিমধ্যে গভর্ণমেণ্টও কিছু বন্দুকধারী গুর্খা সিপাহী নওগাঁ গ্রামে পাঠাইয়া দিলেন। গুর্খা সিপাহীর আগমনে গ্রামের লোক আশ্বস্ত হইল। কৈবর্ত্তদের আত্মরক্ষার বীরত্ব কাহিনী, বিশেষতঃ মেয়েদের বীরত্ব কাহিনী, ঐ সময় আমার বিবৃতিতে আনন্দবাজার পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। অবশ্যই এই ঘটনার দুই বৎসর পর নওগাঁ বিধ্বস্ত হইয়াছিল। আমরা বিধ্বস্ত মুসলমান পল্লিতে যাইয়া ক্ষতিগ্রস্তদের সহিত আলাপ করিলাম। আমরা কয়েকজন মৌলবী এবং হাজী সাহেবের সহিত দেখা করিলাম। আমরা হিন্দু-মুসলমান সকলের সহিত দেখা করিয়া শান্তিতে বাস করার উপদেশ দিলাম। আমি নওগাঁ হইতে লাখাই যাই এবং জজ বাড়ীর শচীন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে উঠি। কৈবর্ত্ত সম্প্রদায়ের বিখ্যাত ধনী শ্যামাচরণ দাসের বাড়ী লাখাই। এই দাঙ্গা উপলক্ষে শ্যামাচরণ দাস এবং আরো কিছু কৈবর্ত্ত সম্প্রদায়ের লোক-কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। আমি শচীন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে সঙ্গে লইয়া শ্যামাচরণ বাবুর বৃদ্ধ পিতাকে দেখিয়া আসিলাম। আমি ইহার পর ঢাকা যাইয়া প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেবের সহিত দেখা করিয়া দাঙ্গা সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করি।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

অনুশীলন সমিতি

একটা জাতি যখন জাগে তখন হঠাৎ জাগে না, অন্ধকার ঘরে আলো জ্বালিলে যেমন সমস্ত ঘর আলোকিত হয়, সেইরূপ কোন যাদুমন্ত্রে হঠাৎ কোন সুপ্ত জাতির তমিস্রা রজনীর অবসান হয় না। জাতি জাগে ধীরে ধীরে, তার পিছনে থাকে বহু নীরব নিঃস্বার্থপর কর্মীর বহু দিনের সাধনা। একটা জাতির মধ্যে যখন জাগরণ আসে তখন তাহা নানা ভাবে প্রকাশ পায়; অরুণোদয় হইলেই মনে হয় সূর্য উঠিতেছে। ভারতের ভাগ্যাকাশে প্রথম অরুণোদয় হয় সিপাহী বিপ্লবের যুগে। তখন অরুণোদয় হইলেও ভারতের ভাগ্যাকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন ছিল, সূর্যোদয় দেখা যায় নাই, সূর্যোদয়ের আভাস পাওয়া গিয়াছে স্বদেশী আন্দোলনের সময়।

পৃথিবীর ইতিহাসের একটা ক্রমবিকাশের ধারা আছে, তাহা ধাপে ধাপে চলে। পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা বহু শতাব্দীর ক্রমবিকাশের ফল; হঠাৎ আমরা বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছাই নাই। অতীতের অভিজ্ঞতার ফল বর্তমান পৃথিবী এবং বর্তমান পৃথিবীরও রূপ পরিবর্তন হইবে, বর্তমান অভিজ্ঞতার ফলে পৃথিবী নূতনরূপ ধারণ করিবে। স্বাধীনতা সংগ্রামেরও একটা ক্রমবিকাশের ধারা আছে, তাহা ধাপে ধাপে চলে, এক ধাপ বাদ দিয়া অপর ধাপে উঠা যায় না। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামও ধাপে ধাপে চলিতেছে, বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া আমরা বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি। মধ্য স্তর বাদ দিয়া এক লাফে ডবল প্রমোশন নেওয়ার উপায় ছিল না, তাহা সম্ভবপর হইত না। স্বদেশী যুগের ফলেই বিপ্লব যুগ, বিপ্লব যুগের ফলেই সত্যাগ্রহ যুগ, সত্যাগ্রহ যুগের ফলেই অ-সহযোগ যুগ, অ-সহযোগের ফলেই আইন অমান্য যুগ, এবং

আইন অমান্য যুগের ফলেই আগষ্ট বিপ্লব। বিপ্লবের গতি ধাপে ধাপে উপরের দিকে অগ্রসর হইতেছে। মধ্যের কোন অবস্থাকে বাদ দেওয়া চলেনা, প্রত্যেক অবস্থারই প্রয়োজন ছিল এবং তাহা দেশকে স্বাধীনতার দিকেই আগাইয়া দিয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের উৎপত্তিও তাহার পূর্ব অবস্থার ফল। জাতির ক্রমবিকাশ এই ভাবেই হয়, একটার সহিত অপরটার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের যেমন একটা ক্রমবিকাশ আছে, জাতির চিন্তাধারারও একটা ক্রমবিকাশ আছে। লোকের চিন্তা ধারা সব সময় একরূপ থাকে না, বিভিন্ন যুগের চিন্তাধারা বিভিন্ন রূপ হয়। আদিম যুগের চিন্তাধারা এবং মধ্য যুগের চিন্তাধারা এক নয়, আবার মধ্য যুগের চিন্তাধারার সহিত বর্তমান যুগের চিন্তাধারায় অনেক পার্থক্য আছে। ভবিষ্যতেও অভিজ্ঞতার ফলে বর্তমান চিন্তাধারার পরিবর্তন হইবে। সিপাহী বিপ্লব যুগের চিন্তাধারা এবং স্বদেশী যুগের চিন্তাধারা এক নয়। সিপাহী বিপ্লবের সময় বিপ্লবীদের চিন্তাধারা ছিল রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। স্বদেশী আন্দোলনের পর, বিপ্লব যুগে, বিপ্লবীদের চিন্তাধারা ছিল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। বর্তমান যুগের চিন্তাধারা সমাজতন্ত্রবাদ। বিভিন্ন যুগের চিন্তাধারা এক হয় না। সিপাহী বিপ্লব যুগের চিন্তাধারার বিচার করিতে হইবে সেই যুগের পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখিয়া। সেই যুগের চিন্তাধারা সেই সময়োপযোগী ছিল কিন্তু বর্তমান সময়ে তাহা চলিতে পারে না। এক সময় যাহা ভাল বলিয়া বিবেচিত হয়, সময়ের ব্যবধানে তাহাই আবার নিন্দনীয় বলিয়া গণ্য হয়। দাসত্ব প্রথা যখন সমাজে প্রচলিত ছিল, তখন লোকের নিকট তাহা অন্যায় বলিয়া মনে হইত না; কিন্তু বর্তমান যুগে কেহ ইহা কল্পনাও করিতে পারে না।

এই পরিবর্তনশীল জগতে কোন কিছুই চিরস্থায়ী হয় না। মানুষের চিন্তাধারার যেরূপ পরিবর্তন হয়, সঙ্গে সঙ্গে নেতৃত্বেরও

পরিবর্তন হয়। স্বদেশী আন্দোলনের সময় আমরা সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্রের নেতৃত্ব দেখিতে পাই, বিপ্লব যুগের বিভিন্ন স্তরে আমরা বিভিন্ন নেতা দেখিতে পাই, জাতীয় কংগ্রেসেরও বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন নেতার আবির্ভাব হইয়াছে, আবার ভবিষ্যতেও নূতন নেতা দেখা দিবে। প্রত্যেক নেতারই প্রয়োজন ছিল, তাহারা জাতিকে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। যে নেতার নেতৃত্বে ও কর্মীদের সাহায্যে ভারতবর্ষ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিবে, তাহার মূলে থাকিবে পূর্ববর্তী নেতা ও কর্মীদের অবদান। পূর্ববর্তী কর্মীরা স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত না করিয়া দিলে তাহারা ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিতে পারিতেন না।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় জাতীয় কংগ্রেস নূতন রূপ ধারণ করে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতাদের কল্পনায় দেশের স্বাধীনতা ছিল না, তাঁহারা ছিলেন সংস্কার পন্থী। তাহাদের কল্পনায় ছিল শাসন বিভাগে কিছু ক্ষমতা লাভ এবং সে ক্ষমতা লাভ সংগ্রামের দ্বারা নহে—সহযোগিতা দ্বারা। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একটা ঐতিহাসিক চাহিদা ছিল, তাই জাতীয় কংগ্রেস ক্রমে ক্রমে জনপ্রিয় হইয়া উঠিল। স্বদেশী আন্দোলনের সময় কংগ্রেস আর এক ধাপ অগ্রসর হইল, নেতারা দাবী করিলেন স্বরাজ বা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন। এখন তাহারা শুধু আবেদন নিবেদনের মধ্যে আবদ্ধ রহিলেন না, সরকারকে চাপ দেওয়ার জন্য ঘোষণা করিলেন, আমাদের দাবী পূরণ না করিলে আমরা বিদেশী পণ্যদ্রব্য বর্জন করিব। ইহা জাতীয় কংগ্রেসের সরকারের বিরুদ্ধে প্রথম অহিংস যুদ্ধ ঘোষণা। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়া অবসাদগ্রস্ত দেশবাসীর আত্মসম্বিত ফিরিয়া আসিয়াছে, দেশবাসী স্বাবলম্বী হইতে শিখিয়াছে।

অনুশীলনের নেতারা জানিতেন, ভোজবাজির মত ইচ্ছা করিলেই দেশে বিপ্লব হয় না, বিপ্লব শুধু কল্পনার বস্তু নয়, কারখানায় ফরমাইশ

দিলেই বিপ্লব তৈয়ার হয় না, বিপ্লবের জন্য চাই বৈপ্লবিক আব-হাওয়া। বৈপ্লবিক আব-হাওয়া সৃষ্টি করিতে না পারিলে শুধু কল্পনা দ্বারা দেশে বিপ্লব আসে না। ঘরে বসিয়া প্রস্তাব পাশ করিলেই বৈপ্লবিক আবহাওয়া সৃষ্টি হয় না, বৈপ্লবিক আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য চাই বৈপ্লবিক কর্মপদ্ধতি। অনুশীলনের কর্মপদ্ধতি প্রকাশ্য ও অ-প্রকাশ্য দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। এবং সভ্যদের মধ্যেও যোগ্যতা অনুসারে বিভিন্ন স্তরের ছিল। অনুশীলনের কর্মীরা বৈপ্লবিক আবহাওয়া সৃষ্টি, দলের বিস্তার ও দেশবাসীকে সঙ্ঘবদ্ধ করার কাজে নিযুক্ত হইল।

জাতীয় কংগ্রেস ১৯২৯ সনে, লাহোর কংগ্রেসে স্বাধীনতার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছে। কংগ্রেস স্থাপিত হওয়ার ৪৫ বৎসর পর জাতীয় কংগ্রেস স্বাধীনতার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু অনুশীলন জাতীয় কংগ্রেসের স্বাধীনতার সঙ্কল্প গ্রহণ করার ২৪ বৎসর পূর্বে, স্বদেশী আন্দোলনের সময়, যখন জাতীয় কংগ্রেস নেতারা ভারতের স্বাধীনতার কল্পনা করিতে পারেন নাই, তাহাদের কল্পনায় যখন ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন ছিল এবং তাহা পাওয়ার জন্য আবেদন নিবেদন, বিলাতি পণ্য বর্জন বা অহিংস অসহযোগ ছিল কর্মপন্থা, তখন অনুশীলনের নেতারা পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবের আয়োজন করিতেছিলেন।

সেই দুর্দিনে, অন্ধকার যুগে, অনুশীলন সমিতির কতিপয় তরুণ কর্মী স্বাধীনতার প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখিতে বদ্ধপরিকর হইল। সেই অন্ধকার যুগে যখন দেশবাসীর মনের মধ্যে কোন রাজনৈতিক চেতনা ছিল না, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতের কল্যাণের জন্য আছে, এই ধারণাই যখন দেশবাসীর মনের মধ্যে বদ্ধমূল ছিল, তখন আমরা, তরুণ বিপ্লবীরা, ভারতবর্ষকে সশস্ত্র বিপ্লব দ্বারা স্বাধীন করার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছি। তখন আমাদের বয়স কত ছিল? আমাদের বয়স তখন ১৮ হইতে ২৪ এর মধ্যে ছিল। আমরা বিদ্বান ছিলাম না, আমাদের

টাকা পয়সা ছিল না, পূর্ব অভিজ্ঞতা আমাদের ছিল না, লোক সমাজে ছিলাম আমরা অপরিচিত। তবে আমাদের আত্মবিশ্বাস ছিল, ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা আমাদের ছিল, আমাদের মধ্যে ভয় ছিল না, স্বার্থভাব ছিল না, আমাদের পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ছিল, আমাদের মধ্যে একতা ছিল। আমরা তাহাই সম্বল করিয়া কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়ি। আস্তে আস্তে বিপ্লবী দল সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িল।

স্বদেশ প্রেমিকের তীব্র আকাঙ্ক্ষা কোন শক্তিই দমন করিতে পারে না। কোন বাধা বিঘ্ন তাহাদের পথ রুদ্ধ করিতে পারে না। অত্যাচার, নির্যাতন, অভাব অনটন তাহাদিগকে বিচলিত করিতে পারে না। নিরাশা তাহাদের মনকে দুর্বল করিতে পারে না। অনুশীলনের তরুণ কর্মীরা অন্ধকার পথে, নিরাশার মধ্য দিয়া গীতার নিষ্কাম-কর্ম-যোগের সাধনায় ব্রতী হইল। সেই ঘোর দুর্যোগের দিনে তাহাদের মাথার উপর দিয়া কত ঝড় ঝাপ্‌টা বহিয়া গিয়াছে, কতদিন তাহারা অনাহারে রহিয়াছে, কত বিনিদ্র রজনী তাহারা যাপন করিয়াছে, তাহার কোন ইয়ত্তা নাই। তখন ফুলের মালা, বাহবা দ্বারা তাহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করার কেহ ছিল না, কেহ তাহাদিগকে ভুরি ভোজনে পরিতৃপ্ত করিত না—তাহাদের সম্বর্দ্ধনা করিত পুলিশ লাঠি দ্বারা, লোকের ভৎসনা শুনিয়াই তাহারা হইত পরিতৃপ্ত। মহৎ কাজে বাধা বিঘ্ন অনেক থাকে, যাহারা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে পারে তাহারাই হয় জয়ী। তরুণ বিপ্লবীরা সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কর্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। এই সব নীরব নির্ভীক কর্মীদের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের ফলে দেশের যুবক সম্প্রদায়ের প্রাণে নূতন সাড়া পড়িল।

স্রোতস্বিনীর স্রোত প্রবাহ বাঁধ দ্বারা আটকানো যায় না, জলধারা কোন না কোন পথে প্রবাহিত হইবেই। জলের প্রবাহের গতি যদি রুদ্ধ হয়, তবে জলরাশি ক্রমে ক্রমে স্ফীত হইয়া বন্যার

আকারে দেখা দিবে, সেই বন্যায় বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইবে, কেহ তাহার গতিরোধ করিতে পারিবেন। রাজনীতি ক্ষেত্রেও তাই হয়। একটা জাতির স্বাধীনতার আকাঙ্খা দমননীতি দ্বারা সাময়িক ভাবে দমন করা যায় কিন্তু চিরতরে লোপ করা যায় না। গভর্ণমেণ্ট দমন নীতি দ্বারা স্বদেশী আন্দোলন দমন করিয়াছে, সভা সমিতি বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে, প্রকাশ্য ভাবে কিছু করার উপায় নাই। তরুণ বিপ্লবীরা যখন দেখিল প্রকাশ্য ভাবে চলার পথ রুদ্ধ, তখন তাহারা গুপ্ত পথ অবলম্বন করিল ; তাহাদের কর্ম প্রবাহ গুপ্ত পথেই চলিতে লাগিল। গভর্ণমেণ্টের দমননীতি অনুশীলন সমিতিকে গুপ্ত সমিতিতে পরিণত করিতে বাধ্য করিয়াছে, —প্রকাশ্য অনুশীলন সমিতি এখন গুপ্ত সমিতিতে পরিণত হইয়াছে।

অনুশীলনের তরুণ নেতারা বহু নীরব কর্মী বাছাই করিয়া, তাহাদিগকে বাড়ীঘর ছাড়াইয়া গ্রামে গ্রামে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত করিয়া দিল। ঐ সব নীরব কর্মীরা পাঠশালার শিক্ষক বা গৃহ শিক্ষক ভাবে বিভিন্ন স্থানে থাকিয়া জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ও সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশী প্রচার করিতে লাগিল। এই ভাবে দল পুষ্ট হইতে লাগিল। এই সব কাজ গোপনে পুলিশের তীব্র দৃষ্টি এড়াইয়া করিতে হইত ; সময় সময় পুলিশ এই সব লোকের সন্ধান পাইয়া গ্রেপ্তার করিয়াছে এবং তাহাদিগকে ১০৯।১০ ধারায় জেল খাটিতে হইয়াছে।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় চরম-পন্থী সংবাদ পত্র ছিল, তাহা দ্বারা দেশের মধ্যে প্রচার কার্য চলিত। সরকারের দমন নীতির ফলে যুগান্তর, সন্ধ্যা, বন্দেমাতরম্ প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী সংবাদ পত্রগুলি বন্ধ হইয়া যাওয়ায় তরুণ বিপ্লবীরা তাহার খুব অভাব অনুভব করিতে লাগিল। প্রকাশ্য ভাবে তাহাদের সংবাদ পত্র বাহির করার কোন উপায় ছিল না।

সঙ্গীত, সংবাদ পত্র ও সাহিত্য জাতির মধ্যে নবজীবন আনে।

এই ত্রি-শক্তি রাজনীতির ক্ষেত্র সতেজ রাখে। এই ত্রি-শক্তির প্রভাবে দেশবাসীর মনের মধ্যে এরূপ আগুন জ্বলে যে রাজনীতি ক্ষেত্রে নেতাদের একটী একটী করিয়া কর্মী কুড়াইয়া লইতে হয় না, দলে দলে লোক স্বেচ্ছায় রাজনীতি ক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়ে। কোন স্বাধীন দেশ যদি অপর কোন দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে চায় তবে লেখকগণ প্রথমে জমি তৈয়ার করেন। তাঁহারা এরূপ লেখনী চালান, যার ফলে দেশবাসী সেই জাতিকে যুদ্ধে পরাজিত করার জন্য অধীর হইয়া উঠে। যুদ্ধে যে লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ দেয়, তার মূলে থাকে লেখকদের লেখনী, বক্তাদের বক্তৃতা, চারণদের প্রচার, সঙ্গীত প্রভাবে দেশের জনগণের ধমনীতে উষ্ণ রক্ত প্রবাহিত হয়, তাহারা তখন স্থির থাকিতে পারে না, তাহারা লাফাইয়া উঠে, ঝাঁপাইয়া পড়ে, প্রাণ রক্ষার দিকে দৃষ্টি থাকে না। সংবাদ পত্র, সাহিত্য ও সঙ্গীত জাতির মনের গতি পরিবর্তন করিয়া দেয়।

অনুশীলন সমিতির কর্মীরা গোপনে দুইখানা সংবাদপত্র বাহির করিতে লাগিল, একখানা বাংলা এবং একখানা ইংরেজী। বাংলা পত্রিকার নাম "স্বাধীন ভারত" ইংরেজীখানার নাম ছিল 'লিবার্টি'। অনুশীলন সমিতির গৃহী সভ্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের ১২নং নবদ্বীপ ওস্তাকার লেনে একটী ছাপাখানা ছিল। তাহাদের এই গোপন ছাপাখানায় তাহারা রাত্রে গোপনে কাগজ ছাপাইত। পত্রিকা ছিল সাময়িক, অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট তারিখে তাহা বাহির হইত না। পত্রিকা যখন বাহির হইত তখন কোন এক নির্দিষ্ট তারিখেই পাঞ্জাব হইতে আসাম পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে হঠাৎ তাহা প্রকাশ পাইত। স্কুল কলেজে, আইন, আদালত গৃহে, রাস্তার দেওয়ালে, হোষ্টেলে ছাত্রদের টেবিলের উপর, বিভিন্ন স্থানে তাহা দেখা দিত। কেহ কেহ ডাক যোগেও পাইতেন। স্বাধীন ভারত ও লিবার্টি যখন প্রকাশ হইত তখন পুলিশের কর্মতৎপরতা বাড়িয়া

যাইত। পুলিশ বহুস্থানে খানাতল্লাস করিত, বহুলোককে ধরিয়া টানাহেঁচড়া করিত।

বিপ্লবীদের সম্বন্ধে অনেকের ধারণা, তাহারা লেখাপড়া জানিত না, কতকগুলি অশিক্ষিত, অর্দ্ধ শিক্ষিত যুবকের দল, শুধু খুন ডাকাতি করিত। বিপ্লবীরা সকলেই উচ্চ শিক্ষিত ছিল না, ইহা অতি সত্য কথা। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তাহাদের বয়স অল্প ছিল, তাহারা স্কুল কলেজ ছাড়িয়া বিপ্লব দলে যোগ দিয়াছে, বাড়ী ঘর ছাড়িয়া স্বাধীনতার কাজে নিযুক্ত হইয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি লাভের জন্য ধাবিত হয় নাই। যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভের পর দেশের স্বাধীনতার কাজে নিযুক্ত হইবে স্থির করিয়াছিল, তাহাদিগকে আর কর্মক্ষেত্রে দেখা যায় নাই। বিপ্লবীদের মধ্যে যাহারা বাড়ীঘর ছাড়িয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী না হইলেও তার অর্থ এই নয় যে তাহারা অশিক্ষিত ছিল। ষ্ট্যালিন, হিটলার মুসোলিনী কেহই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী নহেন। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় এমন অনেক নামকরা লোক আছেন যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রী লাভ করেন নাই। আমাদের দেশের লোকের অবশ্যই ডিগ্রীর একটা মোহ আছে, যাহার ডিগ্রী নাই তাহার কথা কেহ শুনিতে চায় না। যাহারা 'স্বাধীন ভারত' বা 'লিবাটি' পড়িয়াছেন তাহারা বলিবেন না যে বিপ্লবীরা অশিক্ষিত ছিল। যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার অতিক্রম করে নাই এরূপ অনেক বিপ্লবী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধীধারী লোকদিগকে যুক্তি তর্ক দ্বারা বুঝাইয়া বিপ্লব দলে আনিয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পাইলেই যে রাজনীতি ক্ষেত্রেও ডিগ্রী পাইবে তাহা নহে। রাজনীতি ক্ষেত্রের ডিগ্রী আলাদা। এম, এ, পাশ করিয়া যদি বলে, যেহেতু আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি লাভ করিয়াছি, আমি এখন ডাক্তারি করিব,—ইহা দ্বারা তাহার অজ্ঞতাই প্রকাশ পাইবে। ডাক্তারী করিতে হইলে ডাক্তারী শাস্ত্র

অধ্যয়ন করিতে হইবে, অভিজ্ঞ ডাক্তারের অধীনে শিক্ষানবিশী করিতে হইবে, তবেই সে ভবিষ্যতে বড় ডাক্তার হইতে পারিবে। ইহা যোগ্যতার উপর নির্ভর করে, সকলেই বড় ডাক্তার হইতে পারে না। যে, যে ব্যবসা করিবে, তাহার সেই ব্যবসা সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা চাই। এম, এ, পাশ করিলে বড় ব্যবসায়ী হওয়া যায় না। রাজনীতি ক্ষেত্রে যাহারা কাজ করিবে তাহাদের সেই কাজের উপযোগী জ্ঞান থাকা চাই। বিপ্লবীদের কাজ চালানোর মত জ্ঞান ছিল।

বিপ্লবীদের সম্বন্ধে অনেকের ধারণা, তাহারা সন্ত্রাসবাদী ছিল, অর্থাৎ তাহারা বিশ্বাস করিত পুলিশ বা সাহেব খুন করিলেই দেশের স্বাধীনতা আসিবে। বিপ্লবীদের সম্বন্ধে যাহারা এরূপ ধারণা করে, তাহারা নিজেদেরই অজ্ঞতা প্রকাশ করে। যাঁহারা আমাদিগকে সন্ত্রাসবাদী বলেন, আমি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি ভারতবর্ষে কে প্রথম সন্ত্রাসবাদ প্রবর্তন করিয়াছে? বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট শঠতা-কপটতা-বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা, অন্যায় ভাবে বলপ্রয়োগ দ্বারা, ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া সন্ত্রাসবাদ দ্বারা ভারতবর্ষ শাসন ও শোষণ করিতেছে না কি? কোন্ অধিকার বলে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতবাসীর বুকের উপর জগদ্দল পাথরের ন্যায় বসিয়া আছে? একটা শান্তিপ্রিয় জাতিকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখা সন্ত্রাসবাদ নয় কি? রাজনৈতিক কর্মীদের গ্রেপ্তারের পর তাহাদের অসহায় অবস্থায় তাহাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করা সন্ত্রাসবাদ নয় কি? রাজনৈতিক বন্দীদের জেলখানায় মারপিট করা, তাহাদের উপর লাঠি চার্জ করা সন্ত্রাসবাদ নয় কি? নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চালাইয়া তাহাদিগকে পশুর ন্যায় হত্যা করা সন্ত্রাসবাদ নয় কি? কোন অধিকার বলে বিদেশী সরকার আমাদের দেশবাসীকে হত্যা করে? গভর্ণমেণ্টের টেররিজমের ফলে যখন দেশবাসীর মধ্যে ডিমরেলিজেসন আসিয়াছিল, তখন আমরা বিপ্লবীরা কাউণ্টার টেররিজম চালাইয়াছি।

আমরা টেররিজম চালাইয়াছি দেশবাসীকে এই আশ্বাস দেওয়ার জন্য,—অত্যাচারীর শাস্তিবিধানের লোক এদেশেই আছে। আমরা টেররিজম চালাইয়াছি, গভর্ণমেণ্টকে জানানোর জন্য—অত্যাচারের প্রতিশোধ লওয়া হইবে, এক-তরফা কিছুই চলিবে না। আমরা সফল মনোরথ হইয়াছি, আস্তে আস্তে ভারতবাসীর আত্মবিশ্বাস জাগিয়াছে।

বিপ্লবীদল যখন ক্রমশঃ শক্তিশালী হইতে লাগিল, তখন গভর্ণমেণ্টের প্রচার বিভাগ প্রচার করিতে লাগিল, বিপ্লবীরা বিপথগামী, তাহারা সন্ত্রাসবাদী। বৃটিশের প্রচার বিভাগ জনসাধারণের নিকট বিপ্লবীদের হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এরূপ প্রচার করিত এবং আমাদের দেশী লোক, এমনকি স্বদেশী নেতা ও দেশী খবরের কাগজওয়ালারাও অনেকে তাহা বেদবাক্য বলিয়া মনে করিত। এমন কি আজ কালও দেশবাসীর ভ্রান্ত ধারণা দূর হয় নাই, তাহারা বিপ্লবী দিগকে সন্ত্রাসবাদী বলিয়া অভিহিত করেন। তার অর্থ তাহারা বিপ্লববাদ ও সন্ত্রাসবাদের পার্থক্য জানেন না। বিপ্লবীরা যে দেশের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি না করিয়াছিল তা নয়, তাহারা যাহা কিছু করিয়াছে—প্রয়োজন হইতে এবং তাহা সময়োচিত ছিল। তাহারা জানিত ইহাই শেষ নয়। বিপ্লবীরা বিভিন্ন জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস পড়িয়াছে, বিপ্লবের বিফলতার কারণও তাহারা জানিত। বিপ্লবীদের ভাবী বিপ্লব সম্বন্ধে একটা কল্পনা ছিল এবং সেই কল্পনা অনুযায়ী তাহারা কাজ করিয়া যাইতে ছিল। কর্মক্ষেত্রে তাহারা নূতন নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, কাজের মধ্য দিয়াই তাহারা ভাবী কাজের উপযোগী হইয়াছে।

বাংলার পলাতক বিপ্লবীরা এক দিকে যেমন পুলিশের সহিত লড়াই করিয়া প্রাণ বিসর্জন দিয়াছে, পিস্তলের গুলি ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, আবার বহু স্থানে বহু

বার পুলিশের চোখে ধোকা দিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছে। পুলিশের বড় বড় কর্ত্তারা বহু স্থানে বহু বার বিপ্লবীদের নিকট চতুরতায় পরাজিত হইয়াছে। পলাতক বিপ্লবীর সন্ধান পাইয়া পুলিশ বাড়ী ঘেরাও করিয়াছে,সময় সময় সমস্ত মহল্লা ঘেরাও করিয়াছে,তাহারা বলাবলি করিতেছে, জালের মধ্যে বড় বড় রুই কাতলা আটক পড়িয়াছে, মনে মনে কতই উল্লাস কিন্তু অবশেষে দেখা গেল পাখী নাই। এখন গেল কোথায়? সময় সময় পুলিশের দল মাটি খুঁড়িয়া দেখিয়াছে সুড়ঙ্গ পথ আছে কি না। পুলিশের গুপ্তচর তাহাদিগকে ঠিক সংবাদই দিয়াছিল, পলাতক বিপ্লবী সেখানেই ছিল, তাহারা পুলিশের সম্মুখ দিয়াই চলিয়া গিয়াছে, পুলিশ ধরিতে পারে নাই। তবে কি তাহারা যাদু জানিত? তাহারা যাদু জানিত ঠিকই, তবে তার মধ্যে অলৌকিক কিছু ছিল না বা মন্ত্রবল ছিল না, ছিল প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, ছিল বুদ্ধির চাতুরী। তাহারা বেশ পরিবর্তন করিয়া, চাকর সাজিয়া, চাকরাণী সাজিয়া, মুসলমান ফেরিওয়ালা সাজিয়া পুলিশকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠী দেখাইয়া চলিয়া গিয়াছে।

বিপ্লবী জীবন ছিল বৈচিত্র্যময়, তাহারা অনেক দুঃসাহসিক কাজ করিয়াছে,অনেক প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়াছে। তাহাদের নাম কেহ জানে না,জানিতে পারিবেও না। পরাধীন দেশে বিপ্লবদলের বা বিপ্লবীদের ইতিহাস লেখা চলে না, স্বাধীন দেশ হইলে তাহাদের নামে উপন্যাস,নাটক রচিত হইত। অন্ধকার যুগে যাহারা অনাহারে অর্দ্ধাহারে থাকিয়া দিন রাত্র অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করে,তাহারা লোক সমাজে অজ্ঞাতই থাকে। তাহাদিগকে কেহ চিনে না,তাহাদের কথা কেহ স্মরণ করে না,তাহারা জনসমাজে অস্পৃশ্যই থাকিয়া যায়। আধুনিক লোকেরা মনে করে তাহারা অজ্ঞ ছিল, অশিক্ষিত ছিল, অকর্মণ্য ছিল, ভীরু ছিল। আমাদের ভাবী বংশধরগণও আমাদের সম্বন্ধে এই কথাই হয়তো বলিবে। যাহারা এরূপ উক্তি করে তাহারা জানে না বর্তমান অতীতেরই ফল।

বিপ্লবীরা ছিল নীরব কর্মী, তাহারা গীতার নিষ্কাম কর্মযোগের সাধনাই করিয়া আসিয়াছে, নাম যশের দিকে যায় নাই। তাহারা অনুশীলন সমিতির সভ্য হইয়াই শিখিয়াছে, নাম যশ বা নেতৃত্ব স্পৃহা পরিত্যাগ করিতে হইবে, চরিত্র নির্মল ও পবিত্র রাখিতে হইবে, নেতার আদেশ বিনা বাক্য ব্যয়ে প্রতিপালন করিতে হইবে। ইউরোপের মিডক্র্যাসীর ধাক্কা তাহাদের গায়ে লাগে নাই, উচ্ছৃঙ্খলতা তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করে নাই, তাহারা ছিল চরিত্রবান। তাহাদের ধারণায় চরিত্রহীন, উচ্ছৃঙ্খল লোক দ্বারা দেশের স্বাধীনতা আসিতে পারে না, তাই তাহারা চরিত্র নির্মল ও পবিত্র রাখার চেষ্টা করিত,শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা মানিয়া চলিত। চরিত্রহীন, উচ্ছৃঙ্খল লোকদের বিপ্লবদলে কোন স্থান ছিল না।

অনুশীলন সমিতির কাঠামোর সহিত রুশিয়ার বলশেভিক পার্টির অনেকটা মিল আছে। বলশেভিক পার্টির কাঠামো ও গঠন সম্বন্ধে লেনিন বলিয়াছেন—পার্টির দুইটি অংশ থাকিবে। (ক) পার্টির নেতৃস্থানীয় কর্মীদের লইয়া একটি ঘনিষ্ঠ চক্র হইবে। যাহারা পেশাদার বিপ্লবী অর্থাৎ যাহারা পার্টির কাজ ছাড়া আর কিছু করে না এবং যতটুকু থাকা দরকার অন্ততঃ ততটুকু মার্কসবাদ সম্বন্ধে জ্ঞান আছে,রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা আছে, সংগঠনের অভ্যাস এবং পুলিসের সহিত পাল্লা দেওয়া ও এড়াইয়া যাওয়ার দক্ষতা রাখে এরূপ লোক লইয়া ঘনিষ্ঠ চক্র গঠন করিতে হইবে। (খ) জাল বুনানি, শ্রমব্যস্ত লক্ষ লক্ষ জনগণের সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করেন এরূপ বহু সংখ্যক পার্টির সভ্য থাকিবে। এই দলের প্রথম ও প্রধান কাজ ছিল জার শাসনের উচ্ছেদ করা। তাহারা জানিতেন জার শাসনের উচ্ছেদ না হইলে ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ বা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হইবে না।

অনুশীলন সমিতির সভ্যও দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। বাড়ীঘর ছাড়া সভ্য এবং গৃহী সভ্য। সমিতির সভ্যদিগকে যোগ্যতা অনুসারে

আছ্য, মধ্য ও অন্ত্য প্রতিজ্ঞা করিতে হইত। আজকাল দলাদলি ও প্রতিযোগিতার বাজারে যে কোন লোক, এমনকি পুলিশের গুপ্তচর বিভাগের লোকও অনায়াসে দলের সভ্য হইতে পারে, কোন বাছ বিচার নাই, কিন্তু সেই যুগে কেহ ইচ্ছা করিলেই দলের সভ্য হইতে পারিত না। তখন সমিতির সভ্য হইতে হইলে তাহাকে বহুদিন অস্থায়ী সভ্য হিসাবে থাকিতে হইত। যাহাকে দলের সভ্য করা হইবে তাহার স্বাস্থ্য ও চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখা হইত, বিভিন্ন পুস্তক পাঠ ও উপদেশ দ্বারা তাহার মন গঠন করা হইত এবং ছোট খাট কাজের মধ্য দিয়া তাহার পরীক্ষা হইত। নূতন সভ্যকে অন্ততঃ ছয় মাস শিক্ষাধীনে থাকিতে হইত। স্থানীয় নেতা যখন মনে করিতেন উক্ত ছেলেটি দলের সভ্য হওয়ার উপযুক্ত হইয়াছে তখন তাহাকে আছ্য প্রতিজ্ঞা করান হইত। তখনও সে দলের পূর্ণ সভ্য নয়। যাহারা অন্ত্য প্রতিজ্ঞা করিত তাহারাই দলের প্রকৃত সভ্য বলিয়া গণ্য হইত। বাড়ীঘর ছাড়া সভ্য সকলেই অন্ত্য প্রতিজ্ঞার অধিকারী ছিল।

গৃহী সভ্যদিগকেও দুই ভাগে বিভক্ত করা চলে। প্রথম শ্রেণীর গৃহী সভ্যদিগকে আশা করা যাইত তাহারা সর্বদা বাড়ীঘর ছাড়ার জন্য প্রস্তুত। এই শ্রেণীর সভ্য প্রয়োজন হইলে যে কোন মুহূর্তে বাড়ীঘর ছাড়িয়া আসিবে, সকল প্রকার বিপজ্জনক কাজের জন্য প্রস্তুত থাকিবে, বাড়ীতে থাকিয়াই বাড়ীঘর ছাড়া সভ্যের ন্যায় সকল প্রকার কাজ করিবে। দ্বিতীয় স্তরের সভ্যরা বেশী বিপদের সম্মুখীন না হইয়া দলের কাজ করিত ও যথাসম্ভব সাহায্য করিত। ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার পর সমিতির প্রতিজ্ঞাপত্র ও নিয়মাবলী উঠাইয়া দেওয়া হয়, কারণ তাহা ষড়যন্ত্রের দলিল হিসাবে সরকার পক্ষ ব্যবহার করিত।

সমিতির সভ্যদিগকে অনেক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইত। প্রথম পরীক্ষা বাড়ীঘর ছাড়া, দ্বিতীয় পরীক্ষা গ্রামে বসিয়া

গঠনমূলক কার্য দ্বারা দক্ষতার পরিচয় দেওয়া, তৃতীয়,-- বিপজ্জনক কাজের সম্মুখীন হওয়া, চতুর্থ—একবার জেল খাটিয়া পুলিশের অত্যাচার ও জেলের নির্যাতন ভোগ করিয়া, আবার বাড়ীঘর ছাড়িয়া দলের কাজে নিযুক্ত হওয়া। যাহারা এইসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইত, যাহারা বহুদিন যাবৎ কর্মক্ষেত্রে থাকিয়া, বহু আপদ বিপদের মধ্য দিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, যাহারা বীরত্ব, আত্ম-ত্যাগ ও সংগঠন শক্তির পরিচয় দিয়াছে, তাহারাই দলের সভ্যদের নিকট নেতৃস্থানীয় বলিয়া গণ্য হইতেন। অনুশীলনের প্রত্যেক নেতাই ছোট হইতে দক্ষতার পরিচয় দিয়া বড় হইয়াছে। কাজের মধ্য দিয়া যাহারা দক্ষতার পরিচয় দিয়াছে, তাহারা আস্তে আস্তে গ্রাম হইতে প্রধান কেন্দ্রে আসিয়াছে। আমরা সকলেই গ্রামে থাকিয়া, পলাতক অবস্থায়, কিছুদিন শিক্ষকতার কাজ করিয়াছি। অনুশীলন সমিতির সভ্যদিগকে ধাপে ধাপে উচ্চ স্তরে উঠিতে হইত। সমিতির সভ্য হইয়াই কেহ বড় বড় কথা বলিয়া নেতাদের নিন্দা করিয়া, নিজে নেতা হওয়ার দাবী করিতে পারিত না।

অনুশীলনের নেতা ভোটে স্থির হইত না। কোন ধূর্ত লোক ষড়যন্ত্র করিয়া ভোট বাগাইয়া নেতা হইতে পারিত না। অনুশীলনের নেতা হওয়া ধন বা বিদ্যার উপর নির্ভর করিত না। অমুক বড় লোক বা বিদ্বান, তাহাকে নেতা করিতে হইবে, অনুশীলনের সভ্যদের সে ধারণা ছিল না। অনুশীলনে নেতা স্বাভাবিক গতিতে তৈয়ার হইত, হঠাৎ কেহ নেতা হইতে পারিত না। অনুশীলনের গঠন প্রণালী এরূপ ছিল এবং সভ্যদের মধ্যে এরূপ জমাট ভাব ছিল যে তখন নেতৃত্বের কোন প্রশ্ন উঠে নাই, নেতৃত্বের কোন প্রতিযোগিতাও ছিল না। সেই যুগে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও ব্যক্তিগত প্রাধান্যই বড় ছিলনা, দেশের স্বাধীনতার প্রশ্নই বড় ছিল, তাই নেতৃত্বের প্রশ্ন কাহারও মনে উদয় হয় নাই। সকলেই কাজ করিয়াছে, কাজের কথা ভাবিয়াছে ; আমরা সকলে এক, মিলিয়া

মিশিয়া কাজ করিব, পরস্পরকে সাহায্য করিব, এই ধারণাই সকলের মনে স্থান পাইত। তখন পুলিশের গুপ্তচর বিভাগ এতটা উন্নত ছিল না, দলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার কেহ ছিল না, যদি কেহ বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করিত তবে তাহার শাস্তির উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল। কোন বিপ্লবী দলের মধ্যে যদি দলাদলি থাকে, পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা না থাকে. তবে সেই দল টিকিয়া থাকিতে পারে না। অনুশীলনের মধ্যে দলাদলি ছিল না, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা ছিল, তাই অনুশীলন সমিতি এত বড় হইতে সক্ষম হইয়াছিল।

পুলিনবাবুর পর দলের কোন নির্দিষ্ট নেতা ছিল না, কোন ইলেক্‌সনের ব্যবস্থা ছিল না, যাহারা দলের নেতৃস্থানীয় ছিলেন, তাহাদের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ চক্র ছিল, তাহারাই পরামর্শ করিয়া দলের কাজ চালাইতেন। কেহ ধৃত হইলে পরবর্তী লোক স্বাভাবিক গতিতেই তাহার স্থান পূরণ করিত। সমিতির নেতৃস্থানীয় সভ্যদের মধ্যে সকলেই যে পরামর্শ সভায় উপস্থিত হইতে পারিতেন তাহা নহে, কারণ বিভিন্ন সভ্য বিভিন্ন প্রদেশে, বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত থাকিতেন, সব সময় একত্র হওয়া সম্ভবপর হইত না। কোন বিশেষ পরামর্শের প্রয়োজন হইলে নিকটে যাহারা থাকিতেন তাহারাই পরামর্শ করিয়া কর্তব্য নির্ণয় করিতেন। সমিতির প্রত্যেক সভ্যেরই স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ও নেতৃস্থানীয় লোকদের সহিত আলাপ আলোচনা করার অধিকার ছিল। কোন সাধারণ সভ্য বা গৃহী সভ্য যদি কোন নূতন প্রস্তাব করিতেন তবে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা হইত। তখন ছিল সহযোগিতা—প্রতিযোগিতা ছিলনা।

আজকাল আধুনিক সভ্যদের মধ্যে ইলেক্‌সন, ডেমক্র্যাটিক সেন্ট্রালিজম প্রভৃতি রব উঠিয়াছে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে সব সভ্য অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হয় নাই বা ভবিষ্যতেও হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই, যাহারা কর্মক্ষেত্রে বীরত্ব ও আত্মত্যাগের

কোন পরিচয় দিতে পারে নাই, যাহারা দলের বিশেষ কোন কাজ করে নাই, তাহারাই মাতিয়া উঠিতেছে। বিপ্লবী দলে ইলেকসন চলিতে পারে না। বিপ্লবী দলে ইলেকসন প্রথা প্রবর্তন করার অর্থ সরকারের আই, বি, আফিসের সুবিধা করিয়া দেওয়া। সরকার পক্ষ চায় বিপ্লবী দলের কার্য নির্বাহক সমিতিতে তাহাদের কিছু লোক রাখিতে। বিপ্লবী দলের কার্য নির্বাহক সমিতিতে সরকারের লোক রাখিতে পারিলে সরকার পক্ষ সেই দল সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে। তাহা হইলে সরকার যে শুধু দলের সকল সংবাদ পাইবে তা নয়, বিপ্লব পণ্ড করারও সুবিধা হইবে। কার্য-নির্বাহক সমিতির সভ্য হইলে দলের লোকের উপর একটা প্রভাব থাকে। সরকারের লোক কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য হইলে সে তাহার প্রভাব সরকারের কাজে লাগাইতে পারিবে। ইলেকসনের ব্যবস্থা থাকিলে সরকার কতকগুলি তরুণ গুপ্তচরকে দলের সভ্য করাইয়া অনায়াসে সেই দলের কার্যনির্বাহক সমিতি দখল করিয়া লইতে পারিবে। অনুশীলন সমিতির ঘনিষ্ঠ চক্র দখল করার কোন সুযোগ সরকার পক্ষ পায় নাই।

বর্তমান যুগে দেখা যায় ইলেকসনের মধ্যে দুর্নীতি ভরপুর, কোন উপযুক্ত লোক নির্বাচিত হইতে পরে না, যাহারা ষড়যন্ত্র করিয়া অধিক ভোট সংগ্রহ করিতে পারে তাহারাই নির্বাচিত হইতে পারে। এই ইলেকসনের মধ্যে থাকে দুর্নীতি, প্রতিযোগিতা এবং তাহার ফলে দলের মধ্যে ভাঙ্গন ধরে। বিদেশী সরকারের অধীনে থাকা পর্যন্ত বিপ্লবী দলে ইলেকশন পদ্ধতি করা উচিত নয়। অবশ্যই দেশ যখন স্বাধীন হইবে তখন গণভোটে দেশ শাসিত হইবে, তখন ডিক্টেটারী শাসন উচিত নয়—তাহা যে নামেই হউক না কেন অনুশীলন সমিতির নেতাদের মধ্যে যখন দুর্বলতা আসিয়াছে তখন তাহারা নিজ হইতেই সরিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদিগকে সরানোর কোন প্রয়োজন হয় নাই। তখন নেতা হওয়া লাভজনক ব্যবসা

ছিল না, নেতাদের ফাঁসি, দ্বীপান্তর বা গুলির আঘাতে মৃত্যুর সম্ভাবনাই ছিল অধিক।

বর্তমানে পৃথিবীর কোথাও ডেমক্র্যাসী নাই,সর্বত্রই ডেমক্র্যাসীর নামে প্রতারণা চলিতেছে, জনগণ প্রতারিত হইতেছে। বর্তমানে প্রকৃত ডেমক্র্যাসী ইংলণ্ডেও নাই, আমেরিকাতে নাই, রুশিয়াতেও নাই। পূর্বে রুশিয়াতে বলশেভিক পার্টির মধ্যে সেণ্ট্রালিজম ছিল, কিন্তু ডেমক্র্যাসী ছিল না। দেশ শিক্ষিত ও উন্নত না হইলে ডেমক্র্যাসীর কোন অর্থ হয় না। দেশের জনগণ যখন শিক্ষিত হইবে, যখন তাহাদের আত্মচেতনা জাগিবে, যখন তাহাদের মধ্য হইতে দুর্নীতি দূর হইবে, কর্তব্যজ্ঞান জাগিবে, ব্যক্তিগত স্বার্থ অপেক্ষা জাতীয় স্বার্থই বড় হইবে, তখনই জনগণ স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করিতে পারিবে, তখনই দেশে প্রকৃত ডেমক্র্যাসী আসিবে।

অনুশীলন সমিতির সভ্য কেহ ইচ্ছা করিলেই যেমন হইতে পারিত না, আবার কেহ ইচ্ছা করিলেই দল ছাড়িয়া যাইতে পারিত না। বিপ্লবী দলের সভ্য,স্থায়ী সভ্য— আজীবন সভ্য। কেহ একবার বিপ্লবী দলের সভ্য হইলে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত দল ছাড়িয়া যাইতে পারিত না। বিপ্লব দলেরী সভ্যের অনেক গোপনীয় বিষয় জানা থাকে এবং সে দল ছাড়িয়া গেলে অনেক অনিষ্ট করিতে পারে, তাই কেহ দল ছাড়িতে পারিত না। অনুশীলন সমিতির নিয়মাবলীতে ছিল, যদি কেহ দল পরিত্যাগ করে তবে তাহার জ্ঞান লোপ করিতে হইবে। অবশ্যই অবস্থা বিশেষে যে কোন সভ্য দল পরিত্যাগ করিয়া, গৃহী সভ্য হিসাবে থাকিতে পারিত; কিন্তু দলত্যাগ করিয়া দলের ক্ষতি বা বিরুদ্ধাচরণ করার ক্ষমতা কাহারও ছিল না।

বিপ্লব যুগ ছিল বীরত্ব, আত্মত্যাগ ও নির্যাতন ভোগের যুগ। তখন সকলকে নিশ্চয় মৃত্যু জানিয়া কাজ করিতে হইত। তাঁহারা জানিতেন ধৃত হইলে তাঁহাদের হয় ফাঁসি হইবে, নয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইবে;- অথবা বন্দুকের গুলির আঘাতে তাহার মৃত্যু হইবে।

তখন বিপ্লবীদের সম্মুখে লোভনীয় কিছুই ছিল না—কাউন্সিল, কর্পোরেশন ছিল না, ফুলের মালাও ছিল না। অবশ্যই তাহারা জানিত, বিশ্বাসঘাতকতা করিলে সরকার হইতে তাহাদের অর্থ ও চাকুরী লাভ হইবে কিন্তু তাহাতেও নিশ্চয় মৃত্যুর সম্ভাবনা ছিল। বিপ্লবীদের প্রাণে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার আকাঙ্ক্ষা এত প্রবল ছিল যে, তাহাদের মধ্যে কোন দুর্বলতা, নীচতা বা ব্যক্তিগত স্বার্থ স্থান পায় নাই। অবশ্যই সময় সময় যে ইহার ব্যতিক্রম না হইয়াছে তা নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রমও ঘটিয়াছে এবং তাহাদের কেহ কেহ চরম দণ্ড ভোগ করিয়াছে, অবশিষ্টদের লোকালয়ের বাহিরেই জীবনযাপন করিতে হইয়াছে। বিপ্লবী দলের সভ্যদিগকে বিভিন্ন পরীক্ষার মধ্য দিয়া যাইতে হইত, এজন্য দলে সরকারের গুপ্তচর বিভাগের কোন প্রভাব ছিল না। তখন প্রলোভনের কিছু না থাকায় এবং নিশ্চয় মৃত্যু জানায় দলাদলি ছিল না। অবশ্যই কেহ কেহ মতবাদের দোহাই দিয়া দল ছাড়ার চেষ্টা করিয়াছে।

অনুশীলন সমিতির পিছনে আছে একটা মস্ত বড় গৌরবময় ইতিহাস, তাহা হইতেছে বীরত্ব, আত্মত্যাগ ও নির্য্যাতন ভোগের ইতিহাস। স্বদেশী আন্দোলন যখন ব্যর্থ হইল গভর্ণমেণ্ট যখন দমননীতি চালাইতে লাগিল, তখন আন্দোলনের নেতারা ভয়ে পিছনে পড়িলেন, দেশের মধ্যে দেখা দিল নৈরাশ্য-ভয়-অবসাদ। সেই দুর্যোগে অনুশীলনের তরুণ বিপ্লবীরা কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িল, তাহাদের বীরত্ব-আত্মত্যাগ ও নির্যাতন ভোগের ফলে দেশ সজীব হইল, দেশবাসীর প্রাণে নূতন আশার সঞ্চার হইল। অনুশীলন সমিতি ছিল সর্বভারতীয় দল। এক সময় ভারতবর্ষে রাজনৈতিক দল বলিতে বিপ্লবী দলকেই বুঝাইত। কোন কোন বিদেশী গভর্ণমেণ্ট, তাহার শত্রু ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে কিছু করিতে চাহিলে,তাহারা ভারতের বিপ্লবী দলকে তাহাদের সহযোগী হিসাবে পাইবে বলিয়া আশা করিত।

অন্ধকার পথে চলিতে সাধারণতঃ কাহারও কোন উৎসাহ থাকে না, যে পথে বাধাবিঘ্ন অধিক, ভবিষ্যতে উন্নতির কোন আশা নাই, সেই পথে কেহ চলিতে চায় না। যেখানে লাভের আশা আছে, ভবিষ্যতে উন্নতির সম্ভাবনা আছে, লোক সে দিকেই ধাবিত হয়। বিপ্লব যুগে, অন্ধকার পথে, বিপদের বোঝা মাথায় করিয়া, নিরাশার মধ্য দিয়া চলিতে হইত, তাই দেশের প্রতিভাশালী বিদ্বান, চিন্তাশীল বুদ্ধিমান বা বড়লোকের দল এই পথে আসিতেন না, বরং এই পথের নিন্দা করিয়া নিজেদের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতেন। তখন জাতীয় কংগ্রেস নেতারা কোন আপদ বিপদের সম্মুখীন না হইয়া আবেদন-নিবেদন লইয়াই সাধারণতঃ ব্যস্ত থাকিতেন। বিপ্লব আন্দোলনের ফলে যখন বঙ্গ ভঙ্গ রদ হইল, মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিফর্ম আসিল তখন অবস্থা অন্যরূপ দাঁড়াইল। তখন লাভের আশায় বহু লোক রাজনীতিক্ষেত্রে ভিড় করিল। যাহাদের বীরত্ব, আত্মত্যাগে ও নির্যাতন ভোগের ফলে রাজনৈতিক অধিকার আসিল, তাহারা সেই সব সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিল না, তাহারা দেশবাসীর নিকট সন্ত্রাসবাদী বলিয়াই গণ্য হইল।

বিপ্লবীরা লাভের প্রতিযোগিতায় যোগ দেয় নাই, সেভাবে তাহারা অভ্যস্ত ছিল না,তাহারা জানিত বন্দুকের গুলিতে তাহাদের মৃত্যু হইবে,ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে হইবে,যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড ভোগ করিতে হইবে ফুলের মালা, কাউন্সিল-কর্পোরেশনের সভ্য হওয়া তাহাদের কল্পনার অতীত ছিল। তাহারা প্রকাশ্যভাবে চলাফেরা করিত না, তাহা তাহাদের পক্ষে সম্ভবপরও ছিল না। তাহারা প্রকাশ্য সমিতিতে যাইত না, বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যাস তাহাদের ছিল না, তাহারা আত্মগোপন করিয়াই চলিত, এজন্য তাহারা জনসমাজে অপরিচিতই ছিল। বিপ্লবীরা যথাসম্ভব নিজ নাম গোপন করিয়াই চলিত। এমন দৃষ্টান্তও আছে - পুলিশের গুলিতে দেহ-ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, সর্বাঙ্গ রুধির লিপ্ত, মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই,

পুলিশ নাম জানার জন্য উত্যক্ত করিতেছে, সে এই মাত্র বলিল, "আমাকে শান্তিতে মরিতে দাও, বিরক্ত করিও না।" সে শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল, নিজের নামটুকু পর্যন্ত বলিয়া গেল না।

বিপ্লবীরা গুপ্ত আন্দোলন চালাইয়া আসিয়াছে, প্রকাশ্য আন্দোলন চালানোর জন্য যে সব গুণাবলীর প্রয়োজন তাহাদের মধ্যে তাহার অভাব ছিল। প্রকাশ্য আন্দোলনের জন্য বক্তা লেখক ও প্রচারকের প্রয়োজন। বিপ্লবীদের মধ্যে বক্তা কেহ ছিল না, কাজেই জনসাধারণের মধ্যে তাহারা পরিচিত ছিল না। তাহাদের প্রকাশ্য কোন সংবাদপত্র ছিল না। লেখক অবশ্যই কিছু ছিল, কিন্তু সেই সব লেখকদের নাম কেহ জানিত না, তাহাদের প্রচার বিভাগ ছিল আদর্শ প্রচারের জন্য, নিজেকে দেশবাসীর সম্মুখে বড় করিয়া প্রচার করার জন্য নয়। নূতন শাসন সংস্কার যুগে যখন কাউন্সিল-কর্পোরেশনের দরজা খুলিয়া গেল তখন বহু বিদ্বান-বুদ্ধিমান বড়লোক রাজনীতিক্ষেত্রে ভিড় করিল। তাহারা সভা সমিতিতে বক্তৃতা দিয়া আকাশ বাতাস কাঁপাইয়া তুলিলেন, তাহাদের বক্তৃতা শুনিয়া দেশবাসী মুগ্ধ হইল, আশ্বস্ত হইল, তাহারা মনে করিল এত দিনে আমাদের দুঃখের অবসান হইবে।

বিপ্লব আন্দোলন ব্যর্থ হইয়াছে, বিপ্লবীরা ভারতবর্ষ স্বাধীন করিতে পারে নাই। গভর্ণমেণ্ট দমন নীতি দ্বারা বিপ্লব আন্দোলন দমন করিয়াছে, বিপ্লবীরা এখন জেলে আবদ্ধ, দেশের মধ্যে দেখা দিয়াছে নৈরাশ্য-ভয়-অবসাদ, এমন সময় মহাত্মা গান্ধী দেশবাসীকে নূতন আন্দোলনের সন্ধান দিলেন। মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলন অহিংস অসহযোগ আন্দোলন: এই আন্দোলনে বিপদের আশঙ্কা কম। মানুষ সাধারণতঃ নিরাপদ পথেই চলিতে চায়, যে পথে বিপদের সম্ভাবনা আছে সেই পথে চলিতে চায় না। বিপ্লবের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নহে—কণ্টকাকীর্ণ। এই পথে প্রতি-পদে বিপদ, মৃত্যুর সম্ভাবনাই অধিক। অহিংস মতবাদের সহিত ধর্ম ও মানবতার বুলি যুক্ত

করায় ধর্মভীরু ভারতবাসীর মন সহজেই এদিকে আকৃষ্ট হইল। অপর দিকে বিদেশী গভর্ণমেণ্ট ও স্বদেশী নেতাদের প্রচারের ফলে বিপ্লববাদ বা হিংসানীতি অতি নিন্দনীয় বলিয়া প্রমাণিত হইল।

বৈপ্লবিক নেতৃত্বের পতনের কারণ বিপ্লবীদের অ-সফলতা এবং মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি প্রভাবশালী নেতাদের নূতন মতবাদসহ কর্মক্ষেত্রে আগমন। বিপ্লব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় দেশের জনসাধারণ মহাত্মার নূতন আন্দোলনে মাতিয়া উঠিল। কোন কাজ একবার ব্যর্থ হইলে তাহাতে লোকের আকর্ষণ বা বিশ্বাস থাকে না, তাহার পুনরাবৃত্তি আর চলে না। তখন লোকের সম্মুখে নূতন কিছু ধরিতে হয়। নূতনত্বের একটা মোহ থাকে। বিপ্লবী নেতারা বহু বৎসর পর জেল হইতে মুক্ত হইয়া ঘর গুছাইতে ব্যস্ত ছিল, তাহারা লোকের চোখের সামনে চমকপ্রদ কিছু ধরিতে পারে নাই, জাতীয় কংগ্রেস তাহা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। জাতীয় কংগ্রেস নূতন আন্দোলন সুরু করিল। নূতন আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু প্রভৃতি প্রভাবশালী নেতা কারাবরণ করিলেন, ইহাতে দেশের জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িল। ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্ব বিপ্লবীদের হাত হইতে জাতীয় কংগ্রেসের হাতে চলিয়া গেল। তখনও জাতীয় কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্কল্প গ্রহণ করে নাই।

বিপ্লব আন্দোলন ব্যর্থ হইয়াছে, ইহার কারণ এই নয় যে বিপ্লবীরা কপট ছিল। বিপ্লবীরা ফাঁসি, দ্বীপান্তর দণ্ডের মধ্য দিয়া প্রমাণ করিয়াছে তাহারা কপট ছিল না, ভীরু ছিল না। বিপ্লবীদিগকে অনেক প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া চলিতে হইয়াছে। তাহাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না, বয়সও কম ছিল। বিপ্লবীদিগকে পলাতক অবস্থায় কাজ করিতে হইয়াছে, পুলিশ সর্বদা তাহাদের অনুসন্ধানে ছিল, সরকার তাহাদিগকে ধরার জন্য পুরস্কার ঘোষণা

করিত। তাহারা বেশীদিন কাজ করার সুযোগ পাইত না, তাহারা ধৃত হইত ও তাহাদের সুদীর্ঘ কারাদণ্ড হইত। অভিজ্ঞ লোকের স্থান নূতন লোক পূরণ করিত,আবার তাহারাও অভিজ্ঞতা লাভের পূর্বেই ধৃত হইত। তাহাদের ভুল ত্রুটি যে ছিল না তা নয়, তাহারা ভুল করিয়াছে, কর্মক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে ভুলত্রুটির সংশোধনও করিয়াছে। এই অল্পকালের মধ্যে তাহারা বিদেশ হইতে জাহাজ বোঝাই অস্ত্রশস্ত্র আমদানীর ব্যবস্থা করিয়াছে, দেশী সৈন্যদিগকে নিজ দলভুক্ত করিয়াছে; কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাহাদের সকল চেষ্টা পণ্ড হইয়াছে। অবশ্য দলের লোকই বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়াছে। বিপ্লব ব্যর্থ হইয়াছে, কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যর্থ হয় নাই—ব্যর্থতার মধ্য দিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে, তাহাই সফলতার দিকে লইয়া যাইবে। বিফলতার মধ্যেই সফলতার বীজ থাকে।

বিপ্লব সফল হয় নাই কিন্তু বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। বিপ্লবীরা জানিত দেশের জনশক্তিকে সচেতন করিতে না পারিলে দেশের স্বাধীনতা আসিবে না। প্রথম মহাযুদ্ধ তাহার নিকট অপ্রত্যাশিত ভাবে না আসিলেও খুব তাড়াতাড়ি আসিয়াছে এবং সুভাষবাবু যেমন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করিয়া আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়িয়াছেন তাহারাও সেই যুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করিয়া বাহির হইতে ভারত স্বাধীন করিবার চেষ্টা করিয়াছে। তাহাদের চেস্টা সফল হয় নাই, কিন্তু তাহাদের বীরত্ব, ত্যাগ ও নির্যাতন ভোগের ফলে দেশের মধ্যে জাগরণ আসিয়াছে, দেশকে নূতন ভাবে গড়িয়া তোলার সময় আসিয়াছে। এ দিকে রুশ বিপ্লবের সফলতার ফলে পৃথিবীতে সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শ ছড়াইয়া পড়িয়াছে, অনুশীলন সমিতির নেতাদের দৃষ্টিও সেই দিক এড়াইয়া যায় নাই। ১৯২০ সনে তাহারা মুক্ত হইয়া তাহাদের পূর্ব কার্যপদ্ধতি পরিবর্তন করিল এবং দেশকে নূতন ভাবে সংগঠন করার চেষ্টা করিতে লাগিল।

পরিশিষ্ট

(১)

খণ্ডযুদ্ধ

গ্রীয়ার পার্কে ধ্বস্তাধ্বস্তি

১৯১৪ সনের শেষ ভাগে কলিকাতায় গ্রীয়ার পার্কে সন্ধ্যার পর তখনকার পরিস্থিতিতে কর্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য অনুশীলন সমিতির পলাতক বিপ্লবী নায়কগণের একত্রিত হওয়ার কথা ছিল। যে ভাবেই হউক এই সংবাদ পাইয়া লো-ম্যান, ম্যাকলিওর প্রভৃতি আই, বি.র নামজাদা কর্তারা সদল বলে গ্রীয়ার পার্ক ঘেরাও করেন। ধ্বস্তা-ধ্বস্তি সুরু হইল। এই ধ্বস্তা-ধ্বস্তির সময় বীরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় লো-ম্যান সাহেবের দক্ষিণ-হস্তের কব্জি মচ্‌কাইয়া দেন। বীরেন্দ্র নাথ ও নরেন্দ্র মোহন সেন গ্রেপ্তার হন, বাকী সকলে পলায়ণ করিতে সক্ষম হন।

বালেশ্বর খণ্ডযুদ্ধ

বুড়ীবালামের তীরে—৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৫ সন।

পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী জার্মান জাহাজ মেভারিক অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া সুন্দর বনের রায়মঙ্গল পৌঁছানর কথা ছিল। জাহাজ হইতে মালপত্র নামাইয়া নিরাপদ স্থানে রাখার ব্যবস্থার জন্য যতীন্দ্র নাথ মুখার্জি মাদারীপুরের চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন, নীরেন ও যতীশ পালকে সঙ্গে লইয়া বালেশ্বর রওয়ানা হন। এদিকে পুলিশ সংবাদ পাইয়া তাঁহাদিগকে ধরার জন্য অনুসন্ধান করিতে থাকেন। যতীনবাবুও অবস্থা বুঝিতে পরিলেন, তিনি নিরাপদ স্থানে যাওয়ার জন্য পাহাড় জঙ্গল অতিক্রম করিয়া, আহার নাই, নিদ্রা নাই, অনবরত চলিতে লাগিলেন, অবশেষে ক্লান্ত দেহে বুড়ী-বালাম নদীর তীরে গোবিন্দপুর উপস্থিত হইলেন।

বালেশ্বর-এর জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট কিলবী সাহেব, সার্জেন্ট রাদার ফোর্ড ও বহু সশস্ত্র পুলিশ সঙ্গে লইয়া অগ্রসর হইলেন। যতীনবাবুর দল একটি শুকনা পুকুরের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পুকুরটীর চারিদিকে জঙ্গল, পাড় উঁচু, আত্মরক্ষার পক্ষে বেশ ভাল জায়গা। মিঃ কিলবী ও রাদারফোর্ড সাহেব সদল বলে যতীনবাবুর দলকে ঘেরিয়া ফেলিল। উভয় পক্ষ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। তখন চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন প্রভৃতি যতীনবাবুকে বলিল, "দাদা, আমরা লড়াই করিতেছি, আপনি ইতিমধ্যে সরিয়া পড়ুন। "বাঘা যতীন" ভীরু ছিলেন না, পলায়ন করার মনোভাব তাঁহার মধ্যে ছিল না, তিনি সম্মুখ সংগ্রামে মৃত্যু বরণ করিয়া জাতির মধ্যে একটা আদর্শ রাখিতে চাহিয়াছিলেন, তাই তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে নির্দেশ দিলেন। উভর পক্ষে গুলি চলিতে লাগিল। কিলবী ও রাদারফোর্ডের দল হামাগুড়ি দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। বাংলার পঞ্চবীর বুড়ীবালামের তীরে কয়েক ঘণ্টা লড়াই করিলেন, পুলিশ পক্ষে কিন্তু হতাহত হইল। চিত্তপ্রিয় রায় চৌধুরী নিহত হইলেন, যতীনবাবু গুরুতর আহত হইলেন, যতীশ পালও আহত হইল, কার্তুজ শেষ হইয়া গিয়াছে। এমতাবস্থায় আত্মসমর্পণ করা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। যতীনবাবু নির্দেশ দিলেন, "সাদা নিশান উড়াইয়া দাও।" নীরেন ও মনোরঞ্জন দুই খানা সাদা কাপড় উড়াইয়া দিল। যুদ্ধ বন্ধ হইল। কিলবী সাহেব সদল বলে সেখানে উপস্থিত হইলেন, তিনি টুপীতে করিয়া জল আনাইয়া আহতদিগকে পান করাইলেন। পর দিন বালেশ্বর হাসপাতালে যতীনবাবুর মৃত্যু হয়। বিচারে মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত ও নীরেন দাশগুপ্তের ফাঁসি এবং যতীশ পালের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। মনোরঞ্জন নীরেন হাসিমুখে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়াছে। যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি সম্মিলিত দলের নেতা ছিলেন।

সিরাজগঞ্জ খণ্ডযুদ্ধ

১৯১৭ সন।

পাবনা জিলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার আটঘরিয়া থানার তেলিজনা গ্রামে পলাতক বিপ্লবীদের একটি আশ্রয়কেন্দ্র ছিল। সংবাদ পাইয়া তিন জন

শ্বেতাঙ্গপুলিশ অফিসার সদল বলে সেই বাড়ী ঘেরাও করে। সেই বাড়ীতে অনুশীলন সমিতির নিকুঞ্জ পাল (রসুল্লাবাদ, কুমিল্লা) এবং গোবিন্দ কর ছিলেন। উভয় পক্ষে গুলি চলিতে থাকে এবং উভয় পক্ষেই আহত হয়। গোবিন্দ করের দেহে সাতটি গুলি বিদ্ধ হয়, নিকুঞ্জ পালও আহত হইয়া ছিলেন। গোবিন্দ কর ধৃত হন এবং নিকুঞ্জ পাল পাট ক্ষেতের মধ্য দিয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হয়।

খণ্ডযুদ্ধ (গৌহাটি)

গৌহাটির আটগাও বাড়ীতে অনুশীলন সমিতির পলাতক বিপ্লবী নলিনীকান্ত ঘোষ, প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী, মণীন্দ্র রায়, প্রবোধ দাশগুপ্ত থাকিতেন। অনুশীলনের এই আশ্রয় কেন্দ্রেই ফেরারী বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ও অবস্থান করিতেছিলেন। অপর আশ্রয়কেন্দ্র ফাঁসী বাজারের বাড়ীতে নলিনীকান্ত বাগচী, তারাপ্রসন্ন দে, নরেন্দ্র ব্যানার্জি থাকিতেন।

পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয় কেন্দ্রের সংবাদ পাইয়া পুলিশের বড়কর্তা ফেয়াব ওয়েদার সাহেব সদল বলে ৭ই জানুয়ারী, ১৯১৮ সন, গভীর রাত্রে আটগাও আশ্রয় কেন্দ্র ঘেরাও করেন। তিনি দরজা ধাক্কা দিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, Open the door (দরজা খোল)। নলিনী ঘোষ উত্তরে বলিলেন, The door is open, enter and be killed (দরজা খোলা আছে, ভিতরে প্রবেশ কর এবং নিহত হও)। এই বলিয়া নলিনী ঘোষ পিস্তলের গুলি বর্ষণ করিতে থাকেন। তখন উভয় পক্ষে গুলি বর্ষণ চলিতে থাকে। এই খণ্ডযুদ্ধে বিপ্লবীরা জয়ী হন। বে-গতিক দেখিয়া সাহেব সদল বলে সরিয়া পড়েন। বিপ্লবীরাও রাত্রির অন্ধকারে এক খাসিয়া বুড়ির বাড়ীর ভিতর দিয়া পলায়ন করেন। ইহার পর সকলে নবগ্রহ পাহাড়ে একত্রিত হন। পরদিন পুলিশ নবগ্রহ পাহাড় ঘেরাও করে। প্রথম নলিনী ঘোষ পুলিশ দলের উপর গুলি বর্ষণ করেন। খণ্ডযুদ্ধ চলিতে থাকে। ইহার পর কার্তুজ শেষ হইলে বিপ্লবীরা পলায়নের চেষ্টা করেন। অতঃপর আহত অবস্থায় মণীন্দ্র রায় (কামারাটিয়া—ময়মনসিং) এক শ্মশানের নিকট এবং প্রভাসচন্দ্র

লাহিড়ী (রাজসাহী) গুলি বিদ্ধ অবস্থায় কামাখ্যা মন্দিরে ধৃত হন। নলিনী ঘোষ আহত অবস্থায় ঘটনা স্থলে ধৃত হন। আট-গাঁওয়ের ঘটনার সংবাদ পাইয়াই অপর কেন্দ্র ফাঁসী-বাজার হইতে নলিনী বাগচী (মুর্শিদাবাদ) এবং প্রবোধ দাশগুপ্ত (গৈলা—বরিশাল) মুসলমান বেশে, ছয় দিন অনাহার অনিদ্রায় পায় হাঁটিয়া লামডিং ষ্টেশনে উপস্থিত হন। নলিনী কলিকাতা আসিয়া অসুস্থ হইয়া পড়িল। পলাতক বিপ্লবী, হাতে টাকা পয়সা নাই, আশ্রয় কেন্দ্রের সন্ধানে সমস্ত দিন ধরিয়া অবশেষে গড়ের মাঠে গিয়া প্রবল জ্বরে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। ঘটনাক্রমে একজন বিপ্লবী তাহাকে চিনিতে পারিয়া আশ্রয়-কেন্দ্রে লইয়া যায়। নলিনী বাগচী সুস্থ হইয়া ঢাকা চলিয়া যান।

গৌহাটি সংগ্রামের পর যাহারা ধৃত হইয়া ছিলেন তাহাদের বিরুদ্ধে মামলা চলে। বিচারে নলিনীকান্ত ঘোষ ৭ বৎসর, তারাপ্রসন্ন দে ও নরেন্দ্র ব্যানার্জি প্রত্যেকে ৫ বৎসর, মণীন্দ্র রায়, প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী প্রত্যেকে তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড প্রাপ্ত হন। এই সংগ্রামে পুলিশ ইন্সপেক্টারের সাক্ষী অনুসারে পুলিশ দলের ৩০ জন আহত হইয়াছিল জানা যায়।

কলতাবাজার (ঢাকা)
খণ্ডযুদ্ধ

ঢাকা শহরের কলতাবাজার গলিতে পলাতক বিপ্লবী তারিণী মজুমদার (কুমিল্লা), নলিনী বাগচী (মুর্শিদাবাদ), হরিচৈতন্য দে (বরিশাল) একটি ক্ষুদ্র বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকিতেন। পুলিশ তাহাদের সন্ধান পাইয়া একদিন শেষ রাত্রে সেই বাড়ী ঘেরাও করিল। পুলিশ সুপারিণ্টেডেণ্ট স্বয়ং বহু বন্দুকধারী পুলিশসহ উপস্থিত ছিলেন। সেখানে বিপ্লবীদের সহিত পুলিশের একটি খণ্ড যুদ্ধ হয়। ভোরের সময় পুলিশ একটি বিপ্লবীকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছোড়ে, ভিতর হইতে গুলির আওয়াজ দ্বারাই প্রত্যুত্তর আসে। দুই পক্ষ কিছুক্ষণ গুলি চলিতে থাকে, অবশেষে বাড়ীর ভিতর হইতে গুলির আওয়াজ বন্ধ হয়। পুলিশ তখন সেই বাড়ী অধিকার করিয়া দেখিল, দুইটি যুবক অর্ধমৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে, তাদের সম্মুখে পড়িয়া আছে

পিস্তল। পুলিশ পক্ষেও অনেক আহত হইয়াছিল। যুবক দুইটির সমস্ত দেহ ক্ষতবিক্ষত, সর্বাঙ্গ রুধিরাক্ত, মৃত্যুর আর অধিক বিলম্ব নাই। পুলিশ তাহাদের নাম জানিত না, পুলিশ তাহাদের নাম জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু তাহারা তাহাদের নাম বলিল না। পুলিশ তাহাদের নাম জানিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল, ভয় দেখাইল, প্রলোভন দেখাইল অবশেষে তাহাদের উপর অত্যাচার করিল, কিন্তু তাহারা নিজের নামটি পর্য্যন্ত বলিল না। সেখানেই তাহাদের মৃত্যু হইল। সেই বীর বিপ্লবীদ্বয় মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও প্রলোভনকে উপেক্ষা করিয়াছে, অত্যাচারকে উপেক্ষা করিয়াছে, তাহারা ভয়ে ভীত হয় নাই, মৃত্যুর সময় শুধু এই কথাই বলিয়াছিল, "শান্তিতে মরিতেও দিবে না।" তাহারা নিজের নামটি পর্যন্ত বলিয়া গেল না। এই খণ্ড যুদ্ধে পুলিশের উর্দ্ধতন কর্মচারী বসন্ত মুখোপাধ্যায় গুরুতর আহত হন, জন কয়েক পুলিশও আহত হয়। পরে মামলায় হরিচৈতন্যের দশ বৎসর জেল হয়।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন

১৮ই এপ্রিল, ১৯৩০ সন।

১৯৩০ সনের ১৮ই এপ্রিল গুড ফ্রাইডে রাত্রি ১০ টার সময় সূর্য সেন, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, লোকনাথ বল, অম্বিকা চক্রবর্তী, নির্মল সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা সামরিক পোশাকে সজ্জিত হইয়া দুইটী অস্ত্রাগার আক্রমণ করেন, সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া দেওয়া হয়, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ নষ্ট করিয়া দেওয়া হয় এবং রেল লাইনও নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। বিপ্লবীরা প্রহরীদিগকে হত্যা করিয়া অস্ত্রাগার দখল করেন। অতর্কিত আক্রমণে সহরে সরকারী মহলে ভীতির সঞ্চার হইল। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সুপারিণ্টেডেণ্ট ঘটনাস্থলে গিয়াছিলেন এবং বিপ্লবীদের উপর গুলি চালাইয়া ছিলেন, বিপ্লবীরাও গুলি চালাইয়া প্রত্যুত্তর দেন। বিপ্লবীদের গুলিতে ম্যাজিষ্ট্রের আরদালী নিহত হয়, ড্রাইভার আহত হয়, বে-গতিক দেখিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করেন। সহরে ভয়ানক হৈ চৈ, এক দিকে আনন্দোল্লাস, অপরদিকে ত্রাস। রাত্রির অন্ধকারে কাহার কতটুকু সীমা কেহ বুঝিতে পারিল না, চারিদিকে ভীষণ গুজব চলিতে লাগিল।

চট্টগ্রামের তরুণ বিপ্লবীরা বীর শ্বেতাঙ্গ পুরুষদিগের মনে ত্রাস সঞ্চার করিতে সক্ষম হইয়াছিল। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর সেই রাত্রেই চট্টগ্রাম সহরের শ্বেতাঙ্গের দল ভয়ে ভীত হইয়া স্ত্রী-পুত্র পরিবার সহ জাহাজে উঠিয়া কর্ণফুলী নদীর মোহনায় অপেক্ষা করিতে ছিলেন। থানার পুলিশের দল আত্মসমর্পণের চিন্তা করিতেছিল। চট্টগ্রাম সহর তিন দিন অরক্ষিত অবস্থায় ছিল।

চট্টগ্রাম অস্ত্রগার লুণ্ঠনের প্রথম পর্যায় শেষ হইয়াছে, এখন বিপ্লবীদের দ্বিতীয় কর্মপন্থা নির্ণয় করিতে হইবে। এদিকে একটি আহত বিপ্লবীকে নিরাপদ স্থানে রাখিতে গিয়া গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, জীবন ঘোষাল, আনন্দ গুপ্ত আর ফিরিলেন না। স্থর্য সেন প্রভৃতি বিপ্লবীরা তাহাদের জন্য প্রায় দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করিলেন, আর অধিকক্ষণ এই অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকা যায় না, তাই স্থর্য সেন প্রভৃতি নেতারা স্থির করিলেন পাহাড়ে যাইয়া আত্মরক্ষা করিবেন। সেই রাত্রেই বিপ্লবীরা সহর ছাড়িয়া পাহাড়ে পথ ধরিলেন, যে যাহা বহন করিতে পারে, অস্ত্রসস্ত্র সঙ্গে লইয়া চলিলেন। রাত্রির অন্ধকারে বোঝা বহন করিয়া তাহারা অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই, পরিশ্রমে দেহ ক্লান্ত—রাত্রে কিছু খাওয়া হয় নাই। পরদিন প্রাতে সহরের অবস্থা জানার জন্য সতীভুষণ সেনকে পাঠান হইল, সে আর ফিরিল না। দ্বিপ্রহর সমাগত প্রায়, সহরের কোন খবর নাই, নেতারা চিন্তমগ্ন, কিংকর্তব্য-বিমূঢ়। এদিকে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর তরুণের দল পাহাড় জঙ্গল ঘুরিয়া কাঁচা আম ও কচি তেঁতুল পাতা সংগ্রহ করিয়া দাদাদিগকে উপহার দিল। সকলে মিলিয়া তাহাই উপভোগ করিলেন। সন্ধ্যার পূর্বে আবার সহরের খবর লওয়ার জন্য অমরেন্দ্র নন্দী ও দীপ্তি মেধাকে পাঠান হইল, তাহারা সহরের খবর লইয়া ফিরিতেছিলেন, কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে পাহাড়ের রাস্তা ভুলিয়া সারা রাত্রি পাহাড়ে কাটাইয়া পর দিন নিজ গ্রামের বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। বিপ্লবীরা এই স্থানে আর অধিক্ষণ থাকা নিরাপদ মনে করিলেন না তাহারা মালপত্র লইয়া অগ্রসর হইলেন এবং অবশেষে ফতেয়াবাদ পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিন দিনের মধ্যে পেটে অন্ন নাই। অম্বিকা চক্রবর্তী আহার্যের সন্ধানে বাহির হইলেন। সন্ধ্যার পর অম্বিকা চক্রবর্তী

এক হাঁড়ি খিচুরী লইয়া আসিলেন। সকলের মনে কি আনন্দ! কিন্তু দুঃখের বিষয় খিচুরীতে লবণ দেওয়া হয় নাই এবং পানীয় জলও ছিল না। বিপ্লবীরা হৃষ্ট মনে তাহাই উপভোগ করিলেন।

২২শে এপ্রিল বিপ্লবীরা জালালাবাদ পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, এই স্থান হইতে সহর প্রায় তিন মাইল দূর। ইতিমধ্যে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট চট্টগ্রামে সৈন্য আমদানী করিয়াছে, বিপ্লবীদের জালালাবাদ পাহাড়ে অবস্থান সংবাদও সংগ্রহ করিয়াছে, উভয় পক্ষই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। বৃটিশ সৈন্য জালালাবাদ পাহাড় ঘেরাও করিয়া ফেলিল। বিপ্লবীরা বন্দেমাতারম ধ্বনি করিয়া শত্রু সৈন্যের উপর গুলি বর্ষণ করিল, উভয় পক্ষে হতাহত হইল। সন্ধ্যার অন্ধকারে কর্ণেল ডেলাস স্মিথ ও ক্যাপ্টেন টেইট্ এর সৈন্য বাহিনী রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। এই সম্মুখ সমরে নরেশ রায় (ময়মনসিং) ত্রিপুরা সেন (ঢাকা), বিধু ভট্টাচার্য (কুমিল্লা), হরি বল (ঠেগরা), মতি কানুনগো, প্রভাস বল, শশাঙ্ক দত্ত, নির্ম্মল লালা, জিতেন দাসগুপ্ত (কৈবল্য) মধুসূদন দত্ত (বিদগ্রাম), পুলিন ঘোষ, অর্দ্ধেন্দু দস্তিদার নিহত হন। ইহারা সকলেই ছাত্র ছিলেন। হতাবিষ্ট বিপ্লবীরা অবশেষে নিরুদ্দেশের যাত্রা সুরু করিলেন।

জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধ, পরাধীন জাতির ইতিহাসে একটি গৌরবময় অধ্যায়। পথশ্রান্ত, অনাহার অনিদ্রায় ক্লিষ্ট, তৃষিত মুষ্টিমেয় যুবক সুশিক্ষিত তাজা সৈনিকদের সহিত যেরূপ বীরত্ব দেখাইয়া লড়াই করিয়াছে, একমাত্র রাজপুত বীরত্বের সহিত তাহাদের তুলনা করা যায়। এই সব যুবকের দল সাময়িক বিদ্যায় অ-নিপুণ, শুধু মাত্র দেশপ্রেমেই তাহাদিগকে অপরাজেয় করিয়া তুলিয়াছে।

চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পূর্ব্বে, যখন তাহাদের প্রস্তুতি চলিতেছিল, আমি ঐ সময় ১৯৩০ সনের মার্চ মাসের প্রথম ভাগে, পলাতক অবস্থায়, ব্রহ্মদেশ হইতে চট্টগ্রামের পথে ঢাকা ফিরিতেছিলাম। আমি চট্টগ্রামে ২।৩ দিন চারুবিকাশ দত্তের বাসায় ছিলাম। ঐ সময় দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে ঝগড়া চলিতেছিল। আমি বিবাদ মিটনোর জন্য

চারুবিকাশ দত্ত সহ গণেশ ঘোষের বাসায় যাই। সেখানে হাফ প্যান্ট, কোট বুট পরা ২৫।৩০টি ভলান্টিয়ার ছিল, সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিল লোকনাথ বলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ১৫ বৎসর বয়সের হৃষ্ট পুষ্ট সুশ্রী যুবক হরিগোপাল বল (টেগ্‌রা)। বিবাদ সহজেই মিটিয়া গেল। অবশেষে জলযোগের পর গণেশ আমাকে বলিয়াছিল, "আমাদের কিছু করার ইচ্ছা আছে, পূর্ব্বে আপনাকে জানাইব"। অবশ্যই জানাইবার আর সুযোগ ঘটে নাই।

খণ্ডযুদ্ধ—কালারপুল

চট্টগ্রামের চারিজন পলাতক বিপ্লবীর সহিত পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে রজত সেন, দেবপ্রসাদ গুপ্ত, মনোরঞ্জন সেন এবং স্বদেশ রায় নিহত হন।

ধলঘাট—নবীন চক্রবর্তীর বাড়ী

এই বাড়ীতে সূর্য সেন প্রভৃতি পলাতক বিপ্লবীরা আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯৩২ সনের ১৩ই জুন ক্যাপ্টেন ক্যামরণ সৈন্য সহ উপস্থিত হইয়া এই বাড়ী ঘেরাও করেন। উভয় পক্ষে গুলি চলিতে থাকে। এই খণ্ডযুদ্ধে ক্যাপ্টেন ক্যামরণ সূর্য সেনের গুলিতে নিহত হন। বিপক্ষের গুলিতে বিপ্লবী নির্মল সেন এবং অপূর্ব্ব সেন নিহত হন। সূর্য সেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার পলায়ন করিতে সক্ষম হন।

পাহাড়তলী—ক্লাব আক্রমণ

২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ সন।

রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটার সময় প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার বি, এ'র নেতৃত্বে ১০।১২ জন তরুণ বিপ্লবী এই ইউরোপীয়ান ক্লাবঘর আক্রমণ করেন। ঐ সময় ঐ ক্লাব ঘরে প্রায় ৪০টি শ্বেতাঙ্গ নর-নারী আমোদপ্রমোদে মত্ত ছিলেন। প্রীতিলতা ও তাহার সঙ্গীরা ক্লাব ঘরে বোমা নিক্ষেপ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালাইতে লাগিলেন। ক্লাব ঘরের প্রহরী ও

শ্বেতাঙ্গের দল ইতস্ততঃ পলাইতে লাগিল, আক্রমণকারীরাও সরিয়া পড়িলেন। পথিমধ্যে প্রীতিলতা ধৃত হওয়ার আশঙ্কায় আত্মহত্যা করেন।

গৈরলা—সারদা সেনের বাড়ী

১৯৩৩ সনের ১৬ই ফেব্রুয়ারী এক সেনাবাহিনী গৈরলা গ্রাম ঘেরাও করে। সূর্য সেন, কল্পনা দত্ত প্রভৃতি পলাতক বিপ্লবীরা এই গ্রামের সারদা সেনের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখানে খণ্ডযুদ্ধ হয়। সূর্য সেন ধৃত হন, কিন্তু অন্যান্য বিপ্লবীরা গুলি ছুড়িতে ছুড়িতে পলায়ন করিতে সক্ষম হয়। ধৃত হওয়ার পর সূর্য সেনের উপর অমানুষিক অত্যাচার চলিতে থাকে।

গাইরা খণ্ডযুদ্ধ

১৯৩৩ সনের ১৯শে মে সৈন্যবাহিনী গাইরা গ্রাম ঘেরাও করে। কল্পনা দত্ত, তারকেশ্বর দস্তিদার প্রভৃতি পলাতক বিপ্লবীরা এই গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। উভয় পক্ষ হইতে বন্দুকের গুলি চলিতে থাকে। ফলে মনোরঞ্জন দাস, শচীন্দ্র দাস, পূর্ণ তালুকদার নিহত হন এবং কল্পনা দত্ত ও তারকেশ্বর দস্তিদার ধৃত হন। অতঃপর ১৯৩৩ সনের ২৬শে জুন ট্রাইবুনালের বিচারে সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের মৃত্যুদণ্ড এবং কল্পনা দত্তের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়।

আসানুল্লা হত্যা

১৯৩১ সনের ৩০শে আগষ্ট গোয়েন্দা বিভাগের ইনস্পেক্টার খান বাহাদুর আসানুল্লাকে চট্টগ্রাম ফুটবল খেলার মাঠে হরিপদ ভট্টাচার্য্য হত্যা করে। হরিপদ দরিদ্র ব্রাহ্মণের ছেলে, টোলের ছাত্র, ১৪।১৫ বৎসর বয়স। হরিপদ ঘটনাস্থলে ধৃত হয়। ধৃত হওয়ার পর হইতে হরিপদর উপর অত্যাচার চলিতে থাকে। সৈন্যবাহিনী হাত কড়ি ও দড়ি বাঁধিয়া হরিপদকে নিজ বাড়ীতে লইয়া গিয়া তাহার সম্মুখে বাড়ীর সকলের উপর অত্যাচার করিয়াছে; ঘরে আগুন লাগাইয়া বাড়ী পোড়াইয়া দিয়াছে। অতঃপর তাহাকে গ্রামে গ্রামে লইয়া গিয়া সকলের সম্মুখে প্রহার করিয়াছে।

হরিপদ অম্লান বদনে সকল অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করিয়াছে ; কোন প্রকার দুর্ব্বলতা দেখায় নাই। বিচারে তাহার ফাঁসির হুকুম হয়, আপিলে বয়স অল্প বলিয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়।

অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার অভিযুক্তদের নাম

১। আনন্দ গুপ্ত ২। সরোজকান্তি গুহ ৩। হেমেন্দ্র দস্তিদার ৪। জীবন ঘোষাল ৫। লোকনাথ বল ৬। সূর্য সেন (নওয়াপাড়া) ৭। নির্মল সেন (নওয়াপাড়া) ৮। রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ৯। কালীপদ চক্রবর্তী ১০। বীরেন্দ্র দে ১১। কৃষ্ণ চৌধুরী ১২। গণেশ ঘোষ ১৩। অম্বীকা চক্রবর্তী ১৪। হরিপদ মহাজন ১৫। বিনোদ দত্ত ১৬। ভবতোষ ভট্টাচার্য্য ১৭। তারকেশ্বর দস্তিদার ১৮। দীপ্তি মেধা চৌধুরী ১৯। ক্ষীরোদ ব্যানার্জী (বরিশাল) ২০। নারায়ণ সেন (ঢাকা) ২১। সীতারাম বিশ্বাস ২২। শৈলেশ্বর চক্রবর্তী ২৩। সুরেশ দেব (ঢাকা) ২৪। বিনোদ চৌধুরী ২৫। অনন্ত সিং।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় অনন্ত সিং, লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ, লালমোহন সেন, সুবোধ চৌধুরী, ফণীন্দ্র নন্দী, আনন্দ গুপ্ত, ফকির সেন সহায়রাম দাস, বনবীর দাশগুপ্ত, সুবোধ রায় ও সুখেন্দু দস্তিদারের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়।

কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট

খণ্ডযুদ্ধ

জুন, ১৯৩৩ সন

পুলিশ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে এক বাড়ী ঘেরাও করে। উভয় পক্ষে গুলি চলে। অতঃপর যুগান্তর দলের দীনেশ চন্দ্র মজুমদার, নলিনী দাস, জগদানন্দ মুখার্জী ধৃত হন। এই তিন জনই পূর্ব্বে জেল হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। বিচারে দীনেশ মজুমদারের ফাঁসি এবং নলিনী দাস ও গদানন্দের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়।

এলাহাবাদ—আলফ্রেড পার্ক

১৯৩১ সনের ২৭শে ফেব্রুয়ারী অনুশীলন সমিতির পলাতক বিপ্লবী শ্রীচন্দ্রশেখর আজাদকে গ্রেপ্তার করার সময় খণ্ডযুদ্ধ হয়। উভয় পক্ষে গুলি চলিতে থাকে। আজাদের গুলিতে একজন শ্বেতাঙ্গ পুলিশ কর্মচারী আহত হন। চন্দ্রশেখরের পিস্তলের গুলি শেষ হইয়া আসিলে তিনি আত্মহত্যা করেন। ইনি গরীব ব্রাহ্মণের ছেলে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় তাহার বয়স খুব কম ছিল, তখন তাহার বেত্র দণ্ড হয়।

এলাহাবাদ—১৯৩২ সন

অনুশীলন সমিতির পলাতক বিপ্লবী যশপালকে গ্রেপ্তার করার সময় পুলিশের সহিত খণ্ডযুদ্ধ হয়। উভয় পক্ষে গুলি চলে। বিচারে যশপালের ১৪ বৎসর কারাদণ্ড হয়।

প্রতিশোধ

বিপ্লবীরা বহু হত্যা করিয়াছে ; কিন্তু সেই সব হত্যাকাণ্ড ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধন বা ব্যক্তিগত আক্রোশ মিটানর জন্য নয়, তাঁহারা স্বাধীনতার পথের কণ্টক অপসারণ করিয়াছে মাত্র। তাঁহারা ছিলেন নিঃস্বার্থপর নির্ভীক বীর, তাই নিশ্চিত মৃত্যু জানিয়াই এই দুঃসাহসিক কাজে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

এলেন হত্যা প্রয়াস

১৯০৭ সনের ২৩শে ডিসেম্বর অনুশীলন সমিতির দুই জন সভ্য ঢাকার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এলেন সাহেবকে গোয়ালন্দ ঘাটে গুলি করেন। এলেন সাহেব গুরুতর আহত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার মৃত্যু হয় নাই। এই ঘটনার পর তিনি চাকুরী ছাড়িয়া ইংলণ্ডে চলিয়া যান। ঘটনাস্থলে কেহ ধৃত হয় নাই। আক্রমণকারীদ্বয় ভীড়ের মধ্যে পলায়ন করিতে সক্ষম হন।

নরেন গোসাঁই হত্যা

আলীপুর বোমার মামলার সরকারী সাক্ষী নরেন্দ্র গোস্বামীকে ১৯০৮ সনের ৩১ই আগষ্ট প্রেসিডেন্সি জেল হাসপাতালে কানাই লাল দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু গুলি করিয়া হত্যা করেন। সুরক্ষিত জেলের মধ্যে পিস্তল আমদানী করিয়া, অতি সুরক্ষিত স্থানে অবস্থিত সরকারী সাক্ষীকে হত্যা করা অসাধারণ বীরত্ব ও অদ্ভুত কৌশলের পরিচায়ক। সত্যেন, কানাই হাসিতে হাসিতে ফাঁসীকাষ্ঠ বরণ করিয়াছে। কোন প্রকার দুর্ব্বলতা দেখায় নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বেও প্রফুল্ল ছিল। কানাইলালকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, পিস্তল কোথা হইতে পাইলে। উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, ক্ষুদিরামের আত্মা বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহীকে হত্যা করিবার জন্য পিস্তল দিয়া গিয়াছে।

আশুতোষ বিশ্বাস হত্যা

১৯০৯ সনের ১০ই ফেব্রুয়ারী খুলনা জিলার শোভনা গ্রামের চারুচন্দ্র বসু সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাসকে গুলি করিয়া হত্যা করেন।

ঘটনাস্থলে তিনি ধৃত হন এবং বিচারে তাহার ফাঁসীর হুকুম হয়। তিনি জিলা মেজিষ্ট্রেটকে বলিয়াছিলেন, "দায়রায় পাঠাচ্ছেন কেন? আমাকে কালই ফাঁসী দিন।"

লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা

১৯১২ সনের ২৯শে ডিসেম্বর রাজকীয় শোভাযাত্রার সময় শ্রীরাসবিহারীর নেতৃত্বে বসন্ত বিশ্বাস বড়লাটের উপর বোমা নিক্ষেপ করেন। বড়লাট আহত হন। বসন্ত বিশ্বাস বোমা নিক্ষেপ করিয়া সুকৌশলে পলায়ন করেন।

রামদাস হত্যা

রামদাস (উমেশ দে) অনুশীলন সমিতির বাড়ী-ঘর-ছাড়া সভ্য ছিল। সে বৈপ্লবিক কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। পলাতক অবস্থায় তাহার মধ্যে দুর্ব্বলতা আসে এবং সে পুলিসের গুপ্তচর হয়। ১৯১৪ সনের ১৯শে জুলাই রামদাস পলাতক বিপ্লবীদিগকে চিনাইয়া দেওয়ার জন্য পুলিশের ডেপুটী সুপারিণ্টেডেণ্ট বসন্ত চ্যাটার্জি সহ ঢাকা সদরঘাট বাক্‌ল্যাণ্ডবাধে নদীর পাড়ে উপস্থিত হয়। এদিকে অনুশীলন সমিতির সভ্যগণও পিস্তলসহ বাক্‌ল্যাণ্ডবাধে উপস্থিত ছিলেন। বিশ্বাসঘাতক রামদাসকে গুলি করিয়া হত্যা করা হয়। বসন্ত চ্যাটার্জি নদীতে ঝাপ দিয়া আত্মরক্ষা করেন। কেহ ধৃত হয় নাই।

বসন্ত চ্যাটার্জি হত্যা

১৯১৬ সনের ৩০শে জুন অনুশীলন সমিতির কতিপয় সভ্য পুলিশের ডেপুটী সুপারিণ্টেডেণ্ট বসন্তকুমার চ্যাটার্জিকে ভবানীপুর প্রেসিডেন্সী হাসপাতালের নিকট প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি করিয়া হত্যা করে। তাহার দেহরক্ষী একজন হেড কনেষ্টবলও নিহত হয়। আক্রমণকারীরা কেহই ধৃত হয় নাই।

ডে হত্যা

গোপীনাথ সাহা বাংলার অত্যাচারী পুলিশ কমিশনার টেগার্ট ভ্রমে ডে সাহেবকে হত্যা করেন। গোপীনাথ ধৃত হন এবং বিচারে ফাঁসির হুকু

হয়। ১৯২৪ সনের ১লা মার্চ্চ নির্ভিক গোপীনাথের ফাঁসি হয়। ঐ দিন দেশের সর্ব্বত্র শোক সভা হয়। গোপীনাথ তরুণ বিপ্লবী দলের সভ্য ছিলেন।

রাইটার্স বিল্ডিংয়ে আক্রমণ

১৯৩০ সনের ৮ই ডিসেম্বর সুধীর গুপ্ত (বিদগাও ঢাকা) দীনেশ গুপ্ত (যশোলঙ্গ ঢাকা) এবং বিনয় বসু (রাউতভোগ ঢাকা) রাইটার্স বিল্ডিংএ প্রবেশ করিয়া জেল সমূহের ইনস্পেক্টর জেনারেল কর্নেল সিমসনকে, কলিকাতায় তাহার অফিস কক্ষেই হত্যা করেন। এই সময় বিভিন্ন জেলে রাজবন্দীদের উপর ভীষণ অত্যাচার হইতেছিল। আক্রমণকারীত্রয় সিমসন সাহেবকে হত্যা করিয়া অতঃপর অন্যান্য উচ্চপদস্থ শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীকেও আক্রমণ করেন। অপর পক্ষে হইতেও গুলি চলে ; অবশেষে আক্রমণকারী-দিগের কার্তুজ নিঃশেষ হইলে সুধীর গুপ্ত আত্মহত্যা করে। বিনয় স্বীয় মস্তকে নিজে গুলি বিদ্ধ করে। হাসপাতালে তাহার মৃত্যু হয় এবং দীনেশ গুপ্তের বিচারে ফাঁসী হয়। ইহারা সকলেই বি, ভি, দলের সভ্য ছিলেন।

গার্লিক হত্যা

২৭শে জুলাই, ১৯৩১ সন

মিঃ গার্লিক জজ ছিলেন। রামকৃষ্ণ বিশ্বাস এবং দীনেশ গুপ্তের প্রাণ দণ্ডের আদেশ দেওয়ায় তাহাকে হত্যা করা হয়। আক্রমণকারী কানাই ভট্টাচার্য্য (জয়নগর, মজিলপুর) আত্মহত্যা করেন। তিনি বি, ভি, দলের সভ্য ছিলেন।

মেদিনীপুর

১৯৩০ সনের আইন অমান্য আন্দোলনের সময় মেদিনীপুর জিলায় পুলিশ অমানুষিক অত্যাচার করে। এই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য বি, ভি, দলের নেতৃগণ কৃতসংকল্প হন্। ফলে উপর্যোপরি তিন জন শ্বেতাঙ্গ জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট নিহত হন।

১। পেডি হত্যা

১৯৩১ সনের ৭ই এপ্রিল সরকারী স্কুল প্রাঙ্গনে এক শিক্ষা প্রদর্শনী উদ্বোধনের সময় বিমল দাসগুপ্ত ও জ্যোতিজীবন ঘোষ জিলা মেজিষ্ট্রেট পেডি সাহেবকে গুলি করিয়া হত্যা করে। হত্যার পর আক্রমণকারীদ্বয় সরিয়া পড়িতে সমর্থ হন। একটি স্কুলের অল্প বয়স্ক ছাত্র বলিয়াছিল, —"বিমলদা সাহেব খুন করিয়াছে।" বিমলকে ধরার অনেক চেষ্টা চলিতেছিল। অবশেষে ২৯শে অক্টোবর ইউরোপিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মিঃ ভিলিয়ার্সকে গুলি করার সময় ধৃত হন। মিঃ ভিলিয়ার্স আহত হন। ভিলিয়ার্স হত্যা চেষ্টার মামলায় বিমলের দশ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। প্রমাণাভাবে পেডি হত্যা মামলায় মুক্তি পান।

২। ডগলাস হত্যা

১৯৩২ সনের ৩০শে এপ্রিল মেদিনীপুরের দ্বিতীয় শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডগলাস নিহত হন। তিনি জেলা বোর্ডের এক মিটিংএ সভাপতিত্ব করিতে ছিলেন, পুলিশ প্রহরী মোতায়েন ছিল, এমন সময় প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য্য ও প্রভাংশু শেখর পাল মিঃ ডগলাসকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করে। প্রদ্যোৎ তাহার সঙ্গীর পলায়নের সহায়তার জন্য পিস্তল সহ রুখিয়া দাড়ায় এবং ঘটনা স্থলে ধৃত হয়। প্রদ্যোতের বয়স ২০ বৎসর, সে মেদিনীপুর কলেজে পড়িত। প্রদ্যোতের সাথীর নাম বাহির করিবার জন্য তাহার উপর অত্যাচার চলিতে থাকে। কিন্তু সে কোন প্রকার দুর্বলতা দেখায় নাই। ইহার পর বহুলোক গ্রেপ্তার হয়, তন্মধ্যে ফণী দাস ছিলেন। ফণী দাসের উপর খুব অত্যাচার হইয়াছিল। মারপিঠ ও মুখে বিষ্ঠা লেপন ইত্যাদি। ফণীভূষণও কোন দুর্ব্বলতা দেখায় নাই। ১৯৩৩ সনের ১২ জানুয়ারী প্রদ্যোতের ফাঁসি হয়। ফাঁসির সময় জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট বার্জ সাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রদ্যোৎ তুমি কি প্রস্তুত? উত্তরে প্রদ্যোৎ বলিল—"আমি প্রস্তুত আছি। আপনিও প্রস্তুত হন। বহু প্রদ্যোৎ আছে।"

৩। বার্জ হত্যা

মেদিনীপুর জিলার তৃতীয় শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বার্জ ১৯ ৩ সনের ২রা সেপ্টেম্বর নিহত হন। ফুটবল খেলার মাঠে অনাথবন্ধু পাঁজা ও মৃগেন্দ্রনাথ দত্ত কয়েকজন বন্ধু সহ বার্জ সাহেবকে আক্রমণ করেন, বার্জ সাহেব নিহত হন, জোন্স সাহেব গুরুতর আহত হন। পুলিশ প্রহরীও আক্রমণকারীর উপর গুলি চালায়। অনাথ পাঞ্জা ও মৃগেন দত্ত পুলিশের গুলিতে ঘটনাস্থলে নিহত হন, অপর সঙ্গীরা পলায়ন করেন। ইহার পর ব্রজকিশোর চক্রবর্ত্তী, রামকৃষ্ণ রায়, নির্মলজীবন ঘোষ, নন্দদুলাল সিং, কামাখ্যা ঘোষ, সুকুমার সেন ও সনাতন রায়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মামলা হয়। বিচারে ব্রজকিশোর, রামকৃষ্ণ ও নির্মলজীবনের ফাঁসি হয়—নন্দদুলাল, কামাখ্যা ঘোষ, সুকুমার সেন ও সনাতন রায় এর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়।

ভুপেন চ্যাটার্জি হত্যা

পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্টেডেন্ট ভূপেন চ্যাটার্জি, মাঝে মাঝে আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে গিয়া রাজবন্দীদিগের সহিত আলাপ আলোচনা করিতেন। তাহার উদ্দেশ্য ছিল রাজবন্দীদিগের দুর্ব্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া বিপ্লব দলের গোপনীয় সংবাদ সংগ্রহ করা। ১৯২৬ সনের জুলাই মাসে দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় দণ্ডিত অনন্তহরি মিত্র ও প্রমোদ চৌধুরী লোহার ডাণ্ডা দ্বারা ভূপেন চ্যাটার্জিকে জেলের মধ্যে আক্রমণ করিয়া হত্যা করে। বিচারে অনন্তহরি মিত্র ও প্রমোদ চৌধুরীর ফাঁসি হয়। তাহাদের সহায়তা করার জন্য ধ্রুবেশ চ্যাটার্জি, অনন্ত চক্রবর্তী ও রাখিকার যাবজ্জীবন দীপান্তর দণ্ড হয়।

লোম্যান হত্যা

১৯৩০ সনের ২৯শে আগষ্ট পুলিশের ইনস্পেটর জেনারেল লোম্যান সাহেবকে বীর যুবক বিনয় বসু ঢাকা মিটফোর্ড হাঁসপাতালের সম্মুখে

গুলি করিয়া হত্যা করে। লোম্যান সাহেবের সহিত ঢাকায় পুলিশ সুপারিন্টেডেন্ট হডসন্ সাহেবও ছিলেন এবং বহু পুলিশ কর্ম্মচারী ও পিস্তলধারী দেহরক্ষী প্রহরী ছিল। বিনয়ের অতর্কিত আক্রমণে পুলিশের দল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। এই আক্রমণে লোম্যান সাহেব নিহত এবং হড্‌সন সাহেব আহত হয়। বিনয়কে কেহ ধরিতে পারে নাই। বিনয় বসু বি, ভি দলের সভ্য ছিলেন।

ষ্টীভেন্স হত্যা

কুমিল্লার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ষ্টীভেন্সকে ১৯৩১ সনের ১৪ই ডিসেম্বর বিপ্লবীনারী শান্তি ঘোষ ও স্থনীতি চৌধুরী গুলি করিয়া হত্যা করেন। বিচারে তাহাদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। হাসি মুখেই তাহারা কারা বরণ করেন।

বাংলার গভর্ণরের উপর আক্রমণ

১৯৩২ সনের ৬ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে বীণা দাস বি.এ. বাংলার গভর্ণর স্যার ষ্টানলি জ্যাকসনকে গুলি করেন। বীণা দাস ঘটনা স্থলে ধৃত হয়। বিচারে ৯ বৎসর কারাদণ্ড হয়।

পাঞ্জাব গভর্ণরের উপর আক্রমণ

১৯৩০ সনের ২৩শে ডিসেম্বর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন সভায় হরিকিষণ নামক এক যুবক পাঞ্জাবের গভর্ণরের উপর গুলি চালায়। গভর্ণর এবং দুইজন পুলিশ কর্ম্মচারী আহত হন। হরিকিষণ ঘটনাস্থলে ধৃত হয় এবং বিচারে তাহার ফাঁসী হয়।

বোম্বাই প্রদেশের গভর্ণরের প্রতি আক্রমণ

১৯৩১ সনের ২৩শে জুলাই বোম্বাই প্রদেশের গভর্ণর যখন পুনা শহরের ফগুর্সন কলেজে অভিভাষণ পাঠ করিতেছিলেন, তখন বাসুদেব বলবন্ত গোগাটি নামক একটি ১৯ বছরের যুবক তাহার প্রতি গুলি নিক্ষেপ করেন,

কিন্তু গুলি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়। বাসুদেব বলবন্ত ঘটনাস্থলে ধৃত হন এবং বিচারে সুদীর্ঘ কারাদণ্ড হয়।

জেনারেল ডায়ার হত্যা

লণ্ডনে জেনারেল ডায়ারকে হত্যা করা হয়। পাঞ্জাব জালিয়ান-ওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ডের জন্য ইনি দায়ী ছিলেন।

ওডায়ার হত্যা

উধম সিং নামক জনৈক যুবক পাঞ্জাবের ভূতপূর্ব গভর্ণর স্যার মাইকেল ওডায়ারকে লণ্ডনে হত্যা করেন। ইনি পাঞ্জাব মার্শাল ল' জারী কারার জন্য দায়ী ছিলেন।

কার্জন ওইলি হত্যা

মদন লাল ধিংড়া স্যার ওয়ালিয়াম কার্জন ওইলিকে লণ্ডন শহরে এক সভায় ১৯০৯ সনে হত্যা করেন। মদনলাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িতেন। তিনি ফাঁসির হুকুম শুনিয়া বিচারককে বলিয়াছিলেন। Thank you my Lord, I am glad to have the honour of dying for my country. আমার দেশের জন্য মৃত্যু বরণ করার যে সম্মান আমি লাভ করিয়াছি, সে জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

বিভিন্ন মামলা

দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলা

ডিসেম্বর ১৯২৫ সন

দক্ষিণেশ্বরের বাড়ীতে তরুণ বিপ্লবীদের একটি বোমার কারখানা ছিল, পুলিশ এই বাড়ী তল্লাসী করিয়া বোমা, রিভালবার ও বিস্ফোরক দ্রব্য প্রাপ্ত

হয়। এই উপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে খানাতল্লাস ও বহু ব্যক্তি গ্রেপ্তার হন। ধৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বোমার মামলা চলে। এই মামলায় রাখাল দে, রাজেন্দ্র লাহিড়ী, ধ্রুবেশ চ্যাটার্জি, প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী, হরিনারায়ণ চন্দ, নিখিলবন্ধু ব্যানার্জী, বীরেন্দ্র কুমার ব্যানার্জী, সুধাংশু শেখর চৌধুরী, অনন্তহরি মিত্র, দেবীপ্রসাদ চৌধুরী ও অনন্তহরি চক্রবর্তী দশবৎসর হইতে দুই বৎসর পর্যন্ত বিভিন্ন দণ্ডে দণ্ডিত হন।

মেছুয়া বাজার বোমার মামলা

ডিসেম্বর ১৯১৯ সন

এই মামলায় নিরঞ্জন সেন, সতীশচন্দ্র পাকড়াশি, রমেশচন্দ্র বিশ্বাস, সুধাংশু দাসগুপ্ত, নিশাকান্ত রায়চৌধুরী, সুধীর কুমার আইল, দেবপ্রিয় চ্যাটার্জি, শচীন্দ্র কর গুপ্ত, মুকুল রঞ্জন সেন, সুধাংশু মজুমদার, বিহারীলাল বিশ্বাস, মহেন্দ্র চন্দ্র রায়, তারাপদ গুপ্ত, সত্যব্রত সেন, রবীন্দ্রনাথ বসু ও সুবোধ চক্রবর্তী, সাত বৎসর ও পাঁচ বৎসর কারাদণ্ড প্রাপ্ত হন। মুকুল সেন, শচীন্দ্র কর, জগদীশ চ্যাটার্জি, নির্মল দাস মুক্তি পান, ইহারা তরুণ বিপ্লবী দলের সভ্য।

ডালহৌসী স্কোয়ার বোমার মামলা

২৫শে আগষ্ট ১৯৩০ সন

অনুজা সেনগুপ্ত (সেনহাটি, খুলনা) ও দীনেশচন্দ্র মজুমদার (বসিরহাট) অত্যাচারী কুখ্যাত টেগার্ট সাহেবের গাড়ীতে বোমা নিক্ষেপ করেন। টেগার্ট সাহেব বাঁচিয়া যান। দীনেশ ধৃত হন। অনুজ সেন আত্মহত্যা করেন। বিচারে দীনেশ মজুমদারের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। এই উপলক্ষে পুলিশ বহু বাড়ী খানাতল্লাস করে এবং বহুলোককে গ্রেপ্তার করে। এই সম্পর্কে শোভারাণী দত্ত, কমলা দাসগুপ্তা, শৈলরাণী দত্ত, ডাঃ নারায়ণ রায়, ডাঃ ভূপাল বসু, অদ্বৈত দত্ত, অম্বিকা রায়, রসিকলাল দাস, সতীশ ভৌমিক, সুরেন্দ্র দত্ত, রোহিণী অধিকারী প্রভৃতি ধৃত হন। বিচারে নারায়ণ রায়, ভুপাল বসু প্রত্যেকে ১৫ বৎসর দ্বীপান্তর, সুরেন্দ্র দত্ত ১২ বৎসর,

রোহিণী ৫ বৎসর, সতীশ ২ বৎসর দণ্ড প্রাপ্ত হন এবং অন্যান্য সকলে মুক্তি পান। ইহারা তরুণ বিপ্লবী দলের সভ্য।

কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলা

১৯২৬ সন

এই ষড়যন্ত্র মামলায় পণ্ডিত রামপ্রসাদ বিস্‌মিল, রাজেন্দ্র লাহিড়ী, ঠাকুর রোশন সিং আস্‌ফাকউল্লার ফাঁসি হয়। শচীন্দ্রনাথ সান্যালের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। মন্মথ গুপ্তের ১৩বৎসর, যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জি, গোবিন্দ কর, শচীন্দ্রনাথ বক্সি, মুকুন্দীলাল, রাজকুমার সিং, রামকৃষ্ণ ক্ষেত্রী দশ বৎসর, বিষ্ণু শরণ ডুব্‌লিশ, সুরেন্দ্র ভট্টাচার্জি ৭ বৎসর, ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল, রাম দুলারী ত্রিবেদী, প্রেমকিষণ খান্না, বনোয়ারী লাল, পরমেশ কুমার ৫ বৎসর জেল হয়। ইহারা সকলেই অনুশীলন দলের সভ্য।

দেওঘর ষড়যন্ত্র

১৯২৬ সন

এই মামলায় ধীরেন্দ্র ভট্টাচার্য, সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য, তেজেশ ঘোষ, উপেন্দ্র কর, সুশীল সেন, ইন্দ্র নারায়ণ, বদ্রিনারায়ণ, অহিভূষণ, ধরানাথ ভট্টাচার্য, ইন্দ্রচন্দ্র নারং, দয়াল হরি দত্ত বিভিন্ন দণ্ডে দণ্ডিত হন। ইহারা তরুণ বিপ্লবী দলের সভ্য।

লাহোর ষড়যন্ত্র, ২য় পর্ব

১৯৩০ সন

এই মামলায় ভগৎ সিং শুকদেব, শিবরাম ও রাজগুরুর ফাঁসী হয়। কিশোরী লাল, মহাবীর সিং, বিজয় সিং, শিব বর্মা, ডাঃ গয়াপ্রসাদ, জয়দেব কাপুর ও কমল নাথ তেওয়ারীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। সুনন্দ লালের ৭ বৎসর, প্রেম দত্তের ৫ বৎসর জেল হয়। অজয় ঘোষ, জিতেন সান্যাল ও দেশরাজ মুক্তি পান। ইহারা অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন।

আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা

১৯৩৩

"রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন" এই অভিযোগে ৩৮ জন বিপ্লবীর বিরুদ্ধে মামলা হয়। এই ষড়যন্ত্র পাঞ্জাব হইতে ব্রহ্মদেশ, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং সেই সব স্থান হইতে সাক্ষী সংগ্রহ করা হইয়াছে। এই মামলায় প্রভাত চক্রবর্তী, জিতেন্দ্রনাথ গুপ্ত, পূর্ণানন্দ দাসগুপ্ত, ধীরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, সীতানাথ দে, নরেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড প্রাপ্ত হন। কিশোরী মোহন দাসগুপ্ত, মণীন্দ্রলাল চৌধুরী, পরেশ চন্দ্র গুহ, দশ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ড। যতীন্দ্র নাথ চক্রবর্তী দ্বিজেন্দ্রনাথ তলাপাত্র, অবনী মোহন ভট্টাচার্য্য, প্রভাত কুমার মিত্র, সত্যেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার, হরিপদ দে, নিরঞ্জন ঘোষাল, অমল চন্দ্র সেনগুপ্ত, অমিয় কুমার পাল, সাত বৎসর; হেম ভট্টাচার্য্য, বিমল ভট্টাচার্য্য, স্বরেন্দ্র ধর চৌধুরী, জ্যোতিষ চন্দ্র মজুমদার ছয় বৎসর, সুধীর ভট্টাচার্য্য পাঁচ বৎসর; সন্তোষ চ্যাটার্জি, শ্যাম বিহারীলাল শুকলা, ইন্দুভূষণ মজুমদার, প্রবোধ কুমার ঘোষ, অজিত কুমার বসু, অবনী রঞ্জন সরকার, সুশীল কুমার রায় চৌধুরী তিন বৎসর; জ্যোতি মুকুল ঘোষ, লক্ষ্মীনারায়ণ শর্ম্মা, সঞ্জীব মুখার্জি, কালীমোহন দে, ভোলানাথ দাস, এক বৎসর কারাদণ্ড প্রাপ্ত হন। দ্বিজেন রায় মুক্তি পান। পলাতক বিপ্লবীদের মধ্যে মধুসূদন রায়—মহানন্দপুর (বিহার) ছিলেন।

অনুশীলন সমিতীর নেতারা যখন জেলে ছিলেন—তখন প্রভাত চক্রবর্তী, পূর্ণানন্দ দাসগুপ্ত, জিতেন গুপ্ত, সীতানাথ দে প্রভৃতি তরুণ বিপ্লবীরা এই বিপ্লবের আয়োজন করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রায় ২৫০ জন বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই মামলা দুই বৎসর চলিয়াছিল। ইহারা সকলেই অনুশীলন সমিতির সভ্য।

টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলা

১৯৩৪ সন

আন্তঃপ্রদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা যখন চলিতেছিল, তখন অনুশীলন সমিতির তরুণ পলাতক বিপ্লবী প্রফুল্ল সেন বিভিন্ন নামে বিভিন্ন স্থানে দল গঠন

করিতেছিল। বিভিন্ন জেল হইতে যাহারা পলায়ন করিয়াছিলেন, তাহারাও টিটাগরে একত্র হইলেন। পুলিশ টিটাগরে বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া পারুল মুখার্জি, পূর্ণানন্দ দাসগুপ্ত এবং শ্যামবিনোদকে গ্রেপ্তার করেন। ঐ বাড়ী তল্লাসী করিয়া পুলিশ ষড়যন্ত্রের অনেক উপাদান পাইয়াছিলেন। অবশ্যই পারুল মুখার্জি কিছু কাগজ পুড়াইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিল। আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র ও টিটাগর একই ষড়যন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। এই মামলার পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড, প্রফুল্ল সেন ১৪ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ড, শ্যামবিনোদ পাল চৌধুরী ১০ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ড, দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত ৭ বৎসর, নিরঞ্জন ঘোষাল ৭ বৎসর, ধীরেন্দ্র মুখার্জি ৫ বৎসর, হরেন্দ্রনাথ মুন্সী ৫ বৎসর, কার্ত্তিকচন্দ্র সেনাপতি ৫ বৎসর, জগদীশ চক্রবর্তী ৫ বৎসর, শান্তি সেন ৫ বৎসর, জীবন ধুপী ৪ বৎসর, বিভূতি ভট্টাচার্য্য ৪ বৎসর, দেবপ্রসাদ ব্যানার্জি ৪ বৎসর, জগদীশ ঘটক ৪ বৎসর, সুধাংশু বিমল দত্ত ৩ বৎসর, প্রীতিরঞ্জন পুরকায়েস্থ ৩ বৎসর; পারুল মুখার্জি, ৩ বৎসর কারাদণ্ড প্রাপ্ত হন। ধনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সীতানাথ দে, মাখনলাল কর, রবীন্দ্র ঘোষ, কালীপদ ভট্টাচার্য্য, অজিত মজুমদার, জীবন দে, জুড়ন গাঙ্গুলী, বীরেন বসু, ধীরেন ধর, যজ্ঞেশ্বর দে, দেবব্রত রাও, প্রমাণ অভাবে মুক্তি পান। ইহারা সকলেই অনুশীল সমিতির সভ্য ছিলেন।

প্রাগপুর ডাকাতি

১৯১৫ সনের ৩০শে এপ্রিল নদীয়া জেলার প্রাগপুর গ্রামে এক ধনী ব্যক্তির গৃহে উত্তর বঙ্গের বিপ্লবীদলের সভ্যরা এক ডাকাতি করেন। এই ডাকাতির সময় একজন পুলিশ কর্মচারী এবং গ্রামবাসীর সহিত বিপ্লবীদের সংগ্রাম হয়। এই সংগ্রামে বিপ্লবী সুশীল সেন নিহত হন। ডাকাতির পর বিপ্লবীরা সুশীল সেনের মৃত দেহ নদীতে নিক্ষেপ করিয়া নৌকা ডুবাইয়া স্থল পথে চলিয়া যান। এই মামলায় শ্রীআশুতোষ লাহিড়ী এম, এ, (উধুনিয়া) পাবনা, শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র সান্যাল নদীয়া, ফণীভূষণ রায়, কুষ্টিয়া, প্রত্যেকে ১০ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ড প্রাপ্ত হন এবং আন্দামানে প্রেরিত হন।

শিবপুর ডাকাতি

১৯১৫ সনের ৩০শে সেপ্টেম্বর বরিশালের স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের বিপ্লবীদের সভ্যরা নদীয়া জেলার শিবপুর গ্রামে এক ধনী ব্যক্তির গৃহে ডাকাতি করেন। নোয়াখালী জেলার দত্তপাড়া গ্রামের শ্রীনরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ চৌধুরী এই দলের নেতা ছিলেন। ডাকাতির সময় গ্রামবাসী ও পুলিশের সহিত সংগ্রাম হয়। বিপ্লবীরা পলায়ন করিতে সক্ষম হন। অতঃপর শিবপুর ডাকাতি মামলা সুরু হয়। এই মামলায় শ্রীনরেন্দ্র মোহন ঘোষ চৌধুরী, দত্তপাড়া নোয়াখালী, শ্রীযতীন্দ্র মোহন নন্দী, মৃগা ময়মনসিংহ, শ্রীসত্যরঞ্জন বোস, বরিশাল, শ্রীনিখিল রঞ্জন গুহ রায়, ইদিলপুর ফরিদপুর, শ্রীহরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ফরিদপুর, শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ শ্যামপুকুর লেন, কলিকাতা, শ্রীশচীন্দ্র নাথ দত্ত, চান্দপুর, ময়মনসিংহ, শ্রীসানুকুল চ্যাটার্জি, হুগলী, শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস বরিশাল, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন এবং সকলকেই আন্দামানে প্রেরণ করা হইয়াছিল।

রডা কোম্পানীর পিস্তল চুরি

১৯১৭ সনের ২৬শে আগষ্ট শ্রীযুক্ত বিপিন গাঙ্গুলীর দলের সভ্য শ্রীশ সরকার বন্দুক ব্যবসায়ী রডা এণ্ড কোম্পানীর ৫০টী মশার পিস্তল এবং ৪৬ হাজার কার্ত্তুজ সুকৌশলে অপহরণ করেন। শ্রীশ সরকার এই কোম্পানীর কর্ম্মচারী ছিলেন। শ্রীহরিদাস দত্ত গাড়োয়ান সাজিয়া গরুর গাড়ীতে করিয়া মাল অন্যত্র লইয়া যান। শ্রীশ বাবু সামান্য বেতনে চাকরী করিতেন। তিনি বিপ্লব দলের জন্য চাকুরীর মায়া ত্যাগ করিয়া ফেরার হন। এই পিস্তল ও কার্ত্তুজ বিভিন্ন স্থানে সরাইয়া ফেলা হয়, কতক পিস্তল ও কার্ত্তুজ পুলিশ হস্তগত করিতে সক্ষম হয়। অবশিষ্ট পিস্তল ও কার্ত্তুজ বিভিন্ন দলের নিকট দেওয়া হয়। অনুশীলন সমিতিও ইহার কিছু অংশ পাইয়া ছিল। রডা কোম্পানীর পিস্তল অপসারণ সম্বন্ধে শ্রী অতুল কৃষ্ণ ঘোষ বলেন, শ্রীনরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য কয়েকজন সঙ্গী সহ রডা কোম্পানীর সমস্ত পিস্তল ও কার্ত্তুজ রাত্রি ৯টার সময় অতুল বাবুর ২নং ছিদাম মুদী লেনের বাসায় ঘোড়ার গাড়ীতে করিয়া লইয়া যায়। ইহার পর রাত্রি ৬টা পর্য্যন্ত সমস্ত মাল

তাহাদের পুরোহিতের মারফৎ ময়মনসিংএর জমিদার গোপাল দাস চৌধুরীর বাগান বাড়ীতে সরান হয়। শেষ রাত্রে পুলিশ অতুল বাবুর বাড়ী ঘেরাও করে এবং খানাতল্লাসি করে কিন্তু সেখানে কিছুই পায় নাই। এই পিস্তলগুলি হস্তগত হওয়ায় বাংলার বিপ্লব দলগুলির মধ্যে নূতন প্রাণের সঞ্চার হয়। পুলিশ এই উপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে খানাতল্লাসী করে এবং শ্রীঅনুকুল মুখার্জি, শ্রীগিরিন্দ্র ব্যানার্জি, কালিদাস বসু, ভুজঙ্গ ধর, হরিদাস দত্ত, নরেন্দ্র ব্যানার্জি প্রভৃতিকে গ্রেপ্তার করিয়া রডা আর্মস মামলা চালায়।

পলায়ন

শ্রীরাসবিহারী বসুর পলায়ন

সৈন্য দলের সাহায্যে সশস্ত্র-অভ্যুত্থান প্রয়াস ব্যর্থ হওয়ার পর পুলিশ যখন বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসুকে মৃত বা জীবিত অবস্থায় ধরার জন্য চারিদিকে অনুসন্ধান করিতেছিল, তখন ১৯১৫ সনের ১২ই মে শ্রীরাসবিহারী কলিকাতার খিদিরপুর ডক হইতে "শানকীমারা" নামে একটি জাপানী জাহাজে পি, এন, ঠাকুর নামে জাপান যাত্রা করেন। পলাতক বিপ্লবী শ্রীশচীন্দ্রনাথ সান্যাল এবং গিরিজা দত্ত তাহাকে জাহাজে উঠাইয়া দেন।

ইন্টারমেণ্ট হইতে পলায়ন

১। শ্রীআশুতোষ কালী—মহেশখালী হইতে (চট্টগ্রাম)।
২। ,, ক্ষেত্র সিং—হাজিগঞ্জ হইতে।
৩। ,, প্রবোধ ভট্টাচার্য।
৪। ,, জিতেশ চন্দ্র লাহিড়ী।
৫। ,, প্রভাত চন্দ্র চক্রবর্তী—বাঁকুড়া হইতে।
৬। ,, অনিল দাসগুপ্ত।

৭। শ্রীতারানাথ লাহিড়ী—ফকির হাট (খুলনা হইতে)।
৮। ,, ধনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য—বাঁকুড়া কুষ্ঠাশ্রম হইতে।
৯। ,, দীনেশচন্দ্র বিশ্বাস—বীরভূম।

দালান্দা হইতে পলায়ন

১৯১৬ সন, ২৩শে ডিসেম্বর

কলিকাতার কুখ্যাত দালান্দা হাউসে রাজনৈতিক কর্ম্মীদিগকে গ্রেপ্তারের পর অত্যাচার করিয়া স্বীকার উক্তি করান হইত। ঐ স্থানে গ্রেপ্তারের পর অনুশীলন সমিতির শ্রীনলিনীকান্ত ঘোষ ও প্রবোধ বিশ্বাস কিছু দিন ছিলেন। একদিন সন্ধ্যার সময় নলিনীবাবু হাফপেণ্ট ও বুটজুতা পরিয়া প্রবোধ বিশ্বাসকে সঙ্গে নিয়া গেইটের সম্মুখে আসিয়া সিপাহিকে নির্দেশ দিলেন, গেইট খোল। সেখানে বন্দীদিগকে প্রশ্ন করিবার জন্য আই, বি, অফিসারগণ প্রায়ই যাতায়াত করিতেন। সিপাহী নলিনী বাবুকে মনে করিল, কোন অফিসার হইবে এবং প্রবোধ বিশ্বাসকে মনে করিল আরদালী। সিপাহী সেলাম দিয়া গেইট খুলিয়া দিল, তাহারাও বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন।

অনুশীলন সমিতির শ্রীপ্রবোধ দাসগুপ্ত (গৈলা, বরিশাল) ধৃত হওয়ার পর, কিছু দিন দালান্দা হাউসে ছিলেন। তিনি একদিন রাত্রে সেলের জানালার কাচ ভাঙ্গিয়া বাহির হন এবং দেওয়াল টপ্‌কাইয়া পলায়ন করেন।

বাক্‌সা ফোর্ট হইতে পলায়ন

১৯৩৩ সন

ভূটানের পাদদেশে, পাহাড়ের উপর অবস্থিত বাক্‌সা দুর্গ, বাংলার বিপ্লবীদিগকে আটক করিয়া রাখার একটি কেন্দ্রস্থল ছিল। এই দুর্গের চারিদিকে দেওয়াল ও কাঁটা তারের বেড়া ছিল, বন্দুকধারী সিপাহী দিবারাত্র চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দিত। দুর্গের চারিদিকে ভীষণ জঙ্গল, জঙ্গলে বাঘ, ভাল্লুক, বন্যহস্তী ও বিষধর সর্প থাকিত। শীতকালে ভীষণ শীত। এই বন্দীনিবাসে প্রায় দেড়শ দেশপ্রেমিক বিনা বিচারে আটক ছিলেন। এক

অন্ধকার রাত্রে শীতকালে, জিতেন গুপ্ত ও কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী প্রাচীর ও কাঁটা তারের বেড়া টপ্‌কাইয়া দুর্গের বাহির হইয়া পড়িল। অন্ধকার রাত্রি, পাহাড়িয়া রাস্তা, তাহারা কতকটা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে লাগিল, অবশেষে রাস্তা হারাইয়া একটি বৃক্ষে আরোহণ করিয়া সারা রাত্রি কাটাইল। পরদিন প্রাতে পাহাড় জঙ্গল অতিক্রম করিয়া বাক্‌সা দুয়ার ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। সৌভাগ্য ক্রমে গাড়ীও ছাড়ার জন্য প্রস্তুত ছিল, তাহারা তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠিল, গাড়ী ছাড়িয়া দিল। অবশেষে তাহারা নিরাপদ স্থলে চলিয়া গেলেন। ইঁহারা অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন।

আলীপুর সেণ্ট্রাল জেল হইতে পলায়ন

১৯৩৪ সন ৩১শে আগষ্ট

বিপ্লবীদিগকে জেলের ভিতর সুরক্ষিত স্থানে রাখা হইত এবং যাহাতে তাহারা পলায়ন না করিতে পারে, সেজন্য কড়া পাহারার ব্যবস্থা থাকিত। এই সুব্যবস্থার মধ্যেও আলীপুর সেণ্ট্রাল জেল হইতে কয়েকজন বিপ্লবী প্রকাশ্য দিবালোকে পলায়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। একদিন বৈকালে পূর্ণানন্দ দাসগুপ্ত, নিরঞ্জন ঘোষাল, সীতানাথ দে ভোলানাথ দাস, অমূল্য সেন, সত্যেন্দ্র মজুমদার, হরিপদ দে হঠাৎ সেলের প্রাচীর টপ্‌কাইয়া জেলের উচ্চ প্রাচীরের নিকট যায়। এদিকে সিপাহী "আসামী পালাইয়া যাইতেছে", বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে এবং ঘন ঘন হুইসেল বাজায়। জেলের পাগলা ঘুন্টি বাজিতে থাকে। সিপাহীর সহিত কয়েকজনের ধ্বস্তাধ্বস্তি চলিতে থাকে। ইতিমধ্যে হরিপদ বড় দেওয়াল ভর করিয়া দাঁড়ায় তাহার কাঁধে নিরঞ্জন ঘোষাল উঠিয়া দাঁড়ায় এবং নিরঞ্জন ঘোষালের কাঁধে পূর্ণানন্দ দাসগুপ্ত একটি কাপড়ের দড়িসহ উঠিয়া প্রাচীরের উপর উঠে ও কাপড়ের দড়ির সাহায্যে দেওয়ালের অপর দিকে নামিয়া যায়। ইহার পর নিরঞ্জন দড়ি বেয়ে নীচে নামিয়া আসে। তাহার পর হরিপদ এবং সীতানাথ দে ক্রমে ক্রমে নীচে নামিয়া আসে। তাহারা তৎক্ষণাৎ কালী গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া অপর পারে উঠিতে সক্ষম হয়। তখন প্রবল ঝড়বৃষ্টি হইতেছিল। ইতি মধ্যে সিপাহির দল ঘটনা স্থলে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং সত্যেন্দ্র, ভোলানাথ ও

অমূল্যকে দেওয়ালের নিকট ধরিয়া ফেলে। পূর্ণানন্দ, নিরঞ্জন, সীতানাথ ও হরিপদ ঝড়বৃষ্টির মধ্যে দিয়া পদব্রজে বিভিন্ন স্থানে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহারা অত্যন্ত ক্ষিপ্রকারিতার সহিত দেয়াল টপ্‌কাইয়া ছিল এবং গঙ্গা নদী পার হইয়াছিল। ইহাতে তাহাদের মাত্র ৫।৭ মিনিট সময় লাগিয়াছিল; ইহারা সকলেই অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন।

মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেল হইতে পলায়ন

শ্রীসুশীল চন্দ্র দাসগুপ্ত, শ্রীদীনেশ চন্দ্র মজুমদার, শ্রীশচীন্দ্র কর গুপ্ত, মেদিনীপুব সেণ্ট্রাল জেল হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। ইহারা রিভলটিং গ্রুপের ছিলেন।

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুর পলায়ন

১৯৪১ সন ১৭ই জানুয়ারী

দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধের আভাষ পাইয়া শ্রীসুভাষ চন্দ্র বসু ইংলণ্ডের বিরোধী রাষ্ট্রসমূহের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিলেন। তিনি ১৯৪০ সনের ২রা জুলাই ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হন এবং জেলের কতকগুলি দাবী দাওয়া লইয়া অনশন ব্রত অবলম্বন করিলেন। সুযোগ আসিল। ৫ই ডিসেম্বর গভর্ণমেণ্ট স্বাস্থ্য ভঙ্গের জন্য সুভাষবাবুকে মুক্তি দিলেন। সুভাষবাবু মুক্তি লাভের পর নিজ গৃহে আত্মগোপন করিয়া পলায়নের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। চেহারা পরিবর্তন করিতে না পারিলে পলায়ন সম্ভবপর হইবে না। তিনি কাবুলের পথে যাওয়া স্থির করিয়াছিলেন। তাঁহাকে মুসলমান সাজিয়া যাইতে হইবে। তাঁহার গোপদাড়ি কামান থাকিত। তিনি গোপদাড়ি বড় না হওয়া পর্যন্ত নিজ বাড়ীতে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বর্তমান চেহারা যাহাতে অন্যে না দেখিতে পারে, সে জন্য তিনি এক কোঠায় আবদ্ধ থাকিতেন এবং প্রচার করিয়া দিলেন তিনি মৌন ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন এবং নির্জন কোঠায় বসিয়া ধ্যান করেন, কাহারও সহিত দেখা করেন না। তাঁহার উপর আই. বি. পুলিশের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল, কাহারা যাতায়াত করে তাহা লক্ষ্য করিত।

১৯৪৩ সনের ১৭ই জানুয়ারী শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু এক গভীর রাত্রিতে পাঞ্জাবী মৌলভীর বেশে বাড়ী হইতে বাহির হইলেন, তাঁহার এক ভ্রাতুস্পুত্র মোটরগাড়ী চালাইয়া লইয়া যাইতেছিলেন। সুভাষবাবু পরদিন ১৮ই জানুয়ারী শেষ রাত্রে গোমো ষ্টেশনে গিয়া সীমান্ত প্রদেশের গাড়ী ধরেন এবং পেশোয়ারে পৌছিয়ে বেশ বদল করিয়া পাঠান সাজেন। পূর্ব বন্দোবস্ত অনুসারে একজন দুভাষী তাঁহাকে কাবুলে লইয়া যান। সুভাষবাবু বোবা সাজিলেন। সুভাষবাবু উচ্চ শিক্ষিত বড লোকের ছেলে, পাযে হাঁটার বিশেষ অভ্যাস ছিল না কিন্তু তিনি ভীষণ শীতের মধ্যে পাহাড জঙ্গল অতিক্রম করিয়া কাবুল পৌছেন এবং পরে জার্মানীতে যাইয়া উপস্থিত হন। অতঃপর সুভাষবাবু শ্রীরাসবিহারী বসুর আমন্ত্রণক্রমে ডুব-জাহাজে জার্মেনী হইতে জাপানে যাইতে সক্ষম হন। জাপানে অনুশীলন সমিতির নেতৃস্থানীয় শ্রী রাসবিহারী বসু পূর্ব হইতেই আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন করিয়াছিলেন। এখন শ্রীরাসবিহারী উপযুক্ত নেতা সুভাষচন্দ্রকে পাইয়া তাঁহার উপর আজাদ হিন্দ বাহিনীর নেতৃত্বভার অর্পণ করেন এবং নিজে তাহার সহকর্মী হিসাবে কার্জ করিতে থাকেন।

শহীদ স্মরণে

সেই অন্ধকার যুগে, পরাধীন পাক-ভারতে, যখন দেশবাসীর মধ্যে কোন রাজনৈতিক চেতনা ছিলনা, সেই যুগে যাহারা ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দিয়া, সংসার বন্ধন ছিন্ন করিয়া, প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাপাইয়া পডিয়াছিলেন, যে সব নির্ভিক দেশপ্রেমিক দেশের স্বাধীনতার জন্য স-শস্ত্র বিপ্লবের আয়োজন করিয়াছিলেন, যাহারা স্বাধীনতার শত্রু ও দেশদ্রোহীকে হত্যা করিয়া দেশ প্রেমিকের গৌরব অর্জন করিয়াছেন, যাহারা বিপ্লব আন্দোলনে ঝাপাইয়া পড়িয়া ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়াছেন, সম্মুখ সংগ্রামে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন, জেলে-দ্বীপান্তরে অমানুষিক অত্যাচারের ফলে প্রাণ হারাইয়াছেন, আজ স্বাধীন পাক-ভারতে সেই সব সর্ব্ব ত্যাগী, পুত চরিত্র বীর বিপ্লবীদের নাম স-গৌরবে স্মরণ করিতেছি।

শহীদ প্রফুল্ল চাকী (বগুড়া কালীতলা) জন্ম ডিসেম্বর ১৮৮৮ সন। বাংলার প্রথম শহীদ। রংপুর জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র। মজঃফরপুরের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ড সাহেবের গাড়ীতে বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। রাস্তায় ধৃত হওয়ার সময় আত্মহত্যা করেন। ১লা মে, ১৯০৮ সন।

শহীদ ক্ষুদিরাম বসু (মেদিনীপুর জিলার কেশপুর থানার বহুবাণী গ্রাম) জন্ম ৩রা ডিসেম্বর, ১৮৮৯ সন। ফাঁসি ১১ই আগষ্ট, ১৯০৮ সন। মজঃফরপুরের অত্যাচারী জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ড সাহেবের গাড়ীতে বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, বিচারে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। তাহার পিতার নাম ত্রৈলোক্য নাথ বসু।

শহীদ সত্যেন্দ্র নাথ বসু (মেদিনীপুর) ইনি বাংলার জাতীয় নেতা রাজনারায়ণ বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র। প্রেসীডেন্সী জেলে রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে গুলি করিয়া হত্যা করার জন্য ২৩শে নভেম্বর, ১৯০৮ সন ফাঁসি হয়।

শহীদ কানাই লাল দত্ত (চন্দননগর) জন্ম সেপ্টেম্বর ১৮৮৭ সন। ডুপ্লে কলেজ হইতে বি, এ, পাশ করেন। প্রেসিডেন্সী জেলে রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে পিস্তলের গুলিতে নিহত করেন। বিচারে মৃত্যু দণ্ড হয়। ফাঁসি প্রেসিডেন্সী জেলে ১০ই নভেম্বর, ১৯০৮ সন।

শহীদ চারুচন্দ্র বসু (খুলনা শোভনা গ্রাম) আলিপুর ষড়যন্ত্র (বোমার) মামলার সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাসকে গুলি করিয়া হত্যা করার জন্য ফাঁসি হয়। আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০৯ সন।

শহীদ বীরেন্দ্র নাথ দত্ত গুপ্ত (বিক্রমপুর ঢাকা) ১৯১০ সনের ২৪শে জানুয়ারী পুলিশের ডেপুটি সুপারিণ্টেডেণ্ট সামসুল আলমকে হত্যা করেন। সামসুল আলিপুর বোমার ষড়যন্ত্র মামলার তদ্বির করিতেন। বিচারে বীরেন দত্ত গুপ্তের ফাঁসি হয়। বয়স ১৯ বৎসর ছিল।

শহীদ আবদ বিহারী। তিনি দিল্লীর এক কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলায় ফাঁসি হয়। আমবালা জেল ১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯১৪ সন।

শহীদ আমির চাঁদ। ফাঁসি আমবালা জেল ১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯১৪ সন। তিনি দিল্লীর সেন্ট জোসেফ স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলায় ফাঁসি হয়।

শহীদ বাল মুকুন্দ। ফাঁসি ১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯১৪ সন, আমবালা জেল। ইনি যোধপুর রাজকুমারের গৃহ শিক্ষক ছিলেন। দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলায় ফাঁসি হয়। যেদিন তাহার ফাঁসি হয়, সেই দিন তাহার স্ত্রী রামলক্ষ্মী বিষপানে আত্মহত্যা করেন। স্বামী স্ত্রী উভয়ের শব এক সঙ্গে াহ কর হয়।

শহীদ বসন্ত কুমার বিশ্বাস। ফাঁসি আমবালা জেল, ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯১৪ সন। বাড়ী নদীয়া জিলার পোড়াগাছ গ্রামে। বয়স ১৬ বৎসর। ইনি মেয়েলোক সাজিয়া বড়লাটের উপর বোমা নিক্ষেপ করেন। দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলায় তাহার ফাঁসি হয়।

শহীদ মদন লাল ধিংড়া—ফাঁসি লণ্ডন পেন্টনভেলি জেলে—১৭ই আগষ্ট, ১৯০৯ সন। পাঞ্জাবী যুবক। ইনি লণ্ডন শহরে কার্জন ওইলি সাহেবকে পিস্তলের গুলিতে হত্যা করেন। বিচারে ফাঁসি হয়।

শহীদ কার্ত্তার সিং—(সারাবা – লুধিয়ানা) ফাঁসি—লাহোর সেন্ট্রাল জেল ১৭ই নভেম্বর, ১৯১৫ সন। পাঞ্জাবী যুবক, বয়স ১৮ বৎসর। রাসবিহারী বসুর সহকর্মী। ইনি এনট্রেন্স পাশ করিয়া আমেরিকা যান এবং গদর পার্টির সভ্য হন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভারতে আসিয়া রাসবিহারী বসুর সহিত মিলিত হন। তিনি ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য পাঞ্জাবী সৈন্য-দিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতেছিলেন। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় তাহার ফাঁসি হয়।

শহীদ গণেশ বিষ্ণু পিংলে—ফাসি ১২ই জুন, ১৯১৬ সন। তিনি বোমা ও পিস্তল সহ মীরাট কেণ্টনমেণ্টে ধৃত হন। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ফাসি হয়।

শহীদ রাজেন্দ্র নাথ লাহিড়ী (লাহিড়ী মোহনপুর, পাবনা) ফাঁসি গণ্ডা জেল (যুক্ত প্রদেশ) ১৬ই ডিসেম্বর ১৯২৭ সন। কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ, ক্লাসের ছাত্র ছিলেন। কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় ফাঁসি হয়।

শহীদ আসফাকউল্লাহ খাঁ (সাজাহানপুর, ইউ, পি,) ফাঁসি ফৈজাবাদ জেল, ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯২৭ সন। সাজাহানপুরের এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে জন্ম। ইনি জাতিতে পাঠান। কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় ফাঁসি হয়।

শহীদ ঠাকুর রোশন সিং (সাজাহানপুর) ফাঁসি এলাহাবাদ জেল ২১শে ডিসেম্বর, ১৯২৭ সন। তিনি এক জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় ফাঁসি হয়।

শহীদ রামপ্রসাদ বিসমিল (গোয়ালিয়র ষ্টেট্) ফাঁসি গোরখপুর জেল, ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯২৭ সন। কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় ফাঁসি হয়।

শহীদ অনন্তহরি মিত্র, ফাঁসি ২৭শে আগষ্ট, ১৯২৬ সন। দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় দণ্ডিত। আই, বি, পুলিশের ডেপুটি সুপারিণ্টেডেণ্ট ভূপেন চ্যাটার্জিকে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে হত্যা করার জন্য ফাঁসি হয়।

শহীদ প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী (চট্টগ্রাম কেলী শহর) ফাঁসি ৯ই আগষ্ট ১৯২৬ সন। দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় দণ্ডিত। আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে ডেপুটি সুপারিণ্টেডেণ্ট ভূপেন চ্যাটার্জিকে হত্যা করার জন্য ফাঁসি হয়।

শহীদ ভগৎ সিং (পাঞ্জাব) ফাঁসি লাহোর সেণ্ট্রাল জেল ২৩শে মার্চ, ১৯৩১ সন। লাহোর ন্যাশনেল কলেজের ছাত্র। পিতার নাম কিষেণ সিং। ইনি সুবিখ্যাত সর্দ্দার অজিত সিংএর ভ্রাতুষ্পুত্র। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় তাহার ফাঁসি হয়। ফাঁসির পর সমগ্র ভারতে ভগৎ সিং এর জন্য সভা ও শোভা যাত্রা হয়। তিনি এতটা জন প্রিয় ছিলেন যে, দেশের সর্ব্বত্র, হাটে মাঠে ভগৎ সিং জিন্দাবাদ ধ্বনি শোনা যাইত।

শহীদ শুকদেব (পাঞ্জাব) ফাঁসি লাহোর সেন্ট্রাল জেল। ২৩শে মার্চ, ১৯৩১ সন। ভগৎ সিং এর সহকর্মী। লাহোর ষড়যন্ত্র (২য় পর্ব্ব) মামলায় ফাঁসি হয়।

শহীদ রাজগুরু (পাঞ্জাব) ফাঁসি লাহোর সেন্ট্রাল জেল। ২৩শে মার্চ, ১৯৩১ সন। ভগৎ সিং এর সহকর্মী। লাহোর ষড়যন্ত্র (২য় পর্ব্ব) মামলায় ফাঁসি হয়।

শহীদ শিবরাম (পাঞ্জাব) ফাঁসি—লাহোর সেন্ট্রাল জেলে। ২৩শে মার্চ, ১৯৩১ সন। ভগৎ সিং এর সহকর্মী। লাহোর ষড়যন্ত্র (২য় পর্ব্ব) মামলায় ফাঁসি হয়।

শহীদ মনোরঞ্জন দাসগুপ্ত (ফরিদপুর খযেরডাঙ্গা) ফাঁসি ৫ই মে, ১৯১৫ সন। যতীন মুখার্জির সহকর্মী। বালেশ্বর খণ্ড যুদ্ধে আহত, বিচারে ফাঁসি হয়।

শহীদ গোপীনাথ সাহা। ফাঁসি ১লা মার্চ, ১৯২৪ সন। ইনি হুগলী বিদ্যামন্দিরের ছাত্র। কুখ্যাত পুলিশ কমিশনার টেগার্ট ভ্রমে ডে সাহেবকে হত্যা করেন। বিচারে ফাঁসি হয়।

শহীদ দীনেশ চন্দ্র মজুমদার (বসিরহাট) জন্ম ১৯শে মে, ১৯০৭ সন। ফাঁসি ৯ই জুন ১৯৩৪ সন। ডালহৌসী স্কোয়ারএ টেগার্ট সাহেবের গাড়ীতে বোমা নিক্ষেপের জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেল হইতে পলায়ন করেন। কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে পুলিশের সহিত সংগ্রামে ধৃত ও ফাঁসি হয়।

শহীদ অনুজা সেন (সেনহাটি, খুলনা) ডালহৌসী স্কোয়ারে টেগার্ট সাহেবের গাড়ীতে বোমা নিক্ষেপের পর ধৃত হওয়ার সময় আত্মহত্যা করেন। আগষ্ট, ১৯৩০ সন।

শহীদ সূর্য সেন বি,'এ (মাষ্টারদা) নোয়াপাড়া চট্টগ্রাম। জন্ম অক্টোবর ১৮৯৩ সন। ফাঁসি চট্টগ্রাম জেলে ১২ই জানুয়ারী ১৯৩৪ সন।

চট্টগ্রাম বিপ্লব দলের নেতা। অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় রাত্রি ১২ টার সময় ফাঁসি হয়।

শহীদ তারকেশ্বর দস্তিদার (চট্টগ্রাম) ফাঁসি চট্টগ্রাম জেল, ১২ই জানুয়ারী, ১৯৩৪ সন। মাষ্টারদার সহকর্মী। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় ফাঁসি হয়।

শহীদ রামকৃষ্ণ বিশ্বাস (নারোয়াটুলি, চট্টগ্রাম) ফাঁসি জানুয়ারী ১৯৩১ সন। মাষ্টারদা'র সহকর্মী। চাঁদপুরে পুলিশ ইনস্পেক্টার তারিণী মুখার্জিকে হত্যা করেন। বিচারে তাহার ফাঁসি হয়।

শহীদ দীনেশ গুপ্ত (যশোলঙ্গ, বিক্রমপুর ঢাকা) জন্ম ৬ই ডিসেম্বর, ১৯১১ সন। ফাঁসি আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল ৭ই জুলাই, ১৯৩১ সন। রাইটার্স বিল্ডিংএ জেল সমূহের ইনস্পেক্টর জেনারেল সিম্‌সন সাহেবকে হত্যা করার জন্য ফাঁসি হয়।

শহীদ প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য (গোকুলনগর মেদিনীপুর) বয়স ২০ বৎসর। জন্ম ১৩ই নভেম্বর, ১৯১৩ সন। ফাঁসি মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেল, ১১ই জানুয়ারী, ১৯৩৩ সন। মেদিনীপুরের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ডগলাসকে গুলি করিয়া হত্যা করার জন্য ফাঁসি হয়।

শহীদ ব্রজকিশোর চক্রবর্তী (মেদিনীপুর) ফাঁসি মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেল ২৫শে অক্টোবর, ১৯৩৪ সন। মেদিনীপুরের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট বার্জ হত্যা মামলায় ফাঁসি হয়।

শহীদ রামকৃষ্ণ (মেদিনীপুর) ফাঁসি মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেল, ১৯৩৪ সন। মেদিনীপুরের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট বার্জ হত্যা মামলায় ফাঁসি হয়।

শহীদ নির্মল জীবন ঘোষ (মেদিনীপুর) ফাঁসি মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেল ২৬শে অক্টোবর, ১৯৩৪ সন। মেদিনীপুরের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট বার্জ হত্যা মামলায় ফাঁসি।

শহীদ হরেন্দ্র চক্রবর্তী (চট্টগ্রাম) বয়স ১৭ বৎসর। ফাঁসি চট্টগ্রাম জেল, ৭ই জানুয়ারী ১৯৩৪ সন। চট্টগ্রাম খেলার মাঠে এক শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী হত্যার মামলায় ফাঁসি হয়।

শহীদ কৃষ্ণ চৌধুরী (চট্টগ্রাম) বয়স ১৩ বছর। ফাঁসি বহরমপুর জেল, ৭ই জানুয়ারী, ১৯৩৪ সন। চট্টগ্রাম খেলার মাঠে এক শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী হত্যার মামলায় ফাঁসি হয়।

শহীদ ভবানী প্রসাদ ভট্টাচার্য জন্ম ১৯১৪ সন। ফাঁসি রাজসাহী সেণ্ট্রাল জেল, ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫ সন। বাংলার গভর্ণার স্যার জন এণ্ডার্সনকে দার্জিলিংএর লেবং ঘোড়দৌড়ের মাঠে গুলি করার জন্য ফাঁসি হয়।

শহীদ কালীপদ মুখার্জি (ঢাকা) ফাঁসি সেণ্ট্রাল জেল, ২২শে জানুয়ারী, ১৯৩৬ সন। ঢাকার এক ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হত্যার মামলায় ফাঁসি হয়।

শহীদ মতিলাল মল্লিক (ঢাকা) জন্ম ১৯১২ সন। ফাঁসি ঢাকা সেনট্রাল জেল, ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৩৪ সন। সরকারী সৈন্য ও গ্রামরক্ষী দলের সহিত সশস্ত্র সংঘর্ষে মতিলালের গুলিতে সরকারী বাহিনীর নেতা নিহত হয়। ধৃত মতিলালের ফাঁসি হয়।

শহীদ মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (এড়িকাটি, ফরিদপুর) চর মুগুড়িয়া ডাকাতি মামলায় ফাঁসি হয়।

শহীদ অসিত রঞ্জন ভট্টাচার্য, ইটাখোলা ডাকাতি মামলায় ফাঁসি হয়।

শহীদ রোহিণী বড়ুয়া (চট্টগ্রাম) এক দারোগা হত্যা মামলায় ফাঁসি হয়।

শহীদ প্রেমানন্দ দত্ত (চট্টগ্রাম) আই, বি, অফিসার প্রফুল্ল রায়কে হত্যা করার জন্য ফাঁসি হয়।

শহীদ যতীন মুখার্জি (বাঘা যতীন) বিপ্লবী নেতা যতীন মুখার্জি বালেশ্বর খণ্ড যুদ্ধে নিহত হন। ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৫ সন।

শহীদ সত্যেন বর্দ্ধন পুলিশের গুলিতে নিহত হন। ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ সন।

শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরা (মেদিনীপুর) আইন অমান্য করিয়া জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সময় পুলিশের গুলিতে নিহত হন।

শহীদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার বি, এ, (চট্টগ্রাম পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাবে বোমা নিক্ষেপের পর ধৃত হওয়ার আশঙ্কায় আত্মহত্যা করেন। ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ সন।

শহীদ হরি কিষণ (পাঞ্জাব) ফাঁসি ৯ই জুন, ১৯৩১ সন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন সভায় গভর্ণারের উপর গুলি করার জন্য ফাঁসি হয়।

শহীদ রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশের গুলিতে নিহত হন। ২১শে নভেম্বর ১৯৪৫ সন।

শহীদ যতীশ গুহ ১৯৪৫ সনে দিল্লীর লাল কেল্লায় অশেষ নির্য্যাতনের ফলে মৃত্যু হয়।

শহীদ যতীন দাস। লাহোর জেলে ৬৩ দিন অনশনের ফলে মৃত্যু ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৯ সন।

শহীদ হরনাম সিং। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ফাঁসি। ১৭ই নভেম্বর, ১৯১৫ সন।

শহীদ স্বামী সত্যানন্দ পুরি (প্রফুল্ল সেন, ফরিদপুর) রাসবিহারী বসু ও নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের সহকর্মী। ব্যাঙ্ককে দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক। তিনি ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ব্যাঙ্ককে থাকিয়া ভারতের স্বাধীনতার জন্য কাজ করিতেছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় স্বাধীন ভারতসঙ্ঘের সভায় যোগদানের জন্য বিমান যোগে টোকিও রওয়ানা হন। পথিমধ্যে বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়।

শহীদ সতীন্দ্র নাথ সেন (বরিশাল) বহু বৎসর কারাগারে ছিলেন। জেলে মৃত্যু হয়। ২৪শে মার্চ ১৯৫৫ সন।

শহীদ হিমাংশু বসু। অত্যাচারের ফলে প্রেসিডেন্সি জেলে মৃত্যু হয়। ১৯৩৮ সন।

শহীদ সন্তোষ কুমার মিত্র হিজলী বন্দী নিবাসে পুলিশের গুলিতে নিহত হন। ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩১ সন।

শহীদ আশুতোষ কুইলা আগষ্ট আন্দোলনে, মহিষাদল থানা আক্রমণের সময় পুলিশের গুলিতে নিহত হন। ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ সন।

শহীদ উধম সিং (পাঞ্জাব) ফাঁসি লণ্ডন, পেণ্টনভেলি জেল, ১২ই জুন, ১৯৪০ সন। তিনি লণ্ডন সহরে পাঞ্জাবের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর স্যার মাইকেল ওডায়ারকে হত্যা করেন। বিচারে তাহার ফাঁসি হয়।

জালালাবাদ খণ্ড যুদ্ধে নিহত

শহীদ নরেশ রায় (ময়মনসিং নোয়াপাড়া) জালালাবাদ পাহাড়ে সম্মুখ সংগ্রামে নিহত। ২২শে এপ্রিল, ১৯৩০ সন। ছাত্র

শহীদ ত্রিপুরা সেন (ঢাকা)	,,	,,
শহীদ বিধু ভট্টাচার্য (কুমিল্লা)	,,	,,
শহীদ হরিগোপাল বল (ট্যাগরা) চট্টগ্রাম	,,	,,
শহীদ মতি কানুনগো (চট্টগ্রাম)	,,	,,
শহীদ প্রভাস বল (চট্টগ্রাম)	,,	,,
শহীদ শশাঙ্ক দত্ত (চট্টগ্রাম)	,,	,,
শহীদ নির্ম্মল লালা (চট্টগ্রাম)	,,	,,
শহীদ জিতেন দাসগুপ্ত (কৈবল্য চট্টগ্রাম	,,	,,
শহীদ মধুসূদন দত্ত (বিদগ্রাম বিক্রমপুর)	,,	,,
শহীদ পুলিন ঘোষ	,,	,,
শহীদ অর্দ্ধেন্দু দস্তিদার (চট্টগ্রাম)	,,	,,

শহীদ অপূর্ব্ব সেন (চট্টগ্রাম) ধলঘাট সম্মুখ যুদ্ধে নিহত। জুন, ১৯৩২ সন।

শহীদ জীবন ঘোষাল (চট্টগ্রাম) পুলিশের সহিত সংগ্রামে নিহত হন। ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩১ সন। বয়স ১৮ বৎসর।

শহীদ শৈলেন চ্যাটার্জি (কুমিল্লা) জন্ম ফেব্রুয়ারী ১৯১৪ সন। মৃত্যু অক্টোবর ১৯৩৩ সন। পুলিশের গুলিতে আহত হন। দেউলি বন্দি নিবাসে মৃত্যু।

শহীদ হৃষীকেশ সাহা (ঢাকা) জন্ম ৩১শে আগষ্ট, ১৯১৮ সন। মৃত্যু ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪২ সন। আগষ্ট আন্দোলনে পুলিশের সহিত সংঘর্ষে মৃত্যু।

শহীদ মৃগেন্দ্র নাথ দত্ত। (মেদিনীপুর) মৃত্যু ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩ সন। মেদিনীপুর খেলার মাঠে বার্জ সাহেবকে গুলি করার সময় নিহত হন।

শহীদ অনাথ বন্ধু পাঁজা (মেদিনীপুর) মৃত্যু ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩ সন। বার্জ হত্যার সময় পুলিশের গুলিতে নিহত হন।

শহীদ অনিল কুমার দাস (ঢাকা) জন্ম ৮ই জুন, ১৯০৬ সন। মৃত্যু ১৭ই জুন ১৯৩২ সন। পুলিশের নির্য্যাতনের ফলে ঢাকা জেলে মৃত্যু।

শহীদ অতুল সেন মৃত্যু ১৯৩৩ সন। ষ্টেট্‌সম্যান পত্রিকার সম্পাদক ওয়াটসন সাহেবকে গুলি করার পর পটাসিয়াম সাইনাইড সেবনে আত্মহত্যা করেন।

শহীদ অখিল দাস (ঢাকা) মৃত্যু ১৯৪২ সন। ঢাকা সহরে "জনযুদ্ধ" সভার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সময় আই, বি, পুলিশের গুলিতে নিহত হন।

অনশনে জেলে মৃত্যু

যতীন দাস—পিতা বঙ্কিমবিহারী দাস, বাড়ী দক্ষিণ কলিকাতা। ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত প্রভৃতির সহিত লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হন। লাহোর জেলে রাজবন্দীদের দাবী দাওয়া লইয়া অনশন ধর্ম্মঘট সুরু হয়। ৬৩ দিন অনশন ধর্ম্মঘটের পর ১৯২৯ সনের ১৩ই সেপ্টেম্বর লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে যতীন দাসের মৃত্যু হয়। যতীন দাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিরণ চন্দ্র লাহোর হইতে যতীন দাসের শব কলিকাতা লইয়া আসে। হাওড়া ষ্টেশন হইতে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে দুই লক্ষ লোকের শোভাযাত্রা যতীনের শব সহ কেওড়াতলা শ্মশানঘাট পর্যন্ত গমন করিয়াছিল।

মহাবীর সিং—লাহোর ষড়যন্ত্র [২য়] মামলায় দণ্ডিত হন। তিনি আন্দামান সেলুলার জেলে অনশনে প্রাণত্যাগ করেন।

মোহিত মৈত্র—আন্দামানে সেলুলার জেলে অনশনে প্রাণত্যাগ করেন।

মোহন দাস—আন্দামান সেলুলার জেলে অনশনে প্রাণত্যাগ করেন।

হরেন্দ্র মুন্সী—ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে অনশনে প্রাণত্যাগ করেন।

অনিল কুমার দাস—ঢাকা জেলে মৃত্যু ১৯৩১ সালে। ১০৪

মণীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি—বাড়ী কাশী। ফতেহগড় সেণ্ট্রাল জেলে অনশনে মৃত্যু।

পণ্ডিতরাম রক্ষা—বাড়ী ইউ, পি। ১৯১৬ সনে আন্দামান সেলুলার জেলে পৈতা কাড়িয়া লইয়া যাওয়ার প্রতিবাদে অনশন করেন। দুই মাস অনশনের পর মৃত্যু হয়। পৈতা দেওয়া হয় নাই।

জেলে, অন্তরীণে
বা পলাতক অবস্থায় মৃত্যু
হিজলী হত্যাকাণ্ড ১৯৩১ সন

মেদিনীপুর জিলার হিজলী বন্দী নিবাসে বহু বিপ্লবী কর্মী বিনা বিচারে আটক ছিলেন। সেখানে তাহাদের উপর কর্তৃপক্ষ দুর্ব্যবহার করিত এবং তাহাদের অভাব অভিযোগও অনেক ছিল। বন্দীরা প্রতিকারের জন্য প্রতিবাদ করিলে ১৬ই সেপ্টেম্বর পুলিশ তাহাদের উপর গুলি চালায়। এই গুলিচালনার ফলে প্রায় একশত জন বন্দী গুলি বিদ্ধ হয় এবং সন্তোষ মিত্র [কলিকাতা] ও তারকেশ্বর সেনগুপ্ত [গৈলা, বরিশাল] নিহত হন।

ফণীভূষণ নন্দী—জেলে অসুখে মৃত্যু।

হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য—জেলে অসুখে মৃত্যু। [আন্দামানে]

মোহিত অধিকারী—জেলে অসুখে মৃত্যু।

রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী— „ „ „

ধনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য—মেদিনীপুর গ্রামে আত্মহত্যা করেন। বাড়ী দক্ষিণ মৈশুণ্ডী, ঢাকা।

নবজীবন ঘোষ—অন্তরীণে আত্মহত্যা করেন।

ইন্দুভূষণ রায়—আন্দামান সেলুলার জেলে আত্মহত্যা করেন।

প্রফুল্ল চক্রবর্তী—বাড়ী রংপুর। পিতার নাম ঈশান চক্রবর্তী। ১৯০৭ সনে উল্লাসকর দত্তের প্রথম তৈয়ারী বোমা পরীক্ষা করার সময় দেওঘরে নিহত হন।

সুশীল সেন—১৯০৭ সনে ১৫ বৎসর বয়সে কিংসফোর্ড সাহেবের বিচারে ১৫ বেত্র দণ্ড হয়। প্রাগপুর ডাকাতির সময় নিজেদের গুলিতে নিহত হয়। তাহার শব নদীতে নিক্ষেপ করা হয়।

নরেন দত্ত—[গিরিজা দত্ত] বাড়ী শ্রীহট্ট জিলায়। পলাতক অবস্থায় ইউ, পি, তে কাজ করিতেন। বেনারস ষড়যন্ত্র মামলায় তাহার ৭ বৎসর জেল হইয়াছিল। আগ্রা জেলে তাহার মৃত্যু হয়।

গোপেশ রায়—পাথর প্রতিমায় অন্তরীণে আবদ্ধ অবস্থায় মৃত্যু হয়।

প্রবোধ ভট্টাচার্য—পিতা শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য। বাড়ী নাটোর মহকুমার বাসুদেবপুর গ্রামে। পলাতক অবস্থায় ১৯১৬ সনে ললিতেশ্বরে ডাকাতি করিয়া ফিরিবার পথে রাত্রে সর্প দংশনে মৃত্যু হয়।

গোপাল সেন—প্রসিদ্ধ বাহ্রা ডাকাতির সময় ১৯৩৮ সনের ২রা জুন, পুলিশের গুলিতে নিহত হন। ঐ সময় তিনি নৌকায় জল সেঁচিতে ছিলেন। রাত্রে তাহার দেহ নদীতে নিমজ্জিত করা হয়। বাড়ী মধ্যপাড়া বিক্রমপুর।

সত্যেন সরকার—বাড়ী ঢাকা জিলায়। ১৯১৮ সনে অন্তরিণে আবদ্ধ অবস্থায় মৃত্যু হয়।

শচীন দাসগুপ্ত—অন্তরীণে আবদ্ধ অবস্থায় ১৯১৭ সনে রংপুরে আত্মহত্যা করেন।

যোগেশ রায়—বাড়ী কমলাপুর,। রাজাবাজার বোমার মামলায় পলাতক অবস্থায় কাশীতে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়। অসহায় অবস্থায় তাহার মৃত্যু হয়।

নৃপেন চক্রবর্তী—পলাতক বিপ্লবী। দলের সহিত যোগাযোগ ছিন্ন হওয়ায় অসহায় অবস্থায় পড়িয়া কাশীতে আত্মহত্যা করেন।

ভান সিং—ইনি জাতিতে শিখ। ১৯১৭ সনে, আন্দামান সেলুলার জেলে জেল কর্তৃপক্ষের প্রহারের ফলে মৃত্যু হয়;

তন্মুরূপ সেন—১৯২৬ সনে ময়নাগুড়িতে অন্তরীণে আবদ্ধ অবস্থায় মৃত্যু হয়।

সান্ত্বনা গুহ—শান্তিনিকেতনের ছাত্র, সাহিত্যিক ছিল। হিজলী জেলে ডেটিনিউ অবস্থায় একজন অত্যাচারী অফিসারকে প্রহার করার জন্য ৬ বৎসর জেল হয়। রাজসাহী জেলে অত্যাচারের ফলে মৃত্যু হয়।

মহেশ বড়ুয়া—চট্টগ্রাম বাথুয়া ডাকাতির মামলায় দণ্ডিত। জেলে মৃত্যু।

সঞ্জীব রায়—বাড়ী ময়মনসিং জিলার কায়স্থ পল্লীগ্রামে। ১৯১৫ সনে ময়মনসিংহ জেলে মৃত্যু হয়।

রসিক সরকার—বাড়ী ময়মনসিংহ জিলার টাঙ্গাইলের অন্তর্গত নাগর-পাড়া গ্রামে। রাজসাহী জেলে আটক অবস্থায় তাহার কাপড় জামায় কেরোসিন সিক্ত করিয়া আগুন জ্বালাইয়া আত্মহত্যা করেন।

শিশির গুহরায়—(ফরিদপুর) অন্তরীণ অবস্থায় মৃত্যু।

বিপিন বিহারী দত্ত—(কুমিল্লা) পাটনায় মৃত্যু।

অশ্বিনী (উপেন্দ্র) উকিল—বাড়ী ময়মনসিংহ জিলার সান্দিকোনা গ্রামে। ইনি ময়মনসিংহ মেডিকেল স্কুলের ছাত্র ছিলেন। উত্তর বঙ্গে পলাতক অবস্থায় বিপ্লবদল গঠন করিতেছিলেন। ১৯২৩ সনে টি,বি,তে মৃত্যু হয়।

সন্তোষ গাঙ্গুলী—বি, এ, (বজ্রযোগিনী) ১৯৩০ সনে দেউলী জেলে গলায় ফাঁসী দিয়া আত্মহত্যা করেন।

জগদীশ চক্রবর্ত্তী— একরামপুর ঢাকা। রাঁচী হাসপাতালে মৃত্যু হয়।

প্রতাপ সিং—জেলে মৃত্যু।

সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—[মজিলপুর] দেউলী বন্দি নিবাসে মৃত্যু।

ভোলানাথ চ্যাটার্জি—পুনা জেলে আত্মহত্যা করেন।

জিতেন মল্লিক—(মধ্যপাড়া) লক্ষ্ণৌ জেলে মৃত্যু।

সুনীল চক্রবর্তী—চন্দ্রহার (বরিশাল) রাজসাহী জেলে মৃত্যু।

হর্ষ (মতি) চ্যাটার্জ্জি—পলাতক অবস্থায় বসন্ত রোগীর সেবা করার সময় কলিকাতায় মৃত্যু।

চণ্ডী নাগ—পলাতক অবস্থায় মৃত্যু।

রেবতী নাগ—পলাতক অবস্থায় মৃত্যু।

জিতেন সমাদ্দার—মইষাণী বরিশাল, অন্তরীণ অবস্থায় মৃত্যু।

সুধীর কুমার সরকার—বরিশাল অন্তরীণ অবস্থায় মৃত্যু হয়।

আজাদ হিন্দ ফৌজ

ও

আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট

বিপ্লবী নেতা ৺রাসবিহারী বসু ১৯১৫ সনে ভারতবর্ষ হইতে পলায়ন করিয়া জাপানে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ১৯২১ সনে জাপানে "স্বাধীন ভারত সঙ্ঘ" (Indian Independence League) স্থাপন করিয়া

ভারতের স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করিতেছিলেন। রাসবিহারী ও স্বামী সত্যানন্দ জাপান ও শ্যামরাজ্যে তাহাদের প্রভাব বিস্তার করিতেছিলেন।

দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে মিত্র শক্তির ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে, বহু ভারতীয় সৈন্য জাপান কর্তৃক বন্দী হয়। ৺রাসবিহারী এই সুযোগ গ্রহণ করেন। তিনি স্বাধীন ভারত সঙ্ঘের সভাপতি ছিলেন। ৺রাসবিহারী, স্বামী সত্যানন্দ পুরী, গিয়ানী প্রিতম সিং প্রভৃতি স্বাধীন ভারত সঙ্ঘের সভ্যগণসহ, ভারতের স্বাধীনতার জন্য বৃটিশের পরাজিত ও বন্দী ভারতীয় সৈন্যদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন। স্বাধীন ভারত সঙ্ঘের স্বাধীনতাকামী দেশ-সেবকগণ বৃটিশের পরাজিত ও বন্দী ভারতীয় সৈন্যদিগকে ইহাই বুঝাইলেন, ইংরাজের জন্য প্রাণ বিসর্জন না দিয়া নিজ দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসর্জন দেওয়াই শ্রেয়ঃ। ভারতীয় সৈন্যগণও দেশপ্রেমিকদিগের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের আত্মসম্বিত ফিরিয়া পাইল, বন্দী ভারতীয় সৈন্যগণ ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

১৯৪২ সনের ১৫ই জুন হইতে ২৩শে জুন পর্যন্ত ব্যাংকে ৮ দিন ব্যাপী স্বাধীন ভারত সঙ্ঘের এক কন্‌ফারেন্স হয়।

এই সম্মেলনীতে শ্যাম, বার্মা, চীন, মালয়, সিঙ্গাপুর, ইন্দোচীন, জাভা, সুমাত্রা, ফিলিপাইন প্রভৃতি স্থান হইতে বহু সংখ্যক ভারতীয় প্রতিনিধি উপস্থিত হন। এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন ৺রাসবিহারী বসু। এই সম্মিলনীর প্রস্তাবক্রমে ৺রাসবিহারী বসু স্বাধীন ভারত সঙ্ঘ ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সভাপতি নির্বাচিত হন। ক্যাপ্টেন মোহন সিং জি, ও, সি, (G. O. C.) নিযুক্ত হন। বৃটিশের পরাজিত ও বন্দী ক্যাপ্টেন মোহন সিং স্বাধীনতার স্বাদ পাইয়া পূর্ণ স্বাধীন হইতে চাহিলেন, তিনি স্বাধীন ভারত সঙ্ঘের নির্দেশ মানিতে রাজী হইলেন না। অতঃপর তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইল এবং নূতন ভাবে সমর পরিষদ গঠন করা হইল। নূতন সমর পরিষদে লেঃ কর্ণেল শা-নওয়াজ, ক্যাপ্টেন সাইগল, ক্যাপ্টেন গুরুবক্স সিং ধীলন আসিলেন। শা-নওয়াজ হইলেন সেনাপতি এবং সাইগল হইলেন সামরিক সেক্রেটারী। ইহা ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৪৩ সনে।

বার্লিনে সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ বাহিনী দ্বারা ভারত অভিযান সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু রাসবিহারীর আজাদ হিন্দ ফৌজ দ্বারা ভারতের মুক্তি অভিযান সম্ভবপর হইয়া উঠিল। দূরদর্শী রাসবিহারী দেখিলেন, সুভাষচন্দ্রের বার্লিনে আসিয়া বেতার প্রচার ছাড়া অন্য কোন কাজ হইতেছে না। সুভাষ বাবু যদি সংঘের পুরোভাগে থাকেন তবে তাহা বিশেষ কার্যকরী হইবে। সুভাষচন্দ্র দুইবার জাতীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, তিনি ভারতের সর্ববাদীসম্মত নেতা, তাহার ডাকে ভারতের জনগণ মাতিয়া উঠিবে। তাই রাসবিহারী জাপান গভর্ণমেণ্টের মারফৎ হিটলারের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন সুভাষচন্দ্রকে জাপানে পাঠাইতে। হিটলার সম্মত হইলেন এবং একখানা বড় ডুবু জাহাজে (Sub-marine) সুভাষচন্দ্রকে জাপানে পাঠাইয়া দিলেন। সুভাষচন্দ্র তিন মাস জলের মধ্যে অবস্থান করিয়া, শত্রু বেষ্টিত ভূমধ্যসাগর, আটলাণ্টিক মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করিয়া ১৯৫৩ সনের ২০শে জুন টোকিও পৌছেন। ২রা জুলাই সুভাষচন্দ্র ও রাসবিহারী টোকিও হইতে সিঙ্গাপুর পৌছেন। রাসবিহারী মনস্থ করিলেন, সুভাষচন্দ্রের উপর নেতৃত্ব ভার অর্পণ করিয়া তাহার সহকর্মীরূপে কাজ করিবেন। রাসবিহারী ৪ঠা জুলাই সিঙ্গাপুর বিশাল জনমণ্ডলীর সম্মুখে ঘোষণা করিলেন, “আজ আমি স্বাধীনভারতসঙ্ঘ ও আজাদ হিন্দ ফৌজ এর নেতৃত্ব ভার আমা হইতে যোগ্যতা ব্যক্তি শ্রীসুভাষ চন্দ্রের উপর অর্পণ করিলাম! আজ হইতে তিনি আমাদের নেতা। আমরা নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করিব।” রাজনীতিক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ত্যাগের এরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। পরদিন ৫ই জুলাই নেতাজী সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ ফৌজের সামরিক অভিবাদন গ্রহণ করেন। তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজকে সময়োচিত সম্বোধন করেন এবং বলেন, আজ হইতে একমাত্র সমর নিনাদ ধ্বনিত হউক ‘দিল্লী চলো—দিল্লী চলো, দিল্লীর লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা উড্ডীয়মান কর।’

১৯৪৩ সনের ২১শে অক্টোবর অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। নেতাজী সুভাষচন্দ্র স্বাধীন ভারত সংঘ, আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক হন। আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের সদস্যগণ :—

১। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, রাষ্ট্রাধিনায়ক, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র ও যুদ্ধমন্ত্রী।

২। ক্যাপ্টেন মিস্ লক্ষ্মী—নারী সংগঠন। (লেঃ কর্ণেল)

৩। মিঃ এস্, এ, আয়েঙ্গার—প্রচার।

৪। লেঃ কঃ এ, সি, চ্যাটার্জি—অর্থ।

৫। লেঃ কঃ আজিজ আমেদ।

৬। লেঃ কঃ এন, এস, ভগৎ।

৭। লেঃ কঃ জে, কে, ভোঁসলে।

(মেঃ জেঃ জগন্নাথ রাও কৃষ্ণ রাও)

৮। লেঃ কঃ গুলজারা সিং।

৯। লেঃ কঃ এম, জেড্, কিয়ানী।

১০। লেঃ কঃ এ, পি, লোকনাথন।

১১। লেঃ কঃ ঈশান কাদ্রি।

১২। লেঃ কঃ সা-নওয়াজ—সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি।

১৩। মিঃ আনন্দমোহন সহায়—সম্পাদক (মন্ত্রীর পদমর্যাদা সম্পন্ন)।

১৪। মঃ করিম গণি।

১৫। শ্রীদেব নাথ দাস।

১৬। মঃ ডি, এম, খান।

১৭। মিঃ এ, ইয়ে লাপ্পা।

১৮। মিঃ আই, থিবি।

১৯। সর্দার ঈশ্বর সিং। (পরামর্শদাতা)

২০। মিঃ এ, এন, সরকার। (আইন বিষয়ক পরামর্শদাতা)

২১। শ্রীরাস বিহারী বসু—সর্বোচ্চ পরামর্শদাতা।

আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার পর নেতাজী সুভাষচন্দ্র স্বাধীন ভারত গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ইহার পর ভারত আক্রমণের আয়োজন পর্ব সুরু হইল। স্বাধীন ভারত সঙ্ঘ সৈন্য সংগ্রহ, অর্থ সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত হইল। আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট ষাট হাজার সৈন্য ও পনের শত অফিসার সংগ্রহ করেন এবং ব্যাঙ্কে গভর্ণমেণ্টের ৮ কোটি টাকা জমা ছিল।

রেঙ্গুনের গণি নামক একজন ধনী মুসলমান ব্যবসায়ী নেতাজী সুভাষ চন্দ্রকে ৬০ লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। সুভাষচন্দ্রের গলার একটি ফুলের মালা ১২ লক্ষ টাকায় বিক্রী হইয়াছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের মধ্যে জাতিভেদ বা বর্ণ-বৈষম্য ছিল না। সেখানে প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতার নাম গন্ধ ছিল না।

১৯৪৪ সনের ১৮ই মার্চ আজাদ হিন্দ ফোজ ভারত-ব্রহ্ম সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ভারতে প্রবেশ করে। লেঃ কঃ সা-নওয়াজ মণিপুরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

অপর দল জাপানী সৈনিকদিগের সহযোগে আরাকান আক্রমণ করেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও রাসবিহারীর সংস্পর্শে আজাদ হিন্দ ফৌজ অপরাজেয় হইয়া উঠিল। মাত্র কয়েক সহস্র আজাদ হিন্দ ফৌজ আরাকান ও আসামের রণাঙ্গণে লক্ষ লক্ষ ইংরাজ আমেরিকান সৈন্যকে পরাজিত করিয়া ভারত ভূমিতে জাতীয় পতাকা উড্ডীন করিয়াছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের বৃটিশ-আমেরিকান সৈন্য বাহিনীর মত উৎকৃষ্ট অস্ত্র-শস্ত্র ছিল না, তাহাদের খাদ্যাভাব ও বস্ত্রাভাব ছিল কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজ যে স্বদেশ-প্রেম ও আত্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া যুদ্ধ করিতেছিল, তাহার নিকট ভাড়াটিয়া সৈনিকের দল দাড়াইতে পারে নাই। স্বদেশপ্রেমের জয় হইয়াছে। তাই ইম্ফালের সমতল ভূমিতে, আরাকানের পাহাড় জঙ্গলে আজাদ হিন্দ ফৌজ দেখাইয়াছে, নিকৃষ্টতম অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া স্বল্পসংখ্যক দেশপ্রেমিক উৎকৃষ্ট অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত বিরাট বাহিনীকেও পরাজয় করিতে পারে। স্বদেশপ্রেমিকের গতি কেহ রুদ্ধ করিতে পারে না। ভারতের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

আজাদ হিন্দ বাহিনীর জয় যখন সুনিশ্চিত তখন প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে। এপ্রিল মাস হইতে প্রবল ঝড় বৃষ্টি সুরু হয়, ফলে যোগাযোগ ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় তাহাদের সরবরাহ বন্ধ হইয়া যায়। আজাদ হিন্দ ফৌজ পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হয়। নেতাজী সুভাষচন্দ্র ২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৫ সন রেঙ্গুন পরিত্যাগ করেন। রাসবিহারী বসু ইহার পূর্বেই অসুস্থতার জন্য

টোকিও চলিয়া যান এবং ২১শে জানুয়ারী ১৯৪৫ সন দেহত্যাগ করেন। অতঃপর ১৬ই আগষ্ট, ১৯৪৫ সন, সুভাষবাবু বিমান যোগে সিঙ্গাপুর হইতে ব্যাঙ্কক যান এবং ব্যাঙ্কক হইতে বিমানযোগে টোকিও রওয়ানা হন। এরূপ জনশ্রুতি পথিমধ্যে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

ভারতের বাহিরে স্বাধীনতার চেষ্টা

(প্রথম মহাযুদ্ধ)

ভারতের বাহিরে ভারতের স্বাধীনতার জন্য যাহারা চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে পাঞ্জাবের লালা হরদয়ালের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হরদয়াল ১৯০৪ সনে ষ্টেট স্কলারশিপ লইয়া অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি একবার দেশে আসিয়াছিলেন এবং পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপত রায়ের বাড়ীতে ছিলেন। ঐ সময় তাহার মনে দেশের স্বাধীনতার আকাঙ্খা জাগিয়া উঠে। তিনি দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে গিয়া আর সরকারী বৃত্তি গ্রহণ করেন নাই। সর্দ্দার অজিত সিং তিন আইনের বন্দী হইতে মুক্তি লাভ করিয়া ইউরোপে চলিয়া যান। সুফী অম্বা প্রসাদ ও ভাই পরমানন্দ ঐ সময় বিদেশে ছিলেন। ১৯০৯।১০ পর্যন্ত যে সব ভারতীয় যুবক পড়াশুনার জন্য ইউরোপ গিয়াছিলেন হরদয়াল তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করেন। ঐ সময় ভারতবর্ষে অনুশীলন সমিতির বৈপ্লবিক কাজ বিশেষ ভাবে চলিতেছিল। হরদয়াল কালিফর্ণিয়া হইতে গদর পত্রিকা বাহির করেন। গদর পত্রিকার নাম অনুসারে তাহার দল "গদর পার্টি" নামে খ্যাত হয়। বিপ্লবী সুরেন্দ্র কর গদর দলের প্রচার কার্যে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন। রাস বিহারীর নেতৃত্বে ১৯১৩।১৫ সনে অনুশীলন সমিতি যখন ভারতে বিপ্লবের আয়োজন করিতেছিলেন ঠিক সেই সময় লালা হরদয়ালের সংবাদ পত্র "গদর" হইতে ভারতের স্বাধীনতার বাণী প্রচার হইতে থাকে। তিনি

বিদেশে অবস্থিত ভারতবাসীকে বিশেষতঃ শিখ পাঞ্জাবীদিগকে, ভারতের স্বাধীনতার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইতে আহ্বান জানান। উত্তেজনাপূর্ণ লেখার জন্য ১৯১৪ সনে ১৪ই মার্চ তিনি গ্রেপ্তার হন এবং জামিনে খালাস হইয়া সুইজারল্যাণ্ড চলিয়া যান।

সুইজারল্যাণ্ডে চম্পকরাম পিলাইর চেষ্টায় ভারতীয়দিগকে লইয়া 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশানেল পার্টি' গঠিত হয়। সেই দলে চম্পকরাম পিলাই, লালা হরদয়াল, রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ, হেরম্বলাল গুপ্ত ধীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারক নাথ দাস, বরকতুল্লাহ প্রভৃতি ছিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় বিপ্লবীদিগকে লইয়া বার্লিন কমিটি গঠিত হয়, জার্মান গভর্ণমেণ্ট এই কমিটিকে স্বীকার করিয়া লন এবং সর্বতোভাবে ভারতের স্বাধীনতার জন্য সাহায্য করিতে প্রস্তুত হন। বার্লিন কমিটি ভারতের বিপ্লবদলের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের জন্য তিন দলে লোক পাঠান। প্রথম দলে ডাঃ যোশী, অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র সেন প্রভৃতি, দ্বিতীয় দলে ডাঃ অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, সতীশচন্দ্র রায়, শাম্ব্‌শিব রাও প্রভৃতি এবং তৃতীয় দলে ডাঃ সুকৃতাঙ্কর, পারঞ্জপে প্রভৃতি ছিলেন। জার্মান গভর্ণমেণ্ট পাথেয় এবং অন্যান্য খরচের জন্য প্রত্যেককে ১৮৭১ অব্দের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার চিত্র সম্বলিত যথেষ্ট স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া দেন। তাহারা সুইজারল্যাণ্ড হইয়া ইটালীর জেনোয়া বন্দর হইতে বিভিন্ন লাইনের ষ্টিমার ধরিয়া ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯১২ সনে অনুশীলন সমিতির পক্ষ হইতে কেদারেশ্বর গুহকে জার্মানীতে পাঠান হইয়াছিল, তিনি ১৯১৪ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে আমেরিকা চলিয়া যান। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর, ১৯১৪ সনের অক্টোবর মাসে, বার্লিন হইতে ধীরেন্দ্র নাথ সরকার কেদারবাবুর নিকট যাইয়া অনুশীলন সমিতির সহিত যোগাযোগ স্থাপনের জন্য তাহাকে বাংলাদেশে পাঠাইয়া দেন। তিনি দেশে আসার খরচের টাকাও কেদার বাবুকে দেন। কেদার বাবুও দেশে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি ট্যাঁস ফিরিঙ্গি বেশে কলিকাতা ছিলেন এবং অনুশীলন সমিতির নেতৃস্থানীয় অনুকূল চক্রবর্তীর মারফৎ কাশীতে শ্রীরাসবিহারী বসুর সহিত দেখা করিতে সমর্থ হন।

ঐ সময় জার্মানীতে যে সব ভারতীয় ছাত্র ছিল তাহাদের সকলেই ভারতের স্বাধীনতার জন্য কাজ করিতে থাকেন। কেহ কেহ প্রচার কার্যে নিযুক্ত হন, কেহ বা বিস্ফোরক কারখানায় ভর্তি হইয়া কাজ শিখিতে থাকেন, আবার যাহারা আরবী পার্শী ভাষা জানিতেন তাঁহারা মধ্য প্রাচ্যের মুসলমান বন্দীদিগকে দলে টানিবার জন্য বিভিন্ন বন্দী শিবিরে যাইয়া ইংরাজ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রচার করিতে লাগিলেন। সুফী আম্বাপ্রসাদ ও সর্দ্দার অজিত সিং পারস্যে ও কাবুলে থাকিয়া কাজ করিতে ছিলেন ১৯১৫ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের নেতৃত্বে সুফী অম্বাপ্রসাদ ও সর্দ্দার অজিত সিংকে লইয়া কাবুলের একটি অস্থায়ী স্বাধীন ভারত গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহারা স্থির বরেন, ১৯শে ফেব্রুয়ারী, যে দিন রাসবিহারী বসু ভারতে স্বাধীনতা ঘোষণা করিবেন সেই দিন রাজা মহেন্দ্র প্রতাপও তাহার দল বল লইয়া ভারত আক্রমণ করিবেন। ভারতে রাসবিহারীর চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় এবং যুদ্ধে জার্মান গভর্ণমেন্টের বিপর্যয় ঘটায় সব পণ্ড হইয়া যায়।

ভারতের বাহিরে যাহারা স্বাধীনতার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে ছিলেন—

শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মা (রাজপুতানা)।
ম্যাডাম ভিকাজী কামা (বোম্বে)।
লালা হরদয়াল (পাঞ্জাব)।
সর্দার অজিত সিং (পাঞ্জাব)।
রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ (মথুরা ইউ, পি)।
ডা: ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, কলিকাতা)।
তারকনাথ দাস (যশোহর)।
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (বিক্রমপুর ঢাকা)।
হেরম্ব লাল গুপ্ত (যশোহর)।
রামচন্দ্র (পাঞ্জাব)।
চম্পকরাম পিলাই (মাদ্রাজ) (ত্রিবাঙ্কুর)।
বিনায়ক দমোদর (সাভারকার) (নাসিক) (মহারাষ্ট্র)।
বরকতুল্লাহ (যুক্তপ্রদেশ)।

সুফী অম্বাপ্রসাদ (কাবুল জেলে মৃত্যু)।
ওবেদুল্লাহ (সিন্ধী) (যুক্তপ্রদেশ)।
ধীরেন্দ্রনাথ সরকার (অধ্যাপক বিনয় সরকারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা)।
অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য (চুনটা) (ত্রিপুরা)।
নরেন্দ্র ভট্টাচার্য (এম, এন, রায়) (২৪ পরগনা)।
ভগবান সিং (পাঞ্জাব)।
ডাঃ বিষ্ণু সুকতাঙ্কর (মহারাষ্ট্র)।
মারাঠে (মহারাষ্ট্র)।
খানচাঁদ বর্মা (যুক্তপ্রদেশ)।
শিবপ্রসাদ গুপ্ত (যুক্তপ্রদেশ)।
জাফরালী খাঁ (যুক্তপ্রদেশ)।
ডাঃ হাফিজ (যুক্তপ্রদেশ)।
ডাঃ মনসুর আহাম্মদ (যুক্তপ্রদেশ)।
মির্জ্জা আব্বাস (বিহার)
আবদুল ওয়াহেদ (বিহার)।
সর্দ্দার সিংজী রানা (কাথিবাওয়ার)।
চঞ্চয়া (মাদ্রাজ)।
পাণ্ডুরং কান্‌কোজী (বোম্বে)।
হোরমনজী (ফারশাফ) (বোম্বে)।
নন্দরকার (বোম্বে)।
হৃষীকেশ লট্টো (পাঞ্জাব)।
সর্দ্দার ওমরাও সিং (পাঞ্জাব)।
গোপাল পরাঞ্জপে
শাম্ব শিবরাও (অন্ধ্রপ্রদেশ)।
ডাঃ যোশী
সি, পদ্মনাভম পিলাই (মাদ্রাজ)।
সিদ্দিক
অধর লস্কর (বাংলা ২৪ পরগণা)।
খগেন্দ্রচন্দ্র দাস (বাংলা)।

প্রমথ দত্ত (বাংলা) ।

বীরেন দাশগুপ্ত ।

রাসবিহারী বসু (চন্দন নগর) ।

ধনগোপাল মুখার্জি (কলিকাতা) ।

শৈলেন ঘোষ—এম, এস, সি,—কুড়িগ্রাম (নড়াইল থানা যশোহর) ।

অবনী মুখার্জি (খুলনা) ।

চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী ।

হেমেন্দ্র রক্ষিত (ঢাকা) ।

সুরেন কর (যোগপাট্টা) (ফরিদপুর) ।

নলিনী গুপ্ত মাহিলারা (বরিশাল) ।

ডাঃ সুধীন্দ্র বসু (ঢাকা) ।

বাসুদেব ভট্টাচার্য (২৪ পরগণা) ।

সত্যেন সেন (যশোহর) ।

জিতেন্দ্র নাথ লাহিড়ী (শ্রীরামপুর) ।

ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত (বরিশাল) ।

অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র সেন ।

সতীশচন্দ্র রায় ।

বাংলা দেশে

যাহারা নানাভাবে বিপ্লবীদলকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন :—

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ—ব্যারিষ্টার, কলিকাতা ।

মি: বি. সি. চ্যাটার্জি—ব্যারিষ্টার, কলিকাতা ।

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত—ব্যারিষ্টার চট্টগ্রাম ।

বীরেন্দ্রনাথ শাসমল—ব্যারিষ্টার, মেদিনীপুর ।

শরৎচন্দ্র বসু—ব্যারিষ্টার, কলিকাতা ।

কিরণশঙ্কর রায়—ব্যারিষ্টার, জমিদার, তেওতা, ঢাকা ।

নিশীথচন্দ্র সেন—ব্যারিষ্টার, কলিকাতা ।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়—কলিকাতা।

প্রোঃ নৃপেন্দ্রচন্দ্র বানার্জি—বিক্রমপুর, ঢাকা।

ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, উকিল—বিক্রমপুর, ঢাকা।

আশ্রয়-কেন্দ্র

বিপ্লব-যুগে, পরাধীন ভারতে যে সব দেশপ্রেমিক নিশ্চয় বিপদ জানিয়া পলাতক বিপ্লবীদিগকে আশ্রয় দিয়াছেন, অস্ত্রশস্ত্র, লুণ্ঠিত দ্রব্য নিরাপদে রক্ষ করিয়াছেন, আজ স্বাধীন পাক-ভারতে সেই সব তীর্থক্ষেত্র-স্বরূপ আশ্রয়-কেন্দ্রগুলির বিবরণ দিতেছি।

সোনারং জাতীয় বিদ্যালয়

(১)

ঢাকা জিলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত সোনারং গ্রামে শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেন, এম. এ.-র বাড়ী। তিনি অনুশীলন সমিতির নেতৃস্থানীয় ছিলেন। মাখনবাবু নিজ গ্রামে একটি জাতীয় বিদ্যালয় (উচ্চ ইংরাজী) স্থাপন করিাছিলেন। সমিতিগুলি বে-আইনী ঘোষণা ও ঢাকার সমিতির বোর্ডিং ভাঙ্গিয়া দেওয়ার পর অনুশীলন সমিতির বাড়ীঘর ছাড়া পলাতক সভ্যদের ঘোর দুর্দিন উপস্থিত হইল। মাখনবাবু সেই সময় তাহার জাতীয় বিদ্যালয়টি সমিতির হাতে ছাড়িয়া দেন। পলাতক সভ্যরা নাম পরিবর্তন করিয়া সোনারং জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। ঢাকার কেন্দ্র সোনারং-এ স্থানান্তরিত হইল।

স্কুলের সঙ্গেই বোর্ডিং ছিল, সেখানে শিক্ষকগণ এবং পলাতক বিপ্লবীরা থাকিতেন। উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদের বাড়ীতে অস্ত্র-শস্ত্র ও লুণ্ঠিত দ্রব্য থাকিত। মাখনবাবুর প্রভাবে এবং শিক্ষকদের ব্যবহারে সোনারং গ্রামের প্রায় সকলেই অনুশীলন সমিতির প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। পলাতক বিপ্লবীরা রাত্রে তাহাদের বাড়ীতে শয়ন করিতেন। পুলিশের দৃষ্টিও এই স্কুলের উপর পড়িয়াছিল, সময় সময় পুলিশের দল সদলবলে সেখানে উপস্থিত হইত, কিন্তু আপত্তিকর কিছুই পাওয়া যাইত না। এই স্কুলে রমেশ চন্দ্র আচার্য, রবীন্দ্র

মোহন সেন, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, যোগেন্দ্র চক্রবর্তী, দিগিন্দ্র মুখুটী প্রভৃতি স্থায়ী শিক্ষক ছিলেন। বীরেন্দ্র চ্যাটার্জি এবং ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী সময় সময় নৌকার মাঝির বেশ পরিবর্তন করিয়া এই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ করিতেন। পুলিশ অবশেষে একটি মিথ্যা মামলা সাজাইয়া শিক্ষকদিগকে গ্রেপ্তার করে, ফলে সোনারাং জাতীয় বিদ্যালয় উঠিয়া যায়।

ধোপড়াপাশা

(২)

ঢাকা জিলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত ধোপড়াপাশা গ্রামে কালীপদ ব্যানার্জির বাড়ী। তিনি একজন সম্ভ্রান্ত তালুকদার। এই বাড়ী অনুশীলন সমিতির পলাতক বিপ্লবীদের একটি আশ্রয়-কেন্দ্র ছিল। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণের ফটো স্থাপিত আছে এবং প্রত্যেক বৎসর উৎসব হয়। পলাতক বিপ্লবীরা মাঝে মাঝে সেখানে থাকিতেন। কালীপদবাবু অনুশীলন সমিতির গৃহী সভ্য ছিলেন।

কমলা

(৩)

ঢাকা জিলার বিক্রমপুরে অন্তর্গত কমলার প্রসিদ্ধ জমিদার বাড়ী অনুশীলন সমিতির একটি আশ্রয়-কেন্দ্র ছিল। এই বাড়ীর যোগেন্দ্র দাসগুপ্ত (যোগা ভুইঞা) অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন এবং বৈপ্লবিক কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহন করিয়াছিলেন।

মাণিকগঞ্জ

(৪)

ঢাকা জিলার মাণিকগঞ্জের প্রসিদ্ধ মোক্তার রজনীকান্ত বসাক-এর বাড়ী অনুশীলন সমিতির একটি আড্ডা ছিল। রজনীবাবুর বাসায় ৫০।৬০টি স্কুলের ছাত্র থাকিত এবং ছাত্রদের খোরাকীর ব্যয়ভার রজনীবাবু বহন

করিতেন। রজনীবাবুর জন্য আলাদা রান্না হইত না, তিনি সকলের সহিত একত্র বসিয়া ভোজন করিতেন। এই ছাত্রদের মধ্যে অনুশীলন সমিতির প্রসিদ্ধ কর্মী অমৃত সরকার, প্রকাশ চৌধুরীও ছিলেন। রজনীবাবু অনুশীলন সমিতির সহানুভূতিশীল সভ্য ছিলেন। পলাতক বিপ্লবীরা সময় সময় এখানে থাকিতেন। এই বাড়ীর উপর পুলিশেরও নজর ছিল। একদিন রাত্রি ১টার সময় ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী এবং বীরেন চ্যাটার্জি রজনীবাবুর বাসায় উপস্থিত হইয়া তিনি যে গৃহে শয়ন করেন সেই গৃহের দরজায় আস্তে আস্তে ধাক্কা দিলেন। তাহারা উভয়েই পলাতক আসামী ছিলেন তাহাদের নামে পুরস্কার ঘোষনা ছিল। রজনীবাবু দরজা খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, খাওয়া দাওয়া হইয়াছে কি? তাহারা বলিলেন, আমাদের খাওয়া হয় নাই, এত রাত্রে খাওয়ার প্রয়োজন নাই, আমরা এখন শুইয়া পড়িব। রজনীবাবু তাহাদের কথা শুনিলেন না, তিনি ভাড়ার ঘর হইতে, কেহ টের না পায় এরূপভাবে চাউল, ডাইল লইয়া আসিলেন এবং শয়ন-গৃহেই ষ্টোভে খিচুড়ী রান্না বসাইয়া দিলেন। সব কাজ গোপনেই করিতে হইল, কারণ এত রাত্রে হৈ চৈ হইলে পুলিশের নিকট সংবাদ পৌছিবে এবং পুলিশ বাড়ী ঘেরাও করিবে। রজনীবাবু ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া খিচুড়ী রান্না করিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইলেন। আহারান্তে তাহারা রজনীবাবুর বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। ঢাকেশ্বরী কটন মিল রজনীবাবুর অবদান।

গড়পারা

(৫)

মাণিকগঞ্জের অন্তর্গত গড়পারা গ্রামে অশ্বিনী ঘোষের বাড়ী। অশ্বিনী ঘোষ জমিদার-পুত্র, তিনি অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন। তাঁহাদের বাড়ীতে একটি এম. ই. স্কুল ছিল। অনুশীলন সমিতির পলাতক সভ্যরা নাম পরিবর্তন করিয়া এই স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহা অনুশীলন সমিতির একটি গুপ্ত কেন্দ্র ছিল। ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী পলাতক অবস্থায় কিছুকাল এই স্কুলের শিক্ষকতার কাজ করিয়াছিলেন।

নারায়ণগঞ্জ

(৬)

নারায়ণগঞ্জে শ্রীঅশ্বিনী ঘোষাল মোক্তাবের বাসা অনুশীলন সমিতির পলাতক বিপ্লবীদের একটি আড্ডা ছিল। বিভিন্ন স্থানে যাতায়াতেব সময় পলাতক বিপ্লবীরা এখানে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন।

নারান্দিয়া আশ্রয়-কেন্দ্র

(৭)

ঢাকা সহরের নারান্দিয়া সোনারগাঁব জমিদার শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সেনের বাড়ী। প্রভাতবাবুর পুত্র শ্রীনরেন্দ্রমোহন সেন অনুশীলন সমিতির নেতৃস্থানীয় ছিলেন। এই বাড়ী অনুশীলন সমিতির পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয়কেন্দ্র ছিল। এই বাড়ীতে পলাতক বিপ্লবীরা গোপনে আসিয়া আহার করিত। নরেনবাবুর মা জগৎতারা গুপ্তা ও বোন বিরাজমোহিনী গুপ্তা তাঁহাদিগকে যত্নের সহিত খাওয়াইতেন। পুলিশ এই বাড়ীতে বহুবার খানাতল্লাসি করিয়াছে। এই বাড়ীব প্রায় সকলেই অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন।

ঢাকা পাতলাখাঁর গলি

(৮)

ঢাকার প্রসিদ্ধ উকিল ও জননায়ক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন এবং তাঁহার বাসা বিপ্লবীদেব একটি আড্ডা ছিল। বিপ্লবযুগে সাধারণতঃ কোন উকিল ভয়ে রাজনৈতিক মামলা গ্রহণ করিতে সাহস পাইতেন না, ঐ সময় শ্রীশবাবু প্রায় সকল মামলায়ই আসামী পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। শ্রীশবাবুর স্ত্রী এবং পুত্র কন্যাগণ সকলেই অনুশীলন সমিতির সহায়ক ছিলেন। শ্রীশবাবুর স্ত্রী শ্রীযুক্তা জগৎলক্ষ্মী দেবী পলাতক বিপ্লবীদিগকে নিজ পুত্রের ন্যায় আদর যত্ন করিয়া খাওয়াইতেন। এই বাড়ীর উপর পুলিশের তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল, পুলিশ বহুবার এইবাড়ী খানাতল্লাস করিয়াছে। ভারত বিভাগের পর শ্রীশবাবু পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলের নেতা ছিলেন।

ঢাকা সুত্রাপুরের আশ্রয়-কেন্দ্র

(৯)

ঢাকা সুত্রাপুরে শ্রীযুক্ত প্রতুল গাঙ্গুলী ও প্রতুলবাবুর ভগ্নিপতি শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ব্যানার্জি উকিল-এর পাশাপাশি দুই খানা বাসা ছিল। এই দুই বাসায় অনুশীলন সমিতির আড্ডা ছিল। মনোরঞ্জনবাবু অনুশীলন সমিতির সহায়ক ছিলেন। এই বাসার উপর পুলিশের নজর ছিল। একবার প্রতুল বাবু পলাতক অবস্থায় বাসায় ছিলেন, পুলিশ সংবাদ পাইয়া বাসা ঘেরাও করিল। প্রতুলবাবুর দুই বোন এবং মা পুলিশকে বাধা দিলেন, প্রতুলবাবু পেছনের দেওয়াল টপ্‌কাইয়া পলায়ন করিলেন। পুলিশের দল অবশেষে বাড়ী দখল করিয়া দেখেন প্রতুলবাবু নাই। এই বাড়ীতে সময় সময় পলাতক বিপ্লবীরা আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, প্রতুলবাবুর মা শ্রীযুক্তা বগলা সুন্দরী দেবী ও বোন আকিঞ্চন এবং অমিয় ভাগিনী লতিকা সর্বদা পাহারা দিতেন, পুলিশের আভাষ পাইলে পেছনের দেওয়াল টপ্‌কাইয়া পলায়ন করার সহায়তা করিতেন। পলাতক বিপ্লবীদিগকে তাঁহারা খুব আদর যত্ন করিয়া খাওয়াইতেন।

জনিদপুর

(১০)

ময়মনসিং জিলার বাজিতপুর থানার অন্তর্গত জনিদপুর একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। এই গ্রামের চারিদিকে বিস্তীর্ণ মাঠ। স্থানটি স্বাস্থ্যকর। এখানে মাছ, দুধ খুব সস্তা। এই গ্রামে শ্রীগোবিন্দচন্দ্র রায়, গগন চন্দ্র রায়, দীনেশ চন্দ্র রায় এবং শ্রীনাথ রায়-এর বাড়ী। একই পরিবারের এই চারিটি বাড়ী পাশাপাশি অবস্থিত। তাঁহারা তালুকদার এবং গ্রামের মালিক। গোবিন্দ বাবু, গগনবাবু দীনেশবাবু ও শ্রীনাথবাবু অনুশীলন সমিতির গৃহী সভ্য ছিলেন। এই গ্রামটি অনুশীলন সমিতির পলাতক বিপ্লবী, যাহাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়াছে তাহাদের "স্বাস্থ্য-নিবাস" স্বরূপ ছিল। কাহারও অসুখ হইলে বায়ু পরিবর্তনের জন্য জনিদপুর পাঠান হইত। গোবিন্দবাবুর বাড়ীর অবস্থা যেমন স্বচ্ছল ছিল, মনও ছিল উদার। এখানে প্রচুর খাওয়ার খুব সুনাম ছিল।

এখানে ডাকাতির বড় ঘাসি নৌকা জলে ডুবাইয়া রাখা হইত। পুলিশ বিপ্লবীদের সন্ধানে এই গ্রামে আসে কিনা দেখার জন্য গোবিন্দ বাবু গ্রামের চৌকিদারকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আমার পলাতক অবস্থায় একবার জনিদপুর গিয়াছিলাম। গোবিন্দবাবুর দুই পুত্র অজিত রায় ও শিশির রায় বিপ্লব দলে যোগ দিয়াছিল এবং কিছুকাল বিনা বিচারে জেলে আটক ছিল।

সান্ধীকোনা

(১১)

ময়মনসিংহ জিলার সান্ধীকোনা গ্রামে শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার উকিলের বাড়ী। ইনি ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার উকিলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। এই বাড়ী অনুশীলন সমিতির পলাতক বিপ্লবীদের একটি আড্ডা ছিল। এই পরিবারের এবং গ্রামের অনেকেই অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন। ১৯২৪ সনে জ্যৈষ্ঠ মাসে পলাতক বিপ্লবীদের একটি গুপ্ত বৈঠক এই বাড়ীতে হইয়াছিল। এই বৈঠকে বিভিন্ন স্থানের প্রায় ২০।২৫ জন নেতৃস্থানীয় লোক উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, নরেন্দ্রমোহন সেন, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, অমূল্য অধিকারী, প্রতুলচন্দ্র ভট্টাচার্য, প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। পলাতক বিপ্লবী নেতারা তিন দিন সেখানে ছিলেন। হেমন্তবাবু খাবার প্রচুর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সভার কাজ যখন চলিতেছিল তখন আই, বি, পুলিশ হেমন্তবাবুর নিকট অনুসন্ধান করিয়াছিল, পলাতক বিপ্লবীরা এখানে আসিয়াছে কিনা? হেমন্তবাবু বিস্ময়ের ভান করিয়া পুলিশকে জানাইলেন, না এখানে তো কেহ আসে নাই। পলিশের খবর ল, বিপ্লবীরা একত্র হইবে।

কুমিল্লা

(১২)

কুমিল্লা সহরে রমেশ ব্যানার্জির বাসা অনুশীলন সমিতির পলাতক বিপ্লবীদের আড্ডা ছিল। রমেশবাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডাঃ অ.বনাশচন্দ্র ব্যা নার্জি

অনুশীলন সমিতির সহায়ক ছিলেন। উদয়পুর পাহাড়ের শিক্ষাকেন্দ্রে যাতায়াতের সময় বিপ্লবীরা এখানে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। রমেশবাবু ৭ বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছিলেন। ১৯২৯ সনে কুমিল্লা সাম্প্রদায়িক, দাঙ্গার সময় ৩ ৪শ' গুণ্ডা তাঁহাদের পাড়া আক্রমণ করে। রমেশবাবু একা একটি বড় লাঠি লইয়া আক্রমণকারীদের উপর এরূপ প্রবল বেগে পাল্টা আক্রমণ করেন যে তাহারা পিছনে হটিয়া যায় কিন্তু এত লোকের সহিত একা অধিকক্ষণ সংগ্রাম করা সম্ভব হয় নাই, অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়েন এবং সেখানে নিহত হন।

নোয়াখালী

(১৩)

নোয়াখালী সহরে খগেন্দ্র কাহালীর বাসা ছিল। তিনি এবং নিশিবাবু ভুলুয়া রাজ-কাছারীতে চাকুরী করিতেন। খগেনবাবুর বাসা অনুশীলন সমিতির পলাতক বিপ্লবীদের আড্ডা ছিল। নিশিবাবুর বাসায় অস্ত্র-শস্ত্র থাকিত।

দেওপাড়া—ঠাকুরবাড়ী

(১৪)

নোয়াখালী জিলার প্রসিদ্ধ দেওপাড়া-ঠাকুরবাড়ী অনুশীলন সমিতির একটি আড্ডা ছিল। এই বাড়ীর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চক্রবর্তী অনুশীলন সমিতির গৃহী সভ্য ছিলেন। এখানে একটি সংস্কৃত টোল ছিল, এই বাড়ীতে কয়েকজন বড় বড় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহাদের তালুকদারী ছিল, বাড়ীতে হাতী ছিল, বড় বাড়ী, দালান কোঠা, দীঘি সবই ছিল। তাঁহারা খুব সম্মানী ব্রাহ্মণ। এখানে অস্ত্র-শস্ত্র লুণ্ঠিত দ্রব্য থাকিত এবং সময় সময় পলাতক বিপ্লবী থাকিতেন।

বাবুপুর

(১৫)

নোয়াখালী জিলার বাবুপুর গ্রামে শ্রী সারদাচরণ গুহ থাকিতেন। সারদাবাবু অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন। এখানে অস্ত্র-শস্ত্র ও সময় সময় পলাতক বিপ্লবী নেতা থাকিতেন।

নাটোর

(১৬)

রাজসাহী জিলার নাটোর সহরে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তী উকিলের বাসা। শ্রীশবাবু অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন। তাঁহার বাসা বিপ্লবীদলের একটি আড্ডা ছিল। এই বাসায় ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী পলাতক অবস্থায় বিরজাবাবু নামে থাকিতেন। ঐ সময় উত্তর বঙ্গে বিপ্লবীদলের কেন্দ্র এই বাসায় ছিল। নাটোরের প্রসিদ্ধ ধনী চন্দ্র প্রামাণিকের পুত্র রমণী প্রামাণিক, পাচু ঠাকুর, রমেশ দত্ত, নরেন্দ্র ভট্টাচার্য অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন। পুঠিয়া রাজবাড়ীর নকুল সরস্বতী অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন।

পাটুল হাঁপানীয়া

(১৭)

নাটোরের নিকট পাটুল হাঁপানীয়া গ্রামে শ্রীযুক্ত কালী মৈত্র (হরেন্দ্র মৈত্র) মহাশয়ের বাড়ী। তিনি অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন। তাঁহাদের বাড়ী পলাতক বিপ্লবীদের আড্ডা ছিল। এই গ্রামে একটি এম, ই, স্কুল ছিল। শ্রীযুক্ত মদনমোহন ভৌমিক পলাতক অবস্থায় কিছুদিন এই স্কুলে শিক্ষকতার কাজ করিয়াছেন। কলিকাতা মুসলমানপাড়ায় ডেপুটি সুপারেন্টেণ্ডেণ্ট এর বাসায় বোমা নিক্ষেপের সময় কালীবাবু অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনি বোমার গুলিতে আহত হইয়াছিলেন।

বিলাসখান জাতীয় শিক্ষাশ্রম

(১৮)

ফরিদপুর জিলার বিলাসখান গ্রামে শ্রীআশুতোষ কাহালী, জীবন ঠাকুরতা, রাইহরণ সেন, হারাণ রক্ষিত ১৯২১ সনে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে একটি জাতীয় বিদ্যালয় ছিল, তাঁত চরকা ছিল, পাঠাগার ও দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল। এই জাতীয় শিক্ষাশ্রম অনুশীলন সমিতির একটি আশ্রয়-কেন্দ্র ছিল। পলাতক বিপ্লবীরা মাঝে মাঝে এখানে থাকিতেন। অনুশীলন সমিতির ফেরারী বিপ্লবী ভূপেন মজুমদারের (নোয়াখালী) এখানে মৃত্যু হয়।

ফরাসী চন্দননগর

চন্দননগরের প্রবর্তক সংঘ অনুশীলন সমিতির প্রধান আশ্রয়-কেন্দ্র ছিল। শ্রীঅরবিন্দের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হওয়ার পর তিনি চন্দননগর শ্রীমতিলাল রায়ের বাড়ীতে কিছুদিন গোপনে ছিলেন। অনুশীলন সমিতির প্রধান পলাতক বিপ্লবীরা মাঝে মাঝে মতিবাবুর আশ্রমে থাকিতেন এবং মতিবাবুর সহ-ধর্মিণী রাধারাণী দেবী সকল বিপ্লবীদিগকে খুব আদর ও যত্ন করিয়া খাওয়াইতেন। এখানে অনুশীলন সমিতির বোমার কারখানা ছিল। শ্রীমণীন্দ্র নায়েবের তত্বাবধানে বোমা তৈয়ার হইত। চন্দননগরে প্রধান বিপ্লবীদের মধ্যে ছিলেন, শ্রীমতি লাল রায়, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, রাসবিহারী বসু, শ্রীমণীন্দ্র নায়েক, শ্রীঅরুণ দত্ত, (প্রবর্তক সংঘের বর্ত্তমান প্রেসিডেন্ট) কোচেন দত্ত, পূর্ণচন্দ্র দে, বলাই চন্দ্র দে।

দুর্গামণি পাইন

নিশি পাইনের মা দুর্গামণি পাইন। বাড়ী ছবিপুর, জিলা বরিশাল। বিপ্লব যুগে পলাতক বিপ্লবীরা পুলিশের সন্দেহ এড়ানের জন্য তাঁহাদের ভাড়াটিয়া বাসায় কাহারও বৃদ্ধা মা বা বোনকে রাখিত। ঐ যুগে পুলিশের ভয়ে বাড়ীওয়ালা কোন অপরিচিত যুবকের নিকট বাড়ী ভাড়া দিত না। নিশিকান্ত পাইন অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন। তাঁহার মাকে ১৯১৬ সনে ঢাকা আসক জমাদার লেন-এর এক বাসায় পলাতক বিপ্লবীদের আড্ডায় রাখা হইল। নিশি পাইনের মা সকলকে নিজ পুত্রের মত দেখিতেন। একদিন ঐ বাসা ঘেরাও করিয়া পলাতক বিপ্লবী অতুল দত্ত, মথুর চক্রবর্তী ও সুধীর মজুমদারকে গ্রেপ্তার করে। নিশি পাইনের মাকে পুলিশ অনেক উৎপীড়ন করে কিন্তু তিনি নিজের পরিচয়ও দেন নাই। পুলিশ তাঁহাকে ঐ বাড়ীতে আবদ্ধ রাখে। তিনিও একদিন রাত্রে সুযোগ বুঝিয়া পলায়ন করেন। অবশেষে তিনি নিজ বাড়ীতে যান। তিনি গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন এই অপবাদে গ্রামবাসীর নিকট তাঁহার অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছিল।

অনুশীলন সমিতির বিশিষ্ট সভ্য

ভারতের বিপ্লব আন্দোলনে যোগদান করিয়া বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন দলের কয়েক সহস্র নির্ভীক যুবক নানা ভাবে অত্যাচার নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন, সুদীর্ঘ কাল কারাবাসে কাটাইয়াছেন। সকলের নাম সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় নাই, যাহাদের নাম সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাঁহাদের বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

অনুশীলন সমিতি—জিলা ঢাকা

প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, চুড়াইন—জেল ২৮ বৎসর, ৮০ দিন অনশন ১৪ মাস পলাতক।

রমেশচন্দ্র আচার্য, বানরী—জেল ২৭ বৎসর, ২৬ দিন অনশন, ১০ মাস পলাতক।

রবীন্দ্রমোহন সেন, বজ্রযোগিনী—জেল ২৭ বৎসর, ১২০ দিন অনশন, ১৮ মাস পলাতক।

যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জি, গাউদিয়া—জেল ২৪ বৎসর, ১৫০ দিন অনশন, ২৮ মাস পলাতক।

গোবিন্দ কর, কায়েতপাড়া—জেল ২২ বৎসর, ২৪ দিন অনশন, ৮০ মাস পলাতক।

তরণী সোম, টাউন—জেল ২২ বৎসর।

সতীশচন্দ্র পাকড়াশী, মাধবদী—জেল ২১ বৎসর, ১৮ দিন অনশন, ২৪ মাস পলাতক।

মদনমোহন ভৌমিক, ডুমনী—জেল ১৬ বৎসর, ২৪ দিন অনশন, ৩৮ মাস পলাতক।

নরেন্দ্রমোহন সেন, আমিনপুর—জেল ১৫ বৎসর, ২২ দিন অনশন, ৪২ মাস পলাতক।

অমৃত হাজরা, দো-গাছি—জেল ১৫ বৎসর, ৬০ মাস পলাতক।

চিরঞ্জীব মিশ্র, একরামপুর—জেল ১৫ বৎসর, ২২ দিন অনশন, ১২ মাস পলাতক।

স্বদেশ নাগ, শুভাঢ্যা—জেল ১১ বৎসর। জেলে অনশন, দুইবারে ২১ দিন।

পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত, ফেগুণাসার—জেল ১৪ বৎসর, ২৪ দিন অনশন।

চারুচন্দ্র রায়, দক্ষিণ মৈশুণ্ডী—জেল ১৪ বৎসর, ১০দিন অনশন।

খগেন্দ্র চৌধুরী, মাণিকগঞ্জ—জেল ১৩ বৎসর, ২৮ মাস পলাতক।

সুশীলচন্দ্র ঘোষ, টিকাটুলী—জেল ১৩ বৎসর, ১৮ দিন অনশন। ১২ মাস পলাতক।

হীরেন্দ্র মজুমদার (জুমু), একরামপুর—জেল ১২ বৎসর, ১২ দিন অনশন।

দুর্গেশ ভট্টাচার্য, দক্ষিণ মৈশুণ্ডী—জেল ১২ বৎসর, ২২ দিন অনশন, ১৩ মাস পলাতক।

বীরেন্দ্র গাঙ্গুলী, হেমেন্দ্র দাস রোড—জেল ১২ বৎসর।

সরল সেন, টাউন—জেল ১২ বৎসর।

মাখনলাল দত্ত, ঠাটারী বাজার—জেল ১২ বৎসর।

স্বদেশ ধর—জেল ১০ বৎসর।

রবীন্দ্র ধর—১০ বৎসর, পলাতক ১২ মাস।

আশুতোষ দাশগুপ্ত, গাড়ুর গাঁ—জেল ১১ বৎসর।

বিজয়কৃষ্ণ ব্যানার্জি, দিঘলী—জেল ১১ বৎসর; ৭ মাস পলাতক।

তারাপ্রসাদ চক্রবর্তী, বনগ্রাম—জেল ১২ বৎসর।

নলিনীকান্ত ঘোষ, ঝাউগাড়া—জেল ১০ বৎসর, ১৪ দিন অনশন, ৪৬ মাস পলাতক।

নলিনীকিশোর গুহ, বজ্রযোগিনী—জেল ১০ বৎসর।

আদিত্য দত্ত, বরুণা—জেল ১০ বৎসর, ৩৬ মাস পলাতক।

অধীর মুখার্জি, বেজগাঁও—জেল ১০ বৎসর, ২৯ দিন অনশন।

সতীশচন্দ্র রায়, সাটির পাড়া—জেল ১০ বৎসর।

ধনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, ঢাকা টাউন—জেল ১০ বৎসর, পলাতক ২ বৎসর।

বিনোদ চক্রবর্তী, সুভাঢ্যা—জেল ১০ বৎসর।

সুধীর কুশারী, ফরিদাবাদ—জেল ১০ বৎসর।

অন্যান্য যাহারা জেলে ছিলেন

অনাথবন্ধু চক্রবর্তী—সুভাড্যা, নীরদ দত্ত—সুভাড্যা, তারাপ্রসন্ন দে—লাঙ্গুরচর, সুবোধ নাগ—বারদী, সীতানাথ দাস—নারায়ণগঞ্জ, লাল মোহন দে—মধ্যপাড়া, যোগেন্দ্র ভট্টাচার্য—মধ্যপাড়া, মাখনলাল সেন—সোনারং, ডাঃ গুরুগোবিন্দ মজুমদার—কোণ্ডা, যতীন্দ্র চক্রবর্তী—শেখর নগর, ডাঃ প্রফুল্ল দত্ত—সেচর, ধীরেন্দ্র গাঙ্গুলী—হেমেন্দ্র দাস রোড, দীনেশচন্দ্র মস্তফী (স্বামী তুরিয়ানন্দ)—ঢাকা, সতীন্দ্র রায়—আটপাইকা, ব্রজেন্দ্র দাস—নারায়ণগঞ্জ, জিতেন মুখার্জি (দাদু)—টিকাটুলী, সুকুমার বিশ্বাস—টিকাটুলি, দেবেন দত্ত—নারায়ণগঞ্জ, তারকেশ্বর গুহ—বজ্রযোগিনী, অরবিন্দ বসু—টাউন, নলিনী দত্ত—টাউন, সুধীর বসু—টাউন, হরিশ সরকার—টাউন, অসিত ভট্টাচার্য—টাউন, মাখন মিশ্র—টাউন, বলাই দাসগুপ্ত—টাউন, কেদারেশ্বর গুহ—বজ্রযোগিনী, অনিল দাশগুপ্ত—ওয়ারী, সুশীল সরকার—তাঁতিবাজার, অজিতানন্দ দাশগুপ্ত—টিকাটুলী, অমর ব্যানার্জি (কিষ্ট)—টিকাটুলী, সন্তোষ গাঙ্গুলী—বজ্রযোগিনী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য—স্বর্ণগ্রাম, জ্ঞান ঘোষ—রাউত ভোগ, শ্যামবিনোদ পাল, মণীন্দ্র চন্দ্র দত্ত—নারায়ণগঞ্জ, মণীন্দ্র রায় (টুলু) আট পাইকা। রবীন্দ্র সূত্রধর-ঢাকা, মণিন্দ্র ধর—নারায়ণগঞ্জ, রবি বসু (ফটিক), রাখাল ঘোষ, দেবেন্দ্র বণিক, উমা প্রসাদ চক্রবর্তী, সুসময় চাকলাদার, সুপতি পাল—বেলতলী, সুধীর ঘোষ—চাষারা, সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়—সাটিরপাড়া, নৃপেন্দ্রচন্দ্র রায় (বঙ্কুবাবু)—সাটিরপাড়া, ভুপেন রায়—সাটিরপাড়া, হাসিময় সেন—আমিনপুর, সুরপতি চক্রবর্তী।

গৃহী সভ্য—ঢাকা

সুশীল ঘোষ, চুড়াইন, টালা জলের কলের সুপারিণ্টেডেণ্ট, ডাঃ মোহিনীমোহন দাস চাঁদসী, কবিরাজ প্রফুল্ল সেন ঢাকা, ডাঃ জিতেন দত্ত রামকৃষ্ণ আশ্রম, বজ্রযোগিনী, বিন্দুবাসিনী সোম (তরণী সোমের মা), লবঙ্গলতা দাশগুপ্তা (পূর্ণানন্দের মা), ব্রহ্মময়ী সেনগুপ্তা (রবি সেনের মা)।

অনুশীলন সমিতি—জিলা ময়মনসিংহ

ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, কাপাসাটীয়া—জেল ৩০ বৎসর ১৬ দিন অনশন, ৬০ মাস পলাতক।

জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, ময়মনসিংহ টাউন—জেল ২৬ বৎসর।

রমেশচন্দ্র চৌধুরী, নান্দিনা—জেল ২৫ বৎসর, ৯০ দিন অনশন, ৩৬ মাস পলাতক।

অমূল্যচন্দ্র অধিকারী, বাড়রী—জেল ২০ বৎসর, ৫০ দিন অনশন।

প্রভাতচন্দ্র চক্রবর্তী, কাইটাইল—জেল ১৭ বৎসর, ২৮ দিন অনশন।

যোগেন্দ্রকিশোর ভট্টাচার্য, গচিহাটা—জেল ১৬ বৎসর, ৩৪ দিন অনশন, ৫২ মাস পলাতক।

সতীশচন্দ্র রায়, কাপাসাটীয়া—জেল ১৬ বৎসর।

নরেশচন্দ্র সোম, বগাবাইদ—জেল ১৫ বৎসর।

চন্দ্রকুমার ঘোষ, রামপুর—জেল ১২ বৎসর।

অমৃত সরকার, নাগরসাড়া—জেল ১২ বৎসর, ৬০ মাস পলাতক।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, টাউন—জেল ১২ বৎসর।

চারুচন্দ্র অধিকারী, বাড়রী—জেল ১২ বৎসর।

ব্রজেন্দ্র রায়, সিংড়াইল—জেল ১২ বৎসর।

প্রতুলচন্দ্র ভট্টাচার্য, মনাং—জেল ১০ বৎসর।

পূর্ণ চক্রবর্তী—কলমাকান্দা, সৌরভ ঘোষ, পরেশচন্দ্র রায়—কাপাসাটীয়া, প্রোঃ বিনয়েন্দ্র মোহন চৌধুরী—খারুয়া, সুরাংশু অধিকারী—বানিগ্রাম, নরেন্দ্র ভট্টাচার্য—কাইটাইল, নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য—বাড়রী, কুমুদ চক্রবর্তী—সুবন্ধ্যা, মণীন্দ্র ভট্টাচার্য—আশুজিয়া, অমিয়শঙ্কর মজুমদার—গচিহাটা, বিনয়েন্দ্র রায়—(ছুটকুনী) বনগ্রাম, ডাঃ স্নেহময় চৌধুরী—খারুয়া, ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়—সহিলা, ভূপেশচন্দ্র রায়—কাপাসাটিয়া, দেবব্রত রায় (দেবু)—বাসাইল, হরসুন্দর চক্রবর্তী—চরপাড়া, যোগেশ দাস—জামালপুর, যোগেন্দ্র চক্রবর্তী—গৌরীপুর, তারাপ্রসন্ন বল—উথুরী, শরদিন্দু মজুমদার—গাচিহাটা, প্রিয়নাথ রায় জমিদার—ধানাটা, অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ মোক্তার—

টাঙ্গাইল, দ্বিজেন ভট্টাচার্য—কাইটাইল, বীরেন্দ্র চন্দ্র কোনা, বসন্ত রক্ষিত—যশোদল। কুলদা চক্রবর্তী মোক্তার টাঙ্গাইল।

গৃহী সভ্য

চারুচন্দ্র রায় জমিদার, বাসাইল, টাঙ্গাইল।

ডাঃ বিপিনচন্দ্র সেন, ময়মনসিংহ টাউন।

গোপী রমণ গোস্বামী, বড়বাড়ী যশোদন, দুর্গা ভৌমিক, যশোদল।

অনুশীলন সমিতি—ফরিদপুর

পুলিনবিহারী দাস, লোনসিং—জেল ১০ বৎসর।

আশুতোষ কাহালী, বিলাসখান—জেল ২৫ বৎসর, ৭০ দিন অনশন, ৯০ মাস পলাতক।

কেদারেশ্বর সেনগুপ্ত, কোঁয়ারপুর—জেল ১৫ বৎসর, ৩২ দিন অনশন, ৫ মাস পলাতক।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ফতেজংপুর—জেল ২৪ বৎসর, ৪০ দিন অনশন, ৯৬ মাস পলাতক।

দীনেশচন্দ্র বিশ্বাস, শালধ—জেল ১৪ বছর, ৩২ দিন অনশন, ৪৮ মাস পলাতক।

শচীন্দ্রমোহন কর, পালং—জেল ১৩ বৎসর, ১৮ দিন অনশন, ১৫ মাস পলাতক।

জীবন ঠাকুরতা, বিলাসখান—জেল ১২ বৎসর।

নলিনীরঞ্জন ভট্টাচার্য, বিলাসখান—জেল ১২ বৎসর।

রাইচরণ সেন—বালুচড়া, প্রভাত চক্রবর্তী—কোটাপাড়া, রসিক চক্রবর্তী—কোটাপাড়া, হারাণ রক্ষিত—সাজনপুর, গিরীন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য—নলতা, আশুতোষ চক্রবর্তী—শালধ, ভুবন বসু—শালধ, হেমচন্দ্র বসু—দেওভোগ, নিবারণ চন্দ্র পাল—কমলাপুর, রমেশ দাশগুপ্ত—টাউন, যদুনাথ পাল—টাউন, প্রমথ গুহ, নরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নরেন্দ্র বন্দোপাধ্যায়; প্রমথ সরকার, বীরেন সেন—পালং, সীতানাথ দে—পালং; জিতেন গুপ্ত—কুরাশী,

খগেন ব্যানার্জি—ছয়গাঁ, সুবোধ রায়—বিলাসখান, হরেশ্বর কাহালী—বিলাস খান, চিত্ত কাহালী—বিলাসখান, ধীরেন্দ্র আতর্থী—বিলাসখান, সত্যরঞ্জন ঘটক—বিলাসখান, বিজলী দাশগুপ্ত—সহর, উপেন্দ্র রায় চৌধুরী—ইদিলপুর, প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী—রুদ্র কর, নিখিল দাস—আক্সা, সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী—মূলগাঁও, রাধাবল্লভ গোপ—কাঁঠালবাড়ী, তারাপদ লাহিড়ী—টাউন, দীনেশ দাশগুপ্ত—টাউন, সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত—টাউন, দেবেশ রায়—হোগলা। শহীদ শান্তি রঞ্জন গুহ—(খানপুর, থানা নবাবগঞ্জ, ঢাকা) পলাতক অবস্থায় দক্ষিণ ভারতে আওরঙ্গাবাদে মৃত্যু হইয়াছে।

অনুশীলন সমিতির—বরিশাল

যতীন্দ্রনাথ রায় (ফেণ্ড), কুসঙ্গল—জেল ১৪ বৎসর, ১২০ দিন অনশন, ১৮ মাস পলাতক।

দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, কাউনীয়া—জেল ২৪ বছর, ২৬ দিন অনশন, ১৬ মাস পলাতক।

দেবকুমার ঘোষ (মনা), টাউন—জেল ১৫ বছর।

নরেন্দ্রনাথ দাস, স্বরূপকাঠি—জেল ১৪ বছর।

তীর্থরঞ্জন চক্রবর্তী, নারায়ণপুর—জেল ১২ বছর, ৩০ দিন অনশন, ২৪ মাস পলাতক।

তারা গুপ্ত, শিকারপুর—জেল ১২ বছর।

কুমুদ গুহঠাকুরতা, বানরিপাড়া—জেল ১২ বছর।

গোপাল মুখার্জি, টাউন—জেল ১১ বছর।

প্রিয়রঞ্জন দাশগুপ্ত, শোলক—জেল ১১ বছর।

যোগেশ মজুমদার, টাউন—জেল ১১ বছর।

নিরঞ্জন সেন, নারায়ণপুর—জেল ১০ বছর।

নিশিকান্ত পাইন, ছবিপুর—জেল ১০ বছর, ৬৪ দিন অনশন, ১২ মাস পলাতক।

প্রিয়লাল সরকার, মতিযাণী—জেল ১০ বছর।

ননী সেন, খালিসাকোটা—জেল ১০ বছর।

দিলীপ দত্ত, কুশঙ্গল—জেল ১০ বছর।

নলিনী দাশগুপ্ত, বানরিপাড়া—জেল ১০ বছব।

প্রবোধ দাশগুপ্ত,—গৈলা, কুঞ্জলাল ঘোষ—কাউনিযা, চণ্ডীচরণ বসু—দেহেরগতি, শচীন্দ্র গুহঠাকুরতা—বানরিপাড়া, ধীরেশ রায়—বানরিপাড়া, মণীন্দ্র গুহঠাকুবত—বানরিপাড়া, জগদীশ চ্যাটার্জি—ঝালকাঠি, রঞ্জিত সরকার—ঝালকাঠি, শ্রীরাম দাস—ঝালকাঠি, সুরেশ সমাদ্দার—সমুদয়কাঠি, রাধিকা কর—কামারকাঠি, কালাচাঁদ শর্মা সিদ্ধকাঠি, দিবাকর মুখার্জি—ফযেরা, শান্তি মিত্র—আঙ্গারীয়া, বীরেন বসু—সহর, জীবন বসু—মোরাকাঠি, হরিপদ সেন—টাউন, ক্ষিরোদ দত্ত পিরোজপুর, জুরান গাঙ্গুলী—টাউন, কেশব চ্যাটার্জি—কাশীপুর, ফণী চ্যাটার্জি—বানরিপাড়া, মুকুন্দ চক্রবর্তী—গাভা. মাখন সেন—নাবাযণপুব, বরদা দে—আধুনা, কিশোরী-মোহন দত্ত—ভোলা। সবোজ গঙ্গুলী, মণী রায, বাণী রায, বাম গোপাল সেন শোলক, সুধীর কুমাব দত্ত—পিরোজপুব, সবোজ চক্রবর্তী, সাজাহান চৌধুবী, সাহ আলম চৌধুবী—(ট্রেন দুর্ঘটনায মৃত্যু), মুজাম্মেল হক (বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু) রজত কুমাব গুহ ঠাকুরতা, সুরিদ দত্ত। মুজিবর চৌধুবী। নুরুল ইসলাম খান (সুলাতনা)।

গৃহী সভ্য

শীতল মুখার্জি বি, এল, জমিদার—কাশিপুর। নিশি কান্ত বসু—শিক্ষক। অবনী কুমার ঘোষ—উকিল।

অনুশীলন সমিতি, জিলা—কুমিল্লা

রমেশচন্দ্র ব্যানার্জি, টাউন—জেল ১০ বছর।

অতীন্দ্রমোহন রায়, বাগিচা গাঁ—জেল ২৪ বছর, ৩৫ দিন অনশন, ১৮ মাস পলাতক।

অমূল্য মুখার্জি, টাউন—জেল ১৫ বছর, ২০ দিন অনশন।

মণীন্দ্র চক্রবর্তী টাউন—জেল ১৫ বছর, ১৮ দিন অনশন।

যোগেশ চক্রবর্তী, টাউন—জেল ১২ বছর, ১৮ দিন অনশন।

নিকুঞ্জ পাল, রসুল্লাবাদ—জেল ১৪ বছর, ৪৮ মাস পলাতক।

সুরেশচন্দ্র ভরদ্বাজ, চালিতাতলী—জেল ১২ বছর।

মথুর চক্রবর্তী, সামুখসার—জেল ১০ বছর, ২২ মাস পলাতক।

অতুলচন্দ্র দত্ত মজুমদার, বরকামতা—জেল ১০ বছর, ২৪ মাস পলাতক।

সতীশচন্দ্র সিংহ, হরিণা—জেল ১০ বছর।

প্রফুল্লকুমার সেন, ঘাসিগ্রাম—জেল ১৫ বছর, (৪২, ৩৮, ৫১, ৪৫) দিন অনশন, ৪৮ মাস পলাতক।

সুরেন্দ্রকুমার রায়, ভেলানগর—জেল ১৪ বছর।

মণীন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত, চেলিগলা—জেল ১১ বছর, ১৮ মাস পলাতক।

নিবারণচন্দ্র চক্রবর্তী, লাকশ্যাম—জেল ১০ বছর, ১৪ দিন অনশন।

পুলিন গুপ্ত—টাউন, পরেশ চন্দ্র চ্যাটার্জি, টাউন, অনন্ত দে—টাউন; পুলিন পাল—রসুল্লাবাদ, ক্ষেত্রমোহন সিংহ—হরিণা, ভগবান দাস—দুর্গাপুর, কালীপ্রসন্ন মজুমদার—কাশীনগর, বগলা প্রসন্ন মজুমদার—কাশীনগর, অনঙ্গ সরকার—কুরপাই, শশি মজুমদার—কাশীনগর, শান্তি সিংহরায়—খাজুরীয়া, শচীন্দ্র কায়েত, কুমুদ নাগ—ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, জিতেন ভট্টাচার্য, প্রফুল্ল চক্রবর্তী—কালীকচ্ছ, অতুল দত্ত—চাঁদপুর, মাখন দত্ত—চাঁদপুর, যামিনীকান্ত পাল—ইব্রাহিমপুর, উপেন্দ্র চৌধুরী—সরাইল, অমূল্য দত্ত—সরাইল, ক্ষিতীশ ভৌমিক, নীহার রায়, মণি দাশগুপ্ত, দীনেশচন্দ্র ঘটক, বিশ্ব সেন, রমেশ ঘোষ, বিনোদ গুপ্ত—কুমিল্লা, রবি ভট্টাচার্য—মেড্ডা। নেপাল নাহা।

গৃহী সভ্য

হেরম্ব ভট্টাচার্য, প্রবোধ চক্রবর্তী—কালিকচ্ছ, শেফালি মজুমদার (অতুল দত্তের বোন), বিভা চৌধুরী (পুলিন গুপ্তের বোন), সরলা দেবী (পুলিন গুপ্তের মা)।

অনুশীলন সমিতি—আগরতলা

ক্ষিতিশচন্দ্র ব্যানার্জি, বনমালীপুর—জেল ২৪ বৎসর। প্রিয়নাথ ব্যানার্জি (উকিল), সুকুমার ভৌমিক।

অনুশীলন সমিতি—চট্টগ্রাম

চারুবিকাশ দত্ত, কানুনগোপাড়া—জেল ১২ বৎসর, প্রতাপচন্দ্র রক্ষিত, সুলতানপুর—জেল ১২ বৎসর। যশোদা চক্রবর্তী, ফতেয়াবাদ—জেল ১২ বৎসর। শ্যামাচরণ বিশ্বাস, রাউজান—জেল ১২ বৎসর। মোক্ষদা চক্রবর্তী, ফতেয়াবাদ—জেল ১২ বৎসর। প্রিয়দা চক্রবর্তী, ফতেয়াবাদ—জেল ১২ বৎসর। মনোমোহন সাহা, ফতেয়াবাদ—জেল ১০ বৎসর। গিরিজাশঙ্কর চৌধুরী, আমিলাইস—জেল ১০ বৎসর। মহেশ বড়ুয়া, সাতকানিয়া—জেল ১০ বৎসর। কেদারেশ্বর ভট্টাচার্য, ছনহরা—জেল ১০ বৎসর। মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য, দক্ষিণভুরসী—জেল ১০ বছর। উত্তরকুমার ধর—সাধনপুর, সুধাংশু দত্ত—ধর্মপুর, সুধাংশু সেন—বরমা, সুমতি মজুমদার—ধলঘাট, মহেন্দ্র বড়ুয়া—ধলঘাট, সুধাংশু দাস—চক্রশালা, প্রবীন বড়ুয়া—নয়াপাড়া, ব্রজেন দাশ--ডেমসা, নরেন্দ্রবিজয় চৌধুরী—ডেমসা, ক্ষেত্র সেন—সেওড়াতলী।

অনুশীলন সমিতি—নোয়াখালী

অনুকূল চক্রবর্তী, শ্রীরামপুর—জেল ১২ বছর, ৬০ মাস পলাতক। উমেশ চক্রবর্তী, করপাড়া—জেল ১১ বছর, ১২ মাস পলাতক। সুধীর সিংহ রায়, পরশুরাম—জেল ১১ বছর। হৃষীকেশ দাসগুপ্ত, মঙ্গলকান্দী—জেল ১০ বছর। প্রতুল চৌধুরী, জয়াগ—জেল ১০ বছর, যোগেশ মজুমদার, বাতাইয়া—জেল ১০ বছর, ২৪ মাস পলাতক। শান্তিময় দত্ত, ফেণী—জেল ১০ বছর। মাখন পাল, বাবুপুর—জেল ১০ বছর। স্নেহময় দত্ত, ফেণী—জেল ১০ বছর, ২৩ দিন অনশন, ২৬ মাস পলাতক।

সারদাচরণ গুহ--বাবুপুর, কালাচাঁদ রায়---সাধেরখিল, জিতেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী—লামচর, প্রফুল্লকুমার দত্ত—মঙ্গলকান্দী, শুভময় শুর—বারইতলা রাজ্যেশ্বর বণিক—ফুলগাজি, সুখেন্দু বিকাশ রায়চৌধুরী—সনদ্বীপ, সন্তোষ চক্রবর্তী—জয়পুর, সুখময় চক্রবর্তী—সোনাচাকা, যামিনী সেন—ফেণী, মণীন্দ্র চৌধুরী—ফেণী, ইন্দ্রমোহন চক্রবর্তী—খিলপাড়া, কেশব মজুমদার—

লামচর, (টবগ্রাম), কেদারনাথ গুহরায়—দত্তপাড়া, দেওয়ানজী বাড়ী, বিনয়লাল ঘোষ—দত্তপাড়া, চিত্তনারায়ণ চৌধুরী—খিলপাড়া, কৃষ্ণসাহা। ডাঃ দ্বারিকা রায়—লা র।

অনুশীলন সমিতি—শ্রীহট্ট

গিরিজা দত্ত (নগেন)—শ্রীহট্ট, প্রফুল্ল রায়, প্রীতিরঞ্জন পুরকায়স্থ, সুরেশ দেব।

অনুশীলন সমিতি—রাজসাহী

প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী, আরাণী - জেল ২৩ বছর, ৩০ দিন অনশন, ৩৬ মাস পলাতক। সুধাংশু চৌধুরী (চেরু), টাউন—জেল ১৩ বছর। জিতেশ লাহিড়ী, আরাণী—জেল ১২ বছর, ২২ দিন অনশন, ৪২ মাস পলাতক। কালী মৈত্র (হরেন), পাটুল-ইাপানীয়া—জেল ১২ বছর। ক্ষিতীশচন্দ্র দেব, নাটোর—জেল ১২ বছর। বীরেশ চক্রবর্তী, টাউন—জেল ১২ বছর। বীরেন সরকার, টাউন—জেল ১২ বছর। অমিয় স্যান্নাল, টাউন—জেল ১১ বছর। কেদারনাথ সিংহ, নওগাঁ—জেল ১১ বছর। সুরেন রায়, নওগাঁ—জেল ১০ বছর। রাধারমণ ভট্টাচার্য, টাউন—জেল ১০ বছর। অমলেন্দু বাগচী, টাউন—জেল ১০ বছর। সত্যব্রত চক্রবর্তী, টাউন—জেল ১০ বছর। নরেন্দ্রকিশোর ভট্টাচার্য, কুমারপাড়া—জেল ৮ বছর ৭৪ দিন অনশন, ১০ মাস পলাতক। মণীন্দ্র মিত্র—সহর, তারাদাস ভট্টাচার্য, কুমারপাড়া, সুধাংশু মুখার্জি—কুমারপাড়া, সুধাংশু ব্যনার্জি... কুমারপাড়া, অম্বিকা মৈত্র—কুমারপাড়া, হেমন্ত নাগ—কুমারপাড়া, সুবিমল সরকার—কুমারপাড়া, বরদা মুকুটমণি—কুমারপাড়া, কৃষ্ণগোপাল লাহিড়ী—কুমারপাড়া, সুকুমার চক্রবর্তী (চুনী)—কুমারপাড়া, গোরা মৈত্র—কুমারপাড়া, সুকুমার চক্রবর্তী (ননী)—কুমারপাড়া, আত্মনাথ কর্মকার—কুমারপাড়া, ভোলা রায়—কুমারপাড়া, অটল চক্রবর্তী—কুমারপাড়া, জ্ঞানেন্দ্র লাহিড়ীপ—ুঠিয়া, সত্যরঞ্জন লাহিড়ী—পুঠিয়া, জ্ঞান সান্নাল—নাটোর, শ্রীশ চক্রবর্তী (উকিল) নাটোর, বিরজা বসু—নওগাঁ, শচীন্দ্রনাথ খাঁ—খেজুরা, প্রবোধ মৈত্র—টাউন। সত্যেন মৈত্র—(বাগু বাবু) টাউন।

অনুশীলন সমিতি—মালদহ

হংস গোপাল আগড়ওয়ালা, পুরাতন মালদহ—জেল ১৯ বছর, ২৮ মাস পলাতক। মহেন্দ্র দাস, আলাল-জেল ১৪ বছর। বিভূতিভূষণ লাহিড়ী, অনাথবন্ধু ঘোষ, দেবেন্দ্র দাস—মল্লিকপুর।

পাবনা

বঙ্কিমচন্দ্র রায়, হাটুরিয়া—জেল ১৫ বছর। অমূল্য লাহিড়ী, লাহিড়ী মোহনপুর-জেল ১৫ বছর, ২৪ মাস পলাতক। সুধীর মজুমদার লাহিড়ী মোহনপুর—জেল ১৪ বছর, ১৮ দিন অনশন, ১৬ মাস পলাতক। মণীন্দ্র লাহিড়ী (জলপেশ)—লাহিড়ী মোহনপুর। অনাথ লাহিড়ী—লাহিড়ী মোহনপুর, সুধীন্দ্র সরকার-টাউন, নরেন্দ্র ভট্টাচার্য-সিরাজগঞ্জ।

বগুড়া

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, হিলি—জেল ১০ বছর, সুবোধ লাহিড়ী, শেরপুর, শচীশ সরকার, শেরপুর—জেল ১২ বছর, ১৮ দিন অনশন, ৮ মাস পলাতক।

রংপুর

সুশীলচন্দ্র দেব, কুড়িগ্রাম—জেল ১৪ বছর, ২৪ দিন অনশন। পরেশ চন্দ্র গুহ, কুড়িগ্রাম—জেল ১৮ বছর, ২৪ দিন অনশন। খর্গ বর্মণ, কুড়িগ্রাম, বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, কুড়িগ্রাম। শিবদাস লাহিড়ী, টাউন। রামকৃষ্ণ ঘোষ, টাউন, পবিত্র ভট্টাচার্য, নিরঞ্জন রায়, প্রতুল গোবিন্দ দেব, সুরেশ সেন, নলিনী বাগচী।

দিনাজপুর

প্রবোধচন্দ্র বিশ্বাস—টাউন, প্রফুল্ল বিশ্বাস—টাউন, ধীরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি—বালুরঘাট, বরদা চক্রবর্তী—উকিল টাউন।

মুর্শিদাবাদ

জগদানন্দ বাজপেয়ী, জিয়াগঞ্জ—জেল ৮ বছর। ত্রিদিব চৌধুরী, বহরমপুর-জেল ১৪ বছর। মিহির মুখার্জি, পাটকাবাড়ী-জেল ১৪ বছর। সুকুমার রায় চৌধুরী, বহরমপুর—জেল ৮ বছর। নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, বহরম-

পুর—জেল ১৬ বছর। অনন্ত ভট্টাচার্য, বহরমপুর—জেল ১০ বছর। গৌরীপ্রসাদ সেন, জিয়াগঞ্জ—জেল ১২ বছর। তারাপদ গুপ্ত, বহরমপুর—১০ বছর। প্রফুল্ল গুপ্ত, বহরমপুর—জেল ১০ বছর। ননী ভট্টাচার্য, বহরমপুর—জেল ৮ বছর। সন্দীপ শেঠিয়া, বহরমপুর—জেল ৮ বছর। নীরদ সরকার, বহরমপুর—জেল ৮ বছর। নির্মলেন্দু বাগচী বহরমপুর—জেল ৮ বছর। অরবিন্দ ভট্টাচার্য, বহরমপুর—জেল ৮ বছর।

নির্মল ভট্ট—বহরমপুর, হীরেন সরকার—বহরমপুর, অতীন্দ্র মজুমদার—বহরমপুর, দুর্গা সরকার—বহরমপুর, হীরেন সরকার—বহরমপুর প্রবোধ সরকার—বহরমপুর, নিতাই গুপ্ত—বহরমপুর, সবিতা রায় চৌধুরী—বহরমপুর, শৈলেন অধিকারী—জিয়াগঞ্জ, সুধীর ব্যানার্জি—লালগোলা, মধু গুপ্ত—কান্দী, তুষারময় রায় চৌধুরী—বহরমপুর, হরিমোহন ঝা।

নদীয়া

বিশ্বমোহন সান্ন্যাল—শান্তিপুর, সরোজ আচার্য—কুষ্টিয়া।

২৪ পরগনা

হরেন্দ্রনাথ রায়—দক্ষি চাতরা।

মেদিনীপুর

ধনঞ্জয় কর, রাম মজুমদার।

কলিকাতা

যতীন দাস, সুশীল ব্যানার্জি, কিরণ দাস—দক্ষিণ কলিকাতা। মন্মথ। গাঙ্গুলী, সেণ্ট্রাল কলিকাতা, ধীরেন্দ্র মুখার্জি (ম্যানেজার, হিন্দ মোটর), হেম দাশগুপ্ত—সুপারিণ্টেডেণ্ট, যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, অনাদি সেন—রাউডন স্ট্রীট (গ্লাস ফ্যাক্টরীর মালিক), ডাঃ সতীন সেন—বহুবাজার ষ্ট্রীট, জিতেন চক্রবর্তী—ইঞ্জিনিয়ার, বেঙ্গল ল্যাম্প, যাদবপুর। ত্রিগুণা সেন—রেক্টার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। (কিছুকাল জেলে ছিলেন, সকল দলের পলাতক বিপ্লবীদিগকে সাহায্য করিতেন)।

অনুশীলন সমিতি—উত্তর ভারত

বিশিষ্ট সভ্য

দিল্লী—লালা হনুমন্ত সহায়, প্রফেসার নিগম, মন্মথ গুপ্ত, সুশীলা দেবী।

অমৃতসর—চৌধুরী বোগ্গা মল।

লক্ষ্ণৌ—দুর্গা দেবী, প্রকাশবতী।

কানপুর—রাম দুলারী ত্রিবেদী, রাজেন্দ্র দত্ত নিগম, রাজকুমার সিং, বিজয় কুমার সিং, শরৎকুমার সিং।

হামিরপুর—পণ্ডিত পরমানন্দ। ধন্বন্তরী, যশপাল, হংসরাজ, বৈশম্পয়ান (ইউ, পি)।

পাটনা – পরমানন্দ ত্রিবেদী, বাসাওয়ান সিং, যোগেন্দ্র শুকুল।

গয়া—কেশবপ্রসাদ শর্মা। মজঃফরপুর—রামবিনোদ সিংহ, শ্রীধ্বজাপ্রসাদ সাহু, ভাগলপুর—মদনগোপাল যোশী।

বিহার – কামতা প্রসাদ সাহু, শ্রীবনোয়ারী প্রসাদ, শ্রীমদন প্রসাদ আচার্য জে, বি, কৃপালনী, প্রোঃ মালকানী, প্রোঃ চ্যাবলানি, বাবু বৈজনাথ প্রসাদ, বাবু রামবিহারী লাল। মধুসূদন রায়, মহানন্দপুর—বিহার।

অনুশীলন সমিতি—ব্রহ্মদেশ

অনুশীলন সমিতির সভ্যগণ, যাহারা ব্রহ্মদেশে বৈপ্লবিক কাজে বিভিন্ন জেলে ছিলেন।

দীনেশচন্দ্র বিশ্বাস—রেঙ্গুন (বিশ্বাস কোম্পানীর দোকান), সুমতি মজুমদার, সারদা ভট্টাচার্য, কেদারেশ্বর ভট্টাচার্য, প্রবীণ বড়ুয়া, নরেন দাস, প্রফুল্ল সেন, অনাথ চক্রবর্তী, পণ্ডিত হৃষীকেশ শর্মা, পণ্ডিত হরবংশ সিং, ডাঃ রমেশ ঘোষ ডাঃ বিনয় সেন, নরেন ঘোষ, সঞ্জীব মুখার্জি, নবীন দাশ, প্রফুল্ল কুমার ভট্টশালী, ডাঃ গজেন ঘোষ, হীরালাল দে।

সহানুভূতিশীল সভ্য—সি, পি, খিন মৎ-মান্দালয়, রেভারেণ্ড উ, উত্তমা, উ, নাগিন্দা, উ, সানদা, উ, জায়া (ইহারা সন্ন্যাসী ছিলেন)।

বাংলার বিপ্লবী নারী যাঁহারা জেলে বা অন্তরীণে আবদ্ধ ছিলেন

শ্রীলীলা রায় এম. এ, রেণু সেন এম, এ, শৈল সেন বি, এ, বি, টি, কল্যাণী দেবী এম, এ, শান্তিসুধা ঘোষ এম, এ, কমলা চ্যাটার্জি বি, এ, কমলা দাশগুপ্তা বি, এ, প্রতিভা ভদ্র বি, এ, হেলেনা দত্ত বি, এ, প্রমীলা গুপ্তা বি, এ, বীণা দাশ বি, এ, কল্পনা দত্ত বি, এ, অমিতা সেন, সাধনা বসু বনলতা সেন এম, এ, মায়া নাগ, সুশীলা দাশগুপ্তা, লাবণ্যপ্রভা দাশগুপ্তা, ঊষা মুখার্জি, সুনীতি দেবী, সরযু চৌধুরী, বিমল প্রতিভা দেবী ইন্দুসুধা ঘোষ, প্রফুল্ল নলিনী ব্রহ্ম, আশা দাশগুপ্তা, অরুণা সান্ন্যাল, সুষমা দাশগুপ্তা, সুপ্রভা ভদ্র, শান্তিকণা সেন, মমতা মুখার্জি, ঊষা (ময়না) মুখার্জি, সৌদামিনী দেবী, নির্মলা আতর্থী, নিরুপমা আচার্য, সুবর্ণপ্রভা দত্ত, শান্তি দাশ, সুনীতি চৌধুরী, পারুল মুখার্জি, সুরমা মজুমদার।

বিভিন্ন বিপ্লবী দল

আত্মোন্নতি সমিতি—কলিকাতা

এই সমিতি কলিকাতার শ্রীসতীশচন্দ্র মুখার্জি ও নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য স্থাপন করেন। পরে এই সমিতিতে শ্রীবিপিনবিহারী গাঙ্গুলী যোগদান করেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় যখন ময়মনসিংহ জামালপুরে প্রতিমা ভঙ্গ হয় তখন বিপিনবাবু, হরিশবাবু প্রভৃতি বিপ্লবী পিস্তল লইয়া শান্তি রক্ষার জন্য জামালপুর গিয়াছিলেন। এই দলের সভ্যগণই সুকৌশলে রডা কোম্পানীর মশার পিস্তল হস্তগত করিয়াছিলেন। বিপ্লবী বিপিন গাঙ্গুলী বাংলা দেশে সুপরিচিত। এই দলের সভ্যগণ বৈপ্লবিক কাজে যোগদান করিয়া বহু বৎসর কারাগারে কাটাইয়াছেন। এই দলের সভ্যদিগের মধ্যে হরিশ্চন্দ্র শিকদার, প্রভাসচন্দ্র দে, গিরীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুকূল মুখার্জি,

নরেন্দ্র ব্যানার্জি, খগেন্দ্র চ্যাটার্জি, শ্রীশচন্দ্র সরকার, প্রফেসার জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, দেবেন দে, সন্তোষ মিত্র, প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকা, কালীপদ মুখার্জি প্রধান ছিলেন। কালীপদবাবু ১২ বছর জেলে ছিলেন।

যতীন মুখার্জির দল—কলিকাতা

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি "বাঘা যতীন" নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় মিলিত দলের নেতৃত্ব-ভার তিনিই গ্রহণ করেন। তাঁহার দলের সহ-কর্মীদের মধ্যে অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, অমর কৃষ্ণ ঘোষ, নরেন্দ্র ভট্টাচার্য (এম, এন, রায়), সুরেশচন্দ্র মজুমদার (আনন্দবাজার পত্রিকা), হরিকুমার চক্রবর্তী, ভূপতি মজুমদার (ভূতপূর্ব), যাদুগোপাল মুখার্জি, কিরণ মুখার্জি (কিরণদা), নরেন শেঠ, ভোলা চ্যাটার্জি, যতীন্দ্রলোচন মিত্র, সাতকড়ি ব্যানার্জি, মাখন চক্রবর্তী, ভূপেন দত্ত, সুরেশ দাশ প্রধান ছিলেন। এই সব বিপ্লবী কর্মীরা বহু বৎসর বিনা বিচারে জেলে আটক ছিলেন।

যতীনদার দল—উত্তরবঙ্গ

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় উত্তরবঙ্গে "যতীনদা" নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি বগুড়া স্কুলে শিক্ষকতার কাজ করিতেন। তিনি আদি অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন, পরে তাঁহার দল উত্তর বঙ্গে 'যতীনদার দল' নামে পরিচিত হয়। এই বিপ্লবী দলের কর্মীদের মধ্যে বীরেন্দ্রমোহন ঘটক, সত্যপ্রিয় ব্যানার্জি, অবিনাশ রায়, শশধর কর, উমানাথ চক্রবর্তী, ক্ষিতীশ সরকার, যতীন হুই, প্রভাস লাহিড়ী (পাবনা), মানসগোবিন্দ সেন, গোবিন্দ ব্যানার্জি, সুরেন রায়, অক্ষয় গুহ, মহেন্দ্র সেন, শরদিন্দু চক্রবর্তী, আশুতোষ লাহিড়ী, গোপেন্দ্রলাল রায়, কালীপদ বাগচী, মোহিনী সিংহ, যোগেন দে সরকার, খগেন দাশগুপ্ত প্রধান ছিলেন। ইহাদের সকলেই বহু বৎসর কারাগারে ও অন্তরীণে আবদ্ধ ছিলেন। যতীনদা গঠনমুলক কাজে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বগুড়ায় "গণমঙ্গল সমিতি" স্থাপন করিয়া জনসেবা করিতেন। যতীনদা ১০ বৎসর এবং খগেন দাশগুপ্ত ১৪ বৎসর জেলে ছিলেন।

সাধনা সমিতি—ময়মনসিংহ

ময়মনসিং-এর জমিদার শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরীর নেতৃত্বে এই দল গড়িয়া উঠে। বঙ্গভঙ্গের পর স্বদেশী আন্দোলনের সময় এই বিপ্লবীদলের জন্ম হয়। এই দলের প্রধান কর্মীদের নির্যাতন ভোগের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

শ্রীহেমেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী - মুক্তাগাছা, জেলে ৬ বছর, অনশন ৮২ দিন। সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, (এম. পি.) খারুয়া—জেলে ২৪ বছর, অনশন ৯৬ দিন। শ্যামানন্দ সেন, টাউন—জেলে ২০ বছর। বিধু সেন, জামালপুর - জেলে ১৯ বছর অনশন ২৬ দিন। পৃথ্বীশচন্দ্র বসু টাঙ্গাইল—জেলে ১৯ বছর, অনশন ৩৫ দিন। কোহিনুর ঘোষ, টাউন—জেলে ১৭ বছর। বিনোদ চক্রবর্তী, টাউন—জেলে ১৬ বছর, অনশন ২৫ দিন। মহেন্দ্রচন্দ্র দে, জয়কা—১৬ বছর, অনশন ২৫ দিন। আনন্দ মজুমদার, মাইজহাটি—জেলে ১৪ বছর, অনশন ১৪ দিন। নরেশ চৌধুরী, নন্দিনা—জেলে ১৪ বছর, অনশন ৮৫ দিন। ভক্তিভূষণ সেন, (হারু) টাউন—জেলে ১৩ বছর। ক্ষিতিশচন্দ্র বসু, টাঙ্গাইল—জেলে ১২ বছর, অনশন ২৫ দিন। মনোরঞ্জন ধর, টাউন—জেলে ১৪ বছর, সুধেন্দু মজুমদার—চল্লিশকাহন, মতিলাল পুরকায়স্থ—টাউন, সঞ্জীবচন্দ্র রায়—কায়স্থপল্লী, মোহিনীশঙ্কর রায়—গচিহাটা, দ্বিজেন চৌধুরী (ননী)—সুখারী, নগেন্দ্রশেখর চক্রবর্তী—ইদিলপুর, ফরিদপুর।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের দল—বরিশাল

বরিশালে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতীর একটি বিপ্লব দল ছিল। এই দলের সভ্যগণ বহু বছর জেলেও অন্তরীণে ছিলেন। তাঁহাদের নাম :—

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী—উজিরপুর, নরেন্দ্রমোহন ঘোষচৌধুরী—দত্তপাড়া (নোয়াখালী), মনোরঞ্জন গুপ্ত—অধুনা, অরুণচন্দ্র গুহ, অশ্বিনী কুমার গাঙ্গুলী—নাথুল্লাবাদ, নগেন্দ্র গুহরায়—নোয়াখালী, যোগেন্দ্রনাথ বসু—চাঁদসী, রমণীরঞ্জন গুপ্ত, মনোহর মুখার্জি—নলচিরা, সরোজ কাহালী—ভোলা, কেষ্ট চ্যাটার্জি, ডাঃ বিরাজ রায়চৌধুরী, চন্দ্রভূষণ বসু—নোয়াখালী, বিজয়-

রঞ্জন মিত্র—ফরিদপুর, রাধিকা গাঙ্গুলী—বরিশাল, সতীশচন্দ্র দাস—উত্তর সাহাবাজপুর, ডাঃ মাখনলাল দত্তরায়—সাহাবাজপুর, মনোরঞ্জন ঘোষ—সাহাবাজপুর, সুধীর রায়চৌধুরী-পোনাবালিয়া, কান্তি চ্যাটার্জি—খলিসাকোটা, কমুদ চ্যাটার্জি—খলিসাকোটা, যতীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি—খলিসাকোটা, রবীন্দ্রনাথ বসু-চাঁদনী, ডাঃ অজিতলাল রায়—বইসরি, নলিনীকান্ত সেনগুপ্ত—গৈলা, পঞ্চানন বসু-খাপুরা, কেশবচন্দ্র গুহ—খাপুরা, স্বদেশরঞ্জন চ্যাটার্জি—খাপুরা, নলিনীকান্ত বসু—গাভা, নারায়ণ চন্দ্র ঘোষ—লক্ষণকাঠি, ডাঃ বীরেশচন্দ্র গুহ—গাভা, ধীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—গৈলা, নিরঞ্জন চক্রবর্তী, সত্যরঞ্জন নন্দী-উত্তর সাহাবাজপুর, জিতেন্দ্রনাথ মুখার্জি, মনোরঞ্জন বসু, নিরঞ্জন মুখার্জি।

ত্রৈলোক্যনাথ বসু, স্বামী স্বরূপানন্দ গিরি, স্বামী সচ্চিদানন্দ, ডাঃ নিশিকান্ত গাঙ্গুলী—মনপাশা, সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র—নোয়াখালী, ক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী—নোয়াখালী, সুবোধ মিত্র—নোয়াখালী, সত্যরঞ্জন বসু—করাপুর, সরলকুমার দত্ত—বাটাজোড়, সতীন্দ্রনাথ সেন—পটুয়াখালী, সুধীর দাশগুপ্ত—মহিলারা, শৈলেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, শচীন করগুপ্ত—নলচিড়া, মহেন্দ্রনাথ রায়—নলচিড়া, সুধীরকুমার আইচ, মনোজ কাহালী—ভোলা, অবলাকান্ত কর—উত্তর সাহাবাজপুর, নলিনী দাশ, নিখিলরঞ্জন গুহ—ইনিলপুর, ফরিদপুর, ফণী দাশগুপ্ত, নয়নরঞ্জন দাশগুপ্ত। প্রাণ কুমার সেন, বিনোদ কাঞ্জিলাল।

সূর্য সেনের দল—চট্টগ্রাম

সূর্য সেন (মাষ্টারদা) এই দলের নেতা ছিলেন। এই বিপ্লবী দলের সভ্যগণ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। বিশিষ্ট সভ্যদের নাম—সূর্য সেন—জেলে ১০ বছর, ৬ মাস পলাতক, ফাঁসিতে মৃত্যু, অম্বিকা চক্রবর্তী—জেলে ২৩ বছর, অনশন ৫০ দিন, ৫ মাস পলাতক। কালীপদ চক্রবর্তী, পোপদিয়া—জেল ২১ বছর, অনশন ৩৫ দিন। গনেশ ঘোষ, সহর—জেলে ২০ বছর, অনশন ৪৫ দিন, ৯ মাস পলাতক। লোকনাথ বল ধোরলা—জেলে ২০ বছর, অনশন ৪০ দিন। পূর্ণেন্দু দস্তিদার, ধলঘাট—জেলে ২০ বছর। সুশীল দে, কানুনগোপাড়া—জেলে ১৮ বছর। ফকির সেন, ফতেয়াবাদ—জেলে ১৭ বছর, অনশন ৩৫ দিন। আনন্দ গুপ্ত, সহর

—জেলে ১৭ বছর, অনশন ৩৫ দিন। সুখেন্দু দস্তিদার, ধলঘাট—জেলে ১৭ বছর, অনশন ৩৫ দিন ১০ মাস পলাতক। পুলিন দে, ধলঘাট—জেলে ১০ বছর, যতীন রক্ষিত (কবিরাজ), কানুনগোপাড়া—জেলে ১৬ বছর। রাখাল দে, শ্রীপুর—জেলে ১৬ বছর। উপেন্দ্র ভট্টাচার্য, বেতাশী—জেলে ১৬ বছর। শচীন গুহ, কানুনগোপাড়া—জেলে ১৩ বছর। শ্রীমতী কল্পনা দত্ত, শ্রীপুর—জেলে ১০ বছর। দীনেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, ধলঘাট—জেলে ১২ বছর, অনশন ৪২ দিন। নেপাল দস্তিদার, কানুনগোপাড়া—জেলে ১০ বছর। বিনোদ চৌধুরী, উত্তরভূর্তি—জেলে ১০ বছর। শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী -ধলঘাট, রেবতী চক্রবর্তী—আনোয়ারা, নির্মল সেন,, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার।

পূর্ণদাসের দল—মাদারীপুর

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস এই দলের নেতা ছিলেন। বালেশ্বর খণ্ডযুদ্ধে নিহত চিত্তপ্রিয় এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত মনোরঞ্জন, নীরেন এই দলের সভ্য ছিলেন। পূর্ণচন্দ্র দাস, সমাজ ইশিবপুর—জেলে ২৭ বছর, অনশন ৩৫ দিন, ২৪ মাস পলাতক। কালীপ্রসাদ ব্যানার্জি, খালিয়া—জেলে ২৩ বছর, অনশন ৫০ দিন, ২৪ মাস পলাতক। বিজয় চক্রবর্তী কোটালীপাড়া—জেলে ১৬ বছর, অনশন ২০ দিন, ৬০ মাস পলাতক। পঞ্চানন চক্রবর্তী, মাদারীপুর—জেলে ২০ বছর। বিজয়ানন্দ দত্ত, মাদারীপুর—জেলে ১৫ বছর। প্রফুল্ল চ্যাটার্জি (টেনা), মাদারীপুর—জেলে ১৩ বছর। ফণী মজুমদার, মাদারীপুর —জেলে ১৮ বছর। সন্তোষ দত্ত, কেন্দুয়া—জেলে ১৪ বছর। যতীন ভট্টাচার্য, ভাঙ্গা—জেলে ২৪ বছর। বামন চক্রবর্তী, পাঠককান্দী—জেলে ১৪ বছর। বিনোদ দাশ (স্বামী প্রণবানন্দজী)—বাজিতপুর, কল্যাণ নাগ —কুনিয়া (স্বামী সত্যানন্দ), কালীপদ রায় চৌধুরী, আমগ্রাম—জেলে ২০ বছর। বিধুভূষণ মজুমদার—পাঙ্গাইসা। সুকুমার চৌধুরী, করদী—জেলে ১৩ বছর। নলিনী গুহ, বাহাদুরপুর—জেলে ১৩ বছর। ডাঃ তারাপদ চট্টোপাধ্যায়, গৈলা—জেলে ১৩ বছর। পরমানন্দ দে, ঢাকা—জেলে ১১ বছর। রঙ্গলাল সাহা, ঢাকা—জেলে ১১ বছর। জিতেন ঘোষ, বরিশাল —জেলে ১২ বছর। কালিপদ দে ঢাকা—জেলে ১০ বছর। ফণীভূষণ দত্ত

কাসিমপুর—জেলে ১৩ বছর। সুরেশ দাশ, কাসিমপুর—জেলে ১৪ বছর। হরিপদ দাশ, সরমঙ্গল—জেলে ১৩ বছর। সতীশ বিশ্বাস, ভাঙ্গা—জেলে ১১ বছর। পৃথ্বীশচন্দ্র ঘোষ, মাদ্রা—জেলে ১৩ বছর। জনার্দন চক্রবর্তী—ধনা, ঢাকা, নিত্যবন্ধু মজুমদার—ঢাকা, কালীপদ ব্যানার্জী—মাদ্রা, কুমুদ ভট্টাচার্য —মাইঝপাড়া, সুরেশ চট্টোপাধ্যায়—মাইঝপাড়া, শরৎ গুহ—কাউদী, বিজয় চক্রবর্তী—কোটালীপাড়া, ডাঃ প্রতাপচন্দ্র গুহরায়—কেন্দুয়া, অমলেন্দু দাশগুপ্ত—মাদারীপুর, নলিনী গুহ—মাদারীপুর, ইন্দুভূষণ মজুমদার—মাদারীপুর, ডাঃ হরিপদ চক্রবর্তী—মাদারীপুর, রমেশ রায়চৌধুরী —ভাঙ্গা, দীনেশ রায়চৌধুরী—ভাঙ্গা, প্রফুল্ল চৌধুরী—মাণিকগঞ্জ বাতুল ঘোষ —ঢাকা, সুরেন কর—পালং, জীবন সরকার মাদারীপুর, রমেশ দত্ত—ভাঙ্গা, প্রমথ ব্যানার্জি—ভাঙ্গা, ব্রজরাখাল ব্যানার্জি—ভাঙ্গা।

শ্রীসঙ্ঘ—ঢাকা

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ এই দলের প্রতিষ্ঠাতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষের অন্যতম সহকর্মী শ্রীপ্রমথনাথ চক্রবর্তী ঢাকায় এই দলের প্রসারে সহায়তা করেন। অল্পকালের মধ্যেই এই দলের ঢাকার নেতৃত্ব ৺অনিলচন্দ্র রায়ের উপর অর্পিত হয়।

১৯২৮ সালে এই দল দ্বিধাবিভক্ত হইয়া শ্রীসঙ্ঘ ও বি. ভি. নামে খ্যাতি লাভ করে। বি. ভি.র নেতৃত্ব শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীসঙ্ঘের নেতৃত্ব ৺অনিলচন্দ্র রায় গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে শ্রীযুক্তা লীলা নাগ (রায়) এই বিপ্লবী দলে যোগদান করেন এবং দলের দ্বিধাবিভক্তির পর শ্রীসঙ্ঘের নেতৃত্বের দায়িত্ব ৺অনিলচন্দ্র রায়ের সহিত তাঁহার উপরও আসিয়া পড়ে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ‘দীপালি সমিতি’, ‘জয়শ্রী’ পত্রিকা, ‘নারীশিক্ষা মন্দির’, ‘শিক্ষাভবন’, ‘ছাত্রীভবন’ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের নারী-আন্দোলনের অগ্রদূত ছিল। শ্রীলীলা রায়ের বিপ্লবী-আন্দোলনে যোগদান একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা যাহার ফলে শিক্ষিতা মেয়েদের মধ্যে এক নূতন প্রেরণা আসে।

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, ঢাকা—জেলে ২১ বছর, ৫০ দিন অনশন, ৩৬ মাস পলাতক, হরিদাস দত্ত, রংপুর—জেল ১৮ বছর, ২৪ মাস পলাতক, অতুল

চন্দ্র রায়, ঢাকা—জেল ১৬ বছর, ২৪ দিন অনশন, সত্যরঞ্জন বক্সী, বরিশাল—জেল ১৬ বছর, শ্রীযুক্তা লীলা রায়, শ্রীহট্ট ও ঢাকা—জেল ১৬ বছর, ৫৪ দিন অনশন, ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়, ঢাকা—জেল ১৬ বছর, সত্যভূষণ গুপ্ত, ঢাকা—জেল ১৬ বছর, মণীন্দ্র কিশোর রায়, ঢাকা—জেল ১৬ বছর, অনিলচন্দ্র ঘোষ, ঢাকা—পলাতক প্রায় ৫ বছর, জেল ৫ বছর, শৈলেশচন্দ্র রায়, ঢাকা—জেল ১০ বছর, নিকুঞ্জলাল সেন, ঢাকা—জেল ১৬ বছর, বিনয়ভূষণ সেনগুপ্ত, ঢাকা—জেল ১৬ বছর, জ্যোতিষ চন্দ্র জোয়ারদার, ময়মনসিং—জেল ১৬ বছর, রসময় শূর, নোয়াখালী—জেল ৬ বছর, ২৪ মাস পলাতক, ভূপালচন্দ্র বসু, ঢাকা—জেল ১৬ বছর, ভবেশচন্দ্র নন্দী, ঢাকা—জেল ১৬ বছর, জ্যোতিষ গুহ, ঢাকা—১৫ বছর, সুনীল দাস, ঢাকা—জেল ১০ বছর, সুপতি রায়, ঢাকা—জেল ১৪ বছর, অতীন্দ্রনাথ বসু, মালখাঁনগর, ঢাকা—জেল ৩ বছর, শ্রীমতী হেলেনা দত্ত, ঢাকা—জেল ১২ বছর, বীরেন পোদ্দার, ঢাকা—জেল ১০ বছর, বিনয় বসু, ঢাকা—জেল ১০ বছর, বঙ্গেশ্বর রায়, ঢাকা—জেল ১০ বছর, সুকুমার ঘোষ, ঢাকা—জেল ১০ বছর, নিরঞ্জীব রায়, ঢাকা—জেল ১০ বছর, অমলচন্দ্র নন্দী, ঢাকা—জেল ১০ বছর, বিমল চন্দ্র নন্দী, ঢাকা—জেল ১০ বছর, উজ্জ্বলা মজুমদার, ঢাকা—জেল ১০ বছর, অমর সেন, ঢাকা—জেল ১০ বছর, বিমল দাশগুপ্ত, মেদিনীপুর—জেল ১০ বছর, ২৪ মাস পলাতক, সুকুমার দত্ত, ঢাকা—জেল ১২ বছর। সুরেন সরকার, পাবনা—জেল ১৪ বছর।

শ্রীমতী রেণুকা সেন—ঢাকা, সুশীলা দাশগুপ্তা…ঢাকা, প্রমীলা দাশগুপ্তা…ঢাকা, শৈল সেন—ঢাকা, আশা রায়—রাজসাহী, উমা গুহ—বাঁকুড়া, ছায়া গুহ—ঢাকা, লাবণ্য দাশগুপ্তা—ঢাকা, গৌরী সেন—ঢাকা, রেবতীমোহন বর্ম্মণ—শিমুলকান্দী, ময়মনসিং, ললিতমোহন বর্ম্মণ—ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, নেপাল নাগ—ঢাকা, অর্দ্ধেন্দু ভট্টাচার্য্য—ঢাকা, তেজোময় ঘোষ—ঢাকা, সুধীরচন্দ্র নন্দী—ঢাকা, নরেন্দ্রনাথ দাশ—মেদিনীপুর, পরিমল রায়—মেদিনীপুর, নিখিল রায়—মেদিনীপুর, প্রভাংশু পাল—মেদিনীপুর, কামাখ্যা ঘোষ—মেদিনীপুর, হরিপদ ভৌমিক—মেদিনীপুর, অমর চ্যাটার্জি—মেদিনীপুর, ক্ষিতীশ সেনগুপ্ত—মেদিনীপুর, বিনয়জীবন ঘোষ—মেদিনীপুর,

জ্যোতিজীবন ঘোষ—মেদিনীপুর, বীরেন দে—ঢাকা, বিনয় রায়—ঢাকা, প্রভাতচন্দ্র নাগ—ঢাকা, সমর গুহ—ঢাকা, বারীন রায়—ঢাকা, অমূল্যকাঞ্চন দত্ত—কুমিল্লা, বীরেন ভট্টাচার্য্য—কুমিল্লা, মণীন্দ্র সরকার—ঢাকা, বীরেন ঘোষ—ঢাকা, শশাঙ্ক দাশগুপ্ত—ঢাকা।

স্বাধীনতা লাভের পর

১৯৭৬ সনের ১৫ই আগষ্ট কলিকাতায় দাঙ্গা হয়। স্বদেশী আন্দোলনের সময়, ১৯০৫-৬ সনে যখন আমরা বিপ্লব দলে যোগদান করি, তখন আমাদের স্বাধীনতার কল্পনায় সাম্প্রদায়িক মনোভাব ছিল না, আমাদের কল্পনায় ছিল দেশ এবং জাতি। দেশের স্বাধীনতা সকলে, সকল সম্প্রদায়ের লোক, সমানভাবে ভোগ করিবে। মুক্তির পর আমাদিগকে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইল। তখন ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুব জটিল ছিল। ইতিমধ্যে কু-খ্যাত নোয়াখালী দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে, তাহার প্রতিক্রিয়া বিহারে দেখা গিয়াছে। আমি তখন কলিকাতায় ছিলাম। নোয়াখালী দাঙ্গা বিধ্বস্ত অঞ্চলে গভর্ণমেণ্ট শান্তি স্থাপনের জন্য সশস্ত্র-পুলিশ বাহিনী প্রেরণ করিলেন। আমি বন্ধুদের সহিত পরামর্শ করিয়া নোয়াখালী রওয়ানা হইলাম। দত্তপাড়া দেওয়ানজী বাড়ীতে কেদারেশ্বর গুহ নামে আমাদের দলের একজন সভ্য ছিলেন, আমি দত্তপাড়া পৌঁছিলাম। তখন দাঙ্গা বন্ধ হইয়াছে, লোক চলাচল সুরু হয় নাই। স্থানে স্থানে রিফিউজী ক্যাম্প স্থাপিত হইয়াছে, ক্যাম্পে সশস্ত্র-পুলিশ পাহারা দিতেছে। এমন সময় মহাত্মা গান্ধী সদলবলে দত্তপাড়া উপস্থিত হইলেন।

মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে ছিলেন, তাহার নাতনী মনু গান্ধী নাত-বৌ আভা গান্ধী, প্যারি লাল, জীবন সিং, সেক্রেটারী মহাদেব দেশাই, বিভিন্ন সংবাদ পত্রের দেশী ও বিদেশী প্রতিনিধিগণ। মহাত্মা গান্ধীর দেহ রক্ষার জন্য

গভর্ণমেণ্ট ২৫ জন বন্দুকধারী সিপাহী এবং হাবিলদার প্রভৃতি পাঠাইলেন। পুলিসের গুপ্ত বিভাগের লোকও কিছু ছিল। সমগ্র ভারত এবং পৃথিবীর বৃহৎ রাষ্ট্র সমূহের নজর নোয়াখালীর উপর পড়িল। মহাত্মা গান্ধী দত্তপাড়া কয়েক দিন অবস্থানের পর ঘোষণা করিলেন, তিনি প্রত্যেক দিন পদব্রজে একটি করিয়া দাঙ্গা বিধ্বস্ত গ্রামে যাইবেন এবং এক রাত্রি বাস করিবেন। শান্তি স্থাপন না হওয়া পর্যন্ত তিনি এইরূপ ভাবে দাঙ্গা বিধ্বস্ত অঞ্চলে ঘুরিতে থাকিবেন এবং এভাবে তিনি মৃত্যু বরণ করিবেন। তিনি রাজনৈতিক প্রতিভার পরিচয় দিলেন। ৭৮ বৎসর বয়সে, এই শীতকালে তিনি খালি গায়, খালী পায় প্রত্যহ প্রাতে এক গ্রাম হইতে অপর গ্রামে যাইতে লাগিলেন।

মহাত্মা গান্ধীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, বিপ্লবী সমাজ তন্ত্রী দল (R. S. P.), রামকৃষ্ণ মিশন এবং আরো বহু দল দাঙ্গা বিধ্বস্ত অঞ্চলে সাহায্য দানের জন্য বিভিন্ন স্থানে সাহায্য কেন্দ্র স্থাপন করিলেন। মহাত্মা গান্ধীর শিষ্য সতিশ চন্দ্র দাস গুপ্তের প্রধান কেন্দ্র ছিল কাজির মিল, নাম "গান্ধি ক্যাম্প"।

জাতীয় কংগ্রেসের প্রধান কেন্দ্র ছিল চৌমুহনী, সেক্রেটারী ছিলেন হারাণ চন্দ্র ঘোষ চৌধুরী। আমার প্রধান কেন্দ্র ছিল জয়াগ। জয়াগ জমিদার বাড়ীতে একটি রিফিউজী ক্যাম্প ছিল। এই গ্রামের প্রতুল চৌধুরী আমাদের দলের সভ্য ছিলেন। বিভিন্ন দাঙ্গা বিধ্বস্ত অঞ্চলে রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্র ছিল।

মহাত্মা গান্ধী যখন এক গ্রাম হইতে অপর গ্রামে রওয়ানা হইতেন, তাহার সঙ্গে প্রায় দুইশত লোকের শোভা যাত্রা চলিত। মহাত্মা গান্ধী ও তাহার সহচরগণ ব্যতীত সঙ্গে থাকিতেন, বিভিন্ন দেশের সংবাদ পত্রের প্রতিনিধিগণ, ২৫ জন বন্দুকধারী সিপাহী, হাবিলদার, পুলিশ অফিসার, ভলান্টিয়ার ও দর্শক বৃন্দ। থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা প্রত্যেকের নিজের। মহাত্মা গান্ধী যখন এক গ্রাম হইতে অপর গ্রামে পৌছিতেন, তখন সেই গ্রামের সংখ্যালঘুরা মনে করিতেন, "ভগবান আমাদের মুক্তির জন্য ত্রাণ কর্তা

পাঠাইয়াছেন,” দুষ্কৃতকারীরা পুলিশ ও বন্দুকধারী সিপাহী দেখিয়া ভয়ে গ্রাম ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল। প্রত্যহ বৈকালে উভয় সম্প্রদায়ের লোক লইয়া প্রার্থনা সভা হইত এবং প্রার্থনার পর মহাত্মা গান্ধী উপদেশ দিতেন। সুফল ফলিতে লাগিল, অবস্থার উন্নতি হইতে লাগিল। মহাত্মা গান্ধী যখন আমার কেন্দ্রে উপস্থিত হইলেন, তখন আমি সেই দেশী কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিলাম।

মহাত্মার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে একদল মেয়ে লোক খোল কর্ত্তাল বাজাইয়া নৃত্য করিতে করিতে কীর্ত্তন গাইতে লাগিল, মহাত্মা দশ মিনিট দাঁড়াইয়া শুনিলেন। মহাত্মা গান্ধী যখন নোয়াখালী ছিলেন, তখন পণ্ডিত জওহর লাল নেহরু, সর্দ্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের প্রধান প্রধান নেতারা মাঝে মাঝে দাঙ্গা বিধ্বস্ত অঞ্চলে যাইয়া মহাত্মা গান্ধীর সহিত দেখা করিয়াছেন। বাংলা দেশ হইতেও শরৎ চন্দ্র বসু, শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি, ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়, মাঝে মাঝে দাঙ্গা বিধ্বস্ত অঞ্চলে গিয়াছেন। বাংলার প্রধান মন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দ্দী সাহেবও দত্তপাড়া যাইয়া মহাত্মা গান্ধীর সহিত দেখা করিয়াছেন। আমি তখন দত্তপাড়া উপস্থিত ছিলাম।

কিছুদিন পর মহাত্মা গান্ধী তাহার সঙ্গীদিগকে নির্দ্দেশ দিলেন, সকলে একত্র থাকিতে পারিবে না, প্রত্যেকে এক একটি খালি গ্রামে, পোড়া বাড়ীতে, নারিকেল পাতা দিয়া ঘর উঠাইয়া একা থাকিবে। তিনি প্রথম নির্দ্দেশ দিলেন, তাহার ১৮ বৎসর বয়স্কা নাত্‌নী মনু গান্ধীর উপর। মহাত্মার এই নির্দ্দেশের জন্য সকলেই চিন্তিত, ভীত কিন্তু মহাত্মা গান্ধী অচল অটল। মনু গান্ধী একখানা গ্রামে, পোড়াবাড়ীতে, নারিকেল পাতার ঘরে রাত্রে একা কাটাইতে লাগিলেন। অন্যান্য সকলেও সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলেন, প্রত্যেকে এক এক গ্রামে যাইয়া বসিলেন। লোকের মনে সাহস সঞ্চার হইল, যাহারা ভয়ে গ্রাম ছাড়িয়া পালাইয়া গিয়াছিল, আস্তে আস্তে তাহারা আবার নিজ নিজ গ্রামে ফিরিয়া আসিল। সুচেতা কৃপালানী, জীবন সিং, প্যারীলাল প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রামে বসিয়া গঠন মূলক কাজ করিতে

লাগিলেন। কাজের মধ্যে ছিল সাম্প্রদায়িক ঐক্য স্থাপন ও চরকা প্রচলন। জয়াগ জমিদার বাড়ীর অপর হিস্যার মালিক ছিলেন হেমন্ত কুমার ঘোষ, ব্যারিষ্টার, তিনি লক্ষ্ণৌ থাকিতেন, তাহার পুত্র ছিল না, দুই কন্যা ছিল, তিনি দেশে আসিতেন না তাহার ভগ্নিপতি সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেন। হেমন্ত বাবুর ভাগিনেয়গণ আমাদের দলভুক্ত ছিল। আমার কেন্দ্র হেমন্তবাবুর বাড়ীতে ছিল। জয়াগ রিফিউজী ক্যাম্পে আমকী গ্রামের যশোদা কুমার দে, কবিরাজ সপরিবারে ছিলেন। যশোদা বাবুর স্ত্রী আমাকে ধর্মের বাপ ডাকিলেন এবং যশোদা বাবু প্রস্তাব করিলেন, তিনি আমার খাওয়ার ব্যবস্থা করিবেন। হেমন্ত বাবু মহাত্মা গান্ধীর নিকট প্রস্তাব করিলেন, তাহার সম্পত্তি গঠন মূলক কাজের জন্য মহাত্মা গান্ধীকে দান করিবেন।

মহাত্মা গান্ধী এই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। ইহার পর হেমন্ত বাবুর ভগ্নিপতি এবং ভাগিনেয়গণ প্রস্তাব করিলেন আমি যেন এই সম্পত্তি গ্রহণ করি। আমি এই প্রস্তাবে রাজী হইলাম না, কারণ আমার ইচ্ছা ছিল গ্রামে বসিয়া গঠনমূলক কাজ করিব। ইহার পর সতীশ চন্দ্র দাস গুপ্ত হেমন্ত বাবুর সহিত ব্যবস্থা করিয়া এই সম্পত্তি নিজ নামে লেখাইয়া লন। আমার জয়াগ ত্যাগ করার পর সতীশবাবু তাহার কেন্দ্র কাজির মিল হইতে জয়াগ গ্রামে স্থানান্তরিত করেন।

দাঙ্গার পর বিধ্বস্ত অঞ্চলে কোন স্কুল ছিল না, ডাক্তার ছিল না, ডিস্পেন্সারী ছিল না। আমার ৪টি কেন্দ্র ছিল, আমি প্রত্যেক কেন্দ্রে স্কুল এবং হোমিওপ্যাথী ডিস্পেন্সারী স্থাপন করিলাম। আমি জয়াগ কেন্দ্রে একটি প্রাইমারী স্কুল স্থাপন করিলাম এবং উক্ত গ্রামের অর্পণা ঘোষকে মাসিক দশ টাকা বেতনে শিক্ষক নিযুক্ত করিলাম। আমি ছাত্র ছাত্রীদের বই শ্লেট পেন্সিলের ব্যবস্থা করিলাম। আমি জয়াগ গ্রামে একটি হোমিওপ্যাথী ডিস্পেন্সারী স্থাপন করিলাম, দাতা মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্যের পুত্র হেরম্ব ভট্টাচার্যের নিকট হইতে আমার কেন্দ্র সমূহের জন্য ঔষধের ব্যবস্থা করিলাম। জয়াগ কেন্দ্রে ডাক্তার নিযুক্ত হইল, আমাদেরই দলের সভ্য ডাঃ কৃষ্ণ চন্দ্র সাহা। আমকী কেন্দ্রে যশোদা কুমার দে কবিরাজের বাড়ীতে আমার গ্রামের পরিমল রায়কে শিক্ষক, ডাক্তার এবং কর্মী হিসাবে বসাইলাম। আমার গ্রামেঃ

রাজেন্দ্র কুমার চক্রবর্তীকে এক গ্রামে বসাইলাম। কাজ চলিতে লাগিল, সুফল ফলিতে লাগিল। কাজের মধ্যে বড় কাজ ছিল, সাম্প্রদায়িক ঐক্য স্থাপন, খাদী ও চরকা প্রচলন। আমি বিধ্বস্ত অঞ্চলে প্রায় প্রত্যেক গ্রামে গিয়াছি, হাইমচড গিয়াছি, দালাল বাজার গিয়াছি, প্রায় হাঁটিয়াই সর্ব্বত্র যাইতে হইয়াছে। সতীশ বাবু তাহার কাজিরখিল কেন্দ্রে বাঁশের চরখা তৈয়ার করার ব্যবস্থা করিজেন। পূর্ব্ব পাকিস্তানে বাঁশের অভাব নাই, কাঠের চরকা অপেক্ষা বাঁশের চরকায় খরচ খুব কম পড়ে। আমি পরিমল এবং রাজেন্দ্রকে কাজিরখিল পাঠাইয়া বাঁশের চরখা তৈয়ার করা শিখাইলাম, উদ্দেশ্য আমার গ্রামে বাঁশের চরখা তৈয়ার কেন্দ্র স্থাপন করিব।

আমি নোয়াখালিতে প্রায় দেড বৎসর ছিলাম। দেশ বিভাগ যখন হয় তখন আমি দাঙ্গা বিধ্বস্ত অঞ্চলে ছিলাম। ঐ সময় পাক ভারতের পরিস্থিতি অত্যন্ত উত্তেজনা পূর্ণ ছিল। দেশ ত্যাগের হিড়িক চলিতে লাগিল, রাজনৈতিক নেতা এবং কর্ম্মীরা প্রায় সকলেই চলিয়া গেলেন। আমি স্থির করিলাম, আমি দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব না, আমি পাকিস্তানেই থাকিব; পাকিস্তানের জনগণের সুখ দুঃখের অংশ গ্রহণ করিয়াই থাকিব। এই দেশ, পূর্ব্ব বঙ্গ, আমার দেশ; আমার পিতৃ পিতামহের স্মৃতি জড়িত দেশ, আমি এই দেশ কেন ত্যাগ করিয়া যাইব? আমাদের ব্যক্তিগত ভাবে চিন্তা করিলে চলিবে না; সমষ্টিগত ভাবে চিন্তা করিতে হইবে।

দেশ ত্যাগ, সমস্যার সমাধান নয়, দেশে থাকিয়াই সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। আমি যদি দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই, তবে আমি যাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলাম, তাহাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে। আমি দেখিলাম সাম্প্রদায়িক সমস্যা জটিল আকার ধারণ করিয়াছে, সংখ্যালঘুদের মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, এরূপ অবস্থায় আমার দেশত্যাগ চলিবে না, আমার এই দেশেই থাকিতে হইবে, আমি এই দেশে থাকিয়াই দেশের জনগণের সেবা করিব। আমি স্থির করিলাম আমি আমার গ্রামে থাকিয়া গঠন মূলক কাজ করিব, আমার গ্রামকে একটি আদর্শ গ্রামে পরিণত করিব। আমি গান্ধী ক্যাম্পের সহিত সহযোগিতায় কাজ করিতাম। একদিন আমি সতীশ দাসগুপ্ত মহাশয়কে বলিলাম, নোয়াখালীর অবস্থা এখন স্বাভাবিক হইয়াছে, এখন এখানে আপনার

এবং আমার দুইজনের থাকার কোন প্রয়োজন নাই, আমার প্রতিষ্ঠানগুলি আপনার হাতে দিয়া, আমি নিজ গ্রামে গিয়া গঠন মূলক কাজ করিব। আমি একদিন আমার ৪ কেন্দ্রের কর্ম্মীদিগকে সতীশ বাবুর নিকট ডাকাইয়া পরিচয় করাইয়া দিলাম, তাহার মধ্যে আমকীর যশোদা বাবুও ছিলেন। আমার জয়াগ কেন্দ্রের তহবিলে ৮০্ টাকা ছিল, অন্যান্য কেন্দ্রেও কিছু টাকা ছিল, আমি সব টাকা এবং কর্ম্মীদিগকে সতীশ বাবুর হাতে দিয়া মুক্ত হইলাম। আমি পরিমল এবং রাজেন্দ্রকে বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলাম। মহাত্মা গান্ধী যখন নিহত হন, তখন আমি জয়াগ ছিলাম। মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া আমি তৎক্ষনাৎ কাজিরমিল রওয়ানা হইলাম, ১২।১৪ মাইল রাস্তা হাঁটিয়া গেলাম। সেখানে হিন্দু মুসলমান, বহু লোক সমবেত হইয়াছে, কাহারো মুখে শব্দ নাই, সকলেরই চোখ দিয়া জল পড়িতেছে, কি করুণ দৃশ্য!

১৯৪৮ সনে বরিশাল শহরে সোস্যালিষ্ট পার্টির কন্‌ফারেন্স ডাকা হয়, আমি ছিলাম সেই কন্‌ফারেন্সের সভাপতি। দেশ বিভাগের পূর্ব্বে আমরা সর্ব্ব ভারতীয় সোস্যালিষ্ট পার্টির সভ্য ছিলাম, দেশ বিভাগের পর সোস্যালিষ্ট পার্টি দুই ভাগে বিভক্ত হইল। বরিশাল কন্‌ভেন্সনে স্থির হইল পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান মিলিতভাবে "পাকিস্তান সোস্যালিষ্ট পার্টি" নামে স্বাধীন ভাবে সোস্যালিষ্ট পার্টি গড়িয়া উঠিবে, ভারতের সোস্যালিষ্ট পার্টির সহিত কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। কনফারেন্সে বিভিন্ন জেলা হইতে প্রতিনিধি আসিয়াছিল, প্রকাশ্য সভা, আমার অভিভাষণ পুস্তিকা-কারে বাহির হইল। কন্‌ফারেন্সে স্থির হইল, পাকিস্তান সোস্যালিষ্ট পার্টির চেয়ারম্যান ত্রৈলোক্য নাথ চক্রবর্তী, সেক্রেটারী মোবারক সাগর (করাচী) এবং প্রফেসার পুলিন দে (চট্টগ্রাম)। কার্য্যকারী সভ্যদের মধ্যে ছিলেন মুহম্মদ ইউসুফ (লাহোর) দেবেন্দ্র নাথ ঘোষ (বরিশাল) প্রভৃতি। পাকিস্তান সোস্যালিষ্ট পার্টির ভবিষ্যৎ মন্দ ছিল না, কিন্তু অবস্থার চাপে অগ্রসর হইতে পারে নাই। যেখানে সাম্প্রদায়িকতা ও দুর্নীতি সেখানে সমাজতন্ত্রবাদ চলিতে পারে না। সমাজতন্ত্রবাদের জন্য প্রয়োজন সমাজতান্ত্রিক আবহাওয়া তৈয়ার করা। পাকিস্তান সমাজতান্ত্রিক নেতারা সেই আবহাওয়া তৈয়ার করিতে পারেন

নাই। দেশের মধ্যে দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার উৎসব চলিতে ছিল, তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ক্ষমতা তাহাদের ছিল না। সমাজতন্ত্রবাদের জন্য প্রয়োজন মানুষের মন তৈয়ার করা, মানুষের প্রতি মানুষের একাত্মবোধ বা মমত্বভাব জাগান। আমি এবং আমার প্রতিবেশী এক, সকলের একরূপ অভাব, একরূপ প্রয়োজন, সকলে এক সঙ্গে উৎপাদন করিব, সমান ভাবে ভাগ করিয়া খাইব। এই মনোভাব জাগান বল প্রয়োগ দ্বারা বা আইন প্রণয়ন দ্বারা সম্ভবপর নয়, শিক্ষার দ্বারাই সম্ভবপর। সেই শিক্ষা দেওয়ার ব্যয় ভার চালানোর ক্ষমতা সমাজতন্ত্রীদের ছিল না। এমন কি একটা অফিস রাখার ক্ষমতাও ছিল না। সমাজতন্ত্রী দলকে কে অর্থ সাহায্য করিবে? নেতারা সবই ছিলেন গরীব। যাহা হউক সমাজতন্ত্রী দল কোন প্রকারে অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিল।

এশিয়ান সোস্যালিষ্ট কন্‌ফারেন্স রেঙ্গুন হইবে, ব্রহ্মদেশের দেশরক্ষা মন্ত্রী অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই কন্‌ফারেন্সে ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী এট্‌লী সাহেব উপস্থিত থাকিবেন। অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে সব দেশের সোস্যালিষ্ট পার্টিকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে, পাকিস্তান সোস্যালিষ্ট পার্টির চেয়ারম্যান হিসাবে আমিও নিমন্ত্রণ পত্র পাইলাম। আমি শুধু মামুলি নিমন্ত্রণ পত্র পাই নাই, অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান দেশরক্ষা মন্ত্রী আমাকে ব্যক্তিগতভাবে আর একখানা চিঠি লিখিয়া অনুরোধ করিলেন, আমি নিশ্চয়ই যেন সভায় উপস্থিত থাকি, কারণ তাহারা পাকিস্তান সম্বন্ধে interested. আমার পাসপোর্ট (passport) ছিল না, আমি পাসপোর্টের জন্য পূর্বেই দরখাস্ত করিয়াছিলাম। আমি পূর্ব্বেই রাজবন্দী হিসাবে ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন জেলে ছিলাম, পলাতক অবস্থায়ও ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন স্থানে ছিলাম, আমার কিছু পরিচিত লোকও সেখানে ছিল, এজন্য ব্রহ্মদেশে যাওয়ার আমার খুব ইচ্ছা ছিল। আমি ঢাকা গিয়া পাসপোর্টের দরবার করিলাম, মুখ্যমন্ত্রী, ডি, আই, জি, আই, বি, সাহেবকে ধরিলাম, শেষ পর্য্যন্ত পাসপোর্ট পাওয়া গেল না। কন্‌ফারেন্স বসার কয়েকদিন পূর্ব্বে আমি ঢাকা হইতে ষোল টাকা দশ আনা খরচ করিয়া কন্‌ফারেন্সের চেয়ারম্যান এর নিকট কন্‌ফারেন্সের সাফল্য কামনা করিয়া

এবং আমার পাসপোর্ট না পাওয়ায় কনফারেন্সে উপস্থিত হইতে পরিলাম না জানাইয়া টেলিগ্রাম করিলাম। ঐ কনফারেন্সে এটলী সাহেব উপস্থিত ছিলেন, আমাদের পশ্চিম পাকিস্তানের সেক্রেটারী মোবারক সাগরও উপস্থিত ছিলেন। আমার টেলিগ্রাম কনফারেন্সে পাঠ করা হইল এবং সভায় চাঞ্চল্য দেখা গেল। মোবারক সাগর এবং কয়েক জন প্রতিনিধি পাকিস্তান গভর্ণমেন্টের রেঙ্গুনস্থ এম্বেসেডার এর সহিত দেখা করিয়া আমার পাসপোর্ট না দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন, তিনি ইহার কিছুই জানেন না। কনফারেন্স শেষ হওয়ার পর মোবারক সাগর রেঙ্গুন হইতে ঢাকা আসিয়া আমাদের সহিত দেখা করেন। ইহার পর গভর্ণমেন্ট আমাকে পাসপোর্ট দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হইলেন। আমি তখন বাড়ী ছিলাম। একজন আই, বি, অফিসার ৫১ নং হেমেন্দ্র দাস রোডে যাইয়া আমার খবর দিলেন এবং বলিয়া আসিলেন, আমি যেন আই, বি, অফিস হইতে আমার পাসপোর্ট লইয়া আসি। ইহার পর কুলিয়ারচর থানার দারোগা সাহেব একদিন আমার বাড়ী যাইয়া এই শুভ সংবাদ দিলেন যে আমার পাসপোর্ট তৈয়ার হইয়াছে আমি ঢাকা যাইয়া আই, বি, অফিস হইতে যেন আমার পাসপোর্ট লইয়া আসি। আমি ঢাকা গিয়া ডি, আই, জি, আই, বি, এফ, আর, খন্দকার সাহেবের সহিত তাহার অফিসে দেখা করি। তখন রেঙ্গুনে কনফারেন্স হইয়া গিয়াছে, আমি ৬ মাসের জন্য ভারতের পাসপোর্ট পাইলাম। আমি তখন খন্দকার সাহেবকে বলিলাম, "আপনারা আমাকে রেঙ্গুনের পাসপোর্ট না দিয়া কোন বুদ্ধিমানের কাজ করিলেন? আমি রেঙ্গুন কনফারেন্সে পাকিস্তানের পক্ষেওত দু-চার কথা বলিতে পারিতাম। আর যদি আমি বিরুদ্ধে কিছু বলিতাম, তবে দেশে ফিরিয়া আসিলে পরত আমাকে গ্রেপ্তার করিয়া জেলে আটক করিয়া রাখিতে পারিতেন। আপনাদের কি লাভ হইল?"

আমি ১৯০৮ সন হইতে ১৯৪৮ সন পর্যন্ত, হয় গভর্ণমেন্টের অন্নে, নয়, বন্ধু-বান্ধবের অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছি, বাড়ীর ভাত খুব কমই খাইয়াছি। আজ সুদীর্ঘ ৪০ বৎসর পর বাড়ীতে বসিলাম, গ্রামে বসিয়া গঠনমূলক কাজ করার জন্য। দেশ এখন স্বাধীন হইয়াছে, এখন সংগ্রাম বিদেশী গভর্ণমেন্টের

বিরুদ্ধে নয়, সংগ্রাম নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে, দারিদ্রের বিরুদ্ধে, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। এখন আর ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিতে হইবে না, জেল দ্বীপান্তরে পচিতে হইবে না, এখন গভর্ণমেন্টই হইবে সহায়ক। স্বাধীনতা লাভের পর দেশপ্রেমিকদের কর্ত্তব্য জাতীয় সকল প্রকার দুর্ব্বলতা দূর করিয়া জাতিকে সবল করিয়া গড়িয়া তোলা, জাতীয় চরিত্র গড়িয়া তোলা। চরিত্রই জাতির মেরুদণ্ড। একটা জাতির মধ্যে যদি, সাম্প্রদায়িকতা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও দুর্নীতি থাকে তবে সেই জাতি কখনও বড় হইতে পারে না। আমি স্থির করিলাম, আমার গ্রাম এবং আমার অঞ্চলকে আদর্শ গ্রামে পরিণত করিব। আমার অঞ্চলে কেহ অশিক্ষিত থাকিবে না, বেকার থাকিবে না, অনাহার-অ-চিকিৎসায় কাহারও মৃত্যু হইবে না, মামলা মোকদ্দমা আপোষ নিষ্পত্তি হইবে। আমি আমার গ্রামে বাঁশের চরকা তৈয়ারের কারখানা স্থাপন করিলাম, চরকা তৈয়ারের যন্ত্রপাতি ক্রয় করিলাম, পরিমল ও রাজেন্দ্র চরকা তৈয়ার করিতে লাগিল। গ্রামে বাঁশের অভাব নাই, কিছু বাঁশ ক্রয় করিলাম, কিছু সংগ্রহ করিলাম। আমি আমার গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিলাম, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিলাম, লাইব্রেরী স্থাপন করিলাম, দুইখানা তাঁত বসাইলাম। আমি রাজেন্দ্র চক্রবর্তী এবং পরিমল রায়ের হাত খরচ বাবদ মাসিক ৩০্ টাকা এবং ২০্ টাকা ধার্য করিলাম। চরকা তৈয়ার হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের মেয়েদের মধ্যে বিতরণ হইতেছে। তূলা সংগ্রহ করিয়াছি, তূলা বিতরণ করিতেছি, পরিমল ও রাজেন্দ্র সকলকে সূতাকাটা শিখাইতেছে, মেয়েদের মনে খুব উৎসাহ। গ্রামে একটি সরকারী স্কুল ছিল, আমি একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিলাম। গ্রামের একটি মহিলাকে মাসিক দশ টাকা বেতনে শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিলাম। ছাত্রীদের পুস্তক, শ্লেট-পেন্সিল আমি ক্রয় করিয়া দিলাম, স্কুলে কাজ চলিতে লাগিল। আমি মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের দোকান হইতে অর্দ্ধমূল্যে হোমিওপ্যাথী ঔষধ ক্রয় করিলাম এবং আমাদের গ্রামের ডাঃ সতীশচন্দ্র রায়কে দিয়া দাতব্য চিকিৎসালয় খুলিলাম। আমি জেলখানায় এলাউন্সের টাকা হইতে বহু বই ক্রয় করিয়াছিলাম, আমার বইগুলি গ্রামের লাইব্রেরীর জন্য দান করিলাম। গ্রামের লোক লাইব্রেরীর

নাম রাখিল "ত্রৈলোক্য পাঠাগার" এই পাঠাগারে কলিকাতা হইতে মাসিক বসুমতি, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, দৈনিক আনন্দ বাজার পত্রিকা আসিতে লাগিল। আরো অনেকে অনেক বই পাঠাইল, দুই আলমারী বই হইল। আমার কেন্দ্রে প্রায় একশত চরকা তৈয়ার হইয়াছে, কর্মীরা খুব উৎসাহের সহিত সুতা কাটিতেছে। আমি কর্মীদিগকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য চরকা সঙ্ঘের নিয়ম অনুসারে সুতা কাটার মজুরীর টাকা দিয়া সুতা আমি ক্রয় করিয়া লইতাম। আমি তাঁতের স্কুল খুলিলাম, আমার কেন্দ্রে দুই খানা তাঁত বসাইয়াছিলাম, আমার এক রাজনৈতিক বন্ধুর সাহায্যে তাহার আত্মীয় যতীন্দ্র দে কে তাঁতের মাষ্টার নিযুক্ত করিলাম, সে আমার বাড়ীতেই খাওয়া দাওয়া করিবে, থাকিবে, তাহার হাত খরচের জন্য মাসিক ৩০ টাকা দিব। আমি চিত্তরঞ্জন কটন মিলের কর্তা শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ বসুর নিকট হইতে এক মণ পাঁজ করা তুলা আমার কেন্দ্রের জন্য দান হিসাবে সংগ্রহ করিলাম। আমার কেন্দ্রের কর্মীদিগকে আমি চরকা এবং তুলা বিনা মূল্যে দিয়াছি।

২২শে বৈশাখ, গ্রামের লোক খুব উৎসাহের সহিত আমার জন্ম তিথি পালন করিত। বৎসরের মধ্যে এই দিনটি ছিল গ্রামের ছেলে-মেয়েদের খুব অনন্দের দিন। এই জন্মতিথি উপলক্ষে বিকালে সভা হইত, কর্মীরা এবং গ্রামের লোক একত্র হইয়া আলাপ আলোচনা করিত। চরকা বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ স্বাস্থ্য বিভাগের কাজের খতিয়ান করা হইত। গ্রামের রাস্তাঘাট, পানীয় জল, মাঠের ফসল সকল বিষয়ের আলাপ আলোচনা হইত। গ্রাম হইবে একটি আদর্শ পরিবার। গ্রামের প্রত্যেকে প্রত্যেকের সুখ সুবিধা দেখিবে। সভায় সুতা কাটা হইত, যাহারা ভাল সুতা কাটিতেন তাহাদিগকে পুরস্কার দেওয়া হইত। সভা শেষে সকলের মধ্যে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হইত। কুলিয়াচর বাজারে তখন দুধ সস্তা ছিল মিষ্টান্নের চাউল ক্রয় করার প্রয়োজন হইত না, কাজেই খরচ খুব বেশী হইত না, উৎসবের ব্যয় ভার গ্রামের কয়েক জন বহন করিতেন। আমারও চাঁদা ধরা হইত, ব্যবস্থা প্রচুরই থাকিত, গ্রামের বউ-ছেলে-মেয়ে সকলেই মিষ্টান্নের অংশ গ্রহণ করিত। সভা শেষে গানের ব্যবস্থা থাকিত। আমি প্রথম প্রথম

আমার কর্মীদিগকে আমার জন্ম তিথি পালনে উৎসাহ দিয়াছি, আমি মনে করিয়াছি, একটা উপলক্ষ করিয়া গ্রামের লোকের একত্র হওয়ার প্রয়োজন আছে। কিন্তু পরে যখন আমার কেন্দ্রের দুর্দিন চলিতেছিল, তখন আমিই আমার জন্ম তিথি পালন বন্ধ করিয়া দিলাম। আমি মনে করিলাম, আমার জন্ম তিথি পালন করা ভণ্ডামী ছাড়া আর কিছু নয়,কারণ জন্মোৎসব পালনের যোগ্য ব্যক্তি আমি নই। যার প্রতি কাজের মধ্যে ব্যর্থতা, তার আবার জন্মোৎসব কি ? ইতি ১৯২৮ আমার কেন্দ্রে না না শঙ্কট দেখা দিয়াছে, প্রথম শঙ্কট অর্থনৈতিক। আমি আমার কর্মীদের হাত খরচের টাকা নিয়ম মত দিতে পারিতেছি না। আমার ব্যয় হইতেছে কিন্তু আয় নাই। আমার তাঁতের মাষ্টার যতীন্দ্র কয়েক দিনের জন্য বাড়ী গিয়াছিল, কিন্তু সে আর ফিরিল না। আমার কেন্দ্রে সূতা অনেক মজুদ হইয়াছে, কিন্তু তাহা আমি কাজে লাগাইতে পারিতেছি না। আমার একজন তাঁতের মাষ্টার রাখিতে হইলে মাসে ৬০।৭০ টাকা বেতন দিতে হইবে। সেই ক্ষমতা আমার নাই। আশার আলো দেখা দিল। কুলিয়ারচর বাজারে বৃটিশ আমল হইতে প্রায় ১০।১২ বৎসর যাবৎ একটি সরকারী ভ্রাম্যমান বয়ন বিদ্যালয় ছিল। সেখানে কোন কাজ হইত না, সরকারী কর্মচারীরা বসিয়া বসিয়াই বেতন পাইতেন, তাহারা ছিলেন বেকার। কুলিয়াচর আমার বাড়ী হইতে এক মাইল দূর, সরকারী কর্মচারীরা মাঝে মাঝে আমার কেন্দ্রে আসিয়া কাজ দেখিতেন। তাহারা আমাকে পরামর্শ দিলেন, কুলিয়ারচর বয়ন বিদ্যালয়টি আমার গ্রামে স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা করিতে, অথবা উপর হইতে অনুমতি আনিলে তাহারা প্রত্যহ আমর কেন্দ্রে আসিয়া আমার কর্মীদিগকে কাজ শিখাইবেন। কুলিয়ারচর বয়ন বিদ্যালয়ের সরকারী কর্মচারীরা আমার কেন্দ্রে আসিয়া আমার কর্মী ছেলে মেয়েদিগকে কাজ শিখাইতে খুবই উৎসুক ছিলেন। আমি ঢাকা রওয়ানা হইলাম এবং ডিরেক্টার-অব-ইনডাস্ট্রীজ আজম সাহেবের সহিত দেখা করিলাম। আজম সাহেব সহানুভূতির সহিতই আমার কথা শুনিলেন, আমাকে আশ্বাস দিলেন, আমি খুশী হইয়া বাড়ী ফিরিলাম। আমি নিশ্চিন্ত হইলাম, ভ্রাম্যমান বয়ন বিদ্যালয় আমারই কেন্দ্রে ৬ মাস থাকিলে, আমি একদল

কর্মীকে কাজ শিখাইতে পারিব, ভবিষ্যতে আমার কোন চিন্তা থাকিবে না। স্বাস্থ্য মন্ত্রী হবিবুল্লাহ বাহার সাহেব আমার কেন্দ্রে দুই কিস্তিতে ৬ ড্রাম পাউডার মিল্ক দান করিয়াছিলেন, পরিমল ও রাজেন্দ্র প্রত্যহ দুধ তৈয়ার করিয়া গ্রামের এবং আশে পাশের গ্রামের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বিতরণ করিত।

মাঝে মাঝে বাহিরের লোক আমার কেন্দ্রে কাজ দেখিতে যাইতেন, তাহাদের অনেককেই আমি চিনিতাম না। একদিন এক ভদ্রলোক আমার প্রতিষ্ঠান দেখিতে আসিলেন, তখন আমার কেন্দ্রে প্রায় একশত চরকা চলিতে ছিল, কারখানায় আরো চরকা তৈয়ার হইতেছিল। তিনি চরকা তৈয়ার, সূতা কাটা, মেয়েদের স্কুল, লাইব্রেরী সবই দেখিলেন। যাইবার সময় তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি যে এত টাকা খরচ করিয়া এইসব করিতেছেন, আপনার লাভ কি? আমার কি লাভ, কি উত্তর দিব? আমিত ব্যক্তিগত লাভের জন্য কিছুই করিতেছিনা। আমার দেশের অশিক্ষিত দরিদ্র জনগণ যদি উন্নত হয় ইহাইত আমার বড় লাভ। দেশ-প্রেমের স্বাদ যাহারা পায় নাই, ব্যক্তিগত স্বার্থ চিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তা যাহাদের মনে স্থান পায় না, তাহারা কি করিয়া বিশ্বাস করিবে, পাকিস্তানে একজন হিন্দু বিনা স্বার্থে কি করিয়া এই সর্বজন হিতকর কাজ করিতে পারে? তাহাদের মনে এই ধারণা হওয়া স্বাভাবিক, নিশ্চয়ই ইহার পিছনে কোন মৎলব আছে, নতুবা টাকা খরচ করিয়া কেন এই সব করিবে? কি স্বার্থ? অবশ্যই কেহ কেহ আমাকে বলিয়াছিলেন, অর্থ ব্যয় করিয়া কেন এখানে পণ্ডশ্রম করিতেছেন? আপনার কর্মক্ষেত্র এখানে নয়। যাহা হউক আমি আগন্তুক ভদ্রলোককে বলিলাম, আমার অঞ্চলের লোককে স্বাবলম্বী করিব, ইহাই আমার উদ্দেশ্য। আমি জনগণের সেবার জন্য এইসব করিতেছি। তিনি সম্ভবতঃ তাহা বিশ্বাস করিলেন না।

আমার বিশ্বাস ছিল আমার কেন্দ্র স্বাবলম্বী হইবে, তাঁতের উপর আমার বিশ্বাস ছিল বেশী। আমি মাঝে মাঝে ঢাকা যাই। হেমেন্দ্র দাস রোড হইতে মিন্টো রোড পর্য্যন্ত পায়ে হাঁটিয়া যাই। ডিরেক্টার অব ইণ্ডাষ্ট্রীজ

অফিসে যাইয়া তাগিদ দেই, একবার শিল্প মন্ত্রির সহিত ও (ইণ্ডাষ্ট্রীজ মিনিষ্টার) সাথে দেখা করি, সকলেই সহানুভূতি দেখায় কিন্তু আমি কাজে কিছু দেখিতেছিনা। তখন লীগ মন্ত্রী মণ্ডলী চলিতেছিল। অবশেষে আজম সাহেব একদিন বলিলেন, হালুয়াঘাট অঞ্চলে কম্যুনিষ্ট উপদ্রব দেখা দিয়াছে, কুলিয়ারচরের ভ্রাম্যমান বয়ন বিদ্যালয় সেখানে পাঠাইতে হইবে। আমি বলিলাম, আপনাদেরত অনেক তাঁতের মাষ্টার রিজার্ভ আছে, তাহাদের মধ্যে হইতে ৬ মাসের জন্য আমার কেন্দ্রে একজন লোক দিতে পারেন। তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। ইহার পর ৪ মাস অতীত হইল, কুলিয়ারচর বয়ন বিদ্যালয় কুলিয়াচরই রহিল, আমি তাঁতের মাষ্টার পাইলাম না। পরে একদিন সংবাদ পাইলাম, কুলিয়াচরের ভ্রাম্যমান বয়ন বিদ্যালয় হালুয়াঘাট রওয়ানা হইতেছে। এদিকে তাঁতের মাষ্টার না পাওয়ায় আমার কর্মীদের উৎসাহ কমিয়া গেল। সুতা কাজে লাগাইতে না পারিলে সুতা কাটিয়া কি লাভ হইবে? আস্তে আস্তে আমার তাঁতের স্কুল, চরকা-তৈয়ার কারখানা এবং সুতা কাটা বন্ধ হইয়া গেল।

আমার বালিকা বিদ্যালয়টী ৫।৬ বছর ছিল, ইহার মধ্যেও গণ্ডগোল। গ্রামের সরকারী প্রাইমারী স্কুলের হেড মাষ্টার মাঝে মাঝে আমার নিকট আসিয়া অনুযোগ করিতেন তাহার স্কুলে কোন মেয়ে যায় না। এজন্য তাহার স্কুলের ছাত্র সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে, আমার স্কুল রাখার মত কোন প্রয়োজন নাই? পরে স্থির হইল বয়স্কা মেয়েরা আমার স্কুলে থাকিবে। ছোট মেয়েরা সরকারী স্কুলে যাইবে। আমার স্কুলে শিক্ষয়িত্রী ছিলেন মেয়ে, হাতের কাজ কিছু শিখান হইত বিশেষতঃ বই, পেন্সিল, খাতার সাহায্য পাইত, এজন্য সহজে কেহ আমার বিদ্যালয় ছাড়িয়া যাইতে চাহিত না। আমার বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা ক্রমে ক্রমে বাড়িতে লাগিল, কাহারও বিবাহ হইল, কেহ অন্যত্র চলিয়া গেল, অবশেষে আমার বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী মারা গেলেন, আমার বালিকা বিদ্যালয়ও বন্ধ হইয়া গেল

"ত্রৈলোক্য পাঠাগার"এর ও অকাল মৃত্যু ঘটিল। আলমারী দুইটা প্রায় খালি, বই, সংবাদ-পত্র ও মাসিক পত্রিকাগুলি চুরি হইয়াছে এবং বাজারে সের হিসাবে বিক্রয় হইয়াছে। অবশেষে যখন আমি দেখিলাম

ঋণ জালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছি আমার গঠন মূলক কাজের জন্য কাহারও নিকট হইতে অর্থ সাহায্য পাইলাম না. তখন আমার গঠন মূলক কাজের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।

১৯৫৪ সন, আমার গঠন মূলক কাজের মোহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, বাড়ীতে প্রায় বেকার অবস্থায়ই আছি, প্রাদেশিক আইন সভার নির্ব্বাচনের কথাবার্ত্তা চলিতেছে, পৃথক নির্বাচন, আমারও ইচ্ছা হইল নির্ব্বাচনে দাঁড়াইব। আমার গঠনমূলক কাজ ব্যর্থ হইয়াছে, প্রাদেশিক আইন সভার সভ্য হইলে ক্ষমতা এবং মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইবে, সেই সুযোগে জনগণের সেবা করার সুযোগ পাইব। ইলেকশন বড় লোকের কাজ, এক একজনের হাজার হাজার টাকা খরচ হয়, আমি বড় লোক নই, এখন ইলেকশনের খরচের টাকা আসিবে কোথা হইতে ? আমি বন্ধু-বান্ধবদের সহিত পরামর্শ করিলাম, তাহাদের আশ্বাস পাইয়া মন স্থির করিলাম, নির্ব্বাচনে দাঁড়াইব। নির্ব্বাচন সংগ্রামে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতারা একমত হইতে পারেন নাই। তাই বিভিন্ন নামে বিভিন্ন দল নির্বাচন সংগ্রামে মাঠে অবতীর্ণ হইলেন। সংযুক্ত প্রগতিশীল দল (ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ পার্টি) পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস, সিডিউল্ড কাষ্ট ফেডারেশন হইতে এবং স্বতন্ত্র ভাবে বহুলোক নির্ব্বাচনে দাড়াইলেন। আমি সংযুক্ত প্রগতিশীল দল হইতে দাঁড়াইলাম। এই দলের নেতা ছিলেন শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত। সভ্যদের মধ্যে ছিলেন শ্রীকামিনী কুমার দত্ত (কুমিল্লা) ত্রৈলোক্য নাথ চক্রবর্তী (ময়মনসিংহ) প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী (রাজশাহী) সাংগ্রাম মাঝি (রাজশাহী) ফণী মজুমদার (মাদারীপুর) রমেশ দত্ত (ঢাকা) দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ (বরিশাল) হারাণ চন্দ্র ঘোষ চৌধুরী (নোয়াখালী) প্রফেসার পুলিন দে (চট্টগ্রাম) ডাঃ শৈলেন সেন (ঢাকা) আশুতোষ সিংহ (কুমিল্লা) প্রভৃতি। আমি পূর্ব ময়মনসিং হইতে দাড়াইয়াছি। আমার নির্ব্বাচন এলাকা ছিল নেত্রকোনা মহকুমার ১২টি থানা এবং কিশোরগঞ্জ মহকুমার ৮টি থানা। এই এলাকা হইতে আমরা ৬ জন প্রার্থী ছিলাম।

আমি পদব্রজে ভোট ভিক্ষার জন্য রওয়ানা হইলাম এবং প্রায় দেড় মাসে নির্ব্বাচন সফর শেষ করিলাম। প্রায় প্রত্যহ খাওয়ার প্রচুর ব্যবস্থা,

মাঝে মাঝে অনুরোধে অতিরিক্ত ভোজনের জন্য পেটের অসুখ হইয়াছে। নির্ব্বাচন উপলক্ষে গ্রামের সকল বাড়ীতেই যাইতে হইয়াছে, যে যে বাড়ীতে বসিয়াছি, পান, তামাক এবং চা লইয়া আসিয়াছে, আমি তামাক খাইনা, এজন্য তামাক খাওয়া হইতে রক্ষা পাইলাম কিন্তু পান এবং চা খাইতে হইয়াছে। আমি প্রত্যহ ৪০।৫০ কাপ চা এবং পান খাইয়াছি। আমার অবস্থা এরূপ হইয়াছে, চার কাপ দেখিলে বমির উদ্রেক হইত, পান খাইতে খাইতে জিহ্বার ছাল গিয়াছে, খাওয়ার কোন স্বাদ পাই না। গ্রামের লোক আগ্রহ করিয়া চা লইয়া আসিয়াছে, চা পান না করিলে মনে ব্যথা পাইবে এবং ইহাও ভাবিতে পারে, মহারাজের ডেমাক হইয়াছে, আমি গরীব বলিয়া আমার বাড়ীতে চা খাইল না। ইলেকশনে দাঁড়াইয়াছি, কাহাকেও অসন্তুষ্ট করিতে পারি না। আমি যখন বারহাট্টা যাই, আমার কর্ম্মীদের অবস্থা দেখিয়া অভিভূত হইয়া পড়িলাম এবং লজ্জাবোধ করিতে লাগিলাম। আমার প্রতিনিধি ডাঃ সত্যরঞ্জন চক্রবর্ত্তীর নিকট জানিতে পারিলাম, তিনি প্রচারের জন্য ৬ জন কর্ম্মী নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহারা চুঙ্গা ফুকিয়া গ্রামে গ্রামে যাইয়া আমাকে ভোট দেওয়ার জন্য প্রচার করে, তাহারা নিজ নিজ বাড়ীতেই খাওয়া দাওয়া করে তিনি (সত্যরঞ্জন চক্রবর্ত্তী) শুধু তাহাদের চা খাওয়ার জন্য দৈনিক জনপ্রতি দুই আনা ধার্য্য করিয়াছেন। আমার কর্ম্মীরা ইহাতেই সন্তুষ্ট। আমি যখন ভাটি অঞ্চলে গিয়াছি তখন দেখিয়াছি শ্রম শক্তির (Human Labour) কিরূপ অপচয় হইতেছে। গ্রামের লোকের বর্ষার ৬ মাস কোন কাজ থাকে না, তাহারা বেকার অবস্থায় কাটায়। এখন গ্রামে গ্রামে যদি কুটিরশিল্প প্রবর্তন করা হয়, তবে দেশেরও উৎপাদন বৃদ্ধি পায় তাহাদেরও অর্থ লাভ হয়। আমি গ্রামবাসীদের সহিত কুটিরশিল্প প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করিলাম, তাহারা খুব উৎসাহ দেখাইলেন। আমি নির্বাচন কেন্দ্র সফর শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিলাম। আমার নির্ব্বাচন কেন্দ্র ছিল ৬০টী। নির্বাচনের দিন ভোটারদের মিষ্টি মুখ করাইতে হয়, এজন্য প্রার্থীর কিছু ব্যয় হয়। আমি স্থির করিলাম, আমার প্রত্যেক কেন্দ্রের জন্য ঐ দিন ১০ টাকা করিয়া খরচ করিব, ইহাতে আমার ৬০০ টাকা খরচ হইবে। অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত আমার সব কেন্দ্রে টাকা দিতে হয় নাই, কোন

কোন কেন্দ্র হইতে আমাকে জানাইয়া দিয়াছে, তাহাদের টাকার প্রয়োজন হইবে না, পরে জানিতে পারিলাম, তাহারা নিজেরাই টাকা খরচ করিয়া ভোটারদিগকে আপ্যায়িত করিয়াছেন। আবার দুই এক জায়গায় এইরূপও হইয়াছে, আমার কোন প্রতিনিধি ছিল না, ভোটারগণ ভোট দিতে আসিয়া আমার কোন প্রতিনিধি না দেখিয়া, নিজেরাই পরস্পর পরস্পরকে পান বিড়ি খাওয়াইয়া আমাকে ভোট দিয়া গিয়াছেন।

নির্বাচনে আমার সর্বমোট ২৮শ' টাকা খরচ হইয়াছে, আমি জয়ী হইয়াছি। আমি যুক্তফ্রণ্টের যুগে সরকার পক্ষের এম, পি, এ, ছিলাম কিন্তু নিজের অক্ষমতা এবং পারিপার্শিক অবস্থার জন্য আমার এলাকায় ২।৪ টা টিউব-ওয়েল বসান ছাড়া বিশেষ কিছু করিতে পারি নাই। আমার ভোটার এবং কর্মিগণ আমার জন্য যথেষ্ট সহানুভতি দেখাইয়াছেন, ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, কষ্ট করিয়াছেন, প্রতিদানে আমি তাহাদের জন্য কিছুই করিতে পারি নাই। এজন্য আমি দুঃখিত। আজ আমি জীবনের সায়াহ্নে তাহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

মিলিটারী শাসন শুরু হইয়াছে, ১৯৫৮ সন, ২৭শে অক্টোবর, আমি তখন আমার নির্ব্বাচনী এলাকায় ছিলাম। পরস্পর সংবাদ পাইলাম আমাদের এম, পি, এ চাকুরী নাই, আমরা বরখাস্ত হইয়াছি। আমি বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম এবং জানিতে পারিলাম, বাস্তবিকই আমরা বরখাস্ত হইয়াছি। আমরা যে কি অপরাধ করিয়াছি, কেন বরখাস্ত হইলাম, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। অবশেষে একদিন নোটিশ পাইলাম, আমি এবডোতে (E.B.D.O) পড়িয়াছি। আমার বিরুদ্ধে কতকগুলি অভিযোগ আনা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে, আমি যদি এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেই, আগামী ৬ বৎসরের মধ্যে কোন নির্ব্বাচনে দাঁড়াইব না তবে আমার বিরুদ্ধে কিছু করা হইবে না, নতুবা আমাকে ট্রাইব্যুন্যালের সম্মুখে দাঁড়াইতে হইবে। আমি নির্ব্বিবাদে এই হুকুম মানিয়া লইতে রাজী হইলাম না, ট্রাইব্যুন্যালের সম্মুখে দাঁড়াইতে প্রস্তুত হইলাম। আমি নির্দ্দিষ্ট তারিখে ঢাকা গিয়া ট্রাইব্যুন্যালের (Tribunal) সম্মুখে হাজির হইলাম। ট্রাইব্যুন্যালের চেয়ারম্যান ছিলেন জাষ্টিস্ আক্রাম। মামলা সুরু হইল। আমার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ

ছিল, আমাকে পড়িয়া শোনান হইল। আমার উত্তর আমি পূর্ব্বেই বাংলা ভাষায় লিখিয়া সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম, আমি একে একে প্রত্যেকটি অভিযোগের উত্তর পড়িয়া শুনাইলাম এবং জাষ্টিস আক্রামের সহিত তর্ক করিতে লাগিলাম। আমি দাবী করিলাম, আমার বিরুদ্ধে যাহারা রিপোর্ট দিয়াছে, তাহাদিগকে কোর্টে হাজির করিতে হইবে, আমি তাহাদিগকে জেরা করিব। জাষ্টিস্ আক্রাম বলিলেন, তাহাদিগকে কোর্টে হাজির করা হইবে না। আমি বলিলাম, তাহাদিগকে জেরা না করিলে আপনি কি করিয়া বুঝিবেন, তাহাদের রিপোর্ট সত্য না মিথ্যা? তিনি আমার প্রস্তাব বাতিল করিয়া দিলেন। আমার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ ছিল, আমি একটি সোস্যালিষ্ট কন্‌ফারেন্স ডাকিয়া ছিলাম, কন্‌ফারেন্সে একরূপ কতকগুলি লোক ছিল, যাহারা পাকিস্তান বিরোধী। আমি দাবী করিলাম, তাহাদের নাম কোর্টে প্রকাশ করা হউক। উত্তর,—তাহাদের নাম প্রকাশ করা হইবে না। আমার বরিশাল কন্‌ফারেন্সের সভাপতির ভাষণ এর এক কপি ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে দাখিল করিলাম। আমার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ ছিল, আমি কলিকাতার আশেপাশে এক সোস্যালিষ্ট সভায় বক্তৃতা দেওয়ার সময় বলিয়াছি, "কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ" আমি প্রশ্ন করিলাম, সেই সভা কোন সনে এবং কোথায় হইয়াছিল? উত্তর—তাহা বলা হইবে না। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, আমি দুই বাংলা এক করার চেষ্টা করিয়াছি। আমি প্রশ্ন করিলাম, প্রমান কি? উত্তর—বলা হইবে না। আর একটি অভিযোগ ছিল গোপনে নাশকতা মূলক (Sub-Versive) কাজের চেষ্টা করিয়াছি। আমি উত্তরে বলিলাম, পূর্ব্ব পাকিস্তানের প্রথম আই, জি, পি, জ্যাকির হোসেন সাহেব, শামসুদ্দোহা সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া হাফিজুদ্দিন সাহেব পর্যন্ত সকল আই, জি, পির সহিত আমার পরিচয় আছে এবং মাঝে মাঝে দেখা হইয়াছে। আমার যদি সাব্‌ভারসিভ একটি ভিটি থাকিত, তবে তাহারা নিশ্চয়ই আমাকে সাবধান করিতেন। এতকাল আমাকে গ্রেপ্তার করা হইল না কেন? তখন তৃতীয় বিচারক, বাড়ী সিলেট, বলিলেন, আপনি বৃদ্ধ, এজন্য আপনাকে গ্রেপ্তার করা হয় নাই। আমার বিরুদ্ধে সর্ব্বশেষ অভিযোগ, আমি গভর্নমেণ্টকে ফাঁকি দিয়া বহু টাকা আত্মসাৎ

করিয়াছি। আমি মাসিক বেতনের টাকা বেশী নিয়াছি, গাড়ীতে নিম্ন শ্রেণীতে ভ্রমণ করিয়া উচ্চ শ্রেণীর বিল করিয়া টাকা নিয়াছি। উত্তরে আমি বলিলাম আমি প্রচলিত প্রথা অনুসারে বিল করিয়াছি। ইহার পর সরকার পক্ষের উকিল সওয়াল জবাব করেন। তাহার পর আমাকে উত্তর দিতে বলা হইল। আমি বলিলাম, বড় বড় রাজনৈতিক নেতারা, পূর্ব্বে যাহাদের দেশে সুনাম ছিল, অবস্থার পরিবর্ত্তনে, আজ সকলেই "এবডোতে" পড়িয়াছেন। পলিটিক্যাল লিডার্সদের পলিটিক্যাল ফিল্ড হইতে দূরে সরাইয়া রাখার ইহা একটি কৌশল কিনা, আমি ট্রাইব্যুন্যালকে অনুরোধ জানাইতেছি, ইহারও অনুসন্ধান করা হউক। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগের লিখিত উত্তর আমি ট্রাইব্যুন্যালের সম্মুখে দাখিল করিলাম। ট্রাইব্যুন্যালের কাজ যখন শেষ হইল, তখন জাষ্টিস আক্রাম হাঁসিতে হাঁসিতে আমাকে বলিলেন, আপনিত সোস্যালিষ্ট? আমি, হাঁ। **Then you are not un-social,** আমি **Surely not** তখন দ্বিতীয় বিচারক, একজন পাঞ্জাবী মিলিটারীম্যান, বলিলেন **You are a Socialist.** আমি, **Yes Sir,** হাঁসি-মুখে সভা ভঙ্গ হইল। আমার বিবৃতির সারমর্ম্ম ষ্টেটসম্যান কাগজে বাহির হইয়াছিল।

ট্রাইব্যুন্যালের বিচারের রায় বাহির হইল। আমি দোষী সাব্যস্ত হইয়াছি, আমার সাজা ১৯৬৬ সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত আমি কোন নির্ব্বাচনে দাঁড়াইতে পারিব না। নির্ব্বাচনে দাঁড়ানোর আমার আর কোন প্রয়োজনও নাই, বয়স ৭২ বৎসর পাড় হইয়াছে, এখন অবসর গ্রহণ করার সময়। মিলিটারী শাসন, বাড়ীতেই আছি, একদিন সরকারী খামের চিঠি দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম, আবার কোন বিপদ ঘনাইয়া আসিল? তাড়াতাড়ী চিঠি খুলিয়া পড়িয়া দেখিলাম একটি বড় অঙ্ক, সরকারী হিসাবে যাহা আমি বেতন ও এলাউন্স বাবদ সরকারকে ফাঁকি দিয়া অতিরিক্ত গ্রহণ করিয়াছি। তাহা অবিলম্বে সরকারী ট্রেজারীতে জমা দেওয়ার নির্দ্দেশ। এরূপ নোটিশ শুধু আমার একা নয়, সকল এম, পি, এ'র উপরই জারী হইয়াছে। আমরা আমাদের বেতন ও এলাউন্সের টাকার বিল করিয়াছি, এ, জি, অফিস পরীক্ষা করিয়া তাহা মঞ্জুর করিয়াছে, এখন আমরা কিভাবে যে গভর্নমেণ্টকে ফাঁকি দিয়া অতিরিক্ত টাকা লইয়াছি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক

মিলিটারী শাসন, আমি হিন্দু, হুকুম পালন করিতেই হইবে,—টাকা দিতে হইবে। আমার হাত শূন্য-টাকা কোথা হইতে দিব? আমি কখনও কল্পনা করি নাই, আমার এম, পি, এ, গিরী চাকুরী চলিয়া যাইবে, আমি মাসিক ২০০৲ টাকা, যাহা পাইতাম, সবই খরচ করিয়া ফেলিতাম, ভবিষ্যতের জন্য কিছুই জমাই নাই। অবশেষে পৈত্রিক জমি বিক্রী করিয়া সরকারের দাবী পুরণ করিলাম, এম, পি, এ, হওয়ার পাপের প্রায়ঃশ্চিত্ত করিলাম।

ময়মনসিং জেলে ১৯৬৫ সন

ইংরাজ রাজত্বে, পরাধীন পাক-ভারতে, ৩০ বৎসর জেল খাটার ১৮ বৎসর পর, ৭৭ বৎসর বয়সে, গত ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ সন, স্বাধীন পাকিস্তানের ময়মনসিং জেলে রাত্রি দশটার সময় পৌছিলাম। এই দেশের স্বাধীনতার জন্য যাহারা সংগ্রাম করিয়াছেন, যাহাদের নির্য্যাতন ভোগের ফলে আসিয়াছে দেশের স্বাধীনতা, আমি তাহাদের এক জন। আমি দেশের স্বাধীনতা লাভের পর হইতে, গত ১৮ বৎসর যাবত গঠনমূলক কাজই করিয়া আসিয়াছি, গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কিছু করি নাই, আর আমার দেশ সেবার পুরস্কার স্বরূপ আমার স্থান হইয়াছে জেলে, আমি তৃতীয় শ্রেণীর নিকৃষ্ট বন্দী। পাক-ভারত যুদ্ধ বাধিয়াছে, আমিত সে জন্য দায়ী নই, আমি কেন গ্রেপ্তার হইলাম? শুধু আমি নই, পূর্ব্ব পাকিস্তানের প্রত্যেক জিলার সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের শীর্ষ-স্থানীয় লোক, দেশের উভয় সম্প্রদায়ের লোকের উপর যাহাদের প্রভাব আছে,—প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক নেতা, উকিল, ডাক্তার, মোক্তার, ভুতপূর্ব্ব মন্ত্রী, এম, পি, এ, ব্যবসায়ী, সকলেই নিরাপত্যা আইনে বন্দী, সকলেরই এক অবস্থা, সকলেই তৃতীয় শ্রেণীর বন্দী। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর যাহারা প্রকাশ্য সভায় ভারতীয় আক্রমণের বিরুদ্ধে নিন্দা করিয়া বক্তৃতা দিয়াছেন, যুদ্ধ তহবিলে চান্দা দিয়াছেন, তাহারাও রেহাই পান নাই।

আমি পরাধীন ভারতে, বৃটিশের জেলে বহু বার বহু বৎসর নিরাপত্যা আইনে বন্দী ছিলাম, স্বাধীন পাকিস্তানের জেলের অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। গ্রেপ্তারের সময় আমার মনে হইল, ভালই হইল, শেষ বয়সে কিছুদিন বিশ্রাম লাভ হইবে। আমি সঙ্গে জিনিষ পত্র বিশেষ কিছু লইলাম না, একটা

তোষক, মশারী এবং কিছু কাপড়-জামা। আমার বৃটিশ জেলের ধারণা ছিল, ভাবিলাম বেশী জিনিষপত্র সঙ্গে লইয়া কি লাভ, জেলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এককালীন ২৫০৲ টাকা পাইব, বিছানা-পত্র, কাপড়-জামা, জুতা, থালা বাসন ইত্যাদীর জন্য। ইহা ছাড়া হাত খরচের জন্য পাইব মাসিক ৩২৲ টাকা, খোরাকীর জন্য দৈনিক একটা ভাল টাকা পাইব। জেল গেটে প্রবেশ করার পূর্ব্বে ভাবিলাম, এত রাত্রে বিশেষ কিছু খাইব না, শুধু রুটি দুধ খাইব। জেল গেটে আমার বিছানা রাখিয়া দিল। আমি মনে করিলাম, গদী-তোষকযুক্ত বিছানাত তৈয়ারই আছে। জেল সিপাহী আমাকে ১৪নং দো-তালায় লইয়া গেল, দরজা খোলার আওয়াজ শুনিয়া নূতন অতিথিকে অভ্যর্থনা করার জন্য সকলে দরজার সম্মুখে ভিড় করিল, তাহাদের মধ্যে ছিলেন মনোরঞ্জন ধর, কুমুদ চক্রবর্ত্তী, বিনোদ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি। দেখিলাম সকলেরই ভূমি শয্যায় শয়নের ব্যবস্থা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম খাট-টেবিল-চেয়ার, গদী-তোষক-মশারী কোথায়? খাওয়ার কি ব্যবস্থা? একজন বলিলেন কাইলের ঠাণ্ডা ভাত এবং ডাইল কিছু আছে। আমার আর খাওয়ার প্রবৃত্তি হইল না। আমরা সম্মানী অতিথি, আমাদের এই ব্যবস্থা? আমরা সকলেই তৃতীয় শ্রেণীর বন্দী, আমাদের নিজেদের মশারী পর্য্যন্ত ব্যবহারের অধিকার নাই। রাত্রে কি মশার উপদ্রব? সারা রাত্র মশার কামড়ে ছট্‌ফট্ করিতে হয়, কামড়ের সঙ্গে সঙ্গেই ফুলিয়া উঠে এবং ভীষণ জ্বালা করে। এই অবস্থায় আমাদের দিন কাটিতে লাগিল, আবেদন নিবেদনে কোন ফল পাওয়া গেল না। কয়েক মাস পর আমরা ডি, পি, আর বন্দী হইলাম। আমরা অধিকাংশই তৃতীয় শ্রেণীর বন্দী, খোরাকী বাবদ দৈনিক ১।৹ টাকা, ইহার মধ্যে লাক্‌রী, চা-চিনি, তেল-লবন, চাউল-ডাইল, মাছ-তরকারী সবই কিনিতে হইবে, জেলের কন্‌ট্রাক্টর মাল সরবরাহ করিবে। মাসিক ভাতা ৫৲ টাকা। তাহার মধ্যে সংবাদ-পত্র, তেল-সাবান, বিড়ি-সিগারেট কিনিতে হইবে। প্রথম কয়েক মাস জামা-কাপড় দেওয়া হয় নাই, বাড়ী হইতে আনাইয়া ব্যবহার করার উপদেশ পাইলাম। পরে অবশ্যই কিছু জামা-কাপড় দেওয়া হইল, শীত-বস্ত্র আমরা পাই নাই। কয়েকজন দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্য্যাদা পাইলেন, তাহাদের খোরাকী বাবদ দৈনিক ৩৲ টাকা এবং হাত খরচের জন্য মাসিক ১৫৲ টাকা ব্যবস্থা হইল।

সকলেরই ধারণা ছিল, পাক-ভারত যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার পর সকলকেই ছাড়িয়া দিবে। মাত্র ১৭ দিনের যুদ্ধ কিন্তু ১৭ মাস পরও বহু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বন্দী মুক্তি পাইলেন না। জেলে অনেকেরই স্বাস্থ্য ভগ্ন হইতে সুরু হইল। এই যুদ্ধ উপলক্ষে যাহারা আটক হইয়াছিলেন তাহাদের অধিকাংশেরই জীবনে কখনও রাজনীতি করেন নাই, বৃটিশ ভারতে বা স্বাধীন পাকিস্তানে কোন রাজনৈতিক দলের সহিত সম্পর্ক ছিল না, অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, আরামে থাকিতেন, কখনও কল্পনা করেন নাই, জেলে আসিতে হইবে, এখন তাহাদের নিজের চিন্তা অপেক্ষা বড চিন্তা হইল পরিবারের চিন্তা। ময়মনসিংহ জেল হইতে প্রথম স্বাস্থ্যের কারণ মুক্তি লাভ করেন, ময়মনসিং এর প্রসিদ্ধ ডাক্তার কে, পি, ঘোষ। তিনি মুক্তির স্বাদ বেশী দিন ভোগ করিতে পারেন নাই, কিছুদিন পরেই তাহার মৃত্যু হয়। টাঙ্গাইল মোক্তারবারের প্রেসিডেণ্ট বীরেন্দ্রনাথ চৌধুরীও স্বাস্থ্যের কারণ মুক্তি পাইয়াছিলেন। আমারও স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল। একদিন আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম, শরীর খুব দুর্ব্বল। যথা সময়ে জেল হাঁসপাতালে সংবাদ গেল, ডাক্তার আসিলেন, মেডিকেল অফিসার আসিলেন, তাহাদের যত্ন ও চিকিৎসায় আমি রক্ষা পাইলাম। অবশেষে ২০শে আগষ্ট ১৯৬৬ সন ময়মনসিং জেল হইতে স্বাস্থ্যের কারণ মুক্তি পাইলাম।

পৃথিবীর অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, মানুষের চিন্তাধারার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, জেলখানারও পরিবর্তন হইয়াছে কিন্তু জেলের পায়খানার কোন্ পরিবর্তন হয় নাই, সেই আদিম যুগের পায়খানার ব্যবস্থাই রহিয়াছে। আদিম যুগে মানুষ যখন উলঙ্গ থাকিত তখন পায়খানার কোন প্রয়োজন হইত না, স্ত্রী পুরুষ দলবদ্ধভাবে উলঙ্গ অবস্থায় বিচরণ করিত। ইউরোপ, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে একশত বৎসর পূর্ব্বেও স্ত্রী-পুরুষ উলঙ্গ অবস্থায় সমুদ্র-স্নান করিত, কোন প্রকার সঙ্কোচ বোধ করিত না। ১৯২৫-২৮ সনে আমরা যখন ব্রহ্মদেশের জেলে রাজবন্দী অবস্থায় ছিলাম' তখন দেখিয়াছি, সেই দেশীয় কয়েদীরা দলবদ্ধভাবে উলঙ্গ হইয়া স্নান করিত এবং স্নানের পর প্যাণ্ট পরিত। অবশ্যই আমাদিগকে দেখিলে আমাদের পরিচিত কয়েদীরা

সঙ্কোচ বোধ করিত। জেলের বর্তমান পায়খানার ব্যবস্থা বৃটিশ আমলে হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় অল্প খরচে বহুলোকের এক সঙ্গে পায়খানার ব্যবস্থা হইয়াছে কিন্তু লজ্জা নিবারণের কোন ব্যবস্থা নাই। পায়খানার মধ্যে বসাও কঠিন, বিশেষতঃ রাত্রের পায়খানায়। গভর্ণমেন্টের উচিত বর্তমান পায়খানার আমূল পরিবর্তন করিয়া সম্মুখে কপাট যুক্ত স্যানিটারী পায়খানার ব্যবস্থা করা।

ময়মনসিং জেলে ১৯৬৫ সন।
(যাহারা বন্দী ছিলেন)

শ্রীকুমুদচন্দ্র চক্রবর্তী, উকিল। জ্যোৎস্নাময় দত্ত, উকিল। মাখন লাল লাহিড়ী, উকিল। গৌরকিশোর দাস, উকিল, (Ex-M.P.A) আলোকময় নাহা, উকিল। মনোরঞ্জন ধর, (Ex-Minister) ডাঃ ক্ষিতীন্দ্র প্রসাদ ঘোষ। ডাঃ রবীন্দ্র সেনগুপ্ত। ডাঃ অবনী নন্দী। ডাঃ যতীন পাল। শ্রীজলধর পাল, ব্যবসায়ী। শ্রীগুরুপদ দেব, ব্যবসায়ী। শ্রীসত্যনারায়ণ মিশ্র, ব্যবসায়ী। শ্রীমোহিনীমোহন বসাক, ব্যবসায়ী। শ্রীবিনোদচন্দ্র চক্রবর্তী, (Ex-M.P.A.)। শ্রীসুখেন্দু সেনগুপ্ত (ভাই সেন)। শ্রীসুনীল গুহ (ভানু) শ্রীজ্ঞানেন্দ্র ভট্টাচার্য। শ্রীসোমেশ আচার্য, (কবিরাজ)। শ্রীমহাদেব সান্যাল। শ্রীঅজয় রায়। শ্রীজ্যোতিষ বসু। শ্রীমদন পাল, ব্যবসায়ী, হালুয়াঘাট। শ্রীবকুল আচার্য চৌধুরী, জমিদার, মুক্তাগাছা।

নেত্রকোনা

শ্রীদুর্গেশ পত্র নবিশ, উকিল। সুকুমার ভাওয়াল। মিহির মজুমদার। মনোরঞ্জন সিংহ (নকুল)। যতীন্দ্র সিংহ। রূপচন্দ্র সাহা, ব্যবসায়ী, পোড়া কান্দুলী। কালীদাস সাহা, পোড়া কান্দুলী। রমেশ

চক্রবর্তী, সুসং। অশ্বিনী চক্রবর্তী, সুসং। যতীন্দ্র হাজং, সুসং। সুকুমার চাভুগং, সুসং। অনিল গুপ্ত, সুসং। সমরেশ রায়, সুসং। জগবন্ধু সাহা, খুজিউড়া। হরেন্দ্র চন্দ্র সাহা, কুল্লাউড়া। রাখাল সাহা, কুল্লাউড়া। নীরেণ লাহিড়ী, বিড়িসিড়ি। নারায়ণ হাজং, খারনৈ।

জামালপুর

শ্রীরবি নিয়োগী, সেরপুর টাউন। হেমন্ত ভট্টাচার্য, সেরপুর টাউন। রাধামোহন বর্মন, শ্রীবর্দ্দি।

কিশোরগঞ্জ

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, (Ex-M. P. A.) কাপাসাটিয়া। ডাঃ প্রফুল্ল বীর, সহর। নগেন সরকার সহর। খগেন অধিকারী, বাজিতপুর। ইন্দুভূষণ চক্রবর্তী, বাজিতপুর। নগরবাসী দেব নাথ, কটিহাদী। ডাঃ উমেশ বিশ্বাস, কটিহাদী। গঙ্গেশ সরকার, কাটিহাদী।

টাঙ্গাইল

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, মোক্তার, সহর। নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস, উকিল সহর। রাইচরণ রায়, মোক্তার (Ex-M.P.A.), সহর। যোগেশচন্দ্র নিয়োগী (ঘুট্‌বাবু), সহর। ডাঃ ভুবনেশ্বর চক্রবর্তী, নাগরপুর।

পরিশিষ্ট

(২)

সমাজবাদ কি ও কেন ?

মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী

[১৯৪৮ সালের ৫ই জুন বরিশালে পূর্ব্বপাকিস্তান সোসালিষ্ট পার্টির প্রথম সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ। শ্রীসুজিত রায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত এই ভাষণ "পঞ্চায়েত" পত্রিকার ১৩৮১ বঙ্গাব্দের শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত]

ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমাহোদয়াগন,

বরিশালের সহিত আমার নুতন সম্বন্ধ নয়। প্রথম সম্বন্ধ ১৯০৯ সনে বিপ্লব আন্দোলনের সময় পলাতক অবস্থায়। তাহার পর ১৯১৪-১৫ সনে, বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় আমি এক বৎসর বরিশাল জেলে ছিলাম এবং ঐ মামলায় আমার পনর বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ডাজ্ঞা হয়।

দুই বৎসর পূর্বেও অশ্বিনী কুমারের বরিশালে আসিবার সুযোগ হইয়াছিল। দুই বৎসর সমাজ জীবনের প্রগতির পথে খুব অল্প সময় হইলেও ভারতবর্ষের সমাজ জীবনেব পথে এই দুইবৎসর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশে এক ভালমন্দের বিরাট পরিবর্তন সংগঠিত হইয়েছে। তাই দু বছর পূর্বে ইংরেজ তাডাবার যে সমস্যা লইয়া আলোচনা করিয়াছিলাম আজিকার সমস্যা তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।

দেশ স্বাধীন হইয়াছে। আমরা সাধীন দেশে বাস করিতেছি। সকলেই আশা করিয়াছিল স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সকল প্রকারদুঃখ দুর্দশার অবসান ঘটিবে। কিন্তু তাহা হয় নাই। বর্তমানে কি পাকিস্তান কি ভারত ইউনিয়ন সর্বত্রই এক অবস্থা। দেশ দুর্নীতিতে ভরপুর চারিদিকে চোরাবাজারীর রাজত্ব চলিতেছে। দেশে সৎলোক আছে বলিয়া মনে হয় না। আমরা যেন জাতি হিসাবে দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠিতেছি।

সরকারী বিভাগে দুর্নীতি, ব্যবসা ক্ষেত্রে দুর্নীতি, এমন কি তথাকথিত সংসার ত্যাগী সাধু সন্ন্যাসীদের মধ্যেও দুর্নীতি দেখা যাইতেছে। ব্যবসা ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি থাকে কি করিয়া রাতরাতি বড়লোক হওয়া যায়, কি করিয়া ক্রেতাদিগকে ঠকান যায়। যাহারা যৌথ কারবার করে তাহাদের দৃষ্টি রহিয়াছে কি করিয়া অপর অংশীদারকে ফাঁকি দেয়া যায়। ছাত্রদের দৃষ্টি থাকে কি ভাবে নকল করিয়া পরীক্ষায় পাশ করা যায়। শিক্ষকরাও অর্থ-নৈতিক কারণে ফাঁকি দিতে বাধ্য হন। রাষ্ট্র নায়কদের সদা জাগ্রত মন সব সময়ে সুবিধা খুঁজিয়া বেড়ায় কি করিয়া বড়বড় ভাড়াটিয়া কথার ধূম্রজালে স্বার্থসিদ্ধি করিবেন। চাকুরীতে ঘুষ, সরকারী বিভাগে ঘুষ, জিনিষ ক্রয় করিতে ঘুষ, সর্ব্বত্রই ঘুষের রাজত্ব চলিতেছে। স্বার্থসিদ্ধিই বড় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের কেহ চায় দেশের নামে চাকুরী ও ব্যবসায় সুবিধা করিতে, কাহারও দৃষ্টি কাউন্সিল কর্পোরেশনের দিকে, কেহ চায় নেতৃত্ব করিতে, মন্ত্রীত্ব করিতে। সকলেই চায় সস্তায় নাম কিনিতে, জাতি গঠনের চিন্তা কাহারও আছে বলিয়া মনে হয় না।

তাই আমাদের মধ্য দিয়া আমাদের জাতীয় চরিত্রই ফুটিয়া বাহির হইতেছে। আমাদের জাতির মধ্যে নিয়মানুবর্তিতার অভাব এবং উচ্ছৃঙ্খলতার প্রভাব রহিয়াছে। আমরা কোনও বিধি নিষেধ মানিব না, কাহারও কথা শুনিব না, কোনও অন্যায় করিলে যদি কেহ তিরস্কার করে তবে তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিব, গালি দিব ইহাই আমাদের স্বভাব হইয়া উঠিতেছে। আমরা নিজেরা কিছু করিব না, নিজের দোষ ত্রুটি দেখিব না, অপরের সমালোচনা করিব, নেতাদের নিন্দা করিব। আমাদের কাহারও উপর বিশ্বাস নাই, কোন কিছু গড়িয়া তুলিবার ক্ষমতা নাই—ঝগড়া বিবাদ দলাদলি করিয়া কাজ পণ্ড করার উৎসাহই আমাদের অধিক। এরূপভাবে কোনও জাতি বড় হইতে পারে না, টিকিতেই পারে না।

আমরা স্বাধীনতা, পাইয়াছি তবুও আমাদের দুরবস্থা ঘুচিল না কেন? ইহার কারণ, যে স্বাধীনতা পাইয়াছি তাহা স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামের অমোঘ শক্তিতে অর্জিত স্বাধীনতা নয়। যে স্বাধীনতার বনিয়াদ সমগ্র জাতির

আত্মদানের মহিমার উপর, দুঃখ কষ্ট ও ত্যাগ-নিষ্ঠার বীর্যবত্তার উপর গড়িয়া উঠিয়া নুতন চেতনার উপর নূতন স্বাধীনতা দেখা দেয়, ইহা সেই স্বাধীনতা নহে। ইহা রফামূলক স্বাধীনতা। জাতীয় দাবীর ভিত্তিতে স্বাধীনতা রূপ গ্রহণ করে নাই। পরদেশীয় শাসক চলিয়া গিয়াছে মাত্র। দুঃশাসনের কাঠাম রাখিয়া গিয়াছে। পরবশ্যতার কালে যাহারা জাতির দুর্ভাগ্য লইয়া ব্যবসায় করিয়াছে, তাহারা স্বপদে ও স্বস্থানে থাকিয়াই গিয়াছে। রাতারাতি স্বাধীনতা আসিলেও রাতারাতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী বদলায় নাই—দায়িত্ববোধ জাগে নাই—স্বাধীন দেশের জাতির চেতনায় জাতি ও জাতীয় গভর্ণমেণ্ট উদ্বুদ্ধ হয় নাই। জাতির প্রতি অঙ্গের জন্য প্রতি অঙ্গের বেদনাবোধ জাগে নাই। তাই দুর্নীতি, চোরাকারবার, স্বজন প্রতিপালন পক্ষপাতিত্ব। অযোগ্যতা দূর হওয়া দূরে থাকুক, স্বাধীনতার সুযোগ আসিয়া উহাকেই আরো বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছে। বিপ্লবের দ্বারা যখন একটা দেশ স্বাধীন হয়, তখন দুঃখ কষ্ট রক্তপাত ক্ষয়ক্ষতি হয় বটে—কিন্তু ঐ সূত্রেই জাতির চরিত্র গড়িয়া উঠে বলিয়া ক্ষয়ক্ষতি জাতির জীবনে নূতন পলিমাটি পড়িয়া জাতির জীবন ক্ষেত্রকে উর্ব্বর করিয়া তোলে। তখন পঞ্চ-বার্ষিকী বা দশ-বার্ষিকী জাতি-নির্মাণের প্ল্যান সাফল্যমণ্ডিত হয়, ধনধান্যে-শিল্পে-সংগঠনে জাতি সহস্র শীর্ষ হইয়া ধন্য হইয়া উঠে। আজিকার এই স্বাধীনতা যেন অযোগ্যের সুযোগকরিয়া দিয়াছে—পরভুক শ্রেণীর নিকট মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত করিয়া দিয়াছে। ঘুষ দিবার ও ঘুষ লইবার অনাচার জাতির মর্যাদাবোধের মেরুদণ্ডকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিতে বাধা পাইতেছে না। দুর্নীতি ও অসংযম স্বাধীনতার হাত ধরিয়া দেখা দিয়াছে। পরশাসনের কাঠিন্য ও মর্যাদা গিয়াছে, কিন্তু স্বশাসনের মাধুর্য ও মহিমা সেই স্থলে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। স্বাধীনতাকে সমগ্র জাতির জাতি ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলকার স্বাধীনতা বলিয়া উপলব্ধি হয় নাই। কিন্তু এই উপলব্ধি চাই, এই উপলব্ধি আনিয়া দিতে হইবে। জনগণের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক গণচেতনা আনিয়া দেওয়াই হইবে আমাদের প্রধান কর্তব্য।

স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে চোরাকারবারীদের দলের কর্মচারীগণও রাতারাতি স্বদেশপ্রেমিক হয় নাই। ইংরেজ রাজত্বে যাহা ছিল, বর্ত্তমানে তাহাই আছে বরং ইংরেজ রাজত্বে চোরাকারবারীদের এবং দুর্নীতিপরায়ণ

কর্ম্মচারীদের মনে একটা ভয় ছিল, কারণ বিদেশী গভর্ণমেণ্ট হয়ত ইচ্ছা করিলে কঠোর দমননীতিও অবলম্বন করিতে পারে। কিন্তু এখন যেন ঘরের কথা, এই তথাকথিত স্বদেশী আমলে তাহাদের সে ভয়ও যেন নাই। ইহার ফল হইয়াছে যে দেশের জনসাধারণের এই ধারণাই জন্মিতেছে যে ইংরেজ রাজত্বেই আমরা বরং ভাল ছিলাম, সুখে ছিলাম। যে কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই জনসাধারণের এরূপ ধারণা ভাবী অমঙ্গলেরই সূচনা করে।

আমরা স্বাধীন হইয়াছি। স্বাধীন পাকিস্তানে কি স্বাধীন ভারতে চাউলের অভাব, কাপড়ের অভাব। তেল, কেরোসিন, চিনি কোন জিনিষই সহজে পাওয়া যায় না। প্রত্যেক জিনিষই অগ্নিমূল্য। সেই অনুপাতে সর্বসাধারণের আয় বাড়ে নাই। শুধু মুষ্টিমেয় লোকের হাতে অর্থ সঞ্চিত হইয়া এক ঐশ্বর্য্যের মায়াজাল সৃষ্টি করিয়াছে। তাহার উপর আবার অনেকের বৃত্তি নষ্ট হইয়াছে। এমত অবস্থায় লোক কি ভাবে প্রাণ ধারণ করিবে? ক্রমশঃই লোকের মনে স্বাধীন ভারতে বা স্বাধীন পাকিস্তানে এই ধারণাই জন্মিতেছে—স্বাধীন ভারতে বা স্বাধীন পাকিস্তানে যদি-- না খাইয়াই মরিতে হয় তবে এ স্বাধীনতার মূল্য কি?' লোকের সহ্যের একটা সীমা আছে। যখন সেই সীমা অতিক্রান্ত হয় তখন লোক মরিয়া হইয়া উঠে কোনও প্রকার বিধিনিষেধ মানে না। লোক যদি অনবরত দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে থাকে তবে পাকিস্তান বা ভারতীয় ইউনিয়নের লোক বেশীদিন থাকবে না। আজ পাকিস্তান ও ভারত ডোমিনিয়নের নেতা, কর্মীজনসাধারণ ও গভর্ণমেণ্টকে ইহা সম্যকভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে। সমাজ জীবনে অর্থনৈতিক বিষম ব্যবস্থায় গ্লানি আছে, তাহার উপর আছে সাম্প্রদায়িক দুর্বুদ্ধিতা। সমাজে হিন্দু-মুসলমান চিরকাল পাশাপাশি শান্তিতে বাস করিয়াছে, পরস্পরের আপদে বিপদে সাহায্য করিয়াছে, কখনও হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায় হিসাবে বিবাদ করে নাই। পূর্ব্বে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইয়াছে। সৈন্যদের মধ্যে উভয় সম্প্রদায়ের লোকই ছিল। বাংলার স্বাধীনতা হরণের জন্য ইংরেজের ষড়যন্ত্রে প্রধান সেন পতি হইয়াও মিরজাফর যখন বিশ্বাসঘাতকতা করে তখন সিরাজের তথা বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মোহনলাল প্রাণ বিসর্জন দিয়াছে, সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন স্বাধীনতার সেবকের মনে স্থান পায় নাই। সিপাহী বিদ্রোহের সময় হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে স্বাধীনতার জন্য লড়াই

করিয়াছে, প্রাণ বিসর্জন দিয়াছে। সেদিনও বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসু এবং নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের নেতৃত্বে যে ফৌজ গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। হিন্দু মুসলমান মিলিতভাবে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করিয়াছে। আমাদের সমস্যার সমাধান সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা হইবে না। সাম্প্রদায়িকতা আমাদিগকে ধ্বংসের দিকে লইয়া যাইবে। পাকিস্তানের হিন্দু যদি মনে করে তাহারা ভিন্ন সম্প্রদায়ের রাজ্যে বাস করিতেছে তবে তাহা কি দেশ কি জনসাধারণ কাহারও কল্যাণকর হইবে না। এরূপ মনোভাবের ফলে অশান্তি চলিতে থাকিবে, শিল্প বাণিজ্যের প্রসার সম্ভব হইবে না। ফলে দুর্ভিক্ষ, বস্ত্র-সংকট চলিতেই থাকিবে। দেশের জনসাধারণ আরও দুরবস্থায় পতিত হইবে।

এক দিকে দেখিতে পাই দেশের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোক আর্থিক দুরবস্থায় আছে, তাহাদের পেটে অন্ন নাই, চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নাই, সর্ব্বদা অভাবের মধ্যে কালাতিপাত করিতেছে। অন্যদিকে দেখিতে পাই, কতিপয় লোক ভোগ বিলাসিতার মধ্যে মগ্ন আছে, তাহাদের কোন অভাব নাই।

এরূপ অবস্থা হয় কেন? ইহা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার রূপ। দরিদ্রের দারিদ্র ঈশ্বর প্রদত্ত নহে, ভগবান বা খোদা কাহাকেও ধনী বা কাহাকেও দরিদ্র করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। ইহা বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ফল। দেশে যতদিন পর্যন্ত বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা থাকিবে ততদিন গরীব আরও গরীব হইবেই ধনী আরও ধনী হইবে।

যে সমাজ ব্যবস্থার ফলে লোক গরীব হয় সেই সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন করিতে হইবে। এই সমস্যা পাকিস্তান ও ভারতীয় ইউনিয়নের সমস্যা, ইহা পৃথিবীর সমস্যা।

এই অস্বস্তিকর অবস্থার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে চাই রাজনৈতিক আদর্শের ও লক্ষ্যের আমূল পরিবর্তন। আজ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে রাশিয়া ভিন্ন প্রায় সকল দেশেই সাম্যনীতি-বিরোধী সমাজব্যবস্থার ফলে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গণতন্ত্রের নামে আজ সেখানে কতিপয়ের একনায়কত্ব

চলিয়াছে। নাগরিক অধিকার বড়বড় আদর্শের ভূয়া বুলির ভিতর মিথ্যা হইয়া উঠিয়াছে। বিশাল সমাজের ভিতর চলিয়াছে শাসনের নামে ব্যাপক অত্যাচার জনকল্যানের নামে ব্যাপক শোষণ। প্রায় প্রত্যেক দেশেই দেখা যায় যে বড় বড় মিল মালিক ও ব্যবসায়িগণই রাষ্ট্রের পরিচালক। এই সমস্ত লোকের কার্য্যক্রম কোন বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থ সাধনের দিকেই লক্ষ্য রাখিয়া রচিত হয়। সমাজের বিরাট একটি অংশ যা কৃষক ও শ্রমিকের তাহার সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। আজ তাহাদের জাতীয় ঐশ্বর্য কে গড়িয়া তুলিয়াছে? যাহারা শাসন গদিতে বসিয়া অত্যাচার ও অনাচারে মত্ত তাহারা, না যাহারা পর্ণকুটিরে ক্ষুধার জ্বালায় ধুকিতেছে বা ফ্যাক্টরীর ও বস্তির অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার ভিতর ঘৃণ্য জীবন কাটাইতেছে তাহারা? এই প্রশ্নের সমাধানের উপরই নির্ভর করিতেছে আমাদের সমাজের রাষ্ট্রের রূপ কি হইবে।

এই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন প্রণালীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, যাহারা উৎপাদন প্রণালীতে সক্রিয় অংশ গ্রহণকরে তাহাদের উৎপন্ন সম্পদে তাহারাই সর্বপ্রকারে বঞ্চিত। কিন্তু যে স্বল্প সংখ্যক লোক পরগাছার ন্যায় এই সমাজদেহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সমাজের সমস্ত রস টানিয়া লইতেছে তাহাদের প্রভুত্বই পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। এই বৈষম্য-মূলক ব্যবস্থায় যাহারা সমাজের সম্পদ উৎপাদন করে তাহাদের উৎপাদন প্রণালী বা রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় কোন অধিকার নাই, পক্ষান্তরে যাহারা উৎপাদন প্রণালীতে কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে না তাহাদের সমাজ ব্যবস্থায় পূর্ণ প্রভুত্ব। এই ব্যবস্থায় সৃষ্টি হইয়াছে স্বার্থের সংঘাত। এই শ্রেণীর সংঘাত কেহ সৃষ্টি করিতে পারে না, কেহ উহাকে উস্কাইয়া দিতে পারে না। উহা সমাজের অন্তর্নিহিত ব্যাধি এবং উহাই অশান্তির মূল কারণ—দুর্নীতি, অত্যাচার ও অনাচারের দ্যোতক।

এই যে বৈষম্য উহার সমাধানের চেষ্টা পুরাকাল হইতে এ পর্য্যন্ত বহু মনীষী নানারূপে অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু সমাজে যে অসাম্য বর্তমান থাকে তাহা দূর না হওয়ায় এ পর্যন্ত কোন সমাধান হয় নাই। সমষ্টিগত ভাবে যেখানে জিনিষ উৎপন্ন

করে সেখানে সমষ্টিগত ভাবেই উৎপন্ন বস্তু ভোগ করার দাবী করিতে পারে ; বিশেষ ব্যক্তির কোনও বিশেষ অধিকার থাকিতে পারে না। কিন্তু বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা অন্যরূপ। সমাজের সমষ্টিগত চেষ্টার ফলে যাহা উৎপন্ন হয়, সমাজের কতিপয় ব্যক্তি তাহার ফল ভোগ করে, বাকী গোটা সমাজ তাহাদের ন্যায়সঙ্গত দাবী হইতে বঞ্চিত হয়। এই বৈষম্যের প্রতিকারের জন্য সমাজ-তন্ত্রবাদের উৎপত্তি হইয়াছে। পুরাতন সমাজভিত্তির পরিবর্তে নূতন ভাবে সাম্যের উপর নূতন সমাজপ্রথা গড়িয়া তোলাই এই সমাজতন্ত্রবাদের উদ্দেশ্য। পুরাতনের ধ্বংসস্তুপের উপর নবসৃষ্টির প্রেরণার ফলেই সমাজতন্ত্রবাদের উৎপত্তি হইয়াছে।

সমাজের ভিতর বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাইবার জন্য সমাজতন্ত্রীদল বদ্ধপরিকর। সমাজ বিপ্লব যাহাতে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করা যায় সেজন্য সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কল্পনা আমাদের আছে তাহা হইবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। সেখানে প্রত্যেকটি লোক সে যে সম্প্রদায়ভুক্তই হউকনা কেন, সে যে কোনও ধর্মাবলম্বী হউক না কেন সেখানে থাকিবে তাহার স্বাধীন নাগরিকের অবাধ অধিকার।

এখানে আরও একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। কোনও সম্প্রদায় বা কোনও ধর্মের উপর কোনও রাষ্ট্র প্রথাকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা সেখানে দেখা দিবে ফ্যাসীবাদ বা নাৎসীবাদ। মুসোলিনী প্রাচীন রোমান সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যের উপর তাহার ফ্যাসীবাদের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। হিটলার নরডিক (Nordic) জাতির শ্রেষ্টত্বের উপর জার্মানজাতির রাষ্ট্র ভিত্তি গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই ফ্যাসীবাদ নাৎসীবাদের পরিণাম কি তাহা আজ ইউরোপের মানচিত্রের উপর চোখ বুলাইলেই অনুধাবন করা যায়। ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীবাদ জগতের উপর টানিয়া আনিয়াছে মৃত্যুর বিভিষীকা ধ্বংসের তাণ্ডব। তাই আজ এই দুনিয়াতে মুসোলিনী বা হিটলারের কোনও অস্তিত্ব নাই—তাহাদের নাম দুনিয়াতে অভিশপ্ত। ইতিহাসের এই ইঙ্গিতের দিকে লক্ষ্য করিয়া পাকিস্তান ও ভারতীয় ইউনিয়নের উভয় রাষ্ট্রনায়কগণের সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

সাম্প্রদায়িকতা মধ্যযুগীয় নীতি। মানুষের জীবনের ন্যায় প্রত্যেক জাতীয় জীবনেও নানারূপ জটিলতা দেখা দিয়াছে। আদিম সমাজ-ব্যবস্থায় আমরা আমাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে সমর্থ হইতাম। কিন্তু আজিকার যান্ত্রিক যুগের বিরাট বিশ্বসমাজে অন্য নিরপেক্ষ হইয়া কেহই বাঁচিতে পারে না। এই মানবসমাজ একটা বিরাট যন্ত্রের ন্যায় অবস্থান করিতেছে। উহার যে কোনও স্থানে সামান্য একটু অঙ্গুলী স্পর্শে সমস্ত সমাজ ব্যবস্থায় তার প্রতিফলন হয়। মধ্যযুগীয় সাম্প্রদায়িকবাদ শুধু অচল নয় উহা মানব প্রগতির সম্পুর্ণ পরিপন্থী। তাই আজ রাষ্ট্রব্যবস্থা হইতে এই সাম্প্রদায়িকতাকে নিঃশেষ করিতে হইবে। প্রথমে আমরা আমাদের দেশের নাগরিক, তৎপর আমরা হিন্দু বা মুসলমান বা খৃষ্টান। রাষ্ট্রের চোখে আমরা সবাই সমান :—সমান অধিকার, সমান দায়িত্ব।

দেশের ভিতরে ভবিষ্যতে যাহাতে কোন অবস্থাতেই সাম্প্রদায়িকতা প্রবেশ করিতে না পারে, যাহাতে ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপ্রথা গড়িয়া না উঠিয়া অর্থ নৈতিক সাম্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপ্রথা গড়িয়া উঠে সেইজন্য চাই সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রথায় প্রকৃত গণতন্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রকৃতপক্ষে কৃষক ও শ্রমিকদের প্রতিনিধিরাই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রথার কর্ণধার হইবেন। তাঁহারা নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সমস্ত দুনিয়াকে বিচার করিবেন। এতদিন সমাজে যাহারা শোষিত ও অত্যাচারিত ছিল, নূতন রাষ্ট্রব্যবস্থায় তাহারা সর্ব্বপ্রকার শোষণ ও অত্যাচারের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিবে। বর্তমান রাষ্ট্র প্রথায় কৃষক শ্রমিক ও নিম্ন মধ্যবিত্ত জনতা তাহাদের স্বাধীন সত্ত্বা অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তাহারা হইবে আত্ম-সচেতন। নিজেদের ভালোমন্দ ও শিক্ষার বুনিয়াদ নিজেরাই গড়িয়া তুলিবে। ইহারা জমি চাষ করে জমির মালিক হইবে তাহারাই, পরোৎপন্ন-ভুক জমিদার শ্রেণী নয়। শ্রমিক হইবে কলকারখানার মালিক, সমাজের পরগাছা ধনিক শ্রেণী নয়। যেহেতু সমাজের বৃহত্তর অংশ গঠিত হইয়াছে কৃষক ও শ্রমিকদের লইয়া, সেই হেতু এই রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কৃষক ও শ্রমিকদের গণতান্ত্রিক নায়কত্ব প্রতিষ্টিত হইবে। কিন্তু উহা ধনিকতন্ত্র শাসিত

রাষ্ট্রের মত ব্যক্তিগত বা কতিপয়ের একনায়কত্ব নয়, উহা হইবে প্রকৃত গণতান্ত্রিক লোকনায়কত্ব।

কৃষক, শ্রমিক ও বঞ্চিত শ্রমশীল জনতার নায়কত্বে রাষ্ট্র সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করিবে। বর্ত্তমান সমাজে প্রাচুর্যের ভিতর ফুটিয়া উঠিয়াছে সর্ব্বহারাদের মর্ম্মন্তুদ নিঃস্বতা। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রথায় সমাজের সর্ব্বস্তরের লোকই প্রাচুর্যের ভিতর অবস্থান করিবে। এইখানে আর একটি কথা মনে রাখিতে হইবে সামাজিক প্রাচুর্য বা সম্পদ আকাশ হইতে আপনা আপনিই নামিয়া আসে না। সামাজিক শ্রমের উপরই প্রাচুর্য নির্ভর করে। এই সামাজিক উৎপাদন প্রথায় যাহারা যোগদান করিবে সমাজের সম্পদ উপভোগ করিবার অধিকারী একমাত্র তাহারাই। যাহারা এই উৎপাদন কাজে যোগ দিবে না। সমাজের সম্পদে তাহাদের কোন অধিকারই থাকিতে পারে না। সমাজের উৎপাদন, নিয়ন্ত্রণ ও বণ্টনের ভার গ্রহণ করিবে রাষ্ট্র। সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে যে রাষ্ট্রপ্রথা গড়িয়া উঠিবে তাহার ভিতর কোন দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইতে পারে না, তাহার ভিতর থাকিতে পারে না কোনও শোষণ বা অত্যাচার।

সমাজতন্ত্রবাদী রাষ্ট্রে কাহারও কোনও অভাব থাকিবে না, দেশের লোক এরূপ শিক্ষা পাইবে যাহার ফলে কেহ কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করিবে না। পৃথিবীতে যে সম্পদ আছে তাহার যদি সমবণ্টন হয়, এক স্থানেই যদি পুঞ্জীভুত না হয়, তবে কাহারও কোনও অভাব হইবে না। প্রত্যেক মানুষের ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করার প্রবৃত্তি আছে, কিন্তু সে যদি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারে তবে তার সঞ্চয়বুদ্ধি থাকিবে না। সমাজ তান্ত্রিক রাষ্ট্রে কাহারও ব্যক্তিগত ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করার প্রয়োজন হইবে না। নরনারী সকলেই কাজ করিবে, সকলেরই প্রয়োজনানুরূপ খাওয়া পরার ব্যবস্থা হইবে। শিশু, রুগ্ন বৃদ্ধদের ব্যবস্থা রাষ্ট্র করিবে। ছাত্রদের মানুষ করার দায়িত্ব লইবে রাষ্ট্র। কাজেই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সকলেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবে। সমাজের প্রত্যেকেই মিলিত ভাবে প্রকৃতির সম্পদকে মানুষের মঙ্গলকাজে নিয়োজিত করার চেষ্টা করিবে। সত্যিকারের প্রগতির পথে মানব সমাজের যাত্রা সুরু হইবে। পৃথিবীতে যে সম্পদ আছে বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাহার সাহায্যেই মানবজাতির অভাব দূর করা সম্ভব হইবে।

এই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের কল্পনা। তাই চাই একটি সংহত ও সুগঠিত সমাজবাদী দল। ভারত বিভাগের পর সমাজ-তান্ত্রিক দলও আজ স্বতন্ত্র হইয়াছে। ভারতীয় ইউনিয়নের দলের সহিত ইহার আর কোন সম্পর্ক থাকিবে না। বাহিরের কাহারও আদেশ, ইঙ্গিত বা নিয়ন্ত্রণে পাকিস্তান সোশ্যালিষ্ট পার্টির কর্ম্মপদ্ধতি নির্দ্ধারিত হইবে না। ভারতীয় ইউনিয়নের সমস্যা তাহাদের নিজেদের। পাকিস্তানের সমস্যা আমাদের নিজস্ব। এখানকার অবস্থা এবং বিভিন্ন সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া এখানকার সোস্যালিস্ট পার্টি নীতি ও কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করিবে। পাকিস্তান সোস্যালিস্ট পার্টি স্বাধীন দল, ভারতীয় দলের সহিত ইহার আর কোনও যোগাযোগ থাকিবে না। ভারত ডোমিনিয়ন বা অপর কোনও স্থান হইতে ইহা পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত হইবে না। এই দলে সকল সম্প্রদায়ে লোকেরাই সভ্য হওয়ার অবাধ অধিকার আছে। এই দল শ্রমিক, কৃষক ও নিম্নমধ্যবিত্ত লোকের দল। এখানে সকলে স্বার্থই এক। সকলেই গরীব, সকলেই শোষিত ও নির্যাতিত। এখানে সাম্প্রদায়িকতা বা প্রাদেশিকাতার স্থান নাই। এখানে থাকিবে সকল মানুষেরই সমান অধিকার।

সমাজতন্ত্রী দলের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে দলের কর্মীদের যোগ্যতার উপর। দলের প্রত্যেক সভ্যকে খাঁটি সমাজতন্ত্রী হইতে হইবে। তাহারা জাতিকে সমাজতান্ত্রীক ভাবধারায় ও আদর্শে গড়িয়া তুলিবে। সমাজতন্ত্রী দলের সভ্যের যদি আদর্শ সমাজতন্ত্রী না হয়, তাহা হইলে তাহাদের আদর্শে কেহই অনুপ্রাণিত হইবে না এবং তাহাদের হাতে যদি কখনও রাষ্ট্র পরিচালনার অধিকার আসে তবে তাহা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হইবে না সুবিধা-বাদীদের রাষ্ট্র হইবে। তাহারা সমাজতন্ত্রের নামে নিজ স্বার্থ সিদ্ধি করিবে, দেশের জনসাধারণকে শোষণ করিবে।

পূর্ব পাকিস্তান সমাজতন্ত্রীদল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদিগকে এবং দেশের শোষিত নির্যাতিত জনগণকে এই আশ্বাস দিতেছে যে তাহারা তাহাদের সর্ব্ববিধ ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করিবে। সমাজতন্ত্রীদল দেশের সংখ্যালঘুদের এই অনুরোধ জানাইতেছে যে তাহারা যেন নিজ

ঘর বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া না যান। নিজ নিজ বাড়ীতে স্বাধীনভাবে বাস করেন।

সমাজতন্ত্রী দলের সভ্যদের কাজ হইবে কৃষকের পল্লীতে, শ্রমিকের বস্তিতে। তাহারা বিভিন্ন কেন্দ্রে কুটীর শিল্প স্থাপন করিবে এবং স্থায়ীভাবে সেখানে থাকিয়া দুর্নীতি দমন, অস্পৃশ্যতা বর্জন, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিবে।

পাকিস্তান পূর্ণ শিল্পতান্ত্রিক দেশ নয়। শিল্পোন্নতি না হইলে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা দুঃসাধ্য। হাজার বছর পূর্ব্বের অবস্থা এখন নাই। জগতে শিল্পযুগ তাহার পরিণতির দিকে চলিয়াছে। সমবায় প্রথায় এদেশে সুপরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত-ভাবে দ্রুত শিল্পোন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। অন্যথায় বিশ্ব প্রগতি ও লোক সংখ্যার সহিত পাকিস্তান তাল মিলাইয়া চলিতে পারিবে না। বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিয়া অনতিবিলম্বে কৃষি ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করিতে হইবে। দরিদ্র, নিরন্ন, রুগ্ন কৃষককুলের অশিক্ষা ও অভাব অভিযোগ দূর করিতে হইবে। তাহাদের মধ্যে চেতনা জাগ্রত করিয়া কৃষক সংগঠনে সোস্যালিষ্ট কর্মীদের নিস্বার্থভাবে আত্ম নিয়োগ করিতে হইবে।

পাকিস্তানের সহিত পাকিস্তান সোস্যালিষ্ট পার্টির কোনও রূপ বিরোধ নাই। পাকিস্তান তাহাদের মাতৃভূমি। পাকিস্তান সরকার যদি সত্যিকারের জনকল্যাণে কোনও কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করে সোস্যালিষ্টগণ তাহাতে অবশ্যই সহযোগিতা করিবে। মানব কল্যাণের জন্যই পার্টি আত্মনিয়োগ করিয়াছে। তাই মানবের মঙ্গলের জন্য যে কোনও দল, ব্যক্তি বা সরকারের কাজে সোস্যালিষ্টদের সমর্থন না থাকিবার কোন কারণই থাকিতে পারে না। কিন্তু এ কথাও পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দেওয়া প্রয়োজন যে, কোনও দল, কোনও শক্তি বা এমন কি মন্ত্রীও যদি জনসাধারণের স্বার্থহানিকর কোন কিছু করেন, পাকিস্তানের সোস্যালিষ্টগণ শেষ রক্তবিন্দু দিয়াও তাহার বিরোধিতা করিবে।

আমরা সোশ্যালিষ্ট। কোনও দেশের সীমারেখা আমাদের বিশ্ব সংহতির আশা আকাঙ্খাকে বাধা দিয়া রাখিতে পারে না। সংকীর্ণতার মধ্যে নিজেদের চরম উদ্দেশ্যকে আবদ্ধ রাখিতে পারি না। এই বিরাট বিশ্বের যেখানে আছে অত্যাচার, যেখানে আছে নির্যাতন, রিক্ত নিঃস্ব জনমানবের হাহাকার ও দীর্ঘ নিঃশ্বাসে আকাশ বাতাস বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে, সেখানকার বন্ধুদের কখনও আমরা ভুলিতে পারি না। মুক্তির জন্য তাহাদের সংগ্রাম আর আমাদের সংগ্রাম এক এবং অবিচ্ছিন্ন। আমরা সেই দিনের প্রতীক্ষায় আছি যেদিন সমস্ত ভৌগলিক সীমারেখা মুছিয়া যাইবে, যেদিন এক শোষণহীন, উৎপীড়নহীন, শ্রেণীহীন বিরাট বিশ্বসমাজ কায়েম হইবে। কিন্তু যে পর্যন্ত তাহা না হয় ততদিন যার যার ভৌগলিক সীমানার মধ্যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে তীব্র ও সুসংহত করিতে হইবে। স্বার্থে স্বার্থে হানাহানি থাকা সত্ত্বেও দুনিয়ার ধনতন্ত্রী সমাজ ঐক্যবদ্ধ, যদি কোনও একটি অংশ ভাঙ্গিয়া পড়ে, অর্থাৎ পৃথিবীর কোথাও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা হয় তবে বিশ্ব ধনতন্ত্রী সমাজ অনেকখানি দুর্ব্বল ও পঙ্গু হইয়া পড়িবে। গনতন্ত্রের বিকাশ সর্ব্বত্র একইভাবে হয় না। পরিবেশ অবস্থা, সময় ও সংগঠনের উপর নির্ভর করছে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম করার সুযোগ। একথা স্মরণ রাখিয়া আপনাদের কাজে অগ্রসর হইতে হইবে।

বন্ধুগণ, উপসংহারে একটা কথা বলিতে চাই। দেশ বিভক্ত হইয়াছে। বিভক্তদেশের যে যে খণ্ডের অধিবাসী তাহাই তাহার স্বদেশ,—ইহার নাম পাকিস্তানই হউক আর ভারতীয় ইউনিয়নই হউক। স্বদেশবাসীর শ্রীবৃদ্ধি না হইলে অলক্ষিতে সকলের উপরই তাহার অভিসম্পাত দেখা দেয়। আমার সর্বপ্রথম আমাদের দেশের নাগরিক, তারপর হিন্দু-মুসলমান, খৃষ্টান ইত্যাদি। আমরা অকুণ্ঠিতচিত্তে যেন দেশবাসীর মঙ্গল কামনায় আত্মনিয়োগ করি। পাকিস্তানের সত্যিকারের মঙ্গল নিহিত আছে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্তনের মধ্যে। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে মানবতার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব। তাই আজ সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে হইবে, শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের এই আজাদ পাকিস্তানের অভাব, অভিযোগ, দুঃখ, দৈন্য দূর করিবে,

সমগ্র জনসাধারণের সমর্থনপুষ্ট গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিব। ধর্ম-নিরপেক্ষ সমাজতন্ত্র ভাবাপন্ন অন্যান্য দলগুলিকে আহ্বান জানাই, সমস্ত দলাদলি সংকীর্ণতা ভুলিয়া আসুন আমরা হাতে হাত মিলাইয়া একত্রে কাজে ঝাঁপাইয়া পড়ি। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী ও পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু মুসলমান জনতার কাছে আমার নিবেদন এই—আমাদের যাত্রাপথে আপনাদের আশীর্ব্বাদ ও সক্রিয় সংযোগিতা অপরিহার্য এবং অত্যাবশ্যক। এই সহযোগিতা কামনা করি। আপনারা আমার শ্রদ্ধা ও প্রণতি গ্রহণ করন।

ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

বরিশাল, ৫ই জুন '৪৮

পরিশিষ্ট

(৩)

ভারতীয় পার্লামেণ্টে সংবর্ধনার উত্তরে মহারাজ

[মৃত্যুর তিন দিন পূর্বে ১৯৭০ সালের ৬ই আগষ্ট দিল্লীতে পার্লামেণ্টে সংবর্ধনার উত্তরে প্রদত্ত ভাষণ। মহারাজ তাঁর বক্তব্য বাংলা ভাষায়ই রেখেছিলেন। বাংলা ভাষণের ইংরেজী তর্জমা করেন লোকসভা সদস্য শ্রীত্রিদিব চৌধুরী]

মিঃ স্পীকার, মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী এবং বন্ধুগণ:

আমি অসুস্থ, হৃদরোগে ভুগছি, দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে পারি না, আপনারা আমাকে বসে বলবার অনুমতি দিন। প্রথমেই আমি প্রধান মন্ত্রীকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তাঁর এবং আরও কয়েকজন

বন্ধুর প্রচেষ্টায় আমি কিছু দিনের জন্য ভারতে আসবার সুযোগ পেয়েছি। ১৯০৭।৮ সন থেকে শুরু করে যে সব বন্ধু-বান্ধবের সাথে একত্রে দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিলাম, জীবনসন্ধ্যায় তাঁদের দেখবার বড়ই আকাঙ্খা ছিল। ভারতবর্ষে এসে সেইসব পুরানো বন্ধু এবং সহযাত্রীদের সাথে মিলিত হবার সুযোগ পেয়ে খুবই আনন্দ লাভ করেছি। এমনকি দিল্লীতেও আমার অনেক পুরনো বন্ধু ও সহকর্মী আছেন; তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় আমি খুবই খুশী হয়েছি।

১৯০৬ থেকে ১৯৪৬ সনের মধ্যে আমি ছ' বার কারারুদ্ধ হয়েছি ভারতবর্ষে এবং বার্মার বিভিন্ন কারাগারে। সর্বসমেত ৩০ বছর কারাগারে আবদ্ধ ছিলাম এবং ঐ কারাজীবনে ভারতের অনেকগুলি প্রান্তীয় ভাষা শিখেছিলাম; কিন্তু দুর্ভাগ্য, প্রায় সবগুলিই এখন ভুলে গেছি।

১৯১৫ সনে আন্দামান সেলুলার জেলে ছিলাম। তখন সেখানে একশ'জন রাজনৈতিক বন্দী কারারুদ্ধ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সাভারকার ভ্রাতৃদ্বয়, গুরুমুখ সিং, জোয়ালা সিং, পৃথ্বী সিং, শের সিং, ভাই পরমানন্দ এবং আরও অনেকে। বাঙ্গালী বিপ্লবীদের মধ্যে ছিলেন আশুতোষ লাহিড়ী, শচীন সান্ন্যাল, বারীন ঘোষ, পুলিন দাস প্রমুখ। আন্দামানে থাকা কালে উর্দু এবং গুরুমুখী শিখেছিলাম এবং সাভারকর ভাইদের কাছ থেকে শিখেছিলাম মারাঠী। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে সব ভাষা এখন ভুলে গেছি।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র, সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ এবং আরও অনেকের সাথে ১৯২৫।২৬ সনে মান্দালয় জেলে দিন কাটিয়েছি। সে সময় ব্রহ্ম-ভাষা শিখেছিলাম; তাও এখন ভুলে গেছি। ১৯৩০ সনে কেরেলার কেনানুর জেলে ছিলাম; সহবন্দী ছিলেন এ কে গোপালন, ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ, কৃষ্ণ পিল্লাই, গোবিন্দন নায়ার, সদাশিব রাও, মাধব মেনন প্রমুখ; তখন 'মালয়ালাম' শিখেছিলাম,—এখন তাও ভুলে গেছি। ১৯৩২ সনে আমাকে ভেলোর-সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। তখন সে জেলে ছিলেন প্রফেসর এন জি রঙ্গ, বাপিনেদি নারায়ণ

মেনন এবং মোপলা-বিদ্রোহের বন্দী আরও অনেকে। সেখানেও আরও ২।১টি ভাষা শিখেছিলাম; এখন ভুলে গেছি। হিন্দীও শিখেছিলাম, কিন্তু আমি স্বীকার করি তাও আমি ভুলে গেছি। কারণ দীর্ঘকাল যাবৎ পূর্বপাকিস্তানে আছি, সেখানে হিন্দীতে কেউ কথাবার্তা বড় একটা বলে না, আমারও চর্চা নেই,—ফলে হিন্দীও প্রায় ভুলে গেছি।

নোয়াখালী দাঙ্গার পর—বিশেষতঃ দেশ-বিভাগের পর – মহাত্মা গান্ধীর প্রিয় শিষ্য শ্রীযুক্ত সতীশ দাশগুপ্তের সাথে গান্ধীজীর প্রদর্শিত পথে গঠনমূলক কাজ শুরু করি। দেশ-বিভাগের পর কিছুকাল সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা, দাঙ্গা, মারপিট দেশে চল্‌তে থাকে। আমি স্থির করলাম আমি পাকিস্তান ছাড়ব না; সেখানে দেশবাসীর পাশে দাঁড়াব এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পাকিস্তানেই বসবাস করব।

বন্ধুগণ, আমি আনন্দের সাথে আপনাদের জানাচ্ছি যে এককালে,—বিশেষতঃ দেশ-বিভাগের অব্যবহিত পরে পাকিস্তানে মুসলমানদের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা এবং বিদ্বেষের ভাব বর্তমান ছিল অনেক বছর কেটে যাবার পর, তা এখন আর নেই। পাকিস্তানেও বর্তমান ইয়ং জেনারেশন' বিশেষতঃ ছাত্র এবং যুবকদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষভাব নেই। আজকাল সেখানে সাধারণ মানুষ, মুসলমান নওজোয়ান সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষভাব থেকে মুক্ত। পাকিস্তানে একটা নূতন জাগরণের হাওয়া বইছে। পাকিস্তানের তরুণরা কে মুসলমান, কে হিন্দু, সেকথা ভাবে না। তাদের মনে একটা নতুন জাতীয়তা বোধ জাগছে। তাদের শ্লোগান—"বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা—বাংলা দীর্ঘজীবী হোক।" এই চিন্তাধারা সেখানে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই বর্তমান। পাকিস্তানের জনতা নতুন চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নতুন শ্লোগান দিচ্ছে। বিশেষ করে পূর্বপাকিস্তানের জনতা চায় ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, 'full autonomy' এবং সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠা।

পাকিস্তানের আসন্ন সাধারণ নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের ওপর পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ শুভাশুভ

এমন কি জীবনমরণ সমস্যা নির্ভর করছে। বিশেষতঃ এই নির্বাচনে যারা জয়ী হবে তারাই করবে সরকার গঠন আর সংগে সংগে সংবিধানও পরিবর্তন করবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আসন্ন নির্বাচনে প্রগতিশীল দলই জয়লাভ করবে এবং সংবিধানকে গণতান্ত্রিক আদর্শে রূপায়িত করবে। আর এক কথা এই যে, প্রগতিশীল দল যদি ক্ষমতায় আসে তবে পাকিস্তানের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ন্যায্য দাবী ও অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চয় করবে।

পাকিস্তানের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের দাবী হচ্ছে একটি পূর্ণ গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। যদি সেখানে সত্যিকার ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং গণতান্ত্রিক অধিকার স্থির নিশ্চিতভাবে স্বীকৃত হয় তা হলে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় আর বাস্তুত্যাগ করবে না এবং পাকিস্তানকেই নিজেদের স্বদেশ ও মাতৃভূমি মনে করে সেখানেই নিশ্চিন্তে বসবাস করবে।

বন্ধুগণ, আমি পাকিস্তানে বাস করি এবং একজন পাকিস্তানী নাগরিকও বটে। পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের সংস্পর্শে এসে আমি তাদের যতটুকু জেনেছি ও বুঝেছি তাতে করে এইটুকু আপনাদের আমি জোর দিয়েই বলতে পারি যে, পাকিস্তানের জনগণ এখন আর ভারতবিরোধী নয়। তারা সত্যি সত্যি ভারতের সঙ্গে বন্ধুভাবে বসবাস করতে চায়। আমি ভারতে এসে বিভিন্ন পর্যায়ের লোকের সঙ্গে আলাপ আলোচনান্তে এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, ভারতীয়রাও পাকিস্তানবিরোধী মনোভাব পোষণ করে না এবং পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুভাবেই বসবাস করতে চায়।

উভয় দেশের মানুষই পরস্পর মিত্রভাবে বসবাস করতে চায়, অথচ তা কার্যতঃ হচ্ছে না। এর কারণ কি? হতে পারে উভয় দেশের নেতৃবৃন্দ এবং রাজনীতিকদের এই ব্যাপারে কোথাও কিছু একটা অসুবিধা আছে। তবুও তাদের মিলিতভাবে এবিষয়ে সমাধানে আসতে হবে।

আমার বিশ্বাস এই দুই দেশের মধ্যে যে মিত্রতার বন্ধন স্থাপিত হচ্ছেনা তার মূলে কাজ করছে বৈদেশিক শক্তি—যেহেতু এই দুই

দেশের মধ্যে মৈত্রীর বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হলে কোনো কোনো বৈদেশিক শক্তির কাছে তা অসুবিধার কারণ হয়ে উঠতে পারে।

যদি উভয় দেশের মধ্যে মৈত্রীর বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয় তবে দেশ রক্ষা ব্যাপারে যে বিপুল অর্থ ব্যয় হয় সেই অর্থ শিল্পোন্নয়নে ও অর্থ নৈতিক পুনর্গঠনে ব্যয়িত হতে পারে এবং তা যদি হয় তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আগামী দশ বছরের মধ্যে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান বৈষয়িক উন্নতিতে অনেক দূর এগিয়ে যাবে এবং বিশ্বের দরবারে তাদের যথোপযুক্ত স্থান করে নেবে। কেবল তাই নয়, উভয় দেশের মধ্যে মৈত্রীর বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হলে কাশ্মীর সমস্যা, ফরাক্কা সমস্যা কোনো সমস্যা বলেই মনে হবে না। সব কিছুর তখন সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে এবং কাশ্মীর রক্ষার ব্যাপারে যে অর্থ ব্যয় হয়—তা অন্যান্য গঠনমূলক কাজে ব্যয়িত হতে পারবে। উভয় দেশের মধ্যে মৈত্রীর বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হলে ফরাক্কা দিয়ে পাকিস্তানের যতটা জল প্রয়োজন ভারতবর্ষ তা তাকে দেবে। ভারতবর্ষ উত্তর বঙ্গকে মরুভূমিতে পরিণত করতে কখনই চায় না; বরং ভারতে স্বার্থে উত্তর বঙ্গকে শস্য ভাণ্ডারে পরিণত করবে এবং তা দ্বারা ভারতবর্ষও যথেষ্ট উপকৃত হবে।

সমগ্র ভারতে আমার বন্ধুবান্ধব এবং নেতৃবৃন্দ যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, আপনারা পাক-ভারত মৈত্রী বন্ধন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হউন। এটা মনে রাখবেন যে, উভয় দেশের মধ্যে এই মৈত্রীর বন্ধন এবং মধুর সম্পর্ক সকলের স্বার্থেই প্রয়োজন। বন্ধুগণ, আমি কিছুটা দুঃখের সঙ্গেই আর একটা ব্যাপারে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি। ভারতবর্ষ একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র—এখানে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা কেন ঘটবে? ভারতে যখন সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ঘটে তখন পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অত্যন্ত দুঃশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটায়; মেয়েরা বিনিদ্র রজনী যাপন করে। পাকিস্তান ইস্লামিক রাষ্ট্র, সেখানে আমাদের সমানাধিকার নেই। তৎসত্ত্বেও আমরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় পাকিস্তানকে মাতৃভূমি বলেই মনে করি। ভারতবর্ষে সাত কোটি মুসলমান। ভারতে যারা সাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন তাদের একথা জানা

উচিত যে, তারা এই সাত কোটি মুসলমানকে ধ্বংস করতে পারবে না। আর যদিও বা তারা এস্থান ত্যাগ করে তবে ভারতবর্ষ দুর্বলই হইবে।

আমার মুসলমান বন্ধুরা বলেন যে ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র; কাজেই তারা এখানে সংখ্যালঘু নয়। পাকিস্তানে হিন্দুরা সত্যি সত্যি সংখ্যালঘু যেহেতু পাকিস্তান ঐস্লামিক রাষ্ট্র। ভারতবর্ষে মুসলমানরা হিন্দুদের সঙ্গে সমান অধিকার ভোগ করে। এখানে তাঁরা গভর্ণর, জজ বা উচ্চপদস্থ কর্মচারী হতে পারেন, এমন কি গণতান্ত্রিক ভারতের প্রেসিডেণ্টও হতে পারেন। কিন্তু পাকিস্তানে আমরা এরকমটা কল্পনাও করতে পারি না।

আমি ভারতীয় মুসলমানদের বলবো তারা যেন তাঁদের সত্যিকারেব ভারতীয় বলে মনে করেন, ভারতবর্ষকে যেন তাঁরা তাঁদের মাতৃভূমি বলে মনে কবেন, কারণ তাঁদের সকল স্বার্থ, সকল শুভাশুভ ভারতেরবর্তমান ও ভবিষ্যতের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। আমবা পাকিস্তানী। আমরা চাই পাকিস্তান বড় হোক। আমরা পাকিস্তানে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র চাই এবং পাকিস্তানেই গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্টার জন্যে আপ্রাণ সংগ্রাম করে চলেছি। পাকিস্তান যদি বড হয় তবে আমরাও বড হবো এবং আমরা আমাদের পাকিস্তানী বলে ঘোষণা করতে গর্ববোধ করব। (হর্ষধ্বনি)

আজ যদিও আমি পাকিস্তানী নাগরিক কিন্তু ভারতবর্ষ যখন ব্রিটিশের অধীন ছিল তখন ইন্দো-পাক মিলিত এই অখণ্ড মহাদেশের স্বাধীনতার জন্য আমিও সংগ্রাম করেছি। আজ দেশ স্বধীন—একজন স্বাধীনতা-সংগ্রামী হিসাবে আমি অজাকের ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়কে এর জন্য গর্ববোধ করতে বলবো। আমি মনে করি এ উপদেশ দেওয়ার অধিকার আমার আছে। কারণ আজ তারা যে স্বাধীনতা উপভোগ করছে সে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আমি একজন। উভয় দেশের যুবসম্প্রদায়ের কাছে আমি এই আবেদন রাখবো যে তারা যেন সাম্প্রদায়িকতার বিরদ্ধে সংগ্রাম করে, সংগ্রাম করে অনগ্রসরতার বিরুদ্ধে এবং সর্বোপরি চেষ্টা করে শৃঙ্খলা-পরায়ণ হতে, যাতে করে তাদের মাতৃভূমি জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করে।

পরিশিষ্ট অংশটুকুর মুদ্রক :- দি নিউ ওরিয়েন প্রেস, কলিকাতা-৪০।

সংযোজন ঃ কৈফিয়ৎ

দোর্দণ্ডপ্রতাপ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের সেনা-পুলিশ-গোয়েন্দার প্রখর বেষ্টনীর মধ্যে যাঁদের অতি সঙ্গোপনে, নিঃশব্দ পদসঞ্চারে চলতে হ'ত মন্ত্রগুপ্তিই ছিল তাঁদের জীবনমন্ত্র। নিজেকে দেশমাতৃকার মুক্তিবেদীমূলে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে হবে—এটাই ছিল সেদিনের গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলন, গোপন বিপ্লবী সংগঠনগুলির কঠোর, অনড়, নির্দেশনা। কাজেই দীর্ঘ প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে যে সহস্র সহস্র মহাব্রতী সেই মুক্তি-আহবে অকুতোভয়ে নিজেদের সঁপে দিয়েছিলেন তাঁদের অধিকাংশেরই সন্ধান, তাঁদের দুঃখ-লাঞ্ছনার কাহিনী অজ্ঞাত, হয় তো বা অজ্ঞেয়ই থেকে যাবে।

বিপ্লব তাপস মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত বীর মুক্তিসেনাদের একটি তালিকা তাঁর রচিত পুস্তকের পূর্ববর্ত্তী সংস্করণে সংকলন করেছিলেন। একথা জানাই ছিল, তিনিও জানতেন যে ঐ তালিকাটি খুবই অসম্পূর্ণ। এও তিনি বুঝেছিলেন তালিকা সম্পূর্ণ করা কারও পক্ষেই সম্ভব হবে না।

আমরা সেই পুস্তকের বর্তমান সংস্করণে আরও কিছু বিপ্লবী যোদ্ধার নাম সংগ্রহ করে মূল তালিকার সঙ্গে সংযোজিত করে দিলাম। জানি এও অসম্পূর্ণ। ভবিষ্যতে যদি কেউ তার পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে পারেন তবে তিনি বিপ্লব ইতিহাসের এক অমূল্য সম্পদ রচনার গৌরবে নিজেকে মণ্ডিত করার আশীর্বাদ লাভ করবেন।

সেই স্বপ্ন ও প্রত্যাশা বুকে নিয়ে আমরা এবারের কাজ শেষ করলুম। [প্রকাশক]

ঢাকা

অনিল দাশগুপ্ত, অসিত ভট্টাচার্য, অনিল ভট্টাচার্য, অমরেন্দ্র রায়, অনিল গাঙ্গুলী, অনন্ত চক্রবর্ত্তী, অনন্ত সেন, অনিল মুখার্জী, ডাঃ অনিল সেনগুপ্ত, অমূল্য সেন, অনিলকুমার বসু, অধীর নাগ, অমল রায়, অমরেন্দ্র দাশগুপ্ত, অমূল্য দত্ত, অমূল্য ঘোষ, অতুল সেন (কবিরাজ), অমূল্যরতন দাস, অনিল সাহা, অবিনাশ সাহা, আশু চক্রবর্ত্তী, উমেশ চক্রবর্ত্তী, কানাই রুদ্র, কুমুদ দাশগুপ্ত, কুলদা রায়, কেদার মিত্র, কৃষ্ণপদ চক্রবর্ত্তী, কালিচরণ সাহা, কানাই দত্ত, খুশী সেন, গণেন্দ্র ভট্টাচার্য, গৌরাঙ্গবসু, গোকুল দাস, গোপাল গুপ্ত, গরিমা সেন, গিরিজা চক্রবর্ত্তী, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরুদাস সাহা, গুরুগোবিন্দ দত্ত, জীবনকৃষ্ণ মৌলিক, জীতেন মৌলিক, জ্যোতিষ গুহ, জীতেন মল্লিক, জীবন চক্রবর্ত্তী, তারাপদ ধর, তিমিরহরণ মুখোপাধ্যায় (ছোটকা) তারক সাহা, দ্বিজেন রায়, ধীরেন গাঙ্গুলী, ধীরেন রায়, ধীরেন দত্ত, ননী ঘোষ, নীরদ চক্রবর্ত্তী, ডাঃ নারায়ণ চক্রবর্ত্তী, নিখিল দাশ, নলীন্দ্র সেন, নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, নগেন ভট্টাচার্য, নিরুপম কুশারী, নির্মল সেন, নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ নগেন্দ্র দাস, নন্দগোপাল পাল, নরেন্দ্র বসু, ডাঃ পবিত্র রায়, পরিমল ভট্টাচার্য, পরিমল বসু, প্রশান্ত সেন, পরেশ গাঙ্গুলী প্রফুল্ল (কালা) গাঙ্গুলী, প্রফুল্ল সেন, প্রফুল্ল রাহা, নীহার চ্যাটার্জী, ডাঃ নগেন দাস, ফণীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নরেশ গুহ, বারীন দত্ত, বেণু ধর, বিপুল বসাক, বসন্ত রায়, বঙ্কিম ব্যানার্জী, ব্রজেন ভৌমিক, বীরেন চক্রবর্ত্তী, বলাই রুদ্র, বিনয় চক্রবর্ত্তী, বনমালী ঘোষ, বলাই দাশগুপ্ত, রমেন্দ্র গুহ, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, ভূপেশ ব্যানার্জী, ভূপেশ চক্রবর্ত্তী, ভরত দাস, বারীন ঘোষ, মনোজ নাগ, মাখন পাল, মিহির ভট্টাচার্য, সন্তোষ চক্রবর্ত্তী, যোগেশ বিশ্বাস, জ্যোতীশ চক্রবর্ত্তী, রাইমোহন পোদ্দার, রবি মৌলিক, রঘুনন্দন বসাক, রাধাবিনোদ দাস, রমেশ চক্রবর্ত্তী, রবীন্দ্র সাহা, শান্তি বসু, ডাঃ শৈলেন রায়,

শশধর ঘোষ, শিশিরশ্যাম রায়, শিশির সেন, শান্তি ব্যানার্জী, শম্ভু পাল, শ্যামবিনোদ পাল, সুবোধ বসু, সুবিমল রায়চৌধুরী, সত্যেন ব্যানার্জী, সঞ্জীব চৌধুরী, সুধাংশু বসু, সন্তোষ ভট্টাচার্য, সুবোধ আচার্য্য, সুনীলবরণ রায়, সুধীন্দ্র ধর, সাধন চট্টোপাধ্যায়, সুনীল কুমার বসু, সুধাময় ঘোষ, সুধাংশু রায়, সুরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, সুনীল নন্দী, সুনীল বসু (জুনিয়র), সত্যেন গুহ, সুখেন্দু সেন, সমরেন্দ্র দাস, সত্যেন দাস, সুনীলা সেন, সন্তোষ ঘোষ, সুধীর কুশারী, সত্য বসু, হীরেন রায়, হরিদাস দাশ, হরিপদ ব্যানার্জী, হেমন্ত দেব, হেমলতা ঘোষ, শান্তগোপাল রায়, হরিপ্রসন্ন দে, সুধীন্দ্র মজুমদার, সুধীন্দ্র ধর, সুধীর ঘোষ, সুকুমার বিশ্বাস, সীতারাম বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বামী তুরিয়ানন্দ (ব্যাঙ্কক) সুবোধ নাগ, সুবোধ দাস, ক্ষীরোদ দাস, ক্ষণিকা সেন, নলিনী সোম।

ফরিদপুর

অজিতলাল মজুমদার, অমূল্যরঞ্জন কালী, অতুলচন্দ্র ঘটক অমূল্য দে, অমিয় চ্যাটার্জী, আব্দুল হামিদ, আশুতোষ ভরদ্বাজ, অশ্বিনীকুমার দাস, অবনী লাহিড়ী, অমূল্য মিত্র, অবলা নন্দী, অমলাংশু সেন, অনন্ত চক্রবর্তী, অনিল দত্ত, আশুতোষ চ্যাটার্জী, অমল সান্যাল, (রাজবাড়ী), ইন্দুভূষণ আচার্য, উপেন্দ্রচন্দ্র দাস, অনিল কুমার পাল, কালাচাঁদ ব্যানার্জী, (কানাভাই), কালীপদ মৌলিক, কালীপদ বশিষ্ঠ, কালীপদ সিং, কালীদাস চ্যাটার্জী, কামাক্ষ্যাচরণ ভট্টাচার্য কিশোরী মোহন বণিক, কালাচাঁদ সেন, কৃষ্ণ চক্রবর্তী, (হরিঠাকুর), কেদারেশ্বর সেন (কুড়াশী), কালাচাঁদ দে, (কোটাপাড়া), কাপ্তান সেন, কাশীশ্বর ভট্টাচার্য, ক্ষিতীশ ভট্টাচার্য, ক্ষিতীশ চক্রবর্তী, ক্ষিতীশ বণিক, গৌরীশঙ্কর ব্যানার্জী

গিরীন্দ্রনাথ ব্যনার্জী, চিত্তরঞ্জন রায়, চিত্তরঞ্জন সান্যাল, চুনীলাল মুখার্জী, জিতেন গাঙ্গুলী,জীবন দে, জীবন ধূপী,জীবন আচার্য, জীবন কর, জানকী দে সরকার, জ্ঞান কর, তারকেশ্বর ভট্টাচার্য, তেজেন্দ্রনাথ সেন, দেবেন্দ্র বিজয় দত্ত, দশরথ ব্যানার্জী, দিব্যেন্দু মুখার্জী, নারায়ণ ব্যানার্জি, নিশিকান্ত পাইন, নেপাল চক্রবর্তী, নীহার রায়, নলিনী চক্রবর্তী, নারায়ণ চৌধুরী, নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, ননীগোপাল মুখার্জী, নিরঞ্জন ঘোষাল, নেপাল দাস, নেপাল মুখার্জী, নরেশচন্দ্র দে সরকার, নলিনী আচার্য, নীলকৃষ্ণ কুণ্ডু, নীলকৃষ্ণ চৌধুরী, নগেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, নগেন দর্জি, নিবারণ তালুকদার, নিত্যগোপাল কংসবণিক, নৃপেন রায়, নলিনী দে, নিকুঞ্জ দত্ত, নলিনী গুপ্ত, (রতনদিয়া), প্রফুল্ল নারায়ণ সান্যাল, প্রতাপ চন্দ্র দে, প্রবোধ কুমার ঠাকুরতা, প্রভাত কুসুম ভাদুড়ী, প্রভাত দাস, প্রফুল্ল রায়, প্রবোধচন্দ্র রায়, পুলিন নাগ প্রফুল্লকুমার সেন, (পালং) পরেশচন্দ্র ঘটক, প্রিয়নাথ সরকার, পুষ্প চ্যাটার্জী, ফনী লাহিড়ী, ফটিক চক্রবর্তী, ফনী সেন, বিজয়কুমার পাল সরকার, বিনয় সেনগুপ্ত (ডাঃ), বীরেন্দ্রকুমার আতর্থী, ব্রজেন সাহা, বিরজা ভট্টাচার্য, বিনয় রায়, (ইদিলপুর), বৃন্দাবন দাস, ভূপেন্দ্রনাথ দাস, মনোমোহন সাহা, মনোমোহন চক্রবর্তী, মোহিনী গুহ, মতিলাল নন্দী, মনীন্দ্র আচার্য, মুকুন্দ কংসবণিক, মাখন কর, মনীন্দ্র পাল, মনীন্দ্র আতর্থী, মনোরঞ্জন দে সরকার, মনোরঞ্জন চৌধুরী, যামিনীকান্ত ঘোষাল, যোগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, যোগেশচন্দ্র দে, যামিনী সরখেল, যতীন আচার্য (ফেনু), যাদব চৌধুরী, যতীন ঘোষ (ইদিলপুর), যামিনী লোদ (বালুচরা), যতীন চ্যাটার্জী, যজ্ঞেশ্বর দাস, যজ্ঞেশ্বর দাশগুপ্ত, যোগেশ চ্যাটার্জী, রেবতী গুণ, রমণীমোহন কুণ্ডু, রমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, রাজেন ঘোষ, রমেন পাল চৌধুরী, রাধেশ্যাম সাহা,রাখাল দাস, রণজিৎ তালুকদার, রমেশচন্দ্র আচার্য, শ্যামলাল গোস্বামী, শ্যামেন্দ্র ভট্টাচার্য, শচীন্দ্র লাল দাস, শান্তি ভদ্র, ডাঃ সুবোধ ব্যানার্জী, সতীকান্ত মুখার্জী,

সুধাংশু দত্ত, সত্যরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুশীল চক্রবর্তী, সরোজকুমার সেন, সন্তোষকুমার শীলদাস, সন্তোষ চ্যাটার্জী, সত্যবিনোদ পাল, সূর্যকান্ত ঘটক, সত্য সেন, সুরেশচন্দ্র পোদ্দার, ডাঃ সুবোধকুমার সেনগুপ্ত, সুধীর সরকার, সুবোধ সাহা, সুধারঞ্জন মিত্র, হরিদাস ব্যানার্জি, হরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, হীরালাল দাস, হরিপদ কুশারী, হিমাংশু সেন, হরপ্রসন্ন ঘোষ, বীরেন্দ্র মুখার্জী, সত্যরঞ্জন ব্যানার্জী, হরিপদ বসু, নিখিল চৌধুরী, নিতাই কর্মকার, অজিত মুখার্জি, ডাঃ হেমু চক্রবর্তী।

মহিলা

হর্ষবালা দেবী (চৌধুরী), হাস্যবালা দেবী, হেমপ্রভা দেবী, সৌদামিনী দেবী, সরোজিনী দেবী, বনলতা চক্রবর্তী, নির্মলা আতর্থী, নিরুপমা আচার্য, নির্মলা সান্যাল, সুষমা চক্রবর্তী, দুর্গামণি পাইন (নিশি পাইনের মা), কমলা আচার্য, শোভারাণী দে সরকার, আভা আচার্য, সুবর্ণ দত্ত।

বরিশাল

অনিলদাস চৌধুরী অনিল সেন অনিল চ্যাটার্জি অনিল দাশ-গুপ্ত অনিল বসু অনিল দত্ত অনন্তকুমার সরকার অনন্তপ্রসন্ন রায়চৌধুরী অনন্ত ব্যানার্জি অনন্ত সরকার অনন্ত সেন অমিয়কুমার সেন অমিয় বসু অবলা নন্দী অমলাংশু সেন অমূল্য দাশগুপ্ত অমূল্য দাস অমূল্য উকিল অমূল্য ঘোষ অমূল্য চন্দ অন্নদা চক্রবর্তী আশু মুখার্জী আবুলকালাম সামসুদ্দীন অমলগোপাল সেন অরুণ সেনগুপ্ত (ব্যাঙ্গা) ৵অরুণ সেন অরুণ দাশগুপ্ত অরুণ ঘোষ অতিন দে অরবিন্দ গুহঠাকুরতা অতুল দাস অজিৎ ঘোষ অজিৎ বসু অনিল চ্যাটার্জী অবিনাশ দাশগুপ্ত ইন্দু মজুমদার ইন্দু দাশগুপ্ত উপেন্দ্র

চন্দ্র ঘোষ কুঞ্জলাল বসু কুলেশ সরকার কালাচাঁদ চক্রবর্তি কালাচাঁদ ঘোষ কালাচাঁদ ভট্টাচার্য কৃষ্ণলাল চ্যাটার্জী কৃষ্ণকান্ত মুখার্জী কৃষ্ণ সেন কেষ্ট দাশগুপ্ত কেষ্ট ব্যানার্জী কেশব চক্রবর্তী কেশব গাঙ্গুলী কার্তিক চ্যাটার্জি কালিপদ ভট্টাচার্য কিশোরী দাস করুণাবন্ধু মুখার্জী কালীশ পণ্ডিত কানাই কর্মকার কামাক্ষ্যা গাঙ্গুলী খোকন চক্রবর্তি ক্ষিরোদ কর খগেন চক্রবর্তী খগেন দাস খালেক খান ক্ষিতীশ গুহঠাকুরতা ক্ষিরোলাল সরকার গোপাল পাল গোপাল ভট্টাচার্য গোপাল নাথ গৌরাঙ্গ ঘোষ গুরুদাস ঘোষাল চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত চিত্তরঞ্জন সাহা চিত্তরঞ্জন পাল (মাখন) চুনী সোম যতীন চক্রবর্তী যতীন ঘোষ যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (হারাধন) যতীন্দ্রনাথ বসু যতীন ভট্টাচার্য (গুরখা) জ্যেতিরীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (নাড়ু) জ্যোতিমুকুল ঘোষ দস্তিদার জ্যোতিপ্রসাদ ব্যানার্জি (নুটু) জ্যোতি পাল জিতেন দাস জিতেন সমাদ্দার জিতেন ভট্টাচার্য (জুরান) জিতেন সিংহ জিতেন ব্যামার্জী জিতেন ব্যনার্জি (ডাঃ) যোগেন কর্মকার যোগেন্দ্র দাশগুপ্ত জগৎ গুপ্ত যশোদা ঘোষ যাদব চক্রবর্তী জগদীশ চক্রবর্তী জীবন চক্রবর্তী জগবন্ধু ব্যানার্জি জনার্দন চক্রবর্তী জাহাঙ্গীর খান (পেশকার) জ্ঞান দত্ত জ্ঞানরঞ্জন চ্যাটার্জী ত্রৈলোক্যনাথ সরকার ত্রৈলোক্যনাথ বসু তপন চ্যাটার্জী, শ্রীমতি তনিমা দাশগুপ্তা, দেবেন্দ্রনাথ কর্মকার, দেবেন্দ্রনাথ গুহ ঠাকুরতা (ডাঃ). দেবেন্দ্রনাথ দাস, দেবেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী (দেবু), দেবেন রায়, দেবেন (হোমিও ডাঃ) দেবপ্রসাদ ব্যানার্জি (পুটু), দেবকুমার ব্যানার্জী, দেবব্রত সেন, দেবীপ্রসাদ বর্মন, দেবীপ্রসাদ দাস, দিলীপকুমার ব্যানার্জী (ডাঃ) দিলীপকুমার ঠাকুরতা, দুর্গামোহন সেন, দুর্গা ব্যানার্জী দীনবন্ধু ঘোষাল, দশরথ ব্যানার্জী (ফরিদপুর), দাশরথী ব্যানার্জি, দ্বিজেন্দ্রনাথ দাস (পটলা), ধীরেন্দ্র ঘোষ, ধীরেন্দ্র দত্ত, ধীরেন গাঙ্গুলী, ধীরেন মুখার্জী, ধীরেন নাগ, ধীরেন্দ্র গুহঠাকুরতা, ধূর্জটি

নাগ, নরেন সাহা (ডাঃ), নরেন ঘোষ, নরেন বসু. নরেন সেন, নরেন গাঙ্গুলী, নরেন সেন (শ্রমিক নেতা), নরেন সরকার, নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (ডাঃ), নরেশ দাশগুপ্ত, নগেন নন্দী, নলিনী সেনগুপ্ত নলিনী ঘোষদস্তিদার, ননী ঠাকুরতা ননীগোপাল সেন, ননী দাস, ননীগোপাল চৌধুরী, নির্মলগোপাল সেন, নির্মল দাশগুপ্ত, নির্মল ঠাকুরতা, নির্মল ঘোষ, নির্মলকৃষ্ণ ঘোষ (নন্তু), নির্মল সেন (বাংলাদেশ), নির্মল গুহঠাকুরতা (প্রফুল্ল), নিত্যগোবিন্দ চক্রবর্তি, নিত্য বসু (কাশীশ্বর), নিবারণচন্দ্র ঘোষ, নিখিলেশ দত্ত, নিরঞ্জন বিশ্বাস, নীহার দত্ত, নৃপেন ব্যানার্জী, নৃপেন ঠাকুরতা, নারায়ণ দাশশর্মা, নারায়ণ দাস, নারায়ণ চন্দ, নারায়ণ চক্রবর্তি, নকুল গুপ্ত, নারায়ণ কর্মকার, নগেন বক্সী, পরেশচন্দ্র সাহা, পরেশ রায়, পরেশ ব্যানার্জি, পরীক্ষিৎ রায়, প্রফুল্ল মুখার্জী, প্রফুল্ল সেন, প্রফুল্ল পাল, প্রফুল্ল রায়, প্রবোধ গুহঠাকুরতা, প্রবোধচন্দ্র গুপ্ত, প্রণবকুমার ঘোষ, প্রমোদ দাশগুপ্ত (ফরিদপুর), প্রশান্ত কর (ফটিক), প্রিয়লাল রায়, প্রিয়বন্ধু ব্যানার্জী, পৃথ্বীশ ঘোষ, পিয়ারী মোহন দাস, পিয়ারীলাল ভট্টাচার্য, প্রেমরঞ্জন সেনগুপ্ত (Capt), প্রেমরঞ্জন দাস, প্রেমাংশু দাশগুপ্ত, প্রাণকুমার দে, প্রাণকুমার দাস, পান্নালাল দাশগুপ্ত (ফরিদপুর), পান্না সাহা, পিনাকী নাগ, পূর্ণেন্দু দত্তরায়, পঙ্কজ মুখার্জী, পরেশ মুখার্জী, ফণী সরখেল, ফণী রায়, বসন্ত কুমার দত্ত, বনমালী দাস, বঙ্কিম চ্যাটার্জি, বলাইচাঁদ বসু, বলরাম বসু, শ্রীমতি বনলতা সেন, বিপুল কুমার মুখার্জী, বিমলেন্দু চক্রবর্তী, বিধুভূষণ দাস (কুট্টি), বিমল মজুমদার, বীরেন্দ্রনাথ চন্দ, ডাঃ বিনোদবিহারী গুহ (সুনু), বিমান ব্যানার্জী, বিনোদ গুহ ঠাকুরতা, বিজন ব্যানার্জী, বিমল রায় (ফণী), বিমলা চক্রবর্তী, বিমলেন্দু চক্রবর্তী, বিজয় মুন্সী, বিজয়কৃষ্ণ ব্যানার্জী, বীরেশ দাশগুপ্ত, বিরাজ মোহিনী দেবী, বীণাপানি দেবী, ব্রজেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী, ব্রজেশ্বর গাঙ্গুলী, বেলা চাটার্জী, বীরেন দাশগুপ্ত (সাধন), বঙ্কিমচন্দ্র দাস,

বিধুভূষণ দত্ত বিনোদ চক্রবর্তী ভবানী ব্যানার্জী ভজন দাশগুপ্ত ভূজঙ্গ বসু ভুপেশ সরকার ভপেশ গুহঠাকুরতা ভূপেন দে ভূপেন দত্ত মন্মথ দাস মতিলাল চক্রবর্তী মনীন্দ্র সেন (কবিরাজ) মনীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী মহেন্দ্র সরকার মৃত্যুনেশ সরকার মনোরঞ্জন পুতুতুণ্ড মনোরঞ্জন চক্রবর্তী মুকুন্দ বসু মৃন্ময় গুপ্ত মন্মথ গাঙ্গুলী মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা মনষা গাঙ্গুলী মাধব দত্ত মানিক ঘোষ মনষা চক্রবর্তী মহেন্দ্র নাগ মনোরঞ্জন দাস মনোরঞ্জন সেন মনোরঞ্জন বসু মহেন্দ্র সরকার মিহির সেন মনীন্দ্রনাথ গুহ মাখন ঘোষ দস্তিদার রাজেন দাস রমণীমোহন দাস রাজেশ্বর গাঙ্গুলী রমেশচন্দ্র সাহা রমেন বিশ্বাস (ভজু) রমেন পাল চৌধুরী রমেন দাস (গোপাল) রজনী চ্যাটার্জী রমাপ্রসাদ বর্মণ রামজীবন গাঙ্গুলী রাজেন দাস (১) রাজেন্দ্রলাল নাথ (পাগলা) রমেশ রায় রানী দেবী (চক্রবর্তী) রমেন সেনগুপ্ত (প্রঃ) (ফটিক) রামচন্দ্র দাশগুপ্ত রমেশ বসু লক্ষ্মী গাঙ্গুলী লীলা চ্যাটার্জী লাবণ্যপ্রভা চ্যাটার্জী লাবণ্য পাল সুধীন দত্ত শচীন গুহঠাকুরতা (ছোট) সুধীর দাসশর্মা সুধীর সমাদ্দার সুশীল দাশগুপ্ত সুখরঞ্জন বিশ্বাস সুরেশচন্দ্র দত্ত সুধাংশু দাশগুপ্ত (বাবু) সুনীলকুমার চক্রবর্তী সুচারুপ্রভা গুহঠাকুরতা সরোজাভা নাগ সুরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী সুধাংশু দত্ত সচ্চিদ গুহঠাকুরতা সুধীর ঘোষ সুধাংশু আইচ সুকুমার চক্রবর্তী শিবু গাঙ্গুলী সুবোধ গাঙ্গুলী সূর্যকুমার গুহঠাকুরতা সুশীল ঘোষ শিশু দত্ত সুকুমার মুখার্জী সুধাংশু সেন শৈলেন গাঙ্গুলী শৈলেশ চক্রবর্তী (কুট্টি) সুরেন সমাদ্দার সুনীলকুমার আইচ সুধীরচন্দ্র দাস (শর্মা) সত্যব্রত সেন শৈলেন সেন (ডাঃ) শান্তি ভট্টাচার্য সুধীর রায় সতীপ্রসন্ন গাঙ্গুলী (কানু) সুবোধ রায়চৌধুরী শৈলেন গাঙ্গুলী (মন্মথ গাঙ্গুলীর ভাই) সুধীর দত্ত (মোনা), সুধীর গুহ ঠাকুরতা, সরোজ দাস (ফন্তু) সুধীর চক্রবর্তী (দেহেরমতি), সুবোধ মুখার্জী, শান্তি দাস, সুধীর সরকার, সৌরেন দত্তগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, শান্তি ঘোষ, শান্তি দে,

শচীন বসু, সাধন ভট্টাচার্য, সুধীর দাশগুপ্ত, সত্যেশ্বর মুখার্জী, সুরেন দাস, শক্তি ব্যানার্জী, স্নেহময় চৌধুরী (ডাঃ), শঙ্কর দাশগুপ্ত, শিশির ঘোষ, শ্যামলাল চ্যাটার্জী, সত্যগোপাল গুহঠাকুরতা, সুলতান খান (নুরুল) শোভা বসু রায়, সত্যরঞ্জন দাশগুপ্ত (প্রঃ) সত্যেন ব্যানার্জী শান্তি দত্ত সুচন্দ গুহঠাকুরতা সাধনানন্দ গুহঠাকুরতা সুধাংশু চক্রবর্তী সুশীল সরকার সুকুমার ঘোষ সুরেন সরকার সুরেশ গাঙ্গুলী শশী ঘোষদস্তিদার সুধন্য ইন্দু সত্যব্রত সেনগুপ্ত সুধীর ঘোষাল শংকর কর্মকার শান্তি গুপ্ত সুধীরচন্দ্র দাস সুনীল দত্ত শান্তিরঞ্জন ব্যানার্জী সুধাংশু ভট্টাচার্য সতীশ চক্রবর্ত্তী হেমচন্দ্র দত্ত হেমন্ত চক্রবর্তী হেমন্ত চ্যাটার্জী হরেন্দ্রকুমার ঘোষ হারাধন দাস হরিভূষণ নাথ·হিমাংশু দাশগুপ্ত (কালা) হীরালাল চ্যাটার্জী হরিভূষণ দাস হীরামোহন চ্যাটার্জী হিমাংশু বসু হৃষিকেশ গাঙ্গুলী হরিপদ দে হরলাল গাঙ্গুলী হর্ষনাথ পাল হৃষিকেশ ভট্টাচার্য হেমচন্দ্র বসু হরিবন্ধু ঘোষাল ডাঃ হরবিলাস চ্যাটার্জী হেমন্ত কর্মকার হরেন সমাদ্দার হিমাংশু সেনগুপ্ত (তীনু) হরি দাস হীরেন সেনগুপ্ত।

ত্রিপুরা (কুমিল্লা)

অবিনাশ ভট্টাচার্য, অনন্ত দে (ছোট), অবনী ভৌমিক অবনী ভট্টাচার্য, অনিল রায়চৌধুরী, অজিত সেন, অনিল কর (চিনু), অবনী দে, আশু ভদ্র, অবিনাশ ভৌমিক, আশা চক্রবর্তী, অমূল্য চ্যাটার্জী, অমিয় দাস, অজিত দত্ত, অমল দাশগুপ্ত, অনিল কর, ইন্দ্র ভট্টাচার্য, ইন্দু চক্রবর্তী, উপেন চক্রবর্তী, উপেন চৌধুরী, (পুটু), কিরণময় ভৌমিক, কমল রায়চৌধুরী, কুমুদ সেন, কান্তি সেন, কান্তিদেব বর্মণ, কৃষ্ণপ্রসাদ সেন, কল্যাণী সেন, গোপাল দত্ত,

গোবর ব্যানার্জী, খগেন ধর, খগেন গুপ্ত, চিত্ত রায়, চন্দ্রশেখর দাস, দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত, জগবন্ধু ভট্টাচার্য, জিতেন ভট্টাচার্য, জ্যোতিরীন্দ্র মজুমদার, ধীরেন ধর, ধীরেশ ঘোষ, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, ধীরেন চক্রবর্তী, ধীরেন সাহা, জ্যোতীশ মজুমদার, জ্যোৎস্না সিংহ জিতেন সরকার, জিতেন্দ্র দত্ত, ধীরেন দে, নির্মল সেন, নির্মল নন্দী, নিকুঞ্জ পাল নিবারণ দত্ত ননী দত্ত ননী সাহা নগেন দেব নীহার চক্রবর্তী নারায়ণ চক্রবর্তী নির্মল দাস তারিণী মজুমদার তপেন গাঙ্গুলী দ্বিজেন্দ্রবিজয় রায় নলিনী দত্ত নরেন্দ্র রায়চৌধুরী নরেশ দেব নিবারণ পোদ্দার ডাঃ নলিনী রায়চৌধুরী দ্বিজেন্দ্রলাল সিংহ প্রফুল্ল নন্দী প্রভাত চক্রবর্তী প্রবোধ চক্রবর্তী পবিত্র পাল প্রেমাংশু চৌধুরী প্রভাত রায়, পরেশ চ্যাটার্জী, সুকুমার চৌধুরী সুকুমার ভৌমিক প্রফুল্ল সেন প্রতুল দত্ত প্রবোধ কর ফনিভূষণ মজুমদার ভূপেন্দ্র সরকার ভূপেন দাস পূর্ণেন্দু সেনশর্মা বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য বীরেন দত্ত ব্রজেন চক্রবর্তী বিনোদ দাস বিমল গুহ ললিত চক্রবর্তী ললিত দত্তগুপ্ত মুকুল মিত্র মনীন্দ্র দেব মহি পাল মাখন দাশগুপ্ত মনোরঞ্জন রায় (বড়) মনোরঞ্জন রায় (ছোট) মাখন চক্রবর্তী মনোরঞ্জন কর যোগেশ চ্যাটার্জী যদুনাথ ভট্টাচার্য যতীন রায় যমুনা দে যতীন চক্রবর্তী হরিপদ ভট্টাচার্য হরেন্দ্র ভট্টাচার্য হেমেন সেন হীরালাল পাল হরিদাস দে হেমেন্দ্রবিজয় রায় হরিভূষণ মজুমদার হরিকুমার রায়চৌধুরী হিরণ্ময় ভৌমিক হরলাল সাহা রণজিৎ চৌধুরী রাখাল কর রবীন্দ্র ভট্টাচার্য রাধারমণ মিত্র রাইচরণ চক্রবর্তী রমেশ রায় রাজকুমার রায়চৌধুরী রাসমোহন চক্রবর্তী নীরদ দত্তগুপ্ত শৈলেশ চ্যাটার্জী সুরেন রায় শচীন ঠাকুর সুশীল ভট্টাচার্য শচীন্দ্রনাথ দত্ত সুশীল দেববর্মন শচীন মজুমদার শীতল দাস সুধীর ভট্টাচার্য সত্যেন রায় (ননী) শৈলেন রায় শচীন রায় সুবোধ গুপ্ত স্নেহময় দত্ত স্বর্ণরেনু দত্ত সুরথ পালচৌধুরী

শশধর দত্ত সরোজ চক্রবর্তী সুখময় কর (দাদু). শরৎ নাথ স্বদেশ দেব শচীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য শিশির সেন সুভাষ দাশগুপ্ত পারুল মুখার্জী প্রতিভা রায়চৌধুরী (ভদ্র) উষা মুখার্জী·সুপ্রভা কর (ভদ্র) কনক ভট্টাচার্য বিভা সিংহ জাহানারা বেগম শেফালী দত্ত (বসু) অজিত রায় অচ্যুতানন্দ রায় আশুতোষ রায় বিরজা প্রসন্ন রায় হরেন্দ্রচন্দ্র রায় (হারান) গোপীবল্লভ সাহা হেমন্ত সিংহ নির্মল সিংহ প্রেমসাধনা রায় উষা চৌধুরী (হাসি) অমূল্য দে ধীরেন দাশগুপ্ত জগদীশচন্দ্র দাস কালীমোহন দে বিমলাংশু মজুমদার মেদিনী চৌধুরী নির্মল দত্ত অরুণ সেন নরেশ চক্রবর্তী, যোগেন্দ্র ভৌমিক, সুধাংশু রায়, মনমোহন ঘোষ (পচা), কালিভূষণ দত্ত, বিরজা রায়, তরু রায় (দত্ত)।

চট্টগ্রাম

অধীর দাশ, অহিভূষণ চৌধুরী, অশ্বিনী গুহ, অনিল গুহ, অমরপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী, অলকেন্দ্র নন্দী, অমল নন্দী, অবনী ঘোষ, আরতি দত্ত, আশুতোষ ভট্টাচার্য, আদিনাথ দাশ, অরবিন্দ দত্ত, ইন্দুভূষণ সেন, কানাইলাল নন্দী, কল্পতরু সেনগুপ্ত, ডাঃ কালিকুমার দাস, করুণা দত্ত, কালিপদ দে, কুমুদ চৌধুরী, গণেশ দাস, চন্দ্রশেখর দে, চিত্তরঞ্জন হোড়, চিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য, চট্টলেশ চৌধুরী, চারুবালা চক্রবর্তী, জ্যোৎস্না দে, জ্যোৎস্না নন্দী, জ্যোতির্ময় দত্ত, ধীরেন্দ্রলাল কানুনগো, দুর্গাকিঙ্কর ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল নন্দী, ডাঃ দেবেন্দ্র মজুমদার, তেজেন্দ্রলাল রক্ষিত, তেজেন্দ্র নন্দী, ধীরেন্দ্র দাশগুপ্ত, নগেন্দ্রবিজয় চৌধুরী, নগেন্দ্রলাল দাশ, নিরঞ্জন নন্দী, নরেন দাশ, নির্মল পাল, নরেন্দ্রলাল চৌধুরী, নক্ষত্রভূষণ নন্দী, নরেশ দাশ,

নিরঞ্জন দাশ নীরদবরণ দাস ননী দাশ নিকুঞ্জ দে নির্মল দত্ত ডাঃ নগেন্দ্রলাল রক্ষিত শহীদ প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী নীরদবরণ দত্ত প্রাণকুমার চক্রবর্ত্তী প্রফুল্ল পাল প্রোঃ প্রকৃতি বড়ুয়া প্রশান্ত দাশগুপ্ত প্রভা দাশ প্রীতিকণা নন্দী প্রফুল্ল মল্লিক প্রিয়দা সাহা প্রিয়দা মিত্র বিজয় বড়ুয়া বঙ্কিম নন্দী বঙ্কিম দাস বঙ্কিম দত্ত বিহারী বড়ুয়া বীরেন্দ্র চক্রবর্তী বিজন• বিহারী ঘোষ ডাঃ বিনয়ভূষণ নন্দী বিশ্বেশ্বর চৌধুরী বিভূতি বিশ্বাস বারীন রক্ষিত বিমল নন্দী বসুধা রক্ষিত বিমলেন্দু চক্রবর্তী বিজন দত্ত মনোরঞ্জন দাস ডাঃ মনীন্দ্র দাশগুপ্ত ডাঃ মনীন্দ্রলাল চক্রবর্তী মোক্ষদারঞ্জন দাস মতিপ্রভা দত্ত মনোরঞ্জন চৌধুরী মনীন্দ্র চৌধুরী মথুরেন্দ্র নন্দী যতীন্দ্র ভট্টাচার্য যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত যামিনী সেন ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী ডাঃ যোগেশচন্দ্র দে যতীন সরকার রমণী চৌধুরী রবি সেন রমণী শর্মা রমণী দেব লালমোহন দত্ত রাজেন বড়ুয়া ডাঃ হরিপদ ঘোষ হরিপদ দত্ত হেম ভট্টাচার্য হরিপদ চক্রবর্তী হাসি দত্ত হেমেন্দু দাস হিমাংশু দাস হৃদয় সেনগুপ্ত হেমেন্দুবিকাশ নাগ সতীশ সেন সঞ্জীব সেন যতীন্দ্র হোড় সুরেন্দ্রলাল চৌধুরী সান্ত্বনা গুহ সুধাংশু হোড় সুধাংশু বিশ্বাস শাক্যসিংহ বড়ুয়া সুধাংশু কাঞ্জিলাল সাতকড়ি দাশ সুধীর দাশ সুশীল খাস্তগীর (আই এন এ) সরিৎ গুহ, সুধাংশু মজুমদার, সুনীতি নন্দী, সুধাংশুবিমল দত্ত, সুভাষ দত্ত, সুধাংশু সরকার, শচীমোহন বড়ুয়া, সন্তোষ ভট্টাচার্য, শ্রীপতি নন্দী, শশীবিনোদ দাশ, শান্তি ঘোষ, শশাঙ্ক মজুমদার, শশাঙ্ক দাস, সীতানাথ সেন, সুচারু সেন, স্নেহাংশু সাহা, সারদা ভট্টাচার্য, সুবোধবিকাশ দত্ত, সন্তোষ ভট্টাচার্য, হরিহর দত্ত।

নোয়াখালী

লোকনাথ চক্রবর্ত্তী. বারীন্দ্র বর্ধন, প্রমোদ রায়চৌধুরী, উমেশ রায়, ডাঃ শান্তিময় শূর, হরেন্দ্র দাস, রমেশ চক্রবর্ত্তী, শ্যামময় দত্ত, সুশীল রায়চৌধুরী, ফণীন্দ্রবিকাশ রায়চৌধুরী, মুকুন্দ সাহা, রমণী সাহা, নক্ষত্র মজুমদার, ডাঃ সুবোধ সাহা, নীলকৃষ্ণ সাহা, মথুরা বণিক, দক্ষিণা মজুমদার, মাখন দাস, ভূপেন মজুমদার, নীলকণ্ঠ সাহা, অজিত রায়, সুকুমার চক্রবর্তী, প্রমোদ চৌধুরী, ননী চক্রবর্তী, কেশবলাল চক্রবর্তী, যামিনী মজুমদার, ক্ষিতীশ পাল, নিশি চক্রবর্তী, কাশীশ্বর দাশগুপ্ত, সুখেন্দু ভট্টাচার্য, সন্তোষ আইচ, ডাঃ যোগেন চক্রবর্তী, যোগেশ মজুমদার, নরেন্দ্র চক্রবর্তী, নলিনী চক্রবর্তী, বরদা মজুমদার।

খুলনা

অহিভূষণ ভট্টাচার্য্য, অবনীকুমার সরকার, অনিল কুমার সেনগুপ্ত, কেষ্ট চক্রবর্ত্তী, নলিনী ভঞ্জ, নিকুঞ্জ ভঞ্জ, নির্মল রায় চৌধুরী, নীহারকণা রায় চৌধুরী (সেন), নির্মল ভঞ্জ, বিপিন দাস, বাসন্তী দেবী, রমানাথ ব্যানার্জ্জি, রণদা রায়চৌধুরী, শিবপদ রায় চৌধুরী, সুশীল চক্রবর্ত্তী, গিরীশ দাস, মনোরঞ্জন ভঞ্জ, সুশীলা বসু, হেমচন্দ্র ভঞ্জ, সুধীর মুখার্জ্জি, মুকুন্দ ভঞ্জ, হীরেন রায়চৌধুরী, সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, অনিল ঘোষ।

রাজশাহী

ননী মৈত্র বিজন সেন সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার বাণীকান্ত চক্রবর্তী অনিল বটব্যাল সুরেন দাশগুপ্ত প্রেমনীহার নন্দী, যজ্ঞেশ্বর রায় ডাঃ সুধীন রায় (আই, এন. এ) বাণীকান্ত চক্রবর্ত্তী নির্মল রায় পৃথ্বীশ বাগচি তাতা চৌধুরী।

জলপাইগুড়ি

বীরেন দত্ত বিজয় হোড় সুবিমল দত্ত বীরেন চৌধুরী শচীন দত্ত ডাঃ ক্ষীরোদ চ্যাটার্জী ক্ষিতীশ বসু সুপ্রকাশ দত্ত।

ময়মনসিংহ

নরেন ঘোষ অমর রায় কিরণ দে তরুণ মজুমদার সুরমা মজুমদার অমলেন্দু বাগচি মনমোহন সাহা ব্রজেন ব্রহ্ম যতীশ দত্ত।

বাকুড়া

সিদ্ধেশ্বর সাঁই রামসত্য মুখার্জী দেবীদাস বিশ্বাস বীরেম সিং দেব ষষ্ঠী সরকার অনিল মুখার্জী প্রফুল্ল কুণ্ডু চন্দ্রনাথ বিশ্বাস নীরদবরণ দে।

মেদিনীপুর

বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ শশধর পাল শিবপ্রসাদ পাইন বিবেক বসু কিশোরী সরকার সুরেন্দ্র দে রাধাগোবিন্দ ভঞ্জ সুধীর ভট্টাচার্য শচীন মাইতি সুরেন মাইতি অজিত বসু।

দিনাজপুর

ভবেশ ব্যানার্জী কালিদাস ব্যানার্জী নৃপতি চ্যাটার্জী সত্যব্রত চক্রবর্তী সরোজ বসু ঋষিকেশ ভট্টাচার্য ফাল্গুনী মিত্র ডাঃ কাদের সুবোধ দত্ত কালিপদ সরকার লালু পাণ্ডে সরোজ গুপ্ত কুমুদ রায় শচীন্দ্র চক্রবর্তী কুলদা চক্রবর্তী রামকৃষ্ণ সরকার অশোক ঘোষ শশধর সরকার (মণ্ডল)।

পাবনা

ব্যোমকেশ লাহিড়ী সুধীন সরকার বিমল চক্রবর্তী সমর লাহিড়ী রাজেন লাহিড়ী (কাকোরী) রমেশ চাকী।

রংপুর

মনীশ সেন দীনেশ মৈত্র দীনেশ গুহ সরোজ ভট্টাচার্য শচীন বল সুধীর বল সন্তোষ মৈত্র দেবেন অধিকারী বিজয় সেনশর্মা যতীশ ভৌমিক ক্ষিতীশ বিশ্বাস।

বগুড়া

অর্ধেন্দু বসু সুধীন্দু চ্যাটার্জী সুবোধ লাহিড়ী নিতাই কুণ্ডু ক্ষিতীশ কুণ্ডু সুপ্রভা চ্যাটার্জী (গুপ্তা)।

কলিকাতা

জীবনতারা হালদার বিশ্বনাথ মুখার্জী দেবেন ঘোষ ক্ষোভ চৌধুরী প্রবীর ঘোষ ক্ষিতীশ সেন মজুমদার (শ্রীহট্ট) ভূপেন ঘোষ (দাশ) বিনয় রায় সুধীরকৃষ্ণ দাস বীরেন দাশগুপ্ত পরীক্ষিৎ রায় বীরেন সেন রূপক গুহ শচী মজুমদার বরেণ দাঁ বীরেন সেন চিত্ত বল সরোজ রায় হিতিব্রত রায় জ্যোতি রায় অসিতাভ গুহ চিত্ত গুহ মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য শূলপানী চক্রবর্তী দেবজ্যোতি বর্মন শরদিন্দ বসু সুধীর পাল শিশির বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৪ পরগণা

পূর্ণ রায় গোলাম কুদ্দুস সাবেরা খাতুন (দিদি) হরিসাধন ঘোষ নৃপেন মজুমদার অনিল ঘোষ কালী দাস মুস্তাক মিঞা।

ব্রহ্মদেশ

চণ্ডীচরণ নাগ (ত্রিপুরা) ভবানীপ্রসাদ দত্ত (আদিত্য দত্ত) লালমোহন দে ডাঃ রমেশ ঘোষ ডাঃ বিনয় সেনগুপ্ত কৃষ্ণ চক্রবর্তী নরেশ ঘোষ প্রফুল্ল ভট্টশালী সঞ্জীব মুখার্জী শচীন্দ্রলাল দে লালমোহন ঘোষ হীরালাল দাস জ্যোতিষ মজুমদার অচ্যুতানন্দ দাশগুপ্ত দীনেশ বল খগেশ কর ডাঃ গজেন ঘোষ অনাথ চক্রবর্তী প্রফুল্ল সেন নলিনী দে জিতেশ গুহ সমরেন্দ্র দেব রায় পণ্ডিত ঋষীদেব শর্মা বাবু নারায়ণ দীক্ষিত হরবনস সিং দেশাই (সেক্রেটারী আর্য সমাজ) তলওয়ালকর উ্‌তিন মঙ্‌।

বিহার

সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ রাসবিহারীলাল কৈলাশবিহারী লাল কিশোরীলাল সিং বিভাংশু বসু পূর্ণ চক্রবর্তী সচ্চিদানন্দ জয়ন্ত সরকার মহেশ্বরী লাল দেবেন দাশগুপ্ত রামনারায়ণ, রেবতী নাগ প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য গোপেন চক্রবর্তী দক্ষিণা সেনগুপ্ত বসন্ত বক্‌শী প্রফুল্ল দাশগুপ্ত।

মজঃফরপুর—ব্রজেন ব্যানার্জী কৃষ্ণ চ্যাটার্জী রামবিনোদ সিং ধ্বজাপ্রসাদ সাহ্‌ কামতা প্রসাদ বনোয়ারী প্রসাদ মদন কানোয়ার রামদত্ত সিং সলিশপ্রসাদ বর্মা ভগবতী প্রসাদ।

"ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ ইতিহাস কবে রচিত হবে জানি না, তবে সে ইতিহাস যদি কোনদিন রচিত হয় তাহলে সে ইতিহাসের সকলনের একখানি অতি মূল্যবান গ্রন্থ নিঃসন্দেহে তাঁর গ্রন্থনায় সাহায্য করবে। সে গ্রন্থটি হল ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তীর 'জেলে ত্রিশ বছর'। এই নাতিদীর্ঘ ও বহুল আদৃত গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল।"

*   *   *   *

"মত ও পথের পার্থক্য অনুসারে বিপ্লবযুগে বিভিন্ন বিশ্বাসের জন্ম হয়েছিল এক একটি দলকে ঘিরে। 'অনুশীলন' দল এর মধ্যে একটি। বাংলাদেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে এই দলের আদর্শ একদা যুব সমাজকে অগ্নিমন্ত্রে সঞ্জীবিত করেছিল। 'অনুশীলন'কে শুধু একটি মাত্র স্বতন্ত্র বিশ্বাস সম্পন্ন বৈপ্লবিক দল বললে ভুল করা হবে।

*   *   *   *

এই দলের সম্মুখে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আদর্শ ছিল এবং এই দলের প্রতিটি কর্মীর সামনে তাঁদের বিশ্বাস অনুসারে নতুন সমাজ ব্যবস্থার স্বপ্ন ছিল।"